কাঠের ঘোড়ার সওয়ার

মানব মুখার্জী

দ্বিতীয় প্রকাশ :
এপ্রিল, ১৯৫৯

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্ব[illegible]
আদিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিতকুমার মান্না
পারুল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ঈশিতা-কে

কাঠের ঘোড়ার সওয়ার

এখনই সেই মুহূর্ত, যখন সারা গায়ে শিশির মেখে তারারা নিজেদের আরো উজ্জ্বল করে নেয়। ওদিকে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা অন্ধকার ত্রিভুজ কীভাবে যেন কিছুক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে নীল হয়ে উঠবে। দু-একটা বাধোবাধো কণ্ঠস্বর, দু-একটা পাখার ঝটপটানি, তারপর একসাথে ডেকে উঠবে সবাই। জঙ্গলে কেউ দেরি করে ওঠে না। কিন্তু এখন এই প্রায় অন্ধকারে পাতাগুলো থেকে টুপটুপ করে জমে থাকা রাতের শিশির ঝরে পড়ছে। এক প্রহর আগে যে কাদার ওপর পায়ের ছাপ এঁকে দিয়ে একপাল হরিণ জল খেয়ে গেছে, এখন সেখানে জল খাচ্ছে একটা তৃপ্ত নিঃসঙ্গ চিতাবাঘ। জল খাবার পর দ্রুত জঙ্গলের ভিতরে ঢুকতে গিয়ে চিতাবাঘটা লাফিয়ে উঠল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পড়ে থাকা গোল পাথরটার ওপর, তারপর হঠাৎ কী যেন ভেবে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। মাথা তুলে তাকাল একবার আকাশের দিকে, শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ তখন হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে নদীর জলে। পাথর থেকে লাফিয়ে পড়ে চিতাবাঘটা মিলিয়ে গেল অন্ধকার পাকদণ্ডীতে, যে রাস্তা দিয়ে এদিককার লোকজন বৈশাখ মাসে ভুটিয়াদের মেলায় যায়।

এ জঙ্গলে কী করে হাসনুহানার গন্ধ এল? এ ফুল বিদেশী, এমনকী নামটাও বিদেশী। আসলে কাল সকাল থেকে কানে বাজছে নাটমন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ, এমনকী ধুনোর গন্ধও মাঝে-মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। জঙ্গলের দক্ষিণের পাহাড়টা নাকি শঙ্খচূড়ের আড্ডা। হাসনুহানার গন্ধে কি শঙ্খচূড়রা আসবে? আর এলেই বা কী?

একটু আগে যে পথটা দিয়ে চিতাটা নদী থেকে জঙ্গলে ঢুকল, সেই পথটাকে আড়াআড়ি ভেঙে দিয়ে সে নেমে গেল নদীটার দিকে। সাইবেরিয়া কিংবা বৈকাল হ্রদে যারা দল বেঁধে ফিরে গেছে, তাদেরই দলছুট একজন উড়তে-উড়তে চলেছে। একা, যখন আর কোনো পাখি জাগেনি, এমনকী দুই পাহাড়ের মাঝখানের ত্রিভুজে একটুও রং লাগেনি, তখন সে উড়তে-উড়তে চলেছে। ওড়া দেখেই বোঝা যায় কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ তাকে আকর্ষণ করে না, এমনকী আগামী আলোর পুব দিকেও তার ঘোর অনীহা, কারণ সে উড়ছে উত্তর-পশ্চিমের চুম্বক দেখে। তার লক্ষ্য একটাই—ঘর, যেখানে বাকিরা আছে, সন্তান আছে, আছে আগামী সন্তানের সম্ভাবনা।

নদীতে পা ডুবিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর নদীর জল স্পর্শ করে। দু-হাতে আঁজলা করে জল নিয়ে সে অন্ধকারেই সেই জল দেখে। দেখে, সেই জলের সঙ্গে হাতে উঠে এসেছে ভাঙা চাঁদের টুকরো। যেন স্মৃতির দিকে তাকিয়ে আছে সে। বিশ্বাসঘাতক স্থূল আঙুলের ফাঁক গলে ধরে থাকা জল শীর্ণ স্রোত হয়ে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

হতবাক হয়ে সে দেখে তার স্মৃতিশূন্য হাত। নদীও হেসে ওঠে নিঃশব্দে। সে তখন নদীর জল থেকে উঠে আসে সাদা বালির ওপর। পুব দিকে ঝুঁকে থাকা অর্জুন গাছটাই তার নিশান।

প্রতিটি পাতা থেকে তখন জ্বলন্ত ফসফরাস উড়ে যাচ্ছে জোনাকির মতো, গ্রীষ্মের দুপুরে কাপাস তুলোর মতো। প্রতিটি পাতার প্রান্ত তখন নীলচে আলোয় উজ্জ্বল। সে এসে দাঁড়ায় গাছের নীচে। অনেক দিন ধরে খোঁজবার পরে পাবার আনন্দ তার সারা মুখে ছড়িয়ে। এ সবই তার চেনা। এই স্নিগ্ধ নীল আলো, এমনকী আকাশটা যে গ্ল্যাডিওলার মতো সাদা মেশানো বেগুনি রঙের হয়ে গেল—এ সবই তার চেনা। আকাশের এই রং পৃথিবীর কেউ চেনে না, কিন্তু সে চেনে।

গ্রিলের সঙ্গে বাঁধা থাকত কাঠের ঘোড়াটা, যাতে সে সেটাকে টেনে বাড়িময় করতে না পারে। জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পড়লে, ভাইকে সেখানে শুইয়ে দেওয়া হত। সে বেচারা কখনো ঘুমোত, কখন হাত-পা ছুঁড়ে খেলত। আর কাঁদলেই ঘোড়া ছেড়ে সে ছুটত কান্না থামাতে। কান্না প্রায় কোনো দিনই থামত না, কারণ যে কারণে বাচ্চাটা কাঁদত, তার কোনোটারই সমাধান করার ক্ষমতা তার ছিল না। ওই ছুটে যাওয়াটাতেই ছিল আনন্দ। আর সবচেয়ে মজা হত ভাইয়ের সাথে খেলতে। হাত-পা ছুঁড়ত বাচ্চাটা, আর মুখটা কাছে নিয়ে গেলেই ছোট-ছোট হাত দিয়ে নাক-মুখ খিমচে ধরতে চাইত, বিনা কারণে হাসত। এসব কতক্ষণই বা ভাল লাগে। তার থেকে অনেক ভাল কাঠের ঘোড়ায় বসে দোলা। ওই দুলতে-দুলতে কখন যেন আকাশটা এরকম গ্ল্যাডিওলার মতো সাদা মেশানো বেগুনি হয়ে যেত, সমস্ত রূপকথার গল্পগুলো অন্য রকম হয়ে ভিড় করে আসত। পরীর মতো করে মাকে সেখানেই সে প্রথম দেখেছিল, বাবাকে অবশ্য কোনো দিন দেখেনি। সেই দিন থেকেই সে আকাশটাকে চেনে। এতদিনে সে জেনে গেছে, এই আকাশটাই তার মুক্তি, এই আকাশটাই তাকে সারা জীবন বন্দি করে রেখেছে।

সেই চেনা রঙের আকাশ আবার এসেছে। কোনো মেশিনগানের আওয়াজ নেই, নেই কোনো মর্টারের বিস্ফোরণের শব্দ, এমনকী স্নাইপারের বিচ্ছিন্ন কোনো গুলির আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। 'টি-ই সেভেনটি সিক্স'-এর অপ্রশস্ত কুঠরিতে বসে অনবরত যে কাঁপুনিটা অনুভব করত, সেটাও এখন অনুপস্থিত। সে গাছটার নীচে চাতালের মতো পাথরের টুকরোটায় গিয়ে বসে। সে নিশ্চিত এটাই তার জন্মস্থান।

বিশ্বকর্মা পুজোর মাইকগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

এই আকাশ আর জঙ্গলের প্রতিটি বিন্দুতে কেবল মালকোষ ছাড়া অন্য কোনো সুর ওঠে না।

শুধু তার একটাই ভয়, যদি আবার সেই মানুষটা ফিরে আসে। সেই অসম্ভব সুন্দর আর অহঙ্কারী মানুষটা, যাকে সে খুন করেছে। তারপর তার বুকে মাথা রেখে সারারাত কেঁদেছে। এখনো দুহাত আর কপালে লেগে থাকা গরম রক্ত সে অনুভব করছে। সে মানুষটাকে খুন করতেই চেয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি রঙিন আকাশের বেলাতে সে নিজের অজ্ঞাতে মানুষটাকে বসিয়েছিল পিতৃস্থানে। এখনো বাঁ দিকের কানটা জ্বালা করে। বহুদিন ধরে সে ক্যাম্বিসের বলটা খুঁজছে, পাচ্ছে না। বলটা পড়ুক অফস্ট্যাম্পের বাইরে, ওভারপিচ, তারপর ঢুকে

আসুক মিড্‌লস্ট্যাম্পের ওপর। ব্যাটের সুইট স্পটে বলটাকে কেবল অনুভব করবে, গোটা শরীরের ওজনটা ছেড়ে দেবে এগিয়ে থাকা বাঁ পায়ের ওপর। তারপর ফিরেও তাকাবে না। সাদা বারান্দা আর পেতলের মোটা রেলিং, টবের ওপর কালচে লাল রঙের পাতাঅলা ঝুপসি গাছ, দুটো রেলিঙের ফাঁকে লাসা কুকুরের মুখ, পেছনের দেওয়ালে রাজস্থানি ছবির প্যানেল—কোনো দিকে তাকাবে না। কারণ সে জানে, তিশি বলে কেউ নেই। ওটা তার নিজের কল্পনা। এমনকী তিশির গোলাপি, সাদা আর বাদামি মেশানো আঙুলগুলো, যা এরকম রঙিন আকাশের রাতে সে বারবার স্পর্শ করেছিল তার বহু যুগের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দিয়ে, তাও কল্পনা। তিশির কান থেকে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা জমাট মোমের স্রোতের মতো গলাটার ওপর সে একবার মাথা রাখতে চেয়েছিল, ওটাও কল্পনা। তবু, জ্বরে কপালটা পুড়ে যাচ্ছে, একবার ইচ্ছে করে বুকে কপালটা রেখে মিশে যেতে, নিঃশেষে বিলীন হয়ে যেতে। যা তার জানার কথা না, কিন্তু সে নিশ্চিত জানে ওখানে আছে সেই গন্ধটা, যা মা লুকিয়ে রাখত আলমারিতে, শাড়ির ভাঁজে। অভিমানে কান্নায় গলা বুজে আসে—মা গো, তিশি একবারও এল না। আমি আমার গোটা জীবনটাকে মরুভূমির মতো বিছিয়ে রাখলাম, কিন্তু তিশি একবারও এল না। অভিমান আর কান্নার স্তূপ ঠেলে সে নতজানু হয়ে বসে গাছের নীচে। আলোকিত প্ল্যাটফর্ম যেখানে অন্ধকারে মিশেছে, সেখানে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে গায়ত্রীর ট্রেনের লাল আলো দুটো।

গাছ প্রবল স্নেহে বাতাস বুলিয়ে দেয়, গুনগুন করে কানেব কাছে ঘুমপাড়ানি গান শোনায়, চুলে বিলি কেটে দেয়। আর সে দুরন্ত অবাধ্য ছেলের মতো সব কিছু অগ্রাহ্য করে বলে ওঠে, 'আমাকে শেকড়ে ফিরিয়ে দাও, আমি তো ফুল ফোটাতে পারিনি।'

কিছুক্ষণ আগে পেছনের ঝোপে ঝগড়া লেগেছিল বুনো শুয়োবদের মধ্যে, এখন তারাও চুপ। সেই নিঃসঙ্গ পাখিটাও মিলিয়ে গেছে অভ্রের পাতের মতো মেঘের আড়ালে।

স্নেহশীল পিতার মতো, ঈশ্বরের মতো, সেই মহাপ্রৌঢ় জবাব দিল, 'শুভদের বাড়িতে ক্যামেলিয়া ফুটতে দেখে তুমি সারা জীবন দুঃখ নিয়ে কাটালে, কেন ননীমাধব দে লেনে তোমার বাড়িতে তা ফুটল না—একে কী ভালবাসা বলে?'

'তবে কেন আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের বেডে? তবে কেন আমি সকাল থেকে সন্ধে কাটিয়ে দিলাম অ্যাকাউনটেন্সি আর অডিটিংয়ের বই বেচে? বলো না ভালবাসার জন্য এর বেশি আর কে দিয়েছে?'

'এ তো ভালবাসা নয়, এ তো প্রলোভন, বড় জোর এটা আকর্ষণ।'

তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে অবরুদ্ধ ক্রোধ, 'দেখো বৃদ্ধ, নিজের সন্ততির সাথে কেউ এভাবে কথা বলে না।'

উত্তর আসে সারা আকাশ জুড়ে, সে উত্তরে সম্মতি জানায় প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি শিশিরবিন্দু।

'আত্মজ আমার, আমি তোমাকে দোষ দিই না, তোমরা এক নষ্ট লগ্নের ফসল। তোমাদের সৃষ্টিকালে স্বাতী ঢাকা ছিল মেঘে, আর তাই ভালবাসা আর ঘৃণার সীমান্তরেখা তোমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে আছে। যখন ফুল ফোটাতে পারনি, তখনই শিকড়ের খোঁজ করেছ। যাকে ঘৃণা করা উচিত, তার জন্য গোপনে লালন করেছ তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আর যে, কোনো

উষাকাল থেকে রইল তোমার অপেক্ষায়, যার কাছে গেলেই পেয়ে যেতে শিকড়ের খোঁজ, তাকে করেছ অবজ্ঞা। অবশেষে যখন তার কাছে গেলে, তখন তুমি তার ভাষা ভুলে গেছ, তার গান ভুলে গেছ—তার সময় তোমাকে অতিক্রম করে চলে গেছে বহু দূর। সন্তান আমার, সময় তোমাকে অস্বীকার করছে, তুমি নষ্ট হয়ে গেছ।'

হাহাকার করে ওঠে সে।

জোনাকিরা শেষবারের মতো আলো জ্বালিয়ে ফিরে যাচ্ছে পাতার আড়ালে, দিনের অন্ধকারে। উত্তর দিক থেকে একটা হিমেল বাতাস, নদী ছোঁবে, না পাথর ছোঁবে, তা ঠিক করতে না পেরে শেষ হয়ে গেল বালির একটা ঘূর্ণি তুলে। নদীর জলে ঘাই মারল প্রাচীন মহাশোল।

'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' সে শেষ বারের মতো মিনতি করে, 'তোমার তো গোটা আকাশ জোড়া বিস্তার, লক্ষ পাতায় তোমার অস্তিত্ব। অথচ দেখো আমার স্মৃতিতে একটাই মাত্র শৈশব, আমি নষ্ট করেছি কেবল একটাই যৌবন। তুমি তো জান, আমার একটাই কাঠের ঘোড়া ছিল, আমি একবারই মাত্র ভালবেসেছিলাম। এ হয় না, এ ভাবে শেষ হয়ে যাওয়া যায় না।'

সে আস্তে-আস্তে লুটিয়ে পড়ে, স্পর্শ করে মাটিকে। সময় হয়ে যাওয়ায় চাঁদ নেমে যায় পশ্চিমের গাছগুলোর ওপারে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ধ্বনিত হয় গোটা জঙ্গল জুড়ে।

'হে অমৃতের পুত্র, যাত্রা শুরু করো। ব্যক্তি অস্তিত্বের থেকে নৈর্ব্যক্তিক অমর্ত্যের দিকে। নদীর প্রতিটি বিন্দুর দিকে তাকাও—তারা জানে না, কোথায় যাচ্ছে। তার প্রতিটি স্পন্দনে, প্রতিটি হিল্লোলেই আনন্দ আর দুঃখ। প্রতিটি বিন্দু নদীর সঙ্গে মিশে যায়, নদী তাকে আলাদা করে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নদী জানে, কোথায় সে যাচ্ছে। দিগ্‌ভ্রান্ত বিন্দুর জন্য নদী চোখের জল ফেলে না। তার একমাত্র তৃপ্তি, একমাত্র পাওয়া—সাগর। তুমি নদীর কথা ভাবো, শেকড় খুঁজে পাবে। তুমি বরং সাগরের কথা ভাবো, দেখো ফুল ফুটবে।'

সান্ত্বনার অঝোর বর্ষণে সে সিক্ত হয়। সিক্ত হয় তার রোগক্লান্ত শরীর। সে কেঁদে যায়। এ সান্ত্বনা তার কাছে অর্থহীন, কারণ তার কাছে একটাই জীবন ছিল। সে ক্রমাগত সরে আসতে চায় মায়ের কাছে। সন্ধেবেলা গা ধুয়ে আসার পর মায়ের গায়ে থাকত পাউডারের গন্ধ, ওটাকেই সে জানত মায়ের গন্ধ বলে। জ্বর হলে প্রতিদিন এই গন্ধটাই ছিল তার পরম পাওনা। মাটিতে নাক ঠেকিয়ে সে এবার সেই গন্ধ খুঁজে পায়। তার চেতনায় এই মুহূর্তে কোনো বইয়ের দোকানের কাউন্টার নেই, তিশি বলে কেউ নেই—সে শুধু অনুভব করে তার মাকে। বহু দিন পর, বাবা মারা যাওয়ার পর, এই প্রথম সে মায়ের কপালে দেখতে পায় স্নিগ্ধ সিঁদুরের ফোঁটা। ভাবে, একবার মাকে জিজ্ঞাসা করবে—মা তাকে বেশি ভালবাসে, না ছোটকে বেশি ভালবাসে। আর তারপর মুহূর্তেই নিজের ছেলেমানুষীর জন্য তার নিজেরই হাসি পায়।

এর মধ্যে কেন জানি আকাশের রং পাল্টে গেছে। পুব দিকটা ঘন কালো থেকে আস্তে আস্তে ঘন নীল হয়ে আসছে।

কত দিন সে ঘুমোয়নি! তার বহু যুগের ঘুম পাওনা। একটানা যুদ্ধে সে ক্লান্ত।

সে শুধু অস্ফুট স্বরে বলে, 'মা ইমন গাও-জাগো মোহন প্যারে।'

ইমনের সুর বেজে ওঠে তার সারা শরীরে, সারা চেতনায়। সে সারা মুখে স্মিত হাসি ছড়িয়ে ইমনকল্যাণ শোনে, তার জীবনের প্রথম রাগ, মায়ের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও, যা সে কোনোদিনও ঠিক করে গাইতে পারেনি। ইমনের সুরে চাপা পড়ে যায় বাইরে প্রথম ট্রামের আওয়াজ।

অন্যদিন তাও সকালে টিফিন খেয়ে বেরোতে হয়। কিন্তু অষ্টমীর দিন সকালে কোনো টিফিনের ঝামেলা নেই, অঞ্জলি দেবার জন্য উপোস। মুখ ধুয়েই কালকের ছেড়ে রাখা জামা প্যান্টটা পরে ছুট লাগাতে গিয়েছিল। কিন্তু মা তাকে কোনো সুযোগ না দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল।

'চান করে নতুন জামা-প্যান্ট পরে বেরো।'

পুজোতে তার দুটো নতুন জামা-প্যান্ট হয়। একটা কিনে দেয় মা, একটা দেয় মেজপিসি। আগে মামুও দিত, এখন সে বড় হয়ে যাওয়ায় মামু আর জামা-প্যান্ট দেয় না, গল্পের বই দেয়। মেজপিসির দেওয়া জামা-প্যান্টটা ষষ্ঠীর দিন বিকেল থেকে পরে ছিল, আজ সকাল থেকে মার দেওয়া জামা প্যান্টটা পরার কথা।

'দয়া করে গায়ে একটু সাবান দিও, চেহারা দেখে মানুষের বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে না', বলে মা বেরিয়ে যায়। ভারি বয়ে গেছে সাবান দিতে, মনে-মনে সে ভাবে গায়ে দু-মগ ঢেলেই কাজ সারবে। কিন্তু দরজা বন্ধ করতে গিয়েই মুশকিল। কোথা থেকে ছোট এসে হাজির, এসেই চিৎকার—'দাদা বেরো, আমি আগে চান করব।'

তিন বছরের ছোট ভাই, কিন্তু কে যাবে তার সাথে লড়তে।

'দাঁড়া এক্ষুনি হয়ে যাবে', দরজাটা ভেতর থেকে তাড়াহুড়ো করে বন্ধ করে দিতে-দিতে সে বলে।

দাঁড়ানো ছোটর অভ্যাসে নেই। দুমদুম করে টিনের দরজায় লাথি পড়তে থাকে। রান্নাঘর থেকে মার চিৎকার। কিছুক্ষণ পর লাথি বন্ধ, কিন্তু আবার মায়ের চিৎকার, 'ছোট খুব খারাপ হবে, চান না করে বেরোবি না, তুই কিন্তু আজ বাবার হাতে মার খেয়ে মরে যাবি।'

চিৎকারের শেষ অংশ শুনেই বোঝা যায়, এই ধমক বা বাবার মারের ভয়, কোনোটাকেই বিশেষ পাত্তা না দিয়ে ছোট রাস্তায়। তার যে কাজ করার সাহস নেই, ছোট সে-কাজই বুক ফুলিয়ে করে যায়। যাই হোক না কেন, নির্ঘাত মার মেজাজ এখন গরম। সাবধানে সময়টা কাটাতে হবে, পুজোর দিনে মারধর খেতে সে মোটেই রাজি না। মাখবে না ভেবেও শেষমেশ কিছুটা সাবানও মেখে নেয়। প্যান্ডেল থেকে মাইকে অঞ্জলি দেবার ঘোষণা শুরু হয়েছে। শোবার ঘর থেকে মায়ের গজগজানি শোনা যাচ্ছে—এই দুই ছেলের জন্যই এবার তার অঞ্জলি দেওয়া হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও কখনোই তার মনে হয় না, এরকম কিছু

হবে, মা ঠিকই অঞ্জলি দিতে পারবে, আর যদি দিতে নাও পারে, তবে তা ছোটর জন্য, তার জন্য না। কিন্তু এ সব বলতে যাওয়াও বিপদ, কাজেই সে ভাল ছেলের মতো জামা-কাপড় পরে নেয়। কিন্তু এতেও সে ছাড় পেল না, মা চান করতে যাবার মুখে বলে গেল, 'আমি না আসা পর্যন্ত বেরোবি না, ঘরে কেউ নেই, দিনকাল খুব খারাপ।'

ব্যস, ঘরে বসে ঘর পাহারা দাও। ছোটটা তো রাস্তায়, আর বাবা সকাল থেকে প্যান্ডেলে। এবার পাড়ার পুজো করছে বড়রা, বাবা তাদের একজন। যারা পুজো করত—বাচ্চুদা, নান্টুদা, ছোটনদা, এরা প্রায় সবাই পাড়া-ছাড়া, যে দু-একজন আছে, তারাও গা-ঢাকা দিয়ে চলাফেরা করে। কদমতলায় অরুণদার চায়ের দোকানের বেঞ্চিগুলো প্রায় ফাঁকাই থাকে। সকাল-সন্ধ্যায় কয়েকজন বয়স্করা এসে বসে, তাও বড় জোর রাত আটটা পর্যন্ত। এবারের পুজোতে তাই হইচই অনেক কম, কিছুটা যেন দায়সারা ভাব। বাবা নিজে কোনো পুজো-আচ্চা করে না, অঞ্জলিও দেয় না। কিন্তু এবার পাড়ার পুজোয় বাবাও আছে।

মা চান করছে তো করছেই। একবার বারান্দা আর একবার ঘর করে তার প্রায় পা ব্যথা। এমন সময় নজর পড়ল খাটের কোণে ভাঁজ করে রাখা মায়ের নতুন শাড়িটার দিকে। কাঁচের মতো স্বচ্ছ নীল রং আর তার ওপর আকাশি রঙের সুতোর কাজ। কেমন যেন হালকা, স্বপ্ন-স্বপ্ন দেখতে। মা যখন নতুন কিনে এনেছিল, তখনো তার চোখে পড়েনি। এমনকী এবাড়ি-ওবাড়ির মাসিমারা যখন পুজোর বাজার দেখতে এসেছিল, তখনো দু-একবার শাড়িটা দেখেছে—কিন্তু আজ যখন খাটের ওপর শাড়িটা একা, জানালা দিয়ে রোদ এসে তার একটা দিকে পড়েছে, হঠাৎ যেন শাড়িটা অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠেছে। বাথরুমের দরজা এখনো বন্ধ, কাজেই কিছুটা সাহস করেই সে গিয়ে শাড়িটা একবার ছোঁয়, শাড়িটার ওপর হাত বোলায়—এবং তার নাকটা শাড়িতে ডুবিয়ে সে গভীরভাবে শ্বাস নেয়। গন্ধটা মা-মা গন্ধ নয়, অন্যরকম।

আসলে মা যে কী শাড়ি পরে, সে ভালভাবে খেয়ালই করে না। ভাল শাড়ি তো মা পরে বিয়েবাড়ি-টাড়ি গেলে। সে আর কদিন। আর বিয়েবাড়ি থাকলে তার এমন আনন্দ হয় যে, অন্য কোনো দিকে আর খেয়ালই থাকে না। তবে ছুটি থাকলে দু-একদিন দেখেছে, চান করার পর মা হালকা হলুদ রঙের শাড়ি পরে। তখন মাকে খুব সুন্দর লাগে। হালকা হলুদ রংটা মারও বোধহয় খুব পছন্দ। মা খুব ফরসা, হাতের চামড়ার নীচে নীল-নীল শিরা দেখা যায়। পুরনো ছবির অ্যালবামে মা আর মেজমাসির একটা ছবি আছে—মা কী সুন্দর সেখানে, একদম রজনীগন্ধা ফুলের মতো। মা এখনো আগের মতো রোগা-রোগা, বাড়তি শুধু একটা চশমা। অবশ্য মার বিয়ের ছবিগুলো তার একদম ভাল লাগে না। কেমন যেন জবুথবু, জোব্বা চাপানো— সেখানে বাবাও কেমন গোঁফআলা দারোয়ানের মতো। কিন্তু শাড়িটা দারুণ, মাকে নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে। এই সব ভাবতে-ভাবতে মা চান করে বেরিয়ে এল।

সে ঠিক করেছিল, এক সেকেন্ডও না দাঁড়িয়ে ছুট লাগাবে। যদিও নতুন জুতো পরে পায়ে ফোস্‌কা পড়ায় খুব একটা জোরে ছুটতে পারবে না। মা আবার দাঁড় করাল—'দাঁড়া এক সেকেন্ড। কী হবে রে তোর, ক্লাস সেভেনে পড়িস। এখনও চুলটাও ভাল করে আঁচড়াতে পারিস না?'

ছোট্ট বাচ্চাদের মতো তার গলাটা ধরে মা চুল আঁচড়ে দেয়। দেরি হয়ে যাচ্ছে তবু

সে চুপ করে দাঁড়ায়। আসলে চান করে আসার পর মার গা থেকে সাবানের একটা গন্ধ বার হয়, সেটা তার খুব ভাল লাগে। আঁচড়ানো হয়ে গেলে মা বলে, 'লক্ষ্মী বাবা আমার, পারলে ছোটটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে আয়।'

'ও বাবা, ছোটকে ধরে আনা আমার কম্ম না। বেশি কিছু বললে রাস্তাতেই মারপিট শুরু করে দেবে।'

কথার উত্তর না শুনেই সে এবার এক ছুটে রাস্তায়, আর এক ছুটে প্যান্ডেলে। প্যান্ডেলে পৌঁছে সে যখন হাঁফাচ্ছে, তখনই সে বোঝে কিছু একটা হয়েছে। প্যান্ডেলের চেহারা কেমন অন্য রকম। কারণটা জানতে তার সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেন্ড, ভয়-ভয় মুখ করে বাপ্পা এসে সামনের দিকে আঙুল তুলে দেখায় 'দেখেছিস, সি. আর. পি অঞ্জলি দিচ্ছে?'

বিষয়টা এতক্ষণে তার নজরে পড়ে। সে অবাক। সত্যি সত্যি সি. আর. পি-অঞ্জলি দিচ্ছে। এখন অবশ্য সি. আর. পি-র মতো লাগছে না, মনে হচ্ছে একরাম গোয়ালার দলবল। পাঁচ ছটা সি. আর. পি নতুন গেঞ্জি আর নতুন ধুতি পরে এসেছে। একটা আবার টকটকে লাল রঙের স্যান্ডো গেঞ্জি পরা। প্যান্ডেলের বাইরে হাতে বন্দুক নিয়ে আরো সাত-আটটা সি. আর. পি দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় যারা অঞ্জলি দিচ্ছে, তাদের পাহারা দিচ্ছে। পাড়ার পুজো সব সময়ই করেন টিঙ্কুর জ্যাঠামশাই—বেশ উঁচু গলায় রেডিওর মহালয়ার মতো করে মন্ত্র পড়েন। মন্ত্র তিনিই পড়েছেন, কিন্তু সুর একটু কম, ঘনঘন মাথাও নাড়ছেন না। পাড়ার অন্যরাও অঞ্জলি দিচ্ছে, তবে সি. আর. পি-দের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। প্যান্ডেলের ঠিক বাইরে পাড়ার বয়স্কদের একটা জটলা, তার মধ্যে বাবাও আছে ; ছোটটাও বোধহয় ভয় পেয়েছে, সেও বাবার পাঞ্জাবির কোনা একহাতে আর একটা হাতের আঙুল মুখে ঢুকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। গোটা প্যান্ডেলটা জুড়ে একটা থমথমে পরিবেশ, শব্দ বলতে শুধু পুরুতমশাইয়ের মন্ত্রের উচ্চারণ আর তার সাথে বাকিদের অঞ্জলি পড়ার একটা গুনগুন আওয়াজ। একমাত্র এক কোণে সুমিতাদি আর রত্নাদি হাতে ফুল নিয়ে অঞ্জলির দিকে মন না দিয়ে আপ্রাণ হাসি চাপার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে মেয়েগুলো হাসির কী পেল, সেটা সে বুঝে উঠতে পারে না।

একসময় অঞ্জলি শেষ হয়, সি. আর. পি-গুলো বেরিয়ে যায়—কেউ ওদের ডাকেওনি, কেউ ওদের বিদায়ও জানায় না। দলবল বেঁধে সি. আর. পি-গুলো চলে যায় ওদের আস্তানায়। অরুণদার চায়ের দোকানের উল্টোদিকে অনেক দিন থেকে নতুন একটা বাড়ি অর্ধেক হয়ে পড়ে ছিল, ওটাই এখন সি. আর. পি ক্যাম্প। ফল হয়েছে এই, পাড়ার যে জায়গাটা ছিল সবচেয়ে জমজমাট, সেটাই এখন সবচেয়ে ফাঁকা। এমনকী পাড়ার বাচ্চারাও জায়গাটা এড়িয়ে চলে। কারুর বলার দরকার হয়নি, তারাও বোঝে সি. আর. পি মানে ভয়ের জিনিস। অবশ্য ছোটর মতো দু-একজনের খুব সাহস, মোড়ে দাঁড়িয়ে দলবেঁধে চেঁচায়—সি. আর. পি খোট্টা, রাজ্যপালের চোট্টা। কে যে ওদের ছড়াটা শিখিয়েছে, কে জানে?

কিন্তু সে ভাবছিল অন্য কথা। সি. আর. পি-গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক যে লোকটা, তার চুল অর্ধেক পেকে গেছে। অঞ্জলি শেষ হবার পর সে লোকটা অনেক্ষণ হাত জোড় করে চোখ বুজে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। মাও অনেক সময় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'ঠাকুরকে বলছিলাম, আমার ছেলে দুটোকে যেন মানুষ করে।'

এই সি. আর. পি. টা ঠাকুরের কাছে কী চাইছিল? সে কী বলছিল—ঠাকুর, আমি যেন

অনেক ছেলে মারতে পারি? নাকি, দেশে তার মতো ছেলে আছে, বলছিল—ঠাকুর, ছেলেটা যেন মানুষ হয়।

প্রথমে তার যে রকম অবাক লেগেছিল, এখন আর সে রকম লাগছে না। তার এখন ভীষণ ভয় করছে। সি. আর. পি চলে গেছে, তার ভয়টা যায়নি। একবার সে ভাবল বাড়ি ফিরে যাবে—কিন্তু এতক্ষণে মা নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে। বাবার কাছে যাওয়া যায়, তাতে বন্ধুরা আওয়াজ দিতে পারে।

সি. আর. পি পাড়ায় ঢুকলে পেছনের কলোনিতে বেজে উঠত একটানা শাঁখ। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তাঘাট শুনশান, শত গরমের মধ্যেও দরজা-জানালা সব বন্ধ। তারপর রাস্তায় বুটের আওয়াজ তুলে ওরা ঢুকত। তাদের শোয়ার বড় ঘরটা রাস্তার ওপর। দু-ভাইকে ভেতরের ঘরে টেনে এনে মা দরজা বন্ধ করে দিত। চোখ বুজে হাত জোড় করে বিড়বিড় করে কী সব বলত, কখনও দু-ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোনো আওয়াজ না করে মা কেঁদে যেত। মা কেমন জানি অদ্ভুত হয়ে যেত। অধিকাংশ দিনই সে সময় বাবা বাড়িতে থাকত না।

যদি বুটের আওয়াজ আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যেত, তা হলে ভাল। কোনো কোনো দিন লাথি মারত এর-ওর বাড়ির দরজায়। পেছনের কলোনি থেকে নাকি লাথি মেরে দরজা ভেঙে কয়েকটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেলেগুলো আর ফিরে আসেনি। কোনো-কোনো দিন বুটের আওয়াজের সাথে-সাথে পাড়া কেঁপে উঠত বোমের শব্দে। তখন শোনা যেত পাল্টা গুলির আওয়াজ। এই সময় মা কেঁদে উঠত ডুকরে, 'ভগবান, এদের জন্য কি ছেলেগুলো বাঁচতে পারবে না। হে ভগবান, এ তোমার কী বিচার?'

গরমের ছুটির মধ্যে একদিন দুপুরবেলা এরকম গুলি চলার পর অন্তুদের বাড়ির গলিতে একটা ছেলে মরে পড়ে ছিল। সে দেখেনি, শুনেছে গোটা গলিটা নাকি রক্তে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু সে দেখেছে, অন্তুদের বাড়ির দেওয়ালে রক্ত মাখা আঙুলের ছাপ। ছেলেটাকে এপাড়ার কেউ চেনে না, পরে পুলিশ এসে বডিটা নিয়ে গিয়েছিল। সুব্রতদা মারা যাবার পর কদমতলার মোড়ে একটা শহিদবেদি হয়েছিল। এ ছেলেটাকে যেহেতু কেউ চেনে না, এর জন্য কোনো শহিদবেদিও হয়নি। আর মাস তিনেক আগের থেকে সি. আর. পি আর বাইরের থেকে আসে না, পাড়ার ভেতরেই ক্যাম্প করে আছে। পাড়া-ছাড়া হয়েছে দশ-বার জন। যে দিন ক্যাম্পটা হল সেদিনই অরুণদার চায়ের দোকানটা ভাঙচুর করেছিল, আর প্রচণ্ড মেরেছিল অরুণদাকে, অরুণদাকে বাঁচাতে এসে অরুণদার বাবাও মার খায়। সি. আর. পি-র সাথে এ পাড়ার কল্যাণদা আর কলাবাগানের কিছু ছেলেও ছিল। সেদিন থেকে সি. আর. পি-র মতো এদেরও ভয় পেতে শুরু করেছে সে। এখন একটু রাত হলেই পাড়ার রাস্তা ফাঁকা। মেয়েরা তো সন্ধের পর আর বেরোয়ই না প্রায়।

সি. আর. পি এ পাড়ায় আসার পর থেকে সে ভাত খেয়ে খুব ভাল করে হতে ধোয়, যাতে হলুদের দাগ না থাকে। কারণ, সবাই জানে, ছেলেদের ধরে সি. আর. পি-রা হাতে কী সব ঘষে, হাতে বোমার মশলা লেগে থাকলে এতে হাতটা হলুদ হয়ে যায়। সি. আর. পি বুঝতে পারে, এ ছেলে বোমা বেঁধেছে। সে বোমা বাঁধেনি। কিন্তু বলা যায় না, এমনিতেই হাতে হলুদ থাকলে সি. আর. পি যদি ভাবে, সেও বোমা বেঁধেছে। তাছাড়া শম্ভুর মামাবাড়ি বেলেঘাটায়, সেখানে নাকি সি. আর. পি-রা বন্দুকের সামনে ছুরির মতো যেটা লাগানো থাকে, সেটা দিয়ে ছেলেদের

পেট ফাটিয়ে নাড়ি-ভুঁড়ি সব বার করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়েছিল।

সি. আর. পি দেখলে তার ভেতর থেকে কেমন একটা কাঁপুনি দেয়, পেটের কাছটায় কেমন একটা অস্বস্তি হয়। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগে মার জন্যে, সি. আর. পি দেখলে মার চেহারা কেমন পাল্টে যায়। অথচ মা আদপেও ভীতু না, বরং সাহসী। একদিন বিকেল বেলা সে যখন পড়তে গিয়েছিল অনিল-স্যারের কাছে, পাড়াতে সি. আর. পি ঢুকেছিল, প্রচণ্ড বোমা পড়ছিল। ছোটকে ওপরের মাসিমার কাছে রেখে, মা একা এসে দাঁড়িয়েছিল পাড়ার মোড়ে তার জন্য, ওই প্রচণ্ড গুলি আর বোমার মধ্যেই। দেশ ভাগের দাঙ্গার সময় দাদু মায়েদের তিন বোন আর এক ভাইকে নিয়ে পুব বাংলা থেকে এপারে চলে এসেছিল, মা বলে ওই কদিনেই নাকি ভয় ব্যাপারটা চলে গেছে।

বাবার অবশ্য খুব সাহস। বাবা চাকরি করতে যায় সেই কাঁচরাপাড়ায়। শেয়ালদা থেকে দেড় ঘণ্টা। এমনিতেই বাবার ফিরতে রাত সাড়ে সাতটা-আটটা হয়ে যায়। ওদিকে নাকি খুব গণ্ডগোল। মাঝে-মাঝে ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলে ফিরতে বাবার রাত এগারটা-বারটা হয়ে যায়। বাবা তো একাই ফেরে।

এরকম একদিন বাবার ফিরতে দেরি হচ্ছিল। তার আর ছোটর খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায় সাড়ে নটার মধ্যে। ছোটটা তো পারলে সন্ধ্যা সাতটায় ঘুমিয়ে পড়ে, সারা দিন তাণ্ডব করে সেই সময়ই ছোটটা একটু নরম-সরম থাকে। বাবা না ফিরলে সে চেষ্টা করে জেগে থাকতে। কারণ সে সময় মা কিছুটা অস্থির হয়ে পড়ে। আর এখানে সন্ধ্যার পর কান পাতলেই দু একটা বোমার আওয়াজ শোনা যায়। মা একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায়, আর একবার ঘরে ফেরে। তখন অবশ্য অবস্থা এতো খারাপ হয়নি। রাত পর্যন্ত লোকজন রাস্তায় থাকত, আর পাড়ার দাদারা তো অনেক রাত পর্যন্ত কদমতলার মোড়ে আড্ডা মারত। জেগে থাকব জেগে থাকব করেও সাড়ে দশটা নাগাদ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

তাদের বাড়িতে দুটো ঘর। বড় ঘরে মা আর বাবা, ছোট ঘরে সে আর ছোট। নিজের ঘরে গিয়েই সে শুয়েছিল। ছোটর পাশে শোয়াটাও একটা যুদ্ধ। হাত-পা ছড়িয়ে ছোট ঘুমোয়। তাকে সরিয়ে নিজের জায়গা করে নিতে সে ঘেমে নেয়ে একশা হয়।

রাত কটা বাজে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ মা এসে ধাক্কা দিয়ে তার ঘুম ভাঙায় 'ওঠ্, বালিশটা নিয়ে এ ঘরে চলে আয়।'

ছোটটাকেও মা ধাক্কাধাক্কি করে তুলে দেয়। তার প্রথমে মনে হয় বাবার কী তাহলে কিছু হয়েছে? বাবার ফিরতে দেরি হলে তার সবসময়ই ভয় হয়, যদি বাবা না ফেরে? যদি বাবার কিছু হয়? যদি ট্রেনে অ্যাকসিডেন্ট হয়, যদি পুলিস ধরে, যদি বোমা গায়ে লাগে? সে মাকে জিজ্ঞাসা করে,—'মা, বাবা ফিরেছে?'

ছোটর বালিশগুলো গোছাতে গোছাতে মা জবাব দেয়—'হ্যাঁ-হ্যাঁ ফিরেছে।'

বড় ঘরে গিয়ে দেখে বারান্দায় বাবা ছাড়া আরও দু একজন লোক। তাদের মধ্যে একমাত্র সুবীরদাকে সে চেনে। সুবীরদা পাড়ার সবার হিরো, পাড়ার ছেলেদের এক নম্বরের নেতা। কিন্তু বাকিদের সে চেনে না। কী হচ্ছে, সে বুঝে উঠতে পারছে না। কেনই বা এতগুলো লোক এই মাঝরাতে তাদের বাড়িতে। ছোটটা বোধহয় ঘুমের মধ্যেই উঠেছিল, এ ঘরে এসে সটান ঘুমিয়ে পড়েছে। সুবীরদার কথা কানে আসল, 'আপনার জন্য কখন থেকে পাড়ার মোড়ে বসে আছি। দু-বার বৌদির কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে গেলাম। আপনি ফেরেনই না।'

এর উত্তরে বাবা কী বলল সেটা ঠিক শোনা গেল না, শুধু 'অ্যাকসিডেন্ট' কথাটা কানে গেল। এবার সুবীরদা ঘরে ঢুকল, সঙ্গে অল্প বয়সী একটা ছেলে। একটা আধময়লা পাঞ্জাবি পরা। খুব শান্ত ভালমানুষ-ভালমানুষ দেখতে। তাকে জেগে থাকতে দেখে সুবীরদা হাসতে হাসতে বলল, 'ছি-ছি-ছি, তোদের আর পাড়ায় রাখা যাবে না, কলাবাগানের কাছে তিন গোল খেলি?'

এবার ঘুমন্ত ছোটকে দেখে মাকে বলল, 'তোমার এই ছোটপুত্রটি যা হয়েছে না বৌদি, একদম স্প্লিন্টার।'

মা কোনো উত্তর দিল না। এবার ছেলেটাকে সুবীরদা বলল, 'ঠিক আছে, অসীম, তুমি থাকো। আমাদের বউদি খুব ভাল। আর এই দুটো বিচ্ছু রইল, দেখো যদি ক্যাডার বানাতে পার।'

সুবীরদা বেরিয়ে যায়। মা ছেলেটিকে বলে, 'আপনি এ ঘরে আসুন।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে ছেলেটি বলে, 'আমাকে আপনি বলবেন না বৌদি।'

বাবা কেমন চুপচাপ খাটের ওপর বসে থাকে। মা কিছুক্ষণ পর এ ঘরে ফিরে আসে। বাবা কিছুটা থতমত খেয়ে বলতে থাকে, 'দেখো, ওরা যেভাবে বলল তাতে না বলতে পারলাম না। ভাল ছেলে, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, বেচারারা হস্টেলে ঢুকতে পারছে না। আর কয়েক দিন মাত্র থাকবে।'

মা কোনো কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'অনেক রাত হয়েছে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, ভাত বাড়ছি।'

ব্যাপারটা কী হল, এখনো তার কাছে পরিষ্কার না। এত রাতে মা বা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না। কে এই অসীম, কেনই বা মাঝরাতে তাদের বাড়ি এল, কেনই বা তাদের বাড়িতে থাকবে—এরকম নানা প্রশ্ন তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল।

এ ঘরের খাটে চারজন শোয়া যায় না, কাজেই বাবার বিছানা হল মেঝেতে। তার যখন ঘুম এল তখনো পাশের ঘরের আলো জ্বলছিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই যেটা মনে হল, তা অসীম নামের ছেলেটার কথা। মাকে এবার জিজ্ঞাসা করতে হবে। ছোট এখনো ঘুমচ্ছে। রান্নাঘরে মার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। রান্নাঘরে যাবার পথেই চোখে পড়ল ছোটঘরের দরজা খোলা আর ছেলেটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে।

মা চা করছিল। সে এখন কিছুটা বড় হয়েছে, কাজেই সকালে এক কাপ চা সে পায়। মা তাকে দেখে বলল, 'চা পরে খাবি, আগে চা-টা ছোটঘরে দিয়ে আয়।'

প্লেটে করে চা নিয়ে যেতেও তার খুব ভয় হয়, এই বোধহয় চা পড়ে গেল। হাত-টাত কাঁপিয়ে বেশ কিছুটা চা প্লেটে ফেলে সঙ্গের বিস্কুটটাকে ভিজিয়ে চায়ের কাপটা নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। তাকে দেখে ছেলেটা হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'আরে তুমি নিজে আনতে গেলে কেন, আমাকে ডাকলেই তো হত।'

কাপটা তার হাত থেকে নিয়ে ছেলেটা বলল—'বোসো, তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করি। কী নাম তোমার?'

'চন্দ্রশেখর চৌধুরী।'

'ওরে বাবা এত বড় নাম। তোমার ডাক নাম কী?'

'চাঁদু।'

'তোমার ছোট ভাইয়ের নাম কী?'

'রাজশেখর চৌধুরী।'

'ওর ডাক নাম কি রাজু?'

'না-না, ওর ডাক নাম তো ছোট।'

'আচ্ছা, এবার বলো, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?'

'সেভেনে।'

এরপর স্কুলের নাম কী, ক্লাসে কী কী পড়ায়—এইসব হাবিজাবি একগাদা প্রশ্ন। বড় কেউ আলাপ করার সময় যা-যা জিজ্ঞাসা করে সেই সব। এমনিতে এইসব প্রশ্ন তার ভাল লাগছে না, তার ওপর রান্না ঘরে তার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে। সে এখান থেকে যেতে পারলে বাঁচে। কেবল অসীম নামের এই ছেলেটার সম্পর্কে জানার উৎসাহ তাকে এখানে কিছুটা আটকে রেখেছে।

কাল রাতে ছেলেটা যে হালকা খয়েরি রঙের পাঞ্জাবিটা পরেছিল, এখনো সেটাই পরে আছে। কাল রাতে অতটা বোঝা যায়নি, এখন দেখছে পাঞ্জাবিটা সত্যিই ময়লা। খাটের ছত্রিতে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝোলানো। বিছানার ওপর একটা খবরের কাগজে মলাট দেওয়া বই পাতা উল্টে রাখা, বোঝা যায় সে ঢোকার আগে বইটা পড়ছিল। বয়স বোধহয় তার পিসতুতো দাদা সুমনের মতো—বছর উনিশ-কুড়ি হবে। কিন্তু তার অবাক লাগছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ছাত্রের এরকম চেহারা দেখে। সুমনদা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ে, দারুণ স্মার্ট, জামা-কাপড় একদম টিপটপ, লেটেস্ট ফ্যাশানের। আর যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্রের ময়লা পাঞ্জাবি, আর পাঞ্জাবি ফাঁক দিয়ে যে গেঞ্জিটা দেখা যাচ্ছে, সেটা আরও ময়লা, বোধহয় কাচা হয়নি বহু দিন। সে নিজে জামা-কাপড় ময়লা করে বলে মা তাকে জংলি ভূত বলে, তার চোখেও ময়লা লাগছে। কিন্তু ছেলেটা সম্পর্কে আসল কথা কিছুই জানা যাচ্ছে না।

'দাদা ও কে রে?'

হঠাৎ পেছনে ছোটর গলা। এমনিতে বয়সের তুলনায় ছোটর গলার স্বরটা ভারি-ভারি, আর ঘুম থেকে ওঠায় গলার স্বরটা আরো ভারি লাগছে।

ছেলেটা একগাল হেসে জবাব দিল, 'আমি? আমি একজন মানুষ।'

প্রশ্নের ভঙ্গি শুনেই সে বোঝে এই আগন্তুককে ছোটর পছন্দ হয়নি। সে খুব ভয়ে-ভয়ে থাকে, ছোট আবার বেফাঁস কিছু বলে না বসে। এবার ছোটর পরবর্তী প্রশ্ন, 'তোমার কোনো নাম নেই?'

'হ্যাঁ, আমার একটা নাম আছে।'

'কী নাম?'

'অসীম মজুমদার।'

'এখানে এসেছ কেন?'

ছোট এখন গোয়েন্দাদের মতো জেরা করছে। আর ছেলেটা হাসি-হাসি মুখে জবাব দিচ্ছে। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ছোটকে ছেলেটির ভালই লেগেছে। হাসতে-হাসতে ছেলেটি

বলল, 'এই এমনি। তোমাদের সাথে থাকব বলে।'

'কী খাবে?'

'এই, তোমরা যা খাও।'

'আমাদের বাড়িতে কিন্তু রোজ মাছ হয় না।'

ছেলেটা, এবার হো-হো করে হেসে উঠল। আসলে বাড়িতে রোজ মাছ হয় না, এটা ছোটর দীর্ঘদিনের রাগের কারণ। ছোটর ধারণা, এটা শুনে ছেলেটিও রাগ করে চলে যেতে পারে। ছেলেটি এবার হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা রাজশেখরবাবু, আপনাকে আমি ছোট বলে ডাকব, না ছোটবাবু বলে ডাকব?'

এবার ফোঁস করে উঠল ছোট, 'আমাকে বাবু বললে বোমা মেরে মাথা উড়িয়ে দেব।'

ছেলেটা খুব ভয় পেয়েছে এরকম একটা হাবভাব করে বলল, 'না-না বাবা, বোমা-টোমা আমি খুব ভয় পাই। আসলে তোমাকে দেখে আমার বেশ ভয়-ভয় লাগছে, তাই তোমাকে খুশি করার জন্য বাবু বলছিলাম। ঠিক আছে, আমি তোমাকে ছোট বলে ডাকব, তুমি আমাকে তোমার প্রাণে যা চায়, তাই বলেই ডেকো।'

এই সব কথার মধ্যে ছোট ঢুকে গেছে টেবিলের নীচে, তার খেলার জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে। হঠাৎ সেখান থেকে মাথাটা বার করে একটা দুষ্টু-দুষ্টু হাসি দিয়ে বলল, 'আমি তোমাকে হুতোমদা বলে ডাকব।'

হাসতে-হাসতে ছেলেটা জবাব দিল. 'ঠিক আছে বাবা, হুতোমই সই। তাছাড়া ঠিক, আমি তো হুতোম প্যাঁচার মতোই দিনে ঘরের ভেতরে লুকিয়ে থাকি, আর রাতের দিকে একটু ওড়াউড়ি করি।'

অসীমদা যে-রকম হঠাৎ একদিন এসেছিল, সে-রকম হঠাৎই একদিন চলে গেল। রাত দশটা নাগাদ কে একজন জানালা দিয়ে বলে গেল, 'কমরেড অসীম বেরিয়ে আসুন, সি. আর. পি কোম্বিং করছে।'

ঝড়ের গতিতে কাপড়ের ঝোলাটায় জামা-কাপড় আর বইপত্র ঢুকিয়ে ফেলল অসীমদা। তারপর মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলি বউদি, কয়েকদিন খুব জ্বালিয়ে গেলাম।'

মা কোনো জবাব দিল না, বাবা অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করল টাকা-পয়সা লাগবে কি না। কথাটার কোনো জবাব না দিয়ে, শক্ত করে তার কাঁধটা ধরে অসীমদা বলল, 'তাহলে চলি কমরেড গিয়াপ্, লড়ে যাও। ছোটবাবুকে বোলো, আবার দেখা হবে।'

ছোট তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অসীমদা বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর, সে প্রথম পাড়ার রাস্তায় সি. আর. পি-র বুটের আওয়াজ শুনল। গুলি আর বোমার আওয়াজ। অনেকদিন পর সে বাচ্চাদের মতো মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিল। ভয়ে? নাকি অসীমদা চলে যাবার দুঃখে, তা সে জানে না।

অসীমদার সাথে তার আর দেখা হয়নি। অসীমদার খবর দিতে পারত যারা, তারাও দুদিন পর থেকে পাড়া-ছাড়া। কিন্তু সে জানে অসীমদাকে সে কোনোদিন ভুলবে না।

অসীমদা তাকে দাবা খেলা শিখিয়েছে।

অসীমদা তাকে প্রথম ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখিয়েছে।

মার আলমারি থেকে বার করে অসীমদাই তাকে প্রথম পড়ার বইয়ের বাইরে

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পড়িয়েছে।

অসীমদা তাকে জেনারেল গিয়াপের গল্প শুনিয়েছে। এমনকী তাকেই জেনারেল গিয়াপ বলে ডেকেছে।

অসীমদা তাকে অনেক নতুন জিনিস শিখিয়েছে, যা আগে সে জানত না। অনেক নতুন জিনিস দেখিয়েছে, যা সে আগে দেখত না।

কিন্তু সেই রাত থেকেই সি. আর. পি তার বুকের ভেতরে একটা কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

পরের ব্যাচের অঞ্জলি শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু মার দেখা নেই। তার বন্ধু-বান্ধবদের প্রায় সবারই অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেছে। মা না এলে সে অঞ্জলি দেবে না। মাকে অবশেষে যখন প্যান্ডেলে আসতে দেখা গেল—ছোট এক ছুটে মায়ের কাছে। দূর থেকে তার হাত-পা নাড়া দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে উত্তেজিত হয়ে সি. আর. পি-র অঞ্জলি দেওয়ার বিবরণ দিচ্ছে। প্যান্ডেল ঢোকার মুখে মার একটা কথাই সে শুনতে পেল—'বেশ হত যদি তোকে ধরে নিয়ে যেত।'

সে অবশ্য এসব কথা শুনছিল না। সে দেখছিল তার মাকে—সেই নীল শাড়িটা পরে মাকে কী সুন্দর লাগছে! কেমন যেন অচেনা-অচেনা।

অঞ্জলি দিচ্ছিল সে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের পাড়ার পুজোয় ডেকরেশন সব সময়ই করে লাল্টুকাকু। লাল্টুকাকু সিনেমার স্টুডিওতে সেট তৈরি করে। সেখান থেকে জিনিসপত্র এনেই পাড়ার প্যান্ডেল সাজায়। এবার ঠাকুরের পেছনের যে পর্দাটা সেখানে দারুণ একটা ছবি এঁকেছে। দূরে পাহাড়, আর তার সামনে দিয়ে একটা নদী এঁকেবেঁকে সামনের দিকে নেমে এসেছে। নদীটার পাড়ে কাশফুলের বন। তলা থেকে আলো ফেলাতে ছবিটাকে সবসময়ই ভীষণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, মনে হচ্ছে পাহাড়, নদী, আকাশ, কাশ ফুল সব একদম রোদে ধুয়ে যাচ্ছে। মার একপাশে সে আর একপাশে ছোট। ছোট স্নান করেনি, কিন্তু মা ঠাকুরমশাইয়ের কাছ থেকে একটু গঙ্গাজল নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে—এতেই নাকি চানের ব্যাপারটা হয়ে যাবে। মনে-মনে ভাবে, আগে জানলে সেও তাই করতে পারত।

হাতে ফুল নিয়ে সে অঞ্জলির মন্ত্রও শুনছিল না, ঠাকুরও দেখছিল না, সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল পেছনের পর্দার ছবিটা। আকাশের রঙটা এই ছবিতে অদ্ভুত—হালকা নীল আর সবুজ মেশানো। নদীটা ঘন নীল, নদীর পারের ঝোপগুলো হলুদ আর সবুজ মেশানো। কাশ ফুলগুলো সাদা। সামনের কাশ ফুলগুলো আলাদা করে চেনা যাচ্ছে, কিন্তু দূরের ফুলগুলোকে মনে হচ্ছে সাদা একটা ঢেউ।

জোরালো হাওয়ায় কাশফুলগুলো দুলছিল। লাগছিল সাদা ঢেউয়ের সমুদ্রের মতো। নদীটা এখানে বর্ষার সময় অনেকটা ছড়িয়ে যায়, সে জলটা এখনও জমে থাকায় জায়গাটাকে কিছুটা জলার মতো লাগছে। জল এবং মাটি দুটোই ঘন সবুজে ঢাকা, কাজেই ওপর থেকে আলাদা করে বোঝা মুশকিল, কোথায় জল শেষ আর কোথায় জমির শুরু। আকাশটা এখন প্রায় সবুজ, কিন্তু নদীর জলটা আগের মতোই নীল। তীরের ঝোপগুলোতে উড়ে বেড়াচ্ছে উজ্জ্বল রঙের প্রজাপতি ঝাঁকে-ঝাঁকে, নীল আর খয়েরি মেশানো একটা মাছরাঙা একবার জলে ঝাঁপ দিয়ে বোধ হয় কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে গিয়ে বসল তীরের শিরিষ গাছটার

শুকনো একটা ডালের ওপর।

এমন সময় নদীর বাঁক ঘুরে নৌকোটা বেরিয়ে এল। বজরার মতো বড় না হলেও, বেশ বড়। দাঁড়ে টানা নৌকো, কাজেই চলছে খুব আস্তে-আস্তে। একটা নোংরা গেরুয়া রঙের পাল তুলে দিয়ে হাওয়ার গতি নিজের ওপর টেনে নিতে চাইছে—তাতেও যে খুব একটা গতি বেড়েছে তো না। নৌকোটায় লোকজন অনেক—এত দূর থেকে আলাদা করে বোঝা না গেলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে। একটা টকটকে লাল রঙ দেখে মনে হচ্ছে মেয়েরাও আছে তার মধ্যে। এই জলার পেছনে যে গ্রামগুলো আছে তাদেরই লোকজনেরা বোধহয় হাটে যাচ্ছে। এই সকালে হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

আকাশে উড়ে বেড়ানো অসংখ্য চিলের মধ্যে আলাদা করে চিনে নিতে প্রথমে অসুবিধা হচ্ছিল, কিন্তু আওয়াজটা বেড়ে যাওয়ায় সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে খুঁজে পেল। ঘন সবুজের পটভূমিকায় প্রথমে মনে হচ্ছিল চারটে কালো বিন্দু। কিন্তু এই বিন্দুগুলোকে সে চেনে—গানশিপ কোবরা। এই বিস্তীর্ণ নদী আর জলায় এই মুহূর্তে এই বিন্দুগুলোর একটাই লক্ষ্যবস্তু হতে পারে—তা হল নৌকোটা। নৌকোটার দিকে তাকিয়ে মনে হল না আসন্ন বিপদটা তারা নজর করতে পেরেছে। সে দ্রুতগতিতে নিজেদের অবস্থানটা বুঝে নেয়। তাদের ছিপের মতো ছোট নৌকোটা হোগলার ঝোপে এমন ভাবে লুকোনো আছে সেটা বাইরের থেকে খুঁজে পাওয়া কারোর পক্ষে সম্ভব না। তারা তিনজন শুকনো যে ডাঙায় লুকিয়ে আছে সেটাও বাইরের থেকে নজর পড়ার কথা না। নদীটার ওপর নজর রাখার জন্য কেবল সামনের ঝোপটায় কিছুটা ফাঁক করে রাখা আছে। এটা এখন পরিষ্কার, ওরা ব্রেকফাস্টের পর প্রথম শিকার ধরতে বেরিয়েছে। এবং ওদের প্রথম শিকার এই প্রতিরোধহীন দেশী নৌকোটা।

এখন কী হবে সবটাই তার জানা।

নৌকোটা বোধহয় এতক্ষণ তার মৃত্যুদূতদের দেখতে পেয়েছে। জোরালো হাওয়ায় ভেসে আসা সমবেত আর্তনাদও সে শুনতে পায়। নৌকোর লোকেরা এখন আপ্রাণ দাঁড়টা বাইছে, পালটা নামাবার চেষ্টাও হচ্ছে। কিন্তু সে জানে এই সব চেষ্টাই বৃথা। শরৎকালের এই সকালে তারা একটি হত্যাকাণ্ডের নীরব দর্শক হতে চলেছে। চারজনের এই অ্যাডভান্স স্কাউট গ্রুপের সেই নেতা, কিছু করলে সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। সে বোঝে, পাল্টা কিছু করার চেষ্টাটা অর্থহীন। চপারগুলো তাদের রাইফেলের গুলির পাল্লায় আসতেও পারে. গুলি লাগলে বড়জোর একটায়, বাকি তিনটে? প্রথমত, তাদের লুকিয়ে থাকার জায়গাটা ওরা দেখে ফেলবে, এবং পাল্টা আক্রমণ করলে তাদের আত্মরক্ষা করার কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয়ত, যে কাজের জন্য সেই ভোর রাত থেকে এখানে এসে তারা লুকিয়ে বসে আছে, সে কাজটা নষ্ট হয়ে যাবে। তাদের গ্রুপটার কাজ সারা দিন ধরে নদীটার ওপর নজর রাখা। রাতে কতগুলো প্ল্যাটুন নদীটা পার হবে। পার হয়ে কোথায় যাবে, তা সে জানে না। শুধু এটুকু বোঝে জেলা সদরের ওপর কোনো বড় ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে।

এতক্ষণ চপারগুলো উড়ছিল একটা সমান্তরাল লাইন বরাবর পাশাপাশি। এবার তারা আলাদা হয়ে গেল। মাঝের দুটো নদীর ওপর কিছুটা নীচে নেমে এল, আর বাকি উড়ে গেল নদীর দুই তীর বরাবর। নিজের অজান্তেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

বীরপুরুষেরা একটা নিরস্ত্র দেশী নৌকোকে মারতে কত সাবধানতা নিচ্ছে! তীর থেকে যাতে কোনো সাহায্য না আসতে পারে তার জন্য কত ব্যবস্থা। পাশের চপারদুটো মেশিনগান থেকে গুলি চালাতে শুরু করে দিয়েছে। তারা যে ডাঙাটায় আছে। সেটা তীর থেকে কিছুটা ভেতরে। তাছাড়া ওপর থেকে বোঝাও যাচ্ছে না জল কত দূর। ওপর থেকে অন্ধের মতো চালানো মেশিনগানের গুলি যদি গায়ে লাগে, তাহলে বুঝতে হবে তাদের কপাল খারাপ। প্রথম রকেটটা লাগল না, নৌকোটাকে ছাড়িয়ে সেটা পড়ল জলে, একটা ছোটখাট জলস্তম্ভ তুলে। সঙ্গের ছেলেটা ফিসফিস করে বলল, 'শালাদের টিপ দেখো।'

লক্ষ্যভেদ করতে চপার দুটো আরো নিচে নেমে এসেছে। তার এখন আফসোস হচ্ছে, একটা রাইফেলও যদি নৌকোটায় থাকত, তাহলে অন্তত একটা চপারকে ফিরে যেতে হত না। তারা নদীর যে তীরে আছে, সেই তীর বরাবর উড়ে আসা চপারটাকে সে এবার লক্ষ করল। সেটাও যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে। মেশিনগানের গুলির একটা রেখা তৈরি সেটা আসছে। তবে গুলিগুলো পড়ছে তীর ঘেঁষে জলে। এখন একটাই ভয়, গুলি লুকিয়ে রাখা তাদের নৌকোটায় না লাগে। কান ফাটানো আওয়াজ আর দ্রুত ছুটে আসা চপারটার ছায়াটা দেখে সে অভ্যাসবশত মাথাটা নামিয়ে ঘাসের মধ্যে শরীরটা প্রায় মিশিয়ে দেয়। কয়েক সেকেন্ড পর সে যখন মাথা তুলল, তখন নৌকোটার জায়গা নিয়েছে একটা কুণ্ডলী পাকানো আগুন। সেটা ওপরের দিকে উঠে যেতে চোখে পড়ল বিস্ফোরণে টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়া কাঠগুলো জলে এসে পড়ছে, পালটার একটা দিক জলের ওপর উঠে আছে। এত দূর থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই, কোনো মানুষ জীবন্ত অবস্থায় জলে সাঁতার কাটছে কি না। কিন্তু সদ্য পাহাড় থেকে নামা এই খরস্রোতা নদীতে সাঁতার কেটে কেউ বাঁচতে পারবে কি না, এ ব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার দলের তৃতীয় সদস্য যে মেয়েটি, সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে, এবং যথেষ্ট চেঁচিয়েই। চপারগুলোর আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসছে। এক্ষুনি লুকোনো জায়গা থেকে অবশ্য বেরনো যাবে না। কারণ চপারগুলো এই পথেই ফিরবে।

বন্ধুদের দাঁড়াতে বলে সে বাড়ি ফিরে আসে, অঞ্জলি দেবার পর তাকে খেতে হবে।

ফিরে এসে মার ওপর প্রচণ্ড রাগ ধরে গেল। অষ্টমীর দিন সকাল দশটায় খাবার খেতে গিয়েই তার এই ঝামেলা হল। প্যান্ডেলে এসে দেখে, বন্ধুরা কেউ নেই। বাপ্পা মামাবাড়ি যাবে এটা সে জানত, কিন্তু বাকিরা? নিশ্চয়ই তার দেরি দেখে সবাই ঠাকুর দেখতে চলে গেছে। সে এখন একা কী করে? বড়দের গ্রুপে তাকে নেবে না, তাছাড়া ওরা সকালবেলা পাড়ায় বসে আড্ডা মারে, আর রাত্রিবেলা বেরোয়। ছোটদের গ্রুপে তো আর ঢোকা যায়

না। ব্যাজার মুখ করে সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। অথচ সে ভেবেছিল, অনেক মজা হবে। এবারের পুজোতে সে রীতিমতো বড়লোক। মামু এবার তাকে পুজোতে খরচ করার জন্য পাঁচ টাকা দিয়েছিল। এখনো তার কাছে তিন টাকা ষাট পয়সা আছে।

এবারের পুজোতে একা-একা বেশি দূর যাওয়া বারণ। দিনের বেলায় যদিও বা যাওয়া যায়, রাতে তো কিছুতেই না। চারিদিকে প্রচণ্ড গণ্ডগোল। বাবা বলেছে, নবমীর দিন রাতে তাদের দু-ভাইকে নিয়ে ভবানীপুর, গড়িয়াহাট, পার্কসার্কাস, এই সব ঠাকুর দেখিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে তো এখন বড় হয়েছে, বাবার সাথে যাওয়ার থেকে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতেই তার বেশি ভাল লাগে। তারা নিজেরাই একটা নিয়ম তৈরি করে নিয়েছে—এদিকে রেল লাইন আর ওদিকে বড় রাস্তা, এর মধ্যেই তারা ঘোরাফেরা করবে। তার মধ্যে আবার কলাবাগান বাদ। পার্টির ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে দু-পাড়ার ছেলেদের মধ্যে ঝামেলা। তার রেশ দু-পাড়াব ছোটদের মধ্যেও পড়েছে। ওরাও এদিকে আসে না, তারাও ওদিকে যায় না। কলাবাগানে এবার নাকি পুজো হচ্ছে খুব ধূমধাম করে। কাউকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সে ঊর্মি আর গায়ত্রীর সাথেই গল্প করতে শুরু করল। এমনিতে সে ওই মেয়েগুলোকে যে খুব একটা পাত্তা দেয়, তা না। এখন তার কিছু করার নেই। ঊর্মি আর গায়ত্রীই সই।

এমন সময় গাড়িটা প্যান্ডেলের সামনে এসে দাঁড়াল। প্যান্ডেলটা হয়েছে একটা ফাঁকা জমিতে, যার তিনদিকে বাড়ি আর একদিকে রাস্তা। আকাশি রঙের ফিয়াটটা থেকে লোকটা নামল। প্রথমেই তার যেটা চোখে পড়ল, লোকটা ভীষণ ভাল দেখতে। তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর লোক ছিল তার মেজ পিশেমশাই, উত্তমকুমারের থেকেও ভাল দেখতে। কিন্তু এ-লোকটা তার থেকেও ভাল। লোকটা পরে আছে কালো রঙের প্যান্টের ওপর ঘিয়ে রঙের একটা শার্ট। এমনিতেই তাদের পাড়ায় গাড়ি ঢোকে কালেভদ্রে, তার ওপর এই গণ্ডগোলের বাজারে তো আরো ঢোকে না। তাব ওপর তাদের পাড়ার সাথে বেমানান চেহারার একটা মানুষ—উত্তেজনা সৃষ্টি করার পক্ষে এই দুটোই যথেষ্ট।

বাবারা দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিল প্যান্ডেলের সামনেই। লোকটা হাত জোড় করে এগিয়ে গেল সেই ভিড়টার দিকেই। লোকটার গোটা চেহারায় প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, সেটা হল চিবুক। চিবুকটা ভারি এবং মাঝখানটা কাটা। তার ফলে লোকটাকে দেখলেই মনে হয়—রাগী এবং অহংকারী। ঊর্মিটা অনেকক্ষণ থেকে আচার খাবার জন্য বায়না করছিল, সেদিকে কোনো পাত্তা না দিয়ে সে পায়ে-পায়ে ভিড়টার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রথমেই কানে এল বিনয়কাকুর গলা, 'মশাই আপনি কী পাগল? এপাড়ায় এই সময় কেউ জমি কেনে? গণ্ডগোলের ঠেলায় এপাড়া থেকে লোক পালাচ্ছে, আর আপনি এলেন এ সময় মরতে?'

ভদ্রলোক হাসতে-হাসতে বললেন 'কোথায় গিয়ে বাঁচব বলুন, সর্বত্রই এক অবস্থা। মিলিটারিতে কাজ করতাম, বাইরে-বাইরেই কাটিয়েছি। এখন একটা ছোটখাট ব্যবসা করছি। এবার ঠিক করেছি যা হবার হবে, কলকাতাতেই এসে থিতু হয়ে বসব। আর আপনারা তো আছেনই।'

'আমরা কী আর আছি, আসলে সব মরে আছি।' উত্তরটা দিল অন্তুর বড়দা।

এর মধ্যে কে যেন আবার প্যান্ডেলের ভেতরে থেকে একটা প্লেটে ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে এসে দিল। ভদ্রলোক প্লেটটাকে স্পর্শ না করে আঙুল দিয়ে আলগোছে একটা সন্দেশ তুলে

নিয়ে হাতটাকে একবার কপালের কাছে নিয়ে সন্দেশটাকে মুখে ফেলে দিলেন। লোকটার হাবভাব, কথা বলা, এমনকী এই যে প্লেটটাকে না ছুঁয়ে সন্দেশটা তুলে নেওয়া সবই কেমন অন্য রকম। মনে হচ্ছে সবার মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও লোকটা আসলে আলাদা। আর এই আলাদা হওয়াটা লোকটাকে মানিয়ে যাচ্ছে।

এক অষ্টমীর সকালে দু-দুটো ঘটনা, তাদের পাড়ায় হই-চই ফেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এ রকম ঘটনা তাদের পাড়ায় রোজ-রোজ তো ঘটে না। এক, সি. আর. পি-র অঞ্জলি দেওয়া, দুই, একজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারের এ পাড়ায় জমি কেনা। এখন তার মনে হচ্ছে, বন্ধুদের সাথে ঠাকুর দেখতে না গিয়ে ভালই হয়েছে। তার বন্ধুদের গ্রুপে এক মাত্র সে-ই পরের ঘটনাটা নিজের চোখে দেখেছে। কাজেই বন্ধুদের কাছে ব্যাপারটার বর্ণনা দেবার সুযোগ সে একাই পাবে।

দেখা গেল,পাড়ায় একজন মিলিটারি অফিসারের জমি কেনা নিয়ে নানা লোকের নানা মতো। কেউ বলল, আসলে লোকটা সি. আই. ডি-র লোক—সি. আর. পি-র ক্যাম্প বসিয়ে হয়নি, এখন সি. আই. ডি-র লোক ঢোকাচ্ছে। কেউ বলল সি. আই-এরও হতে পারে। কেউ কেউ খুব খুশি। কারণ পাড়াতে এরকম লোক আসা মানে পাড়াটা জাতে উঠছে। আর উর্মি, গায়ত্রী বা টিঙ্কুর মতো পাকা মেয়েগুলোর একটাই কথা—ইস্ কী দারুণ দেখতে। পাড়ার ছেলে এবং মেয়ে, ছোট এবং বড়, সবাই কয়েক দিনে মেতে রইল একটাই বিষয় নিয়ে—আকাশি রঙের ফিয়াটে করে আসা ভীষণ সুন্দর দেখতে একজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসার।

সে এর আগে কোনো মিলিটারির লোককে এভাবে কাছ থেকে দেখেনি। এমনিতে মিলিটারির লোকদের সম্পর্কে তার এতদিনের যা ধারণা, তার সাথে লোকটা খাপ খেয়ে যায়। মিলিটারি মানেই বেশ স্মার্ট, কঠোর একটা ব্যাপার। মিলিটারিতে ছিল মানেই নিশ্চয় লোকটার খুব সাহস, আর যুদ্ধও করেছে। ওই বিষয়টাই তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে। কিন্তু সে একটা বিষয় বোঝে, পাড়ার অন্য লোকেরা, যাদের অনেককে সে জেঠু, কাকা বা মেসোমশাই বলে ডাকে—এ লোকটা তাদের মতো না। পাড়ার লোকদের মধ্যে কাউকে-কাউকে সে পছন্দ করে, কাউকে করে না—কিন্তু যাই হোক না কেন, তাদের সবাইকেই তার কাছের লোক বলে মনে হয়। একে তা মনে হচ্ছে না। অথচ লোকটা মিলিটারির লোক, যুদ্ধ করেছে—এইসব বিষয় জানতে পারলে কী ভাল হত! কিন্তু ঐ মাঝখানে কাটা ভারি চিবুক, সবার মধ্যে থেকেও আলাদা একটা ব্যাপার—তাদের আর লোকটার মধ্যে একটা পাহাড় তৈরি করে দিয়েছে।

এখন একটাই চিন্তা—সামনের বছর পাড়ার পুজোটা কোথায় হবে? কারণ লোকটা পুজোর মাঠটাই কিনেছে—ওখানেই নতুন বাড়ি তৈরি হবে। এমনিতে পাড়াতে নতুন বাড়ি হওয়া মানে ভালই। প্রথম যখন ভিত খোঁড়া হয়, তখন সেখানে নেমে চোর-চোর খেলা যায়। তারপর সামনে বালি পড়লে সেটা আর একটা খেলার জায়গা হয়। ক্রিকেট খেলার উইকেটের সমস্যা মিটিয়ে দেয় নতুন বাড়ির ইট। মাঠটা তাদের বাড়ির লাইনের উল্টোদিকে দুটো বাড়ির পর, কাজেই গোটা ব্যাপারটাই তার হাতের মুঠোয় থাকবে। কিন্তু মাঠটা চলে যাওয়া মানে অনেক কিছু চলে যাওয়া। পেছনে দুটো ডুমুর আর একটা কাপাশ তুলোর গাছ ছাড়া মাঠটা ফাঁকাই। প্রত্যেকবার পুজোর আগে মাঠটা পরিষ্কার করা হয়। তারপর কালীপুজোর কিছু দিন বাদে ওই মাঠে ব্যাডমিন্টনের কোর্ট কাটা হয়—পাড়ার বড়রা রাতে

কাঠের বোর্ডে লাইট লাগিয়ে খেলে। অবশ্য এবার যা গণ্ডগোল, রাতে আদপেও খেলা হবে কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বড়রা রাতে খেললেও তাদের মতো বয়সী যারা, তারা দিনের বেলাতেই খেলে, স্ট্রিং ছেঁড়া র‍্যাকেট আর ভাঙা পালকের ফেদার নিয়ে। আর ব্যাডমিন্টন না খেললে ধার্সি খেলা হয় ঐ কোর্টেই। ডিসেম্বর মাসে অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেলে তারা সন্ধের পর বাইরে থাকার অনুমতি পায়, তখন বড়রা ব্যাডমিন্টন খেলে আর তারা ছোটরা মশার কামড় খেতে খেতে শীতে জবুথবু হয়ে বসে খেলা দেখে। বাবা খেলে না, কারণ বাবার অফিস থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়। দিনের বেলায় তারা মাঠটায় ক্রিকেট খেলে। অবশ্য পাড়ার পেছনের ক্যাম্পের মাঠটা বড়, সেখানে খেলতে বেশি ভাল লাগে। কিন্তু সেখানে তাদের থেকে বড় যে ছেলেরা তারা খেলে, কাজেই তাদের ক্রিকেট খেলাটা হয় এই মাঠেই। এ মাঠে ক্রিকেট খেলা হলেও ফুটবল বারণ, তাহলে আশেপাশের বাড়ির দরজা-জানালা আর আস্ত থাকবে না। কাজেই শীত চলে গেলে মাঠটা ফাঁকা পড়ে থাকে। তখন ধার দিয়ে দিয়ে আকন্দ আর শেয়ালকাঁটার ঝোপ গজায়। শেয়ালকাঁটার ফুলের মতো ঝকঝকে হলুদ রঙের প্রজাপতিগুলো উড়ে আসে, আর আসে ফড়িং। তার ছোট ভাইয়ের মতো বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলো গরমকালে এই মাঠে প্রজাপতি আর ফড়িং ধরে। সে যখন ছোট ছিল সেই তাই করত। ফড়িং ধরে তার ল্যাজে একটা সুতো বেঁধে সুতোর একটা দিক হাত ধরে রেখে ফড়িংটা ছেড়ে দেওয়া হত। তাতে ফড়িংটা উড়ত, কিন্তু সুতো বাঁধা থাকত বলে পালাতে পারত না। ওটাই খেলা। গরমকালে কাপাসফুলগুলো ফট্‌ফট্ করে ফাটত আর তুলোগুলো উড়ে যেত। সেগুলোকে ধরাও একটা খেলা। পিছনের ডুমুর গাছটায় একবার টুনটুনি পাখির বাসা তারা আবিষ্কার করেছিল—ডুমুরপাতা দিয়েই বানানো, ছোট্ট কাপের মতো। ভেতরটা শুকনো ঘাস আর কাপাসতুলো দিয়ে মোড়া, আর তার মধ্যে হালকা সবুজ রঙের ছোট ছোট দুটো ডিম। ঠিক হয়েছিল ডিম ফুটে টুনটুনির বাচ্চা হলে তারা পুষবে। কিন্তু পরের দিন গিয়ে দেখে ডিমসুদ্ধু পাখির বাসা কে তুলে নিয়ে গেছে।

বেশি বৃষ্টি হলে মাঠটা জলে ভরে যায়। নর্দমার সঙ্গে মাঠের জল মিশে যায়। এটা হলে খুব মজা হয়। কোথা থেকে জমা জলে ল্যাটা আর খলশে মাছের বাচ্চা চলে আসে। স্কুল ছুটি থাকলে কারুর বাড়ি থেকে একটা গামছা লুকিয়ে জোগাড় করে মাছ ধরা হয়। সে মাছ অবশ্য কেউ খায় না, হরলিক্‌সের শিশিতে তারা সেই মাছ পোষে। বিশেষত খলসে মাছগুলোর গায়ে বেশ রঙ থাকে। বর্ষাকালে সারা সন্ধ্যায় ব্যাঙ ডাকে মাঠটা থেকে। একবার একটা সাপও পাওয়া গিয়েছিল। সেটা নিয়ে খুবই চেঁচামেচি, সবাই মিলে মারা হল। কিন্তু বড়রা বলল ওটা নাকি আসলে ঢোড়া সাপের বাচ্চা, কোনো বিষ নেই। একে বাচ্চা, তার ওপর কোনো বিষ নেই শুনে তারা খুবই হতাশ হয়েছিল। অজগর না হোক, গোখরা বা কেউটে তো হতে পারত। স্কুলে সে কেউটে বলেই চালিয়েছিল। তারপর বর্ষা গেলেই পুজো, মাঠের আবার নতুন চেহারা।

অবশ্য দু-বছর আগে ফুলদির বিয়ের সময় ওখানে প্যান্ডেল হয়েছিল বিয়েবাড়ির, আর সেই প্যান্ডেল থেকে পড়ে গিয়ে অন্তুর হাত ভেঙেছিল। আর একবার ভোটের সময় সুবীরদাদের পার্টির একটা মিটিং হয়েছিল।

মাঠটা আর থাকবে না। মাঠটার জন্য তার একটু দুঃখই হচ্ছিল।

অসীমদা বলল, 'আয় তো দেখি, তুই কেমন ইংরেজি শিখেছিস।'

এই একটা বিষয়কে সে যমের মতো ভয় পায়। ইংরেজি মানেই তার গায়ে জ্বর, একদম ছোটবেলা থেকে। হাফইয়ার্লির খাতা স্কুল থেকে বাড়িতে দিয়ে দেয়, পরের দিন বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে আবার জমা দিতে হয়। ঐ একটা দিন তার বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কাটে। গতবার খাতা দেখে তার বাবা বলেছিল, একটা গাধাও নাকি তার থেকে ভাল ইংরেজি জানে।

অথচ ভাল করে ইংরেজি শিখতে তারও খুব ইচ্ছে করে। তার হিরো হল পিসতুতো দাদা সুমন। সুমনদা দারুণ ইংরেজি বলে। অবশ্য সুমনদা ছোটবেলা থেকেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছে।

অসীমদার কাছে তার ইংরেজির দৌড়টা ধরা পড়ে যাক, এটা সে চায় না। দুরুদুরু বুকে সে এগিয়ে গেল। যে বইটা অসীমদা পড়ছিল, সেই বইটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পড় তো বইটার নাম।'

তার কপাল ভাল, নামটা সে পড়তে পারল, 'পিপ্‌লস্ আর্মি পিপ্‌লস্ ওয়ার।'

তার ফাঁড়া তখনও কাটেনি, অসীমদা এবার বলল, 'লেখকের নামটা পড় তো।'

এবার সে গেল আটকে। 'ভো...ভো...'

'আরে ভো-ভো করছিস কেন, পুরো নামটা পড়।'

হাত তুলে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, 'মাঝখানেরটা পড়তে পারছি না।'

মাথা নেড়ে অসীমদা বলল, 'না, তোকে দিয়ে কিছু হবে না। নামটা হল, ভো ন্‌গুয়েন গিয়াপ। আচ্ছা এবার বল এই লোকটার নাম তুই কখনো শুনেছিস?'

মাথা নেড়ে জানায় যে, সে নামটা কখনও শোনেনি। অসীমদা এবার জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, তুই ভিয়েতনামের নামটা কখনো শুনেছিস?'

ভিয়েতনাম কথাটা সে আগে শুনেছে। দেওয়ালে লেখা থাকে, মিছিলেও ভিয়েতনাম-ভিয়েতনাম কী সব বলে। একদিন স্কুলে স্ট্রাইক হয়েছিল, তখন স্কুলের সামনে অল্পবয়সী যে ছেলেটা বক্তৃতা দিচ্ছিল, সেও ভিয়েতনাম নিয়ে কী সব বলছিল। খবরের কাগজেও সে দু-একবার ভিয়েতনাম কথাটা দেখেছে। কিন্তু সেসব খবর সে পড়েনি। আসলে সে খবরের কাগজে অরণ্যদেব, গোয়েন্দা রিপ আর যাদুকর ম্যানড্রেক পড়ে, আর খেলার খবর পড়ে। তাও সব খেলার খবর না, ক্রিকেটের খবর পড়ে আর ইস্টবেঙ্গল যদি জেতে কিংবা মোহনবাগান যদি হারে বা ড্র করে, তবে সেই খবর। সুতরাং এবার সে মাথা নাড়ল। কিন্তু অসীমদাকে আজ প্রশ্নে পেয়েছে, এবারের প্রশ্ন, 'আচ্ছা বল তো ভিয়েতনামে কী হচ্ছে?'

এর উত্তরও তার জানা, বলল, 'যুদ্ধ হচ্ছে।'

'এবার বল, কার সাথে কার যুদ্ধ হচ্ছে?'

এটা সে জানে না, অতএব চুপ।

অসীমদাই বলে দিল, 'যুদ্ধটা হচ্ছে ভিয়েতনামের সাথে আমেরিকার। আর তুই যদি বুদ্ধিমান হতিস তাহলে জিজ্ঞাসা করতিস, যুদ্ধটা কেন হচ্ছে। যেহেতু বুদ্ধিমান নোস, তাই আমিই তোকে বলে দিচ্ছি, যুদ্ধটা হচ্ছে স্বাধীনতার জন্য। ইতিহাসে কত পেয়েছিস আমি জানি না, কিন্তু তুই অন্তত এটা জানিস যে আমরাও এক সময় ইংরেজদের অধীন ছিলাম। আমরা যেভাবে হোক স্বাধীনতা পেয়ে গেছি। কিন্তু ভিয়েতনামের মানুষ এখনো স্বাধীনতা পায়নি। প্রথমে তারা ছিল ফরাসিদের অধীনে, তারপর ফরাসিদের হারিয়ে দেয়। তখন আমেরিকানরা ওদের দেশ দখল করে নেয়—এখন ওরা লড়াই করছে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। এই যে লোকটার নাম তুই পড়তে পারলি না, সেই ভো ন্‌গুয়েন গিয়াপ বা সংক্ষেপে জেনারেল গিয়াপ হচ্ছে ওদের লড়াইয়ের খুব বড় একজন নেতা। আর এই বইটা হল, ওরা কীভাবে যুদ্ধ করছে সে বিষয়ে।'

যুদ্ধের ব্যাপারটা বোধহয় ইন্টারেস্টিং হবে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা যুদ্ধের বই?'

প্রশ্ন শুনে অসীমদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'একদিক থেকে এটা যুদ্ধেরই বই, তবে তুই যেরকম ভাবছিস সে রকম না।'

'তা হলে কী রকম?'

'আগে তুই বল যুদ্ধ বলতে তুই কী বুঝিস?'

এই প্রশ্নটার সে কোনো মানে বুঝতে পারে না, আমতা আমতা করে জবাব দেয়, 'যুদ্ধ মানে লড়াই।'

'কী করে হয় লড়াইটা?'

যুদ্ধ বলতে তার ধারণাটা ভাসাভাসা। বাবা তাকে একবার 'লংগেস্ট ডে' নামের একটা যুদ্ধের সিনেমা দেখতে নিয়ে গিয়েছিল, আর সে কতগুলো যুদ্ধের গল্প পড়েছে। ঠিক কী উত্তর দেবে তা বুঝতে না পেরে ভাঙা-ভাঙা ভাবে সে বলল, 'যুদ্ধ মানে, প্লেন থাকে, প্লেন থেকে বোমা ফেলে, ট্যাংক থাকে, কামান থাকে, বন্দুক থেকে গুলি ছোঁড়ে, এইসব হয়।'

'এই থাকে?'

'এই সবই তো থাকে।'

'না হে বোকচন্দর, এছাড়াও আর একটা জিনিস থাকে। তা হল মানুষ। যুদ্ধটা মানুষই করে। আচ্ছা এবার বল, দু-দলের মধ্যে লড়াই হলে কার জেতার চান্স্‌ বেশি?'

'যাদের জোর বেশি।'

'ভেরি গুড। তাহলে যাদের জোর বেশি, মানে ট্যাংক, প্লেন, কামান, বন্দুক, জাহাজ, সৈন্য এইসব বেশি, তারাই যুদ্ধে জিতবে।'

সে ঘাড় নাড়ল।

'কিন্তু তুই ভেবে দেখ, এরকমটা সব সময় হলে খুব মুশকিল, যে সব দেশের জিনিসপত্র বেশি বা এই সব জিনিস বানানোর মতো টাকা বেশি, তারা চাইলে যা খুশি তাই করতে পারে। যে সব দেশের জোর কম, তারা বেঁচে থাকবে কী করে?'

সে খুব বোদ্ধার মতো মাথা নাড়ল।

'আচ্ছা ধর, তোদের পাড়ার কোনো একটা ছেলের গায়ে খুব জোর। এখন সে যদি

রোজ এসে তোকে মারে, তুই কী করবি?'

সেও বোকার মতো জিজ্ঞাসা করল,—'কী করব?'

'কী আর করবি, তোকে মাথা খাটিয়ে এমন একটা উপায় বার করতে হবে, যাতে গায়ে কম জোর থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধটায় তুই ই জিতিস। বুঝলি রে চাঁদু, এই এটা হল তোর মতো কম জোরআলা লোকেরা কীভাবে যুদ্ধ করলে বেশি জোরআলা লোকদের হারিয়ে দিতে পারে, এই যুদ্ধ সম্পর্কিত একটি মহামূল্যবান বই। যাক, এসব তোর মাথায় একবারে ঢুকবে না, তুই বরং রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখে আয় বৌদি চা করছে কি না।'

এই কথাবার্তা বেশ ভালই লাগছিল, সেটা হঠাৎ এভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা তার পছন্দ হল না। সে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করতে লাগল, 'না আমার মাথায় ঢুকবে, তুমি বলো। চা হলেই আমি নিয়ে আসব।'

অসীমদা হাসতে-হাসতে বলল, 'না গুরু, বইটা আমায় তাড়াতাড়ি ফেরত দিতে হবে, তোমার সাথে এখন গ্যাজেতে গেলে বইটা শেষ হবে না। তাছাড়া তোমাকে আমি এসব বোঝাই আর তোমার মা বাবা এসে আমায় ঠ্যাঙাক, তোমার মগজ-ধোলাই করেছি বলে।'

সে চ্যাঁচাতে শুরু করল, 'না-না কিছু বলবে না, বাবা-মা কিচ্ছু বলবে না, তুমি বলো।'

হতাশ হয়ে অসীমদা বলল, 'দেখ তোকে সেদিন যখন শরৎচন্দ্রের মহেশ পড়াচ্ছিলাম, তুই ভেবেছিলি আমি দেখিনি, কিন্তু আমি দেখেছি তুই বারবার চোখ মুছছিলি। কান্না পাচ্ছিল?'

লজ্জা পেয়ে সে বলল, 'ধ্যাৎ!'

'আরে ধ্যাৎ' এর কী আছে, এসব পড়লে আমারও তো কান্না পায়। আচ্ছা বল তোর কান্না পাচ্ছিল কেন?'

সে মাথা নিচু করে জবাব দিল, 'মহেশের জন্য।'

এবার অসীমদা সশব্দে কপাল চাপড়ে উঠল, 'ওরে গরু, তোদের জন্যই এ দেশের কিছু হবে না। গরুর দুঃখে তোর কান্না পেল, আর গফুর আর আমিনা দু-দুটো মানুষের জন্য তোর কোনো কষ্ট হল না?'

'না-না ওদের জন্যও কষ্ট হচ্ছিল।'

এবার অসীমদা অনেকক্ষণ কোনো শব্দ না করে হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আচ্ছা বল, গফুররা তো সারা বছর ধরে এত পরিশ্রম করে, কিন্তু তাদের কত কষ্ট, অথচ তুই খোঁজ নে, দেখবি গ্রামের জমিদার যে, সে সারা বছর কোনো কাজ করে না। কিন্তু ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দিব্যি আরামে আছে। এটা অন্যায় তো?'

আবার কী বেঁফাস বলে ফেলে এই ভয়ে সে ইতস্ততভাবে মাথা নাড়ল।

'এই অন্যায়ের অবসান একমাত্র হতে পারে, যদি জমিদারের যত জমি আছে, তা গফুরের মতো গরিব যারা আছে, তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া যায়। তাতে গরিবরা সবাই খেয়ে বাঁচতে পারবে।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে জমিদারদের কী হবে?'

'কী আর হবে, হয় সবার মতো খেটে খাবে, অথবা না খেয়ে মরবে।'

অসীমদার কথাগুলো ঠিকই, কিন্তু একটাই খট্‌কা, মার দাদু নাকি পুববাংলায় জমিদার ছিল। তাই কিছুটা সন্দেহ নিয়ে সে বলল, হ্যাঁ, সে রকম হলে তো ভালই হয়।'

'ভাল তো হয়, কিন্তু ভালটা কে করে? তুই যদি জমিদারের জমি কাড়তে যাস তাহলে পুলিস, মিলিটারি এসে একেবারে হামলে পড়বে। পিটিয়ে তোকে ছাতু করে দেবে। অথচ দেখ, গরিবদের কষ্ট তো দূর হওয়া উচিত।'

কথাটা তার ঠিকই মনে হল। তাদের বাড়িতে কাজ করে লক্ষ্মীর মা, থাকে পেছনের কলোনিতে। এক দিন এসে কী কান্না, ওর ছোট ছেলেটা মরে গেছে। বারবার মাকে বলছিল, 'মরবার আগে ছেলেটার মুখে একটুও ওষুধ দিতে পারলাম না গো বৌদি।' সেদিন তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। সে অসীমদার সঙ্গে একমত হয়ে বলে, 'ঠিকই তো, কিছু একটা করা দরকার।'

অসীমদা বলল— এই তো তোর মাথা খুলেছে এতক্ষণ। বুঝলি রে চাঁদু, এখানেও একটা পিপলস্ ওয়ার, মানে জনযুদ্ধ হওয়া দরকার। যুদ্ধ করার জোর ওদের বেশি, কিন্তু গরিব লোকদের সুবিধা তারা সংখ্যায় অনেক।'

সে বিষয়টা নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছে। মনে পড়ল বাবাও অনেক সময় অফিস থেকে ফিরে জামা ছাড়তে ছাড়তে বলে, 'খেটে মরি আমরা আর মজায় থাকে কর্তারা।'

এবার বেশ উৎসাহ নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের এখানে তাহলে কবে জনযুদ্ধ শুরু হবে?'

অসীমদা হাসতে-হাসতে বলল, 'দাঁড়া পঞ্জিকাটা দেখে একটা দিনক্ষণ ঠিক করি।'

তারপরই গম্ভীর হয়ে বলল—'এটাই তো সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন। আসলে জনযুদ্ধ মানে তো জনগণের যুদ্ধ, সাধারণ মানুষের যুদ্ধ, মানুষ যতক্ষণ না যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ তো হবে না।'

'ওমা যুদ্ধ হলে তো তাদেরই লাভ।'

'আরে না, যুদ্ধ শুরুর আগে, যুদ্ধ করব, এই মানসিকতা তো তৈরি করতে হবে। আসলে কী জানিস, যুদ্ধকে সবাই ভয় পায়। ভাবে, যাই হোক করে কাটিয়ে দেব। ঝামেলার দরকার নেই।'

'যুদ্ধে আবার ভয় কী?'

'ওরে বীরপুরুষ, তুই জানিস যুদ্ধ কাকে বলে? এই যে ভিয়েতনাম—পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষকে এত কষ্ট করতে হয়নি, ওদের যা করতে হচ্ছে। দেশটাকে আমেরিকানরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছে, লাখ লাখ মানুষ মারছে। ছেলে-মেয়ে-বাচ্চা-বুড়ো কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। শোন, ওরা একরকম বোমা ফেলছে তার নাম নাপাম বোমা। এই বোমা ফাটার পর চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে জ্বলন্ত পেট্রলিয়াম জেলি, আর পেট্রলিয়াম জেলি এমন এক জিনিস, যা একবার জ্বলতে শুরু করলে আর নেভানো যায় না। যার গায়ে লাগবে সে জ্বলতে জ্বলতে শেষ হয়ে যাবে। ধর, একটা গ্রাম চারিদিক থেকে ঘিরে শয়ে শয়ে নাপাম বোমা যখন ফেলা হচ্ছে, তখন সে গ্রাম থেকে জীবন্ত কেউ বেরিয়ে আসতে পারছে না। শুধু তাই না, মানুষ যাতে না খেয়ে মরে, তার জন্য আকাশ থেকে সমস্ত খেত-খামারে বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে—যাতে আগামী বেশ কিছু বছর সেই সব খেতে কোনো চাষবাস না হতে পারে। সে বিষ কেবল খেত জ্বালাচ্ছে না, ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের শরীরে। ভিয়েতনামে হাজার-হাজার বাচ্চা জন্মাচ্ছে বিকলাঙ্গ হয়ে। গোটা দেশটাকে ওরা শেষ করে দিচ্ছে। মানুষও যে জানোয়ারের অধম হতে পারে, তা ভিয়েতনামে আমেরিকানদের দেখলে

বোঝা যায়।'

অসীমদা এমন ভাবে বলছে যেন কোনো মিটিঙে বক্তৃতা দিচ্ছে।

'এত করেও আমেরিকা কিন্তু ভিয়েতনামকে হারাতে পারছে না। ভিয়েতনামই জিতছে। জেনে রাখ, এই হল মানুষ। নিজের অধিকারের জন্য সে হয়ত যুদ্ধে নামতে ভয় পায়। কিন্তু একবার যদি সে নামে কারুর ক্ষমতা নেই তাকে আটকায়। অথচ দেখ, ভিয়েতনাম আমাদের পশ্চিমবাংলার থেকেও ছোট একটা দেশ, আমাদের থেকেও গরিব, আর আমেবিকা হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক, সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ।'

সে ভাবছিল অন্য কথা। সুমনদা কি ভিয়েতনামের কথা জানে না? তাহলে কেন বলে পাশ করেই আমেরিকা চলে যাব। ওটাই নাকি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা।

একটানা বলে অসীমদা প্রায় হাঁফাচ্ছে। একটু দম নিয়ে বলে, 'আয় তোকে একটা ছবি দেখাই।'

বইটার একটা পৃষ্ঠা খোলে অসীমদা, সে ঝুঁকে পড়ে ছবিটা দেখে। রোগা শান্ত মতো একটা মানুষের ছবি। যুদ্ধের বইয়ে এ রকম ছবি মানায় না। অসীমদা বলে, 'এই হল জেনারেল গিয়াপ্। এঁর ভয়েই আমেরিকার প্রেসিডেন্টের রাতে ঘুম হয় না। গোটা পৃথিবীর মানুষ লোকটাকে সেলাম করে।'

সে ভাল করে ছবিটা দেখে। কে বলবে লোকটা এ রকম, দেখলে মনে হয় ক্লাস ফাইভে ইতিহাস পড়ায়।

প্রসঙ্গ পাল্টে হঠাৎ অসীমদা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, বড় হয়ে তুই কী হতে চাস?'

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। বহুবার সে প্রশ্নটা শুনেছে, উত্তরটাও তার মুখে লেগে থাকে, 'আমি বড় হয়ে পাইলট হব, প্লেন চালাব।'

অসীমদা বলে, 'আচ্ছা ভেবে দেখ, জেনারেল গিয়াপের মতো বীর হবি, না পাইলট হবি?'

প্রশ্ন শুনে সে কিছুটা থতমত খেয়ে যায়। সে এভাবে বিষয়টা কখনও ভেবে দেখেনি। একটু চুপ করে থেকে সে বলে, 'আমি জানি না।'

অসীমদা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তুই পাইলট হলে আমি খুশিই হব, তবে সবচেয়ে খুশি হব যদি তুই জেনারেল গিয়াপের মতো কিছু হোস।'

সে মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ ভাবে।

সেই দিন থেকেই অসীমদা তাকে জেনারেল গিয়াপ বলে ডাকে।

আর ওই দিনই সে জেনারেল গিয়াপকে দেখে। একটা আইসক্রিম গোলাপি আকাশের নীচে, একটা টিলার ওপর, একটা আখরোট গাছের ছায়ায় জেনারেল গিয়াপ দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে একটা দূরবীন, সেটা দিয়ে সামনের দিকে দেখছিলেন। সে অনুভব করে গোলাপি আকাশের নীচে জেনারেলের সাথে তার দেখা হবে, যে কোনো দিন, যে কোনো মুহূর্তে।

সকালবেলা তার ঘুম ভেঙেছে মন খারাপ নিয়ে। কাল রাতে বাবা আর মার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে। এরকম ঝগড়া হলে তার মনটা সারাক্ষণ খারাপ হয়ে থাকে। মা কাল রাতে রাগ করে কিছু খায়নি। কী নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়েছিল, তা তার জানা নেই। কারণ সে আর ছোট অন্য ঘরে বসে পড়ছিল। মা আর বাবার ঝগড়া মানে বাবাই একটানা চেঁচিয়ে যায়। মা নীচু স্বরে কখনও দু-একটা মন্তব্য করে। অধিকাংশ সময় ঝগড়াগুলো শুরু হয় সংসারের খরচ নিয়ে। এইসব ঝগড়া থেকেই সে বোঝে বাবার মাইনেয় সংসার চলে খুব টানাটানি করে। কিন্তু ঝগড়া শুরু হলে সেটা আর টাকা পয়সার মধ্যে আটকে থাকে না। বাবা তার মধ্যে নানা বিষয় টেনে আনে। বাবাকে তখন তার খুব খারাপ লাগে। এই সব ঝগড়া হলে মা আর বাবার কথা কয়েক দিন বন্ধ থাকে, এমনকী তখন মা তাদের সাথেও খুব কম কথা বলে। মা বলে তারা দু-ভাই না থাকলে নাকি মা, যে দিকে চোখ যায়, সে দিকে চলে যেত।

অথচ বাবা যে খুব একটা ভারিক্কি প্রকৃতির রাগী লোক, তা নয়। বাইরের লোকদের কাছে বরং বাবা কিছুটা সিঁটিয়েই থাকে। তার টাইফয়েড হবার পর বাবা তাকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, কারণ অনেক দিন অ্যাবসেন্ট হয়েছিল। মনে হচ্ছিল হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাবা যেন রীতিমতো ভয় পাচ্ছে। এত ভয় পাবার যে কী, তা তার মাথায় ঢোকেনি। এমনকী মেজ পিসেমশাইয়ের সাথে বাবা যখন কথা বলে, তখনো সে এরকম একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে। মেজ পিসেমশাই যেহেতু খুব বড়লোক, বড় চাকরি করে, বাবা যেন সব সময় তার ভয়ে কাঁটা। আর মামু যেহেতু স্কুলে পড়ায়, তাই তার সাথে বাবা কথা বলে খুব ভারিক্কি চালে।

বাড়িতে কী হবে, কী হবে না, সবই মা ঠিক করে। কিন্তু বাবা মাঝে-মাঝে এমন ভাব করে যেন তার দয়াতেই সবাই বেঁচে আছে। বাড়িতে এসে বাবা যখন অফিসের গল্প করে তখন মনে হয় বাবা যেন অফিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেউ। কিন্তু তার মাঝেমাঝে এ সন্দেহও হয় যে, বাবা যে রকম বলছে বিষয়টা সে রকম নয়।

কাল রাতে বাবা যখন চেঁচাচ্ছিল, সে বই বন্ধ করে চুপ করে বসেছিল। বাবা চেঁচাচ্ছিল, 'জমিদারের মেয়ে, জমিদারের মতো হাবভাব ; আমার মতো কেরানিকে বিয়ে না করে কোনো রাজা-বাদশাকে বিয়ে করলেই তো পারতে, রানির হালে থাকতে।'

মার চাপা গলার উত্তরটাও তার কানে এল, 'অসভ্যের মতো চেঁচিও না, গোটা পাড়ার লোক শুনছে।'

বাবা আরো জোরে চেঁচায়, 'অসভ্যলোকের সাথে থাকতে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, দরজা খোলা আছে সোজা বেরিয়ে যাও। আই সে গেট আউট।'

ছোটটা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদতে শুরু করল। এ রকম

সময় তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। একবার মনে হল, মার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল, সে ঠিক নিশ্চিত নয়। সে নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ছোটর মাথায় হাত বোলায়। তাতে ছোটর কান্না আরো বেড়ে যায়।

একসময় ঝগড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কালো ঝুলের মতো ঝগড়াটা জমে থাকে গোটা বাড়িতে। এই সময় ছোটটা তাকে ছাড়তে চায় না। বাচ্চাটা বোঝে এখন মা-বাবার কাছে যাওয়া যাবে না। সেও ছোট ভাইটার বিছানা করে দেয়, মশারি টাঙিয়ে দেয়। বিছানায় ছোটটা তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোয় সে রাতগুলোতে।

মা দোকান থেকে কতগুলো জিনিসপত্র আনতে পাঠাল। আজ রবিবার স্কুলও নেই, বাবার অফিসও নেই। কাজেই বাড়িটা সারাদিন থমথমে হয়ে থাকবে এবং সারা দিন এই বাড়িতেই কাটাতে হবে তাকে।

শীতটা কয়েকদিন হল জব্বর পড়েছে। দোকানে যেতে হলে এ রকম সময় সে মায়ের একটা পুরনো চাদর গায়ে জড়িয়ে নেয়। বাড়িতে সে হাফপ্যান্ট পরে, কাজেই পা দুটোতে ঠাণ্ডা লাগে, এসব অভ্যাস হয়ে গেছে।

সে যখন বাড়ি থেকে বেরচ্ছে, তখনই আকাশি রঙের ফিয়াটটা মাঠের পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে যিনি নামলেন, তিনি তার চেনা, কর্নেল চ্যাটার্জি। লালার দোকানে যেতে হলে তাকে মাঠের পাশ দিয়েই যেতে হবে। কাজেই গাড়িটা তার সামনেই রয়েছে। নতুনত্ব যেটা, কর্নেল চ্যাটার্জির সঙ্গে নামল একটা মেয়ে। হালকা বাদামি রঙের একটা লম্বা স্কার্ট আর একটা সাদা সোয়েটার পরা। দেখলেই বোঝা যায়, কর্নেলের মেয়ে। বয়স বোধহয় তার মতোই অথবা একটু ছোট।

মা মাঝে-মাঝে বলে, সে নাকি বড় হচ্ছে। নিজেও ব্যাপারটা কিছুটা বোঝে, হঠাৎই সে অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে, পুরনো হাফ প্যান্টগুলো প্রায় সব কটাই ছোট হচ্ছে। মা বলেছে, সামনের বছর ক্লাস এইটে উঠলে স্কুলে যাবার জন্য ফুল প্যান্ট কিনে দেবে। পিসতুতো দিদি ঋতু বলে 'কী একটা হেড়ে গলা তোর হয়েছে চাঁদু, প্লিজ কানের কাছে চেঁচাস না।' মা বলেছে, এটাও নাকি সে বড় হচ্ছে, তার লক্ষণ। আয়নার সামনে দাঁড়ালে, নাক আর ঠোঁটের মাঝখানটা কেমন জানি কালো হয়ে আসছে বলে মনে হয়, জুলফির তলায় দু-একটা করে চুল ক্রমশ শক্ত হচ্ছে।

বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় এখন মেয়েদের প্রসঙ্গ খুব বেশি-বেশি ওঠে এবং তার মধ্যে দু-একটা বিষয় বেশ খারাপ। খারাপ বুঝেও সেই সব আলোচনায় সে শ্রোতা হিসেবে অংশগ্রহণ করে, খুব একটা খারাপ যে লাগে, তা না। তার দু-একজন বন্ধু তো দাবি করছে, তারা রীতিমত প্রেম করছে। ব্যাপারটা নিয়ে তারও একটা আকর্ষণ তৈরি হচ্ছে। রাস্তায় ঘাটে কোনো মেয়ে দেখলে কখনো-কখনো ভালই লাগে। মাঝে-মাঝে মনে হয়, প্রত্যেক মেয়েই কেমন যেন রহস্যে মোড়া। পাড়ার সমবয়সী মেয়েগুলো, যারা দুদিন আগেও তাদের সঙ্গে খেলত, এখন আর খেলে না। নিজেরা বসে কী সব গুজগুজ-ফিসফিস করে, আর হাসতে-হাসতে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। ওরা কেউ কারণ জানতে চাইলে, পাকাপাকা হাবভাব করে বলে, 'মেয়েদের কথায় তোদের কী দরকার রে?'

মেয়েদের কিছু আলাদা কথা আছে প্রথম-প্রথম তা শুনে তাই অবাকই লাগত, এখন

আর লাগে না। কারণ তাদেরও এমন কিছু কথা আছে, যা মেয়েদের সামনে বলা যায় না।

একদিন সন্ধেবেলা গায়ত্রী এসে হাজির তাদের বাড়ি। সে আর গায়ত্রী একই ক্লাসে পড়ে তবে আলাদা স্কুলে। কম্পাস হারিয়ে গিয়েছিল, তাই গায়ত্রী এসেছিল কম্পাস চাইতে। কম্পাস নেওয়ার পর গায়ত্রী বলল, রাস্তাটা খুব অন্ধকার ওকে একটু পৌঁছে দিতে। গায়ত্রীদের বাড়িটা খুব দূরে নয়, এক মিনিটেই সে আর গায়ত্রী পৌঁছে গিয়েছিল। কথা হচ্ছিল গায়ত্রীদের স্কুলের অঙ্কের দিদিমণি কত খারাপ সেই নিয়ে, গায়ত্রীই বলছিল, সে শুনছিল। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে গায়ত্রী কোনো কথা বলেনি। গায়ত্রী ওদের বাড়ির দরজায় পৌঁছানোর পর সে যখন প্রায় ফিরে আসছে তখন হঠাৎই গায়ত্রী বলে উঠল, 'চাঁদু, তোকে একটা কথা বলব?'

সে বলল, 'বল।'

একটু থেমে তার হাতটা ধরে গায়ত্রী বলল, 'তুই না খুব ভাল ছেলে।' বলেই এক ছুটে ভেতরে ঢুকে গেল। প্রথমে সে খুবই অবাক। তারপর বিষয়টা তার ভালই লাগল। কেন ভাল লাগল তা সে জানে না, কিন্তু বুকের কাছটায় কেমন জানি ভীষণ ভাল লাগা ভাল লাগা ব্যাপার। ভাল লাগাটা বেশ কয়েকদিন তার সঙ্গে ছিল। সে অনেক ভেবেছে—'তুই না খুব ভাল ছেলে', এই কথাটার মানে কী? কথাটার অন্য কোনো একটা মানে আছে, সে আন্দাজও করে মানেটা কী হতে পারে, কিন্তু সে যা ভাবছে সেটা তাই কি না, এ ব্যাপারেই তার সন্দেহটা থেকে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা তার ভাল লেগেছে। মনে হল, ব্যাপারটা কাউকে বলতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু কাকে বলবে? বন্ধু-বান্ধবদের বলা যাবে না, কারণ তাহলে এসব নিয়ে এমন তার পেছনে লাগবে যে, পাড়ায় বেরনো মুশকিল হয়ে যাবে। বাড়িতে ফিরে আসার পর মা জিজ্ঞাসা করেছিল, এত রাতে সে কোথায় গিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে সে উত্তর দিয়েছিল, 'অন্তুর কাছ থেকে ইংরেজি মানে বই আনতে গিয়েছিলাম।'

কিন্তু আজ শীতের সকালে আকাশি ফিয়াট থেকে নামা মেয়েটিকে তার আলাদা করে নজরে পড়ল না, কারণ কাল রাতের ঘটনা এখনো তার সারা মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

দোকান থেকে সে যখন ফিরে আসছে, তখন মেয়েটি একা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। কর্নেল বোধহয়, ভিত খুঁড়ছে যে মিস্তিরিরা, তাদের সাথে কথা বলছে। উল্টোদিকের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে টিঙ্কু, বোধহয় মেয়েটাকে ভাল করে জরিপ করছে। মেয়েটা অবশ্য টিঙ্কুর দিকে তকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে উল্টো দিকে। হাতে একগাদা মালপত্র, তার ওপরে একটা বড় চাদর, খুব সাবধানেই তাকে হাঁটতে হচ্ছে। টিঙ্কুদের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই টিঙ্কুর ক্যানক্যানে গলা, 'চাঁদু তোর চাদরের লেজ বেরিয়ে গেছে।'

মাথায় রক্ত তোলার পক্ষে গোটা ব্যাপারটা যথেষ্ট। এমনিতেই সে টিঙ্কুকে খুব একটা পছন্দ করে না। অসম্ভব ন্যাকা একটা মেয়ে। এটা সে বোঝে, আজকের এই বদ রসিকতার একটাই উদ্দেশ্য, তা হল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটার দৃষ্টি আকর্ষণ করা, আর ঠিক এটাই সে চাইছিল না। শীতকালের সকালের তার এই পোশাকটা নিয়ে সে কিছুটা বিব্রতই। কিন্তু কীই বা করবে, তার মতো বয়সী ছেলেদের নিজস্ব কোনো আলাদা চাদর থাকে না, আর সাত-সকালে গায়ে একটা সোয়েটার চাপানোও অনেক ঝামেলা। কাজেই যে অবস্থায় সে ছিল, সেই অবস্থাতেই বেরিয়েছে। সে যদি জানত, আকাশি ফিয়াট আর মেয়েটা থাকবে, তাহলে কখনোই সে এভাবে বেরত না। সে ভেবেছিল, কারুর নজরে না পড়েই সে ফিরে

আসতে পারবে, কিন্তু টিঙ্কুর এই বদ রসিকতাটা তার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

টিঙ্কুর মন্তব্যে মেয়েটি পেছনের দিকে তাকাল। প্রথমে টিঙ্কুর দিকে, তারপর তার দিকে। রাস্তায় কোনো লোক নেই, টিঙ্কুর মন্তব্যটা যে তাকে লক্ষ করে, সেটা বুঝতে কারোর অসুবিধা হবার কথা নয়। তার মনে হচ্ছে, সে যদি মাটিতে মিশে যেতে পারত তাহলে খুব ভাল হত। তার কোনো উপায় নেই। রাগে সারা গা জ্বলছে। টিঙ্কুর মতো গলাটা ক্যানক্যানে করে সে ভেঙিয়ে ওঠে, 'আমার তো চাদরের ল্যাজ বেরিয়েছে, আর তোর তো নিজের আসল ল্যাজটা বেরিয়ে গেছে।'

তার উত্তর শুনে মেয়েটা কি মুচকি হাসল? সে ঠিক খেয়াল করতে পারেনি। কিন্তু টিঙ্কু হাসল এবং গায়ে জ্বালা ধরানো ভঙিতেই বলল, 'আহা চাঁদু, রাগ করিস না, শত হলেও আমরা তো তোর পুরনো বন্ধু।'

'পুরনো' কথাটার ওপর জোরটা বেশি। টিঙ্কুটা অসহ্য। 'পুরনো' বলার মধ্যে ইঙ্গিতটা পরিষ্কার—পাড়ায় আসা নতুন মেয়েটি। কোনো কথার উত্তর না দিয়েই সে হাঁটার গতি বাড়াল। মেয়েটি তাকে দেখছে কি না, এটা সে বোঝার চেষ্টাও করল না।

শীতের সকালে সে মাঝে মাঝে এসে বসে বাড়ির সামনের দিকের বারান্দায়, ওখানে রোদ এসে পড়ে। কিন্তু সে আজকে তাও পারছে না, কারণ বারান্দায় বসলে মেয়েটি তাকে দেখতে পাবে। মেয়েটি তাকে দেখুক, এটা সে আজ চায় না। কাজেই ঠাণ্ডা, নিরানন্দ ঘরে সে বসে রইল। পায়ের পাতা দুটো ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে। রোদে বসতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু সে আজ নিরুপায়। সে ঠিক করল, রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের পাশে দাঁড়ালে অন্তত উনুনের আগুনে পাটা গরম হতে পারে।

প্রথমে সে মাকে খুঁজে পাচ্ছিল না। উঠোনটায় একদল মেয়ের ভিড়। তার মধ্যে দু-একজন বয়স্ক থাকলেও অধিকাংশই অল্পবয়সী। চেঁচামেচি আর হাসিতে কান পাতা দায়। ভিড়ের মধ্যে কারা যেন গান গাইছে। একজন গাইছে আর বাকিরা ধুয়া ধরছে। উঠোনোর একদিকে একটা কামিনী ফুলের গাছ। গাছটার গায়ে বেয়ে বেয়ে উঠবার চেষ্টা করছে দুটো বেড়ালের বাচ্চা। একটা উজ্জ্বল বাসন্তী রঙের আকাশ—ঠিক যেন সরস্বতী পুজো। কিন্তু সে নিশ্চিত এখনও সূর্য ওঠেনি। উঠোনের এক কোনো একসার গাঁদা ফুলের গাছ। তার মনে পড়ে গেল, তাদের স্কুলের বাহাদুরের মেয়েটা গাঁদাকে বলে 'শয়পত্রী'।

ধূপ আর পায়েস রান্নার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। উঠোনের এক কোনো একটা সাদা গরু বাঁধা। আর উঁচু দাওয়ার ওপর একটা রঙিন আসনে বসে আছেন একজন বৃদ্ধা, শীতে জবুথবু হয়ে। সেখানে বসেই কী সব জানি বলছেন, বোধহয় কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। উঠোনের ঠিক মাঝখানটাতেই মেয়েগুলোর ভিড়। যে জায়গাটা ঘিরে ভিড়, সেখানটায় চৌকো মতো একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে জল রাখা আছে, জলে ভেসে বেড়াচ্ছে গাঁদাফুলের পাপড়ি। চার কোণে চারটে পাটকাঠি আর মোটা লাল সুতো দিয়ে চৌকো জলের জায়গাটা ঘিরে রাখা হয়েছে। চৌকো জায়গাটার চারিদিকে আলপনা দিচ্ছে অল্পবয়সী একটা মেয়ে। সামনে একটা নকশা-করা আসন পাতা, বোধহয় পুরুতমশাই ওখানে বসে পুজো করবেন। পুজোর জিনিসপত্র সামনে সাজানো। আর উঠোনের

একপাশে কাঠের আগুনের ওপর বসানো চকচকে একটা তামার হাঁড়ি, পায়েসের গন্ধের উৎস বোধহয় ওটাই।

কেউ আশেপাশে নেই যাকে সে জিজ্ঞাসা করবে এটা কী পুজো হচ্ছে। মাকেও এর মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। কনকনে ঠাণ্ডা। সে অনুভব করে তার পাটা এখনো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। হঠাৎ একটা শোরগোল পড়ে যায়, কারা যেন গান গাইতে-গাইতে এদিকে আসছে। এই গান কখনো সে আগে শোনেনি, কিন্তু সুরটা খুব চেনা। তার একবার মনে হল, তাকে ঘুম পাড়ানোর সময় মা বোধহয় এই সুরে গান গাইত। সে গানটা মনযোগ দিয়ে শোনে, কিন্তু গানের কোনো মানে খুঁজে পায় না।

চোখে মুখে জল দিতে কী কী ফুল লাগে,
শরুয়া মরুয়া দুইখান ফুল লাগে,
ভাই আইনা দিল সরিষার ডালি,
তাই দিয়া আমরা মুখ প্রক্ষালি,

গানটা গাইতে গাইতে একদল মেয়ে উঠোনে এসে ঢুকছে, সবার কাঁখে ছোট-ছোট পিতলের কলসি। গান গাইতে-গাইতে ওই ঘটের জল তারা ঢেলে দিচ্ছে চৌকো গর্তটায়। বয়স্করা সব উলু দিচ্ছে। পুরোনো গানটা ছেড়ে এখন নতুন গান ধরেছে—

উঠরে উঠরে সূর্য উদয় দিয়া,
বাওন বাড়ির পিছন দিয়া।
বাওনার হইল বড় সেয়ান
পৈতা জোগায় বেয়াই বেয়ান।

এই ভোরে কনকনে হাওয়ায় বাচ্চা মেয়েগুলো গায়ে কেবল একটা শাড়ি জড়িয়ে রেখেছে। ভোর হলেও সূর্য এখনো ঢাকা আছে বাঁশঝাড়ের ওপারে। মাকে এবার সে খুঁজে পেল—মাকে খুঁজে পেল বলাটা ঠিক না, আসলে সে প্রথমে শাড়িটা খুঁজে পেল। সেই স্বপ্ন-নীল শাড়িটা। মাকে দেখে এখন তার হাসি পাচ্ছে। মেজমাসির সাথে ছবিতে যে রকম দেখেছিল, তার থেকেও ছোট। রোগা ফরসা বাচ্চা একটা মেয়ে—কিন্তু কী সুন্দর! ভিড়ের মধ্যে মেজমাসিকে সে দেখতে পায়, কিন্তু বড়মাসিকে খুঁজে পায় না। কিন্তু সে নিশ্চিত, লাল কলকা পাড় সাদা শাড়ি পরা মহিলাই তার দিদু। মা বলে, দিদু নাকি দুর্গা ঠাকুরের মতো দেখতে ছিল। দিদুকে সে কখনো দেখেনি, কারণ মার বিয়ের আগেই দিদু মারা যায়।

এরপর মেয়েগুলো সব জটলা করে বসল দাওয়ায় বসে থাকা বৃদ্ধাকে ঘিরে, দাওয়াতে সবার জায়গা না হওয়ার কেউ-কেউ বসল উঠোনে। বৃদ্ধা এক অদ্ভুত সুরেলা গলায় গল্প বলে, আর মেয়েগুলো মুগ্ধ হয়ে তা শোনে।

'সূয্যি ঠাকুরের বড় দুঃখ। হ্যায় সারা জগতেরে আলো দেয়, কিন্তু তার নিজের ঘর অন্ধকার। বিয়ার জন্য মনের মতো মাইয়া পায় না। অনেক খুইজা একদিন রূপসাগরের তীরে দেখে এক পরম রূপবতী কইন্যা। হ্যার দুধে আলতা গায়ের রং, ম্যাঘের মতো চুল। সূয্যিঠাকুর তারে জিগায়—কইন্যা কী তোমার পরিচয়, কোথায় তোমার ঘর? সেই কইন্যা তখন কয়—আমি মাধব রাজার কইন্যা, চন্দ্রকলা নাম আমার, রূপনগর ধাম।

সূয্যিঠাকুর তখন চললেন রূপনগর, মাধব রাজার কাছে। রাজা তখন বইছেন

রাজসভায়, চারিদিকে পাত্র, মিত্র, অমাত্য, অগণন মানুষ। ঠাকুর দরিদ্র ব্রাহ্মণের বেশ ধইরা গিয়া খাড়াইলেন সবার শ্যাষে। দানবীর মাধব রাজা সেই দরিদ্র বাহ্মণরে জিগায়, ঠাকুর তুমি কোনো দান চাও? সেই ব্রাহ্মণ কোনো উত্তর দেয় না। রাজা জিগায়, তোমার কি অন্ন লাগব, তোমার কি বস্ত্র লাগব, তোমার কি ভূমি লাগব, তোমার কি অর্থ লাগব, কী লাগব তুমি কও? তোমার মনোবাসনা আমি পূর্ণ করুম। তখনো ব্রাহ্মণ নিশ্চুপ, কোনো কথা কয় না। রাজা তখন কয়, ব্রাহ্মণরে আমি শূন্য হাতে ফিরাইতে পারুম না, ঠাকুর আমার যা আছে সবই তুমি লও। তখন সেই ব্রাহ্মণ কইল—মহারাজ, আমি তোমার দানব্রতে খুশি হইছি। আমি তোমার কিছুই চাই না, কেবল তোমার কইন্যা চন্দ্রকলারে বিয়া করতে চাই। রাজসভায় উপস্থিত সবাই হায়-হায় কইরা উঠল—এই বুড়া ব্রাহ্মণ কয় কী, চাল নাই, চুলা না, পরনের কাপড়টা পর্যন্ত শতছিন্ন ত্যানা, হ্যায় করব চন্দ্রকলারে বিয়া?

'তখন মাধব রাজা কইল—হে ব্রাহ্মণ, আমি সব দিমু, আমার মাইয়ারেও দিমু। কিন্তু তুমি তোমার কূল পরিচয় কও? আমার কূল পরিচয়ের মালিক তো আমি না, আমার বাপ পিতামহ। সেই কূল পরিচয় তো আমি ভাসাইয়া দিতে পারি না।

'তখন সূয্যি ঠাকুর নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। কইলেন—এই আমার পরিচয়। এইবার তোমার কইন্যারে আমার হাতে সমর্পণ করো।

'রাজা হইলেও বাপ তো, হ্যায় তখন ভাবতাছে। আমার মাইয়া যদি সূর্যের ঘরনি হয়, মাইয়া থাকব স্বর্গে, জীবৎকালে হ্যার দ্যাখা পামু না। রাজা তখন কয়—হে ঠাকুর, তুমি তো স্বর্গের দ্যাবতা, আমার মাইয়া মর্তের মানুষ—জীবৎকালে হ্যায় যাইবা কী কইরা? আর মর্তের মানুষ যদি স্বর্গে যায়, তার ফল কি ভাল হইব?'

সূয্যি ঠাকুর কইল, 'এ তোমার মাইয়ার পরম সৌভাগ্য।'

রাজা কইল, 'ঠাকুর আমারে ক্ষমা কইর, যারে তুমি সৌভাগ্য কও সেইটা সৌভাগ্য না, সেইটারে আমি কই দুর্ভাগ্য। ভগবান মানুষরে পাঠাইছে মর্তধামরে স্বর্গ বানাইতে, স্বর্গের জন্য লোভ করতে না। মর্তের মানুষ যদি স্বর্গের লোভ করে তবে সে স্বর্গও পায় না, মর্তেও সুখ পায় না। তুমি যদি আজ চন্দ্রকলারে সশরীরে স্বর্গে লইয়া যাও, তবে এই ধরাধামে যত কুমারী আছে সবাই তোমার মতো স্বামী-কামনা করব, তার ফল ভাল হইব না।'

সূয্যি ঠাকুর হাইসা কইল, 'হে রাজন তোমার মতো জ্ঞানী আর কেউ নাই। কিন্তু তুমিও কুমারী মাইয়ার মনের কথা জান না। সব কুমারী গোপনে আমার মতো পতি কামনা করে। আর আমি যুগে-যুগে ফিরা আসি সেই কন্যারে গ্রহণ করতে যে একমনে শুদ্ধ চিত্তে আমারে কামনা করে।'

রাজা আর তখন কী করে, মাইয়া চিরকালের মতো চইলা যাইব এই দুঃখে চোখের জল ফ্যালাইতে লাগল।

'ঠাকুর তখন কয়, হে রাজন, তোমার কোনো চিন্তা নাই। তোমার মাইয়া হইব আমার ঘরনি, আমারে বিয়া কইরাই হ্যায় পাইব স্বর্গের দেবীর সম্মান। তোমার মাইয়ার মতো সৌভাগ্য মর্তের কোনো মাইয়ার হইব না।

'তখন মহা ধূমধামে মর্তের মাইয়া চন্দ্রকলার লগে সূয্যিঠাকুরের বিয়া হইয়া গেল। এরপরেই বয়স্ক মহিলারা গান ধরল—

চন্দ্রকলা মাধব কইন্যা মেলিয়া দিছেন ক্যাশ,
তারে দেইখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফিরে না দ্যাশকে দ্যাশ।
চন্দ্রকলা মাধব কইন্যা মেলিয়া দিছেন শাড়ি,
তাই দেইখ্যা সূর্যাই ঠাকুর ফ্যারেন বাড়ি বাড়ি।
চন্দ্রকলা মাধব কইন্যা গোল খাড়ুয়া পায়,
তারে দেইখ্যা সূর্যাই ঠাকুর বিয়া করতে চায়।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই মা বলিব কারে?
আমার মা তোমার শাশুড়ি মা বলিও তারে।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই বাপ বলিব কারে?
আমার বাপ তোমার শ্বশুর বাপ বলিও তারে।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই ভাই বলিব কারে?
আমার ভাই তোমার দ্যাওর ভাই বলিও তারে।
তোমার দ্যাশে যাব সূর্যাই বইন বলিব কারে?
আমার বইন তোমার ননদ বইন বলিও তারে।

গান চলতে থাকে, দিদু মার মাথায় হাত বোলায়। একঘেয়ে সুরে গান হয়ে যায়, কেমন জানি ঘুমপাড়ানি সুর। তার চোখ বুজে আসে ঘুমে, তন্দ্রা নেমে আসে তার সারা চেতনায়। শুধু গানের সুরটা ভেসে বেড়ায় ফাল্গুনের হাওয়ার মতো, সর্বত্র আছে কিন্তু তাকে আলাদা করে অনুভব করা যায় না। সে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়েছিল—শুধু তার মনে আছে কখন যেন গানের সঙ্গে মিশে গেছে একটা নীচু স্বরের কান্না। একসময় গানটা হারিয়ে যায়, তার জায়গা নেয় একটা গ্রাম্য বাঁশির সুর, সে সুর বড় কান্নাজড়ানো।

সে চোখ খুলে দেখে, উঠোনটায় এখন আর কেউ নেই। মাঝখানটায় পড়ে আছে কিছু পোড়া কাঠ আর বালি, কাল রাতে বোধহয় ওখানটায় কোনো যজ্ঞ হয়েছিল। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কিছু গাঁদা ফুল। আল্পনা আঁকা একটা পিঁড়ি পরে আছে এক পাশে। মাথার ওপর টাঙানো শামিয়ানাটা বোধহয় তৈরি হয়েছে অনেক রকম শাড়ির পাড় পরপর জোড়া লাগিয়ে। উঠোনে ঢোকবার দরজাটার দু-পাশে মঙ্গলঘট আর কলাগাছ, একটা কলাগাছ হেলে পড়েছে। বিকেল তখন গড়িয়ে গেছে। কিছুক্ষণ দেখবার পর সে বুঝতে পারে বাইরে রঙচঙে সিন্দুক বলে যেটাকে মনে হচ্ছিল, আসলে সেটা একটা পালকি। পালকির পর্দাটা টকটকে লাল। গোটা পালকিটার সারা গায়ে কড়ির আল্পনা। লাঠি হাতে পালোয়ান মতো দুটো লোক পালকিটার দু-পাশে দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মুর্তির মতো, তাদের মাথায়ও টকটকে লাল পাগড়ি।

পুরনো আমলের বাড়িটার ভেতর থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের সমবেত গান—

চলো সখী যমুনায়, বাঁশি ডাকে আয় আয়
দিনমনি ধীরে ধীরে যায়।
পাটিতে ঢালিয়া চাউল, রাধা করে আলো উজল
আজ বুঝি শ্যামেরে হারায়।

গান ঢাকা পড়ে সমবেত উলুধ্বনি আর শাঁখের আওয়াজে। ঘরের দরজা দিয়ে যে ভিড়টা বেরিয়ে এল তার ঠিক মাঝখানে লাল বেনারসিতে জড়ানো ক্রন্দনরত কিশোরীটিই

যে তার মা সেটা বুঝতেই তার বেশ সময় লাগে। কে একটা গেরুয়া আলখাল্লা আর পাগড়ি পরা লোক উঠোনের এককোণে একতারা বাজিয়ে গান ধরে—

সুনাম গঞ্জের নৈদার ঠাকুর, দ্যাখন গঞ্জের মাইয়ারে
ও মাইয়া লইয়া যায়, লইয়া যায় রে—

আকাশের রঙ তখন কালো আর লালে মেশানো। এখানে-ওখানে প্রদীপ আর ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে উঠছে। আকাশে উড়ে যাচ্ছে হাউই, এক-একটা রঙের ঝালর তুলে সেগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। বাইরে বেজে উঠছে নাকাড়া আর রাজবংশী বাঁশি। হাতে বাঁশের লাঠি নিয়ে নাচছে কুচকুচে কালো একদল মানুষ। মাকে এনে তোলা হল পালকিতে। তার দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে ছিল মানুষটি। সে কেবল লম্বা মানুষটার উজ্জ্বল ঘাড় আর তার ওপর এলিয়ে পড়ে থাকা সাদা ফুলের মালাটা দেখতে পাচ্ছিল। অনেক মানুষের ভিড়েও তাকে আলাদা করা চেনা যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল তাকে ঘিরেই এই উৎসব, অথচ সে নির্লিপ্ত। পালকি উঠে যাবার পর একবারই মানুষটা পেছনে ফিরে তাকিয়েছিল। সে দেখেছিল মাঝখানে কাটা ভারী চিবুক আর সুন্দর অথচ অহংকারী চোখ দুটো।

সেই মুহূর্তে তার নিজেরও অহংকার হচ্ছিল।

কাপাস গাছটা ওরা কেটে ফেলেছে বহু দিন, তাই চোখ বুজে সে মাঝেমাঝে গাছটাকে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু দেখতে-দেখতে বাড়িটা প্রায় হয়ে গেল। ইংরেজি 'এল' অক্ষরের দোতলা বাড়ি। 'এল' এর এক প্রান্তে এসে বাড়িটা সামনের রাস্তাটা ছুঁয়েছে। সেই দিকের একতলাটায় গ্যারাজ, আর গ্যারাজের ওপরটাতেই একটা বারান্দা। আর বাড়িটায় ঢুকবার গেটটা এল-এর ফাঁকা জমিটার এক দিকে, ফাঁকা যায়গাটাতে বোধহয় বাগান করবে। বাড়িটায় সবে রঙ করা হয়েছে—একদম ধপধপে সাদা। সে ক্যালেন্ডারে একটা ছবি দেখেছিল—গ্রিস না কোথাকার একটা গ্রামের ছবি। সমুদ্রের পারে পাহাড়ের ঢালে গ্রামটা। সেখানের সব কটা বাড়ি ছিল কেমন যেন চোখধাঁধানো সাদা। এই বাড়িটাকেও সেরকম সাদা লাগছে। কিন্তু বারান্দাগুলোয় রেলিঙের বদলে আছে পেতলের মোটা রড, সেগুলোয় সূর্যের আলো পড়লে আরো ঝক্ঝক্ করে। তাদের পাড়ার অন্য বাড়িগুলোর মধ্যে এই বড়িটা মাথা তুলেছে একদম রাজরানির মতো। তাদের বাড়িগুলো দেখতে কত খারাপ, তা এখন বোঝা যাচ্ছে। এখানে অধিকাংশ বাড়িরই রঙ হলুদ, এলা রঙ দেওয়া। আশেপাশের একটা বাড়িতেও গত কয়েক বছর রঙ পড়েনি, কাজেই বিবর্ণ হলুদের মধ্যে পড়েছে শুকনো শ্যাওলার কালো ছোপ। এই রাস্তা দিয়ে যেই যায় একবার নতুন বাড়িটার দিকে তাকায়, তাকাতে বাধ্য হয়। বাড়িটার গেটের দুপাশে দুটো পিলারের মাথায় দুটো কাচের বড় বল লাগানো হয়েছে, বোধহয় ওখানে আলো লাগাবে। আর একটা পিলারের

গায়ে পাথরের টুকরোয় ইংরেজিতে লেখা আছে—'মাই হেভেন'। এরকম নাম তাদের পাড়ায় কোনো বাড়িতে নেই। তারা যে বাড়িতে থাকে তার নাম 'মোক্ষদা ভবন'। এটা নাকি ওপরের মেশোমশাইয়ের মার নাম। টিঙ্কুদের বাড়িতে লেখা আছে 'ওঁ নারায়ণ'। বুবাইদের বাড়ির নাম 'পিতৃস্মৃতি'। কিন্তু এ বাড়ির নাম 'মাই হেভেন'। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'আমার স্বর্গ'। স্বর্গে তো মানুষ মরলে যায়, তাহলে বাড়িটার নাম এরকম কেন? শুধু তার মনে হয় ওরা যদি বাড়িটার গেটের দুপাশে দুটো জলপাই গাছ লাগাত, তাহলে খুব ভাল হত, যদিও জলপাই গাছ সে কখনো দেখেনি।

অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে, কাজেই একশ পারসেন্ট ছুটি। সকাল বেলা তারা ক্রিকেট খেলছিল। খেলছিল রাস্তাতেই, মাঠটা আর নেই। সাধারণত তারা যখন এখানে খেলে, তখন তাদের উইকেটটা হয় ঠিক নতুন বাড়িটার সামনে। কারণ ওটা একটা তিন রাস্তার মোড়, বোলার সামনে গলিটার থেকে বল করে, আর ব্যাটস্ম্যান দু-পাশের গলিতে মারতে পারে। কিন্তু তাদের উইকেটটা ঠিক যেখানে হয়, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে আকাশি ফিয়াটটা। তাদের খেলার জন্য কেউ গাড়ি সরাবে এতটা তারা আশা করে না। কাজেই আজ উইকেট হয়েছে উল্টোদিকে।

বোলার বল করবে নতুন বাড়ির দিক থেকে। গলির ক্রিকেটে এক দিক থেকেই বল করা হয়, তাছাড়া তাদের ব্যাটও একটাই। কেউ এক রান নিলে বা ওভার শেষ হলে ব্যাট পালটে নিতে হয়। রানারের হাতে ব্যাটের বদলে থাকে একটা ভাঙা কাঠের উইকেট।

আগে তারা রাবারের বলে খেলত, এখন খেলে ক্যাম্বিসের বলে। বলের জন্য রীতিমতো চাঁদা দিতে হয়, বল ফাটলেই দশ পয়সা। ব্যাটটা অবশ্য লান্টুর। রাস্তায় খেলার একটাই অসুবিধা, বলটা বারবার নর্দমায় পড়ে। রাবারের বল নর্দমায় পড়লে এত অসুবিধা হয় না, তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। কিন্তু ক্যাম্বিসের বল নর্দমায় পড়লে বলটা অনেকক্ষণ ভেজা থাকে। বোলাররা অবশ্য ভেজা বলেই বল করতে চায়। আসল আপত্তিটা মার, ঐ নর্দমার নোংরা লাগা বলে ক্রিকেট খেলে ফিরলেই চেঁচায়, 'চান না-করে ঘরে ঢুকবি না'।

রাস্তার ক্রিকেটে যে দল টসে জেতে, তারা সব সময়ই প্রথমে ব্যাটিং নেয়। কারণ পরে যারা ব্যাটিং করে, তারা অনেক সময়ই পুরো ব্যাটিং পায় না। বেলা হয়ে গেলে ফিল্ডিং সাইড 'তোরা জিতে গেছিস' বলে বাড়ি চলে যায়।

আজ তাদের কপাল ভাল, তারাই টসে জিতেছে। আসলে তারা টস করে না, তারা করে ইন-আউট। এক দলের ক্যাপ্টেন হাতে একটা ছোট ইটের টুকরো নিয়ে বিপক্ষের ক্যাপ্টেনের কাঁধের ওপর দিয়ে হাতটা নিয়ে তার পেছনের দিকে হাতটা ঝাঁকায়, তারপর হাতটা মুঠো করে সামনে এনে জিজ্ঞাসা করে, ইন না আউট। অর্থাৎ মুঠোর ভেতর ইটের টুকরোটা আছে না নেই। ঠিক বলতে পারলে উত্তরদাতা ক্যাপ্টেন জিতবে, আর না পারলে হারবে।

তাদের প্যাভেলিয়ান বা গ্যালারি সবটাই হল টিঙ্কুদের একতলার রোয়াক। ওখানে ব্যাটিং সাইড বসে, ওখানেই রান লেখা হয়—আর সেখানেই রেলিঙে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে ছোটদের দলবল। কখনো কখনো লোক কম পড়লে ছোটদের খেলায় নেওয়া হয়। কিন্তু সে একদম বাধ্য হলেই, কারণ ওগুলো না করতে পারে বল, না ধরতে পারে ব্যাট—আর একটাকে নিলেই বাকিগুলোকেও নিতে হয়।

তার ব্যাট করার পালা আসল দুজন আউট হবার পর। তখন তাদের রান সতের। গলির

ক্রিকেটে এটা অবশ্য খুব খারাপ রান নয়। কারণ এখানে বাউন্ডারি মারা খুব কঠিন। বাউন্ডারির সীমানা হল, সামনের দিকে নতুন বাড়ি আর পেছন দিকে শিখাদিদের বাড়ি। সামনের দিকে বাউন্ডারি মানে স্ট্রেট ড্রাইভ। কিন্তু ওই টুকু সরু রাস্তায় সেটা খুব কঠিন, কারণ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন ফিল্ডার, বোলার নিজে আর তার পেছনে আরো দুজন। আর যদি উইকেট কিপার আর স্লিপের মাঝখান দিয়ে বল গলিয়ে পেছনের ফিল্ডারের পাশ দিয়ে চার মারা যায়। সেটা খুব কঠিন।

ওদিকের বোলার শম্ভু, ওদের দলের সবচেয়ে ফাস্ট বোলার। ওভারের প্রথম বলেই লাল্টু বোল্ড হয়েছে, কাজেই তাকে পাঁচটা বল খেলতে হবে। যে কোনো সময় ব্যাট করতে নেমে তার প্রথমেই ভয় হয়, যদি প্রথম বলে আউট হয়ে যাই। আর শম্ভু না হয়ে অন্য কেউ বোলার হলেই সে বেশি খুশি হত।

প্রথম দুটো বলে সে ব্যাট লাগাতেই পারেনি। কারণ বল দুটো পড়ে শরীরের ওপর কোমরের সমান উঁচু হয়ে আসছে, এ বল মারা খুব কঠিন। সে ইচ্ছে করে ব্যাট চালায়নি, কারণ সামনের দিকে ক্যাচ উঠে যাবে। দ্বিতীয় বলটা তার কোমরে লেগে প্রায় উইকেট ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, সমস্বরে আওয়াজ উঠল, 'হাউস্ দ্যাট'। হঠাৎ বাসুদার গলা, 'চাঁদু, বাঁ পাটা এক স্টেপ্ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মার।'

বাসুদা হল টিঙ্কুর ছোটকাকা। এককালে নাকি খুব ভাল খেলত। তারা ক্রিকেট খেললে অনেক সময় বাসুদা ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখে, এরকম এটা-ওটা পরামর্শ দেয়। এবং আম্পায়ারিং নিয়ে কোনো ঝামেলা হলে বাসুদা চূড়ান্ত রায়টা দিয়ে দেয়। তারা বাসুদার কথা মেনে নেয়, বদলে বলের পয়সা কম পরলে বাসুদা চার আনা আট আনা দিয়ে দেয়।

বাসুদার কথামতো সে পরের বলটা খেলতে গেল বাঁ পা বাড়িয়ে। কিন্তু ব্যাটে বলে হল না, কারণ বলটা ছিল অফ্ স্ট্যাম্পের অনেকটা বাইরে। বাসুদার দিকে তাকাতে বাসুদা ঘাড় নাড়ল। পরের বলটা সে ব্যাটে পেল, এবং বলটা ব্যাটে লাগা মাত্র সে বুঝল মারটা হয়েছে। ব্যাট থেকে বলটা বেরল মাটি কামড়ে বুলেটের গতিতে। বোলারের একদম পাশ দিয়ে বলটা বেরল, কিন্তু বোলার শম্ভু ফলো আপে হাতটা নামিয়েও বলটা ছুঁতে পারল না। এটা দেখেই সে রানের জন্য ছুটেছে। কিন্তু চার হবে না, কারণ বলের লাইনেই ফিল্ডার দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু বলটা এতটাই জোরে যাচ্ছিল, ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা তিনু হাত না নামাতে পেরে পা দিয়ে বলটা ঠেকাল এবং তিনুর পায়ে লেগে বলটা গড়িয়ে পড়ল নর্দমাতে। দ্বিতীয় রানের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ, পার্টনারের দিকে না তাকিয়েই সে পরের রানের জন্য ছুটল এবং ভালয়-ভালয় পরের রানটাও হয়ে গেল। টিঙ্কুদের বাড়ির একতলা থেকে দু-একটা হাততালিও পড়ল। সে এবার ঠিক করে নিল, যা মারবার তুলেই মারতে হবে, তাতে হয় ছয়, তা না হলে অন্তত চার।

যে ভাবে ভেবেছে, ঠিক সে ভাবেই সে ব্যাট চালাল। কিন্তু মারতে গিয়েই বুঝল, আগের থেকেই তুলে মারব ভাবাটা তার ঠিক হয়নি। কারণ নর্দমা থেকে তোলা ভেজা বল একবারও না ঝেড়েই সমস্ত জোর দিয়ে শম্ভু বলটা করেছে। ফলে বলটা পড়েছে কিছুটা শর্ট পিচ। বলটা তার ব্যাটে লাগল, কিন্তু নীচের দিকে না লেগে বলটা লাগল ব্যাটের কিছুটা

ওপরে। ব্যাটে লেগে বলটা সোজা ওপরের দিকে উঠে গেল। ফিল্ডিং সাইড থেকে শোরগোল উঠল 'ক্যাচটা ধর'। ক্যাচ উঠলেও সে যথেষ্ট জোরেই মেরেছে, কাজেই বলটা বোলার এমনকী মিড্ অফে দাঁড়িয়ে থাকা তিনুরও মাথার ওপর দিয়ে উঠল এবং তারপরই বিপজ্জনকভাবে সোজা নামতে শুরু করল। রান নিতে ছুটতে-ছুটতে সে দেখছে বলটা লক্ষ্য করে তিনু ক্রমশ পেছোচ্ছে আর বলটা দ্রুত নেমে আসছে। পেছতে-পেছতে তিনু যখন আকাশি ফিয়াটটার গায়ে ধাক্কা মারল, বলটা ঠিক তার হাতের নাগাল এড়িয়ে গিয়ে ড্রপ খেল গাড়িটার ছাদে এবং সেখান থেকে সোজা নতুন বাড়ির দেওয়ালে।

'প্যাভেলিয়ান' থেকে আওয়াজ উঠল 'চার, চার'। এবং আম্পায়ার, যে আবার ব্যাটিং সাইডের লোক, সঙ্গে-সঙ্গে বাউন্ডারির সিগনাল দিল। কিন্তু ফুঁসে উঠল ফিল্ডিং সাইড—'চার মানে? আসলে তো আউট। গাড়িটা না থাকলে তো তিনু ক্যাচটাই ধরত।' এই নিয়ে দু-পক্ষের তুমুল ঝগড়া।

সে দেখল ঝগড়ায় অংশগ্রহণ না করে বরং বুদ্ধিমানের কাজ হবে আবার ব্যাটিং ক্রিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। চারই হোক বা সিঙ্গলই হোক, সে অন্তত আউট হয়নি। ঝগড়া পেছনে রেখে সে মাঝ পিচ পর্যন্ত চলে এসেছে, সে খেয়ালও করেনি ঝগড়াটা হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেছে। সে যখন খেয়াল করল, তখন তার বাঁ-কানটা কে যেন সজোরে টেনে ধরেছে। মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা ঘোরাতেই তার প্রথমেই যেটা নজরে এল, সেটা হল—মাঝখানে কাটা একটা ভারি চিবুক। চাপা গর্জন তার কানে এল, 'এটা কী হল?'

তার অবশ্য কোনো কথা কানে যাচ্ছে না। প্রথমে সে অবাক হয়েছিল, কিন্তু এখন তার অসম্ভব রাগ আর লজ্জা হচ্ছে। প্রথমেই তার মনে হল, হাতের ব্যাটটা সজোরে চালিয়ে দেবে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আবার ভয় হল। লোকটা তার এত কাছে দাঁড়িয়ে যে, ওর গা থেকে একটা পারফিউমের একটা হালকা গন্ধও সে পাচ্ছে। এই মুহূর্তে কানের যন্ত্রণাটা কোনো ব্যাপারই না তার কাছে, তার আসল যন্ত্রণা—ক্লাস নাইনে সে উঠবে দু-দিন পরে, আর এই লোকটা পাড়ার ভেতরে এতগুলো লোকের সামনে তার কান ধরেছে। কথাটা আবার ভেসে এল, 'এটা কী হল?'

কী হয়েছে তা সে এতক্ষণে নজর করল। নর্দমার জলে ভেজা ক্যাম্বিস বলটা বারান্দার ঠিক নীচে চোখ ঝল্সানো সাদা দেওয়ালের ওপর একটা নোংরা কালো ছাপ ফেলে এসেছে।

তার বন্ধুদের মধ্যে কেউ একজন, খুব সম্ভবত শম্ভু, বলে উঠল—'মারছেন কেন? ও কি ইচ্ছে করে করেছে?'

লোকটা ফিরে তাকাল বন্ধুদের দিকে। আর সেই সুযোগে সে এক ঝট্‌কায় কানটা ছাড়িয়ে এক পা পিছিয়ে ব্যাটটা শক্ত করে ধরে দাঁড়াল। লোকটা আবার ফিরে তাকিয়েছে তার দিকে। রাগে ফরসা মুখটা লাল হয়ে গেছে। প্রায় পৌনে ছ-ফুট লম্বা আর মানানসই স্বাস্থ্যের একজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারের দু-হাত দূরে দাঁড়িয়ে রোগা, ছোট্টো চেহারার একটা বছর চোদ্দর ছেলে। ডিসেম্বরের সকাল পৌনে দশটার ননীমাধব দে স্ট্রিটের তিন মাথার মোড়টা শিল্পীর ইজেলে আবদ্ধ স্থিরচিত্রের মতো দাঁড়িয়ে আছে পরবর্তী ঘটনার জন্য। এই প্রথম সে লোকটার চোখের দিকে তাকাল। যেটা সে লক্ষ করল, লোকটার চোখ দুটো ঠিক কালো নয়, একটু যেন নীলচে। সে দিকে তাকিয়ে থেকেই, প্রায় ফিসফিস করে,

কিন্তু প্রথম শব্দটার ওপর যথেষ্ট জোর দিয়ে সে বলে উঠল, 'বেশ করেছি।'

দাঁতে দাঁত চেপে লোকটা বলে উঠল, 'তা তো বলবেই, স্কাউন্ড্রেল ছেলে।'

এবার সে বাকি সবাই শুনতে পারে এরকম ভাবে গলাটা তুলেই বলল, 'বেশ করেছি, আবার করব।'

কাজটা সে ঠিক করেছে, না ভুল করেছে, এ বিচার সে করতে চায় না। সে শুধু তার অপমানের জবাব দিতে চায়। তার সব জোর দিয়ে সে পাল্টা আঘাত করতে চায়, তাতে যা হবার হোক, এই মুহূর্তে সে কিছুর পরোয়া করে না। লোকটা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'কী বললে, 'আবার করব'?'

হাতে ব্যাটটা শক্ত করে ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল। তার ভেতরে কোথাও সে একটা কণ্ঠস্বর সে শুনতে পাচ্ছে 'লড়ে যাও, জেনারেল গিয়াপ'। কখন যেন হাতে একটা বড়সড় ঢিল নিয়ে ছোট এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। ডান হাতে ব্যাট আর বাঁ হাতে ছোটকে ঠেকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, এই প্রথম একটুও ভয় না পেয়ে। তার অপমান তাকে ভয় ভুলিয়ে দিয়েছে। তারপর শেষবারের মতো তাদের দুজনের দিকে আগুনের দৃষ্টিতে তাকিয়ে লোকটা ফিরে চলল তার 'মাই হেভেন'-এর দিকে। আর তার পেছনে ছোটর হাতটা ধরে সেও হাঁটতে শুরু করেছে। ওপর থেকে বাসুদার গলা পাওয়া গেল, 'ছেড়ে দে, ওদিকে গিয়ে খেল তোরা।'

সে অবশ্য ওসব কথা আর শুনছে না, আর যেই খেলুক সে অন্তত খেলছে না। ব্যাটটা কার হাতে দিল সেটাও তার খেয়াল নেই। তার ভেতর থেকে কেউ একটা কথা সমানে বলে যাচ্ছে, কিছু একটা করতে হবে। ছোটটাও চুপচাপ তার পেছন পেছন আসছে। দাদার অপমান তার গায়েও লেগেছে।

বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে সে ছোটর দিকে তাকায়, এবং ঠাণ্ডা গলায় বলে—'বাড়িতে কিছু বলবি না।'

ভয় পাওয়া চোখে ছোট ঘাড় নাড়ে।

নিজের ঘরে ঢুকে সে চুপচাপ বসে থাকে। কিন্তু ভেতরের তুমুল ঝড় কেবল একটাই কথা বলে যায় : কিছু একটা করতে হবে।

কী করবে সে ভেবে পায় না। তার মনে হচ্ছে গোটাটাই তার সময় নষ্ট। প্রায় দু-মাস হল সে এদের সাথে যোগ দিয়েছে। কিন্তু যা ভেবে আসা, তার কিছুই হচ্ছে না। যেখানে তারা আছে, তার ধারে কাছে যুদ্ধের নামগন্ধও নেই। এমনকী কয়েক দিন ক্লাসের সময় ছাড়া বন্দুক ছুঁতেও দেওয়া হয়নি। অথচ সে কত কিছু ভেবে এসেছিল। শুধু সকাল থেকে হাড়ভাঙা ফিজিকাল ট্রেনিং। প্রথম প্রথম তার মনে হচ্ছিল, সে বোধহয় মরে যাবে, তবে আস্তে-আস্তে সয়ে গেছে। তবে তাদের গ্রুপের ছেলেগুলো ভাল। দু-তিনজন মাত্র কলকাতার, বাকি সব বাইরের। সবাই মিলে দল বেঁধে কেটে যেত। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে তাও বন্ধ। সকালের ট্রেনিং-এর পর তাদের আলাদা আলাদা করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'জনগণের মধ্যে কাজ' করার জন্য। জনগণের মধ্যে কাজ মানে হল গ্রামের কোনো একটা পরিবারে গিয়ে তাদের সাথে কাজ করা। এখানেও তার কপাল খারাপ। সন্ধেবেলা সবাই যখন ক্যাম্পে ফিরে আসে, সবাই তাদের সারা দিনের অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে গল্প

করে, কিন্তু সে বসে থাকে চুপ করে, কারণ বলার মতো কোনো কথাই প্রায় তার থাকে না। তাকে যে পরিবারে পাঠানো হয়েছে সেটা কোনো পরিবারই নয়, একজন মানুষ মাত্র। প্রৌঢ়া একজন বিধবা মহিলা, তার বয়স ঠিক কত সে আন্দাজ করতে পারেনি। কারণ তিনি এখনো বেশ শক্তপোক্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, মহিলা বিশেষ কোনো কথাই বলেন না। মাসিমা বলে ডাকলে বড়জোর হাঁ-হুঁ বলে উত্তর দেন। প্রথমে তার মনে হচ্ছিল, বোধহয় অপরিচিত বলে তার সাথে কথা বলছে না, কিন্তু পরে সে দেখেছে উনি কারুর সাথেই বিশেষ কথা বলেন না। এরকম একজনের সাথে দিনে দশ ঘণ্টা কাটানো মানে নরকযন্ত্রণা।

বছরের এই সময় চাষবাসের কাজও বিশেষ থাকে না, কাজে সে প্রায় বেকার। সামনের জমিতে কিছু পালং শাক আর বেগুনের চারা লাগানো আছে। সামনের পুকুর থেকে জল এনে সে খেতে দেয়। নিজের বিচারবুদ্ধিমতো আগাছা-টাগাছা তোলবার চেষ্টা করে। উঠোনটা ঝাঁট দেয়। এমনকী দু-দিন চালও বেছে দিয়েছে। কিন্তু মহিলা নিজের থেকে তাকে কোনো কাজ করতে বলেন না। একদিন ঘরের চালে খড় দিতে সে উঠেছিল, কিন্তু মহিলা তাকে জোর করে নামিয়ে নিজেই চালে উঠে খড় ছাইতে থাকেন, আর সে নীচের থেকে খড় দিয়ে যায়। ছোট একটা জাল দিয়ে মহিলা পুকুর থেকে মাছ ধরেন, তাকে খাওয়ানোর জন্য। সে চেষ্টা করেনি, কারণ মাছ চুরি ঠেকানোর জন্য যে সব কাঁটাগাছ পুকুরে ডুবিয়ে রাখা আছে সেগুলো এড়িয়ে সে জাল ফেলতেই পারবে না, তার অপচেষ্টায় বড়জোর জালটা ছিঁড়বে। সারাদিন এইসব করে এবং দাওয়ায় বসে অবিরাম হাই তুলে সন্ধেবেলায় একরাশ বিরক্তির বোঝা নিয়ে সে ক্যাম্পে ফেরে। শুধু লাভ হল দুপুরের ভাতটা, ক্যাম্পের খাবার মুখে তোলা যায় না।

সে এতই বিরক্ত যে, শেষে একদিন না পেরে তাদের ক্যাম্পেরই একজন ট্রেনারকে জিজ্ঞাসা করে 'আচ্ছা কমরেড, এই যে 'জনগণের মধ্যে কাজ'—জনযুদ্ধে এটা কতটা দরকারি? আমি যুদ্ধ করব, আমাকে যুদ্ধ না শিখিয়ে চাল বাছতে শিখিয়ে কি খুব লাভ হচ্ছে কি?'

ট্রেনার বেঁটেখাটো একজন ভদ্রলোক। তার ধারণা যুদ্ধ শুরু হবার আগে ভদ্রলোক নির্ঘাত মফস্বলের কোনো সরকারি অফিসের কেরানি ছিল। তিনি তার বক্তব্য বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর পড়া বোঝানোর মতো করে শুরু করলেন, 'কমরেড যাদের মুক্তির জন্য লড়ছেন, তাদের জীবনকে যদি না চেনেন, কী করে জনযুদ্ধ করবেন? আপনারা শহর থেকে এসেছেন গ্রামের মানুষকে তো জানতে হবে। এদের মধ্যেই আমাদের থাকতে হয়, এরাই আমাদের মজুত বাহিনী, এদের জোরেই আমরা লড়ছি। আপনি তো নিশ্চই কমরেড মাও-এর সেই বিখ্যাত কথাটা জানেন—মাছ যেভাবে জলে থাকে, আমরা সেভাবে জনগণের মধ্যে থাকি।'

কমরেডের সব কথাই ঠিক, কিন্তু সবটা নিয়েই তার ভীষণ বিরক্ত লাগছে। সে তাই ঠ্যাটার মতো বলে, 'এক নম্বর, আমি অন্য কারোর মুক্তির জন্য লড়ছি না, আমি লড়ছি নিজের মুক্তির জন্য। দু-নম্বর, আপনার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে, আমরা যখন শহরে ঢুকব, তখন শহরের মানুষের জীবনকে জানবার জন্য আপনার উচিত হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসন মাজা।'

এবার ভদ্রলোক কিছুটা রাগত স্বরেই উত্তরটা দিলেন, 'আপনার এক নম্বর প্রশ্নের উত্তর হল, আপনি কি একা-একা নিজের মুক্তি আনতে পারবেন? যদি পারতেন তাহলে বিপ্লবী বাহিনীতে আপনার যোগ দেবার দরকার হত না। আপনার নিজের মুক্তির জন্যই আপনি এই গ্রামের মানুষদের সাহায্যপ্রার্থী। আপনি শ্রমিকও নন, গরিব কৃষকও নন, একজন মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া মাত্র। আপনাকে এদের নেতা বলে মানতে হবে, এদের কাছ থেকে আপনাকে অনেক কিছু শিখতে হবে, জানতে হবে। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হল, একজন বিপ্লবীকে প্রয়োজন হলে বাসনও মাজতে হয়। আসলে আপনার মতো পেটি বুর্জোয়ারা মনে করেন কিছু কিছু কাজ করলে আপনাদের সম্মান চলে যায়।'

সে কোনো কথার উত্তর না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে, ভদ্রলোকই বলে যান, 'বুঝলেন, অন্যদের সাফল্য থেকে আমাদের শিখতে হয়। আপনি তো লেখাপড়া জানেন, দাঁড়ান, আপনাকে একটা জিনিস পড়াই।'

এই বলে তিনি উঠে গেলেন, কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন হাতে একটা বই নিয়ে। তারপর বইটা থেকে একটা পৃষ্ঠা বার করে বললেন—'পড়ুন, এই জায়গাটা পড়ুন।'

সে খবরের কাগজে মলাট দেওয়া বইটা হাতে নিয়ে প্রথমে বইটার নামটা দেখল, 'জনযুদ্ধ ও গণবাহিনী', লেখকের নাম—ভো ন্‌গুয়েন গিয়াপ। সে সেই পৃষ্ঠাটা এবার পড়ে। সেখানে আছে বারটা নির্দেশ। ১৯৪৮ সালে হো চি মিন তার বিপ্লবী বাহিনীর উদ্দেশে এই বারটা নির্দেশ দিয়েছিলেন। বারোটা নির্দেশের আবার দুটো ভাগ—প্রথম ছটা হল 'যা-যা করা যাবে না', আর পরের ছটা হল 'যা-যা করতে হবে'। যা-যা করা যাবে না, সেগুলো হল—এক, জনগণের ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, খেত ও ফসল নষ্ট হতে পারে এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

—দুই, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো জিনিস তাদের কাছ থেকে জোর করে কেনা যাবে না বা নেওয়া যাবে না।

—তিন, পাহাড়ি উপজাতিদের ঘরে মুরগি নিয়ে যাওয়া যাবে না।

—চার, কখনো কোনো গোপন কথা ফাঁস করবে না।

—পাঁচ, জনগণের বিশ্বাস বা আচার-আচরণে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনো কাজ করা যাবে না।

—ছয়, এমন কিছু বলা যাবে না বা করা যাবে না, যাতে জনগণের মনে হতে পারে যে, আমরা তাদের দয়া করে কিছু করছি।

আর যা-যা করতে হবে, সেগুলো হল—

—এক, জনগণকে প্রাত্যহিক কাজে সাহায্য করো।

—দুই, হাট বা বাজার থেকে দূরে থাকে, এরকম জনগণের জন্য যতখানি সম্ভব জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এসো।

—তিন, যখনই সময় পাবে জনগণকে জনযুদ্ধ সম্পর্কে আকর্ষণীয় গল্প বলো।

—চার, জনগণকে সাক্ষর করো এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি শেখাও।

—পাঁচ, প্রত্যেক অঞ্চলের জনগণের আচার-আচরণ অনুধাবন করো, চেষ্টা করো যাতে একটা সহানুভূতির আবহাওয়া তৈরি করা যায়, তারপর তাদের বুঝিয়ে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করো।

—ছয়, কাজের মধ্য দিয়ে জনগণকে বোঝাও, তুমি ন্যায়নিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ, এবং বিনয়ী।

কথাগুলো তার কাছে নতুন না। মাসখানেক আগে জেলা কমিটির সেক্রেটারি এসেছিলেন মিটিং করতে। ক্যাম্পের বাইরের মাঠে মাথা-ঢাকা হ্যারিকেনের আলোতে মিটিং হয়েছিল। বক্তা ছিলেন সেক্রেটারি একাই। তিনি বয়স্ক পাকা চুলের একজন সৌম্যদর্শন মানুষ। পরেছিলেন মিলিটারি পোশাক, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল ধুতি পাঞ্জাবি পরলেই ভাল মানাত। তিনি এইসব বলেছিলেন। আরো বলেছিলেন, মুক্তাঞ্চলে সাধারণ মানুষের জীবনের উন্নতির কথা, শোষণ-মুক্তির কথা। কীরকম একটা জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে তাদের এই লড়াই চালাতে হচ্ছে সেটা বুঝিয়েছিলেন অনেকক্ষণ ধরে। তার খুব ভাল লেগেছিল বক্তৃতাটা, বেশ গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা ব্যাপার। আর এটা ভেবে আরো খারাপ লাগছে, কোথায় লড়াই আর কোথায় চালের ধান বাছা।

সে ভাবার চেষ্টা করল 'মাসিমা'র সাথে এই বারো দফা নির্দেশ নিয়ে সে কী করতে পারে। যা-যা করা যাবে না, সেই তালিকার সে কিছুই করে না। আর, যা-যা করতে হবে, তার মধ্যে প্রাত্যহিক কাজে যতটা সম্ভব সে সাহায্য করে। হাট-বাজারে সে নিজেই যায় না। কাজেই জিনিস কিনে আনার কোনো সুযোগ তার নেই। মাসিমা যেহেতু কথাবার্তা প্রায় বলেনই না, সেক্ষেত্রে একপক্ষীয় ভাবে জনযুদ্ধের গল্প বলাটা খুব কঠিন। অক্ষরজ্ঞান দেবার বিষয়টা সে চেষ্টা করে দেখতে পারে, অবশ্য যদি মাসিমা রাজি হন তবেই। কুসংস্কার বলতে, সে যেটুকু দেখেছে, তা হল, বিধবা বলে নিরমিষ খান। এই কুসংস্কার সে কাটাতে পারবে, এটা ভাবারই কোনো সুযোগ নেই।

দুপুরবেলায় দাওয়ার এক কোণে বসে মাসিমা মুড়ি ভাজছিলেন, সে বসেছিল দাওয়ার আর এক কোণে। সাহস করে সেই কথাটা পাড়ল, 'আচ্ছা মাসিমা, দুপুরে যখন কাজ একটু কম থাকে, তখন তো আপনি একটু লেখাপড়া শিখলেও পারেন। দেখবেন তাতে আপনার কত সুবিধা।'

মুড়ির কড়াই থেকে চোখ না তুলেই তার বক্তৃতাকে মাঝপথে থমিয়ে মাসিমা বললেন, 'আমি লিখতে পড়তে জানি।'

এই উত্তরে সে যুগপৎ লজ্জিত এবং বিস্মিত। এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলার মতো জায়গায় সে আর ছিল না।

মোদ্দা কথা, বার দফা কর্মসূচি পালনের কোনো সুযোগ তার সামনে বিশেষ নেই, এটা পরিষ্কার।

আসলে এই মহিলা তাকে ঠিক কী চোখে দেখেন, এটাই সে বুঝে উঠতে পারছে না, তার সমস্ত অস্বস্তির কারণ বোধহয় এটা। মাঝে-মাঝে মনে হয়, তার মতো একটা আপদকে নিয়ে মহিলা বেশ বিরক্ত। আবার খেতে দেবার সময় এত যত্ন করে তাকে খাওয়ায় যে, মনে হয় ব্যাপারটা উল্টো। কিন্তু সারা দিন কথা না বলে থাকা যায়? দুপুরবেলা মাসিমা নানা রকমের কাজ নিয়ে বসেন দাওয়াতে, কোনো দিন মুড়ি ভাজেন, কোনো দিন ঝাঁটা বানান, কোনো দিন কাঁথা সেলাই করেন। সে দাওয়ার একপ্রান্তে বসে নানা কথা বলে যায়। আদপেও মহিলা তার কোনো কথা শোনেন কি না, এব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। কারণ শুনলে দু-একটা হুঁ-হাঁ তো করবেন? কিন্তু কথা যে শোনেন সেটা একদিন সে

বুঝেছে। সে একদিন কী করে বাড়ি থেকে এখানে চলে এল সেই গল্প করছিল। যথারীতি অপর-পক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু একবারই তার দিকে তাকিয়ে মাসিমা হঠাৎই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসার সময় মা-রে বলে আসেননি?'

সে বোঝে তার দুর্বলতম জায়গাটা এই মহিলা ধরে ফেলেছেন। জনযুদ্ধের বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তার বলার কথা, কিন্তু সে বলে ফেলেছে একজন বিপ্লবীর কাপুরুষতার গল্প। বলব-বলব করেও সে মাকে কথাটা বলে উঠতে পারেনি। ভয় ছিল, যদি মা তাকে আটকে দেয়? সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে থাকে, কী উত্তরই বা সে দেবে? তার ফেলে আসা জীবনের এটাই তো একমাত্র দুর্বল জায়গা। এই একটা কারণেই প্রথম-প্রথম দু-একটা রাত চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছে। কিন্তু সে নিশ্চিত, মা তাকে ক্ষমা করবে। খুশি হবে, এই প্রথম তার দুর্বল মুখচোরা ছেলেটা সাহস দেখিয়েছে।

আজ একটা বিষণ্ণ খয়েরি আকাশের সকালে সে এইসবই ভাবছে। ভাল না লাগার যে বিষয়টা, সেটা তার নিজের ছায়ার মতোই লেপটে আছে সারাক্ষণ, সে সেটাকে তাড়াতে পারে না। আজ তার ক্যাম্প ডিউটি, কাজেই তার আজ মাসিমার বাড়িতে যাওয়া নেই, এমনকী কপাল ভাল থাকলে কোনো কাজও নেই। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় চারিদিকটা কেমন কুয়াশা-কুয়াশা। এই একা-একা বসে থাকাটাও বেশ বিরক্তিকর, আরো মন খারাপ হয়ে যায়।

এক সময় তার ডাক পড়ল রান্নাঘরে—কাঠ কেটে দিতে হবে। কাঠ কাটতে অবশ্য তাকে জঙ্গলে যেতে হবে না। এই পরিত্যক্ত বিশাল বাড়িটার একতলায় একটা ঘরে নানা রকমের জিনিস ডাঁই করা আছে, তার থেকে কিছু একটা বার করে কেটে দিলেই হবে।

তারা যে বাড়িটায় ক্যাম্প করেছে, সেটা কোনো এক জমিদারের পুরনো বাড়ি। এই এলাকা মুক্ত হবার অনেক আগেই এ বাড়ির বাসিন্দারা পালিয়েছিল। এমনিতেও অবশ্য বাড়ির মালিক এখানে থাকত না, শহরেই থাকত। ফলত বাড়িটা অনাদরেই পড়েছিল। এর আসবাবপত্র এমনকী কিছু দরজা-জানালাও লুট হয়ে গেছে। বাড়ির একতলাতে কোণের একটা ঘরে—পুরোনো ভাঙা কিছু আসবাবপত্র, তক্তা, ভাঙা দরজা-জানালা ডাঁই করা, সেখান থেকেই কাঠ বার করে আনতে হবে। ঘরটা ঝুল আর ধুলোয় ভর্তি,তার ভেতরে বিছে বা সাপখোপ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সে অবশ্য এই সব নিয়ে খুব চিন্তিত না, তার আসল চিন্তার বিষয় হল আরশোলা। এই একটা জিনিসকে সে কতটা অপছন্দ করে, তা সে ভাষায় বর্ণনা করতে পারবে না, আর তা যদি উড়তে শুরু করে তাহলে তো আর কোনো কথাই নেই। কিন্তু সে কথা সে কী করে বলে? যুদ্ধ করতে আসা একজন বিপ্লবী আরশোলার ভয়ে পালাচ্ছে, এটা কাউকে বোঝানো যাবে না। অতএব যাবতীয় উৎকণ্ঠা আর অস্বস্তি নিয়েই সে কাঠ আনতে চলল। দরজার একদম সামনে তক্তার একটা প্রান্ত বেরিয়ে আছে। তার মনে হল কোনোভাবে সে যদি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তক্তাটাকে টেনে বার করে আনতে পারে, তাহলে গোটা ব্যাপারটার একটা ভদ্রলোকের মতো সমাধান হয়। সে তক্তাটা ধরে নীচু হয়ে টানতে শুরু করল, একটু জোর দিয়ে টানতেই তক্তাটা বেরিয়ে আসতে শুরু করল। জিনিসটা বেরিয়ে এল তক্তাটার সাথে।

এই ঘরে আলো আসার একমাত্র পথ হল দরজাটা, যেটা ঢেকে সে দাঁড়িয়ে আছে, কাজেই ঘরটার ভেতরটা আধো অন্ধকার। কিন্তু তার মধ্যেই সে বুঝল, জিনিসটা একটা

বাঁধানো ছবি। ওপরের কাঁচটার একটা কোনো ভাঙা, এছাড়া বোধহয় গোটা ছবিটাই অক্ষত আছে। প্রাথমিকভাবে এই ছবি দেখার কোনো উৎসাহ সে বোধ করেনি, এই জমিদারবাড়ির কোনো বর্তমান বা প্রাক্তন সদস্যের ছবি দেখে সে কীই বা করবে। কিন্তু পরে মনে হল, দেখা যাক না কার ছবি। আসলে পুরনো ছবি দেখার ব্যাপারে প্রত্যেকেরই একটা অদ্ভুত উৎসাহ থাকে। তুলব-না তুলব-না করেও সে ছবিটা তুলল। এবং তুলতে গিয়ে বুঝল, ছবিটা যথেষ্ট ভারি। ফ্রেমটাতে কাঠের কাজ করা। ছবিটা ধুলোয় ঢাকা, কাজেই বোঝার উপায় নেই কার ছবি। একহাতে তক্তা আর এক হাতে ছবিটা নিয়ে সে বেরিয়ে এল। তক্তা এবং ছবি, দুটোই মাটিতে নামিয়ে রেখে সে খুঁজতে শুরু করল কিছু একটা, যা দিয়ে সে ছবিটা মুছতে পারে। পেয়ে গেল একটুকরো কাগজ। ছবিটার ওপরের একটা কোণার দিকের কাচটা ভাঙা। সে তাই নীচের দিক থেকেই ছবিটা মুছতে শুরু করল। অনেক দিনের জমে থাকা ধুলো কাজেই একবার মুছলেই সবটা পরিষ্কার হচ্ছে না, দু-তিন বার মুছতে হচ্ছে। ফলে, থিয়েটারের পর্দা আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠলে যেরকম হয়, ছবির মানুষটা সেরকম ভাবে তার সামনে ক্রমশ পুরো চেহারা নিচ্ছে।

পায়ে নাগরার মতো জুতো। পরে আছে ধুতির মতো কিছু একটা। ধুতিটা পায়ের পাতা থেকে কিছুটা উঠে আছে। লোকটা সিংহাসনের মতো কোনো একটা বড় চেয়ারে বসেছে। ডান হাতটা একটা লম্বা তরোয়ালের বাঁটের ওপর রাখা। ওপরে পরে আছে পুরোনো পিরানের মতো একটা জামা। সেটার ওপর সুতো কিংবা জরির জমকালো কাজ করা। গলার ওপর ঝুলছে লকেটহীন একটা মোটা হার, বোধহয় সোনার। চওড়া বুক আর মোটা কবজি দেখলে বোঝা যায় লোকটা যথেষ্ট শক্তিশালী। ছবিটার কাঁধ ছাড়িয়ে আর একবার মুছতেই বেরিয়ে এল, মাঝখানে কাটা একটা ভারি চিবুক। দ্রুতগতিতে তিন-চার বার মুছতেই পরিষ্কার হল চোখটা—ঠিক কালো নয়, একটু যেন অন্য রঙের, আর তাকানোর ভঙ্গিতেই বোঝা যায় লোকটার অহংকার।

একটা ছাই-ছাই সবুজ রঙের আকাশের নীচে সে তাকিয়ে থাকে অহংকারী চোখ দুটোর দিকে।

বাবা সেদিন রাতে ফিরল না। রাত এগারোটা নাগাদ অনুপকাকু এসে বলে গেল চিন্তা না করতে। পুলিস অ্যারেস্ট করতে পারে এই ভয়ে কেউই বাড়ি ফিরছে না।

স্ট্রাইক শুরু হয়েছে তিন দিন আগে। বাবার কাছ থেকেই শুনেছিল স্ট্রাইক হতে পারে। বাবা অবশ্য স্ট্রাইকটার ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহী ছিল তা তার মনে হয়নি। কিন্তু স্ট্রাইক শুরু হবার পর থেকে গোটা ব্যাপারটাতেই বোধহয় বাবা জড়িয়ে গেছে। প্রায় রোজই ভোরে বেরিয়ে বাবা ফিরছিল অনেক রাতে।

এমনিতে সে এই স্ট্রাইকের ব্যাপারটায় খুশি। চারদিকে একটা দমবন্ধ করা অবস্থা, তার মধ্যে স্ট্রাইকটাকে একটা উৎসাহ পাবার মতো ব্যাপার মনে হচ্ছে। কিন্তু সমস্যারও একটা দিক আছে। সে এখন ক্লাস টেনে পড়ে, একদম বাচ্চা ছেলে নয়। সংসারের ব্যাপার-স্যাপার সেও কিছুটা বোঝে। যদি দীর্ঘদিন ধরে স্ট্রাইক চলে, আর মাইনে-কড়ি বাবার বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সংসার চলবে কী করে? এই নিয়ে একটা চিন্তা আছেই। স্ট্রাইক শুরু হবার আগের দিন বাবা আর মা রাতে অনেকক্ষণ ধরে এসব নিয়ে আলোচনা করছিল—সে শুনছিল। সাধারণত এই সব আলোচনায় সে থাকে না। হয় সেদিন উত্তেজনায় মা-বাবা কেউ খেয়াল করেনি, সে আছে অথবা তারা চেয়েছিল সে সেখানে থাকুক। সেও মনে মনে ভেবে রেখেছে, প্রয়োজন হলে সে কোচিংয়ে পড়াটা ছেড়ে দেবে।

গতকালই বাবা এসে বলছিল, পুলিসের ভয়ে কাঁচড়াপাড়াতে লোকজন কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু বাবাকেও পুলিসে ধরতে পারে, এটা সে ভাবেনি। কাজেই বাবার না ফেরাটা তার কাছে কিছুটা অপ্রত্যাশিত। মাঝে মাঝে মা বলত, 'তুই বাড়ির বড় ছেলে, দুদিন পর তোকেই তো সব সামলাতে হবে।' সত্যি-সত্যি কি এবার তাকে সব সামলাতে হবে?

সে দিন রাতে শুয়ে তার অনেকক্ষণ ঘুম এল না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি, কেমন যেন একটা ভয়। ভয়ের কারণ দুটো—এক, যদি বাবার খোঁজে পুলিস বা সি. আর. পি আসে। আর দুই, বাবাকে যদি ওরা ধরতে পারে, বাবা যদি আর না ফেরে। দ্বিতীয় কারণটাই তাকে ভাবাচ্ছে বেশি। এই ক্লাস টেনে পড়া অবস্থাতেও, অন্য কোনো কারণে ভয় পেলে এখনও তার মনে হয়, মার কাছে চলে যাই। কিন্তু এবার সে মার কাছেও যেতে পারবে না। যদি সত্যি বাবার কিছু হয়, তাহলে তাদের কী হবে? পাশে ছোটটা হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমচ্ছে, ও ঘরে মা—কিন্তু সে একা জেগে আছে। বাসে যেতে যেতে সে দেখেছে, তার বয়সী একটা ছেলে গুরুদশার কাপড় পরে ভিক্ষে করছে, হঠাৎ যেন নিজেকে সেই ছেলেটা বলে মনে হচ্ছে। তার মধ্যে আবার সব কিছু ছেড়ে পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই একটা ঘুম না আসা রাত তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে—পালাবার কোনো পথ নেই।

পরের দিন সকালে উঠে তাকেই বাজারে যেতে হল। খুব ছোটবেলায় সে বাবার সাথে বাজারে গেছে, কিন্তু বড় হয়ে এই প্রথম। তার দু-একজন বন্ধু বাজার করে এবং তারা হল অন্য বন্ধুদের চোখে হিংসার পাত্র। সব সময়ই তারা বড়লোক। কারণ বাজারে গেলেই কিছু পয়সা 'ম্যানেজ' হয়। সে বহু দিন মনে-মনে চেয়েছে, বাড়ির বাজারটা তাকে করতে দেওয়া হোক, কিন্তু দেওয়া হয়নি। সে বাড়ির র‍্যাশন তোলে, দুধের ডিপো থেকে দুধ আনে, কিন্তু কোনোটাতেই কিছু 'ম্যানেজ' করা যায় না। আজ যখন সে সত্যি সত্যি বাজারে যাবার সুযোগ পেল, তখন কিছু 'ম্যানেজ' করার কথা সে ভাবতেই পারছে না।

মা সব লিখে দিয়েছিল, সে সেই লিস্ট দেখেই বাজার করে। গুনে-গুনে খুচরো ফেরত নেয়। এমনকী অন্যদের দেখাদেখি-দরাদরিও করে। লিস্টের বাইরে সে একটাই জিনিস কেনে, পুঁইশাক। সে জানে, মা পুঁইশাক খেতে ভালবাসে। অবশ্য তার ভয়ও করছিল, মা যদি বকাবকি করে। মা বকেনি, শুধু হাসতে হাসতে বলল, 'পুঁইশাক আনলে সঙ্গে কুমড়ো আনতে হয়।' সে নামতা পড়ার মতো মনে-মনে মুখস্থ করে, পুঁইশাকের সঙ্গে কুমড়ো

আনতে হয়।

স্কুলে যাবার জন্য সে তৈরি হচ্ছিল। মা বলল, 'একবার তোর মেজপিসিকে ফোন করে খবরটা দিবি?' খবর দিতে তার কোনো আপত্তি নেই, বরং সে চাইছে খবর দিতে। কাল রাত থেকেই তার মনে হচ্ছে, পিসিরা বা মামু যদি একবার আসে, তাহলে সে একটু ভরসা পায়। কিন্তু তার আপত্তি ফোনে। পাড়ায় ফোন দুটো, একটা কর্নেলের বাড়িতে, যেখানে যাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর একটা রায় মাসিমাদের বাড়িতে, যেখানে সে যেতে চায় না। পাড়ার এই একটা বাড়িতে সে কখনো যেতে চায় না। রায় মাসিমার ছেলে ছোটনদা কয়েক বছর আগে অদ্ভুতভাবে মারা যায়। ছোটনদা চাকরি পেয়ে খবর দিতে গিয়েছিল দিদির বাড়িতে, আর সেখান থেকে ছোটনদা নিখোঁজ হয়। দুদিন পরে ছোটনদার লাশ পাওয়া যায়। আর তার দুদিন পরে রায় মেসোমশাইয়ের কাছে একটা চিঠি আসে, তাতে লেখা—ভুল করে 'শ্রেণীশত্রু' ভেবে ছোটনদাকে খুন করা হয়েছে। যারা খুন করেছে, তারা এর জন্য দঃখিত। পাড়ার সবাই জানে, রায় মাসিমা এক ফোঁটাও কাঁদেনি। কিন্তু তারপর থেকে রায় মাসিমা আর বিশেষ কথাবার্তা বলেন না। রায় মাসিমাদের বাড়িতে ফোন করতে গেলে মাসিমা কেমন যেন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। তার ভয় লাগে। কিন্তু এখন মাকে সে কথা বলা যায় না।

সে বলল, 'খবর দেবার কী দরকার মা?'

মা তার কথাটা গুরুত্ব দিয়ে শুনল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, দরকার নেই।'

সে বুঝল, মা তার উত্তরে খুশি হয়েছে। মার চোখেও সে সত্যি-সত্যি বড় হয়ে গেছে।

মেজপিসিরা খুব বড়লোক, মেজপিসেমশাই বিশাল চাকরি করে, বছরে বোধহয় দশবার বিদেশে যায়। দু-দুটো গাড়ি। ভবানীপুরে পিসেমশাইদের পুরোনো আমলের বিরাট বাড়ি। তার পিসি গাড়ি করে তাদের বাড়িতে আসে, এ নিয়ে পাড়াতে তার খুবই অহংকার। মেজপিসি তাদের দু-ভাইকেই খুব ভালবাসে, ঘনঘনই সে মেজপিসির বাড়িতে যায়। ছোটবেলাতে তো ওখানে গিয়ে থেকেও আসত, এখন বড় হওয়ায় একটু লজ্জা-লজ্জা করে। আর তার পিসতুতো দাদা সুমন তো তার কাছে একদম হিরো। তবে আজকাল তার মাঝে-মাঝে মনে হয়, কথাটা না বললেও মেজপিসি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, তারা বড়লোক। মার সাথে মেজপিসির খুবই ভাব, কিন্তু এটাও সে আজকাল বোঝে দুজনের মধ্যে একটা প্রাচীরও আছে। সে বলেছে, খবর দেবার দরকার নেই, এটা শুনে মা খুশি হয়েছে।

এই প্রথম স্কুলে গিয়ে সে আলাদাভাবে চেষ্টা করল পড়াটা বোঝার, অন্তত প্রথম দুটো ক্লাসে। তারপর বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর সিনেমার গল্প শুনতে গিয়ে চেষ্টাটা কখন যেন মিলিয়ে গেল। তাদের পাড়ার কাছেই একটা নতুন সিনেমা হল হয়েছে—কাজেই আড্ডাতে সিনেমার ব্যাপারটা খুব বেশি-বেশি থাকছে। এমনকী দু-একদিন বন্ধুদের সাথে স্কুল কেটে সে সিনেমাও দেখেছে। আজ শনিবার পাড়ার বন্ধুদের সাথে তার বিকেলে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল, অবশ্য মাকে লুকিয়ে। কিন্তু সে ঠিক করল সিনেমায় যাবে না। মাকে লুকিয়ে আজ সিনেমায় যাবার কথা ভাবতে তার কেমন জানি লজ্জা করল। আজই বোধহয় প্রথম মা তার ওপর নির্ভর করছে, সারা জীবনে আজই প্রথম, আর আজই মাকে লুকিয়ে সিনেমায় সে যেতে পারবে না।

বিকেলে মেজপিসি এসে হাজির, বাবা তাকে কোথা থেকে যেন ফোন করেছিল। পিসি

ঢুকলেই বকবক করতে-করতে, 'কোনো দায়িত্বজ্ঞান নেই। দুটো ছোট-ছোট বাচ্চা আর বউকে ঘরে রেখে কেউ যায় এসব স্ট্রাইক করতে?' ফলত বেশ কিছুক্ষণ মেজপিসিই বক্তা তারা তিন জন শ্রোতা। তারপর একটু দম নিয়ে হাতের ব্যাগ থেকে কিছু টাকা বার করে মার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রাখ এই টাকা কটা, কতদিন যে এইসব চলবে।'

মা একগাল হেসে বলল, 'এখন দরকার নেই মেজদি, কিছু টাকার ব্যবস্থা তোমার ভাই করে গেছে। সে সব ফুরিয়ে গেলে নেব।'

হাঁ-হাঁ করে উঠল মেজপিসি, 'ছাড় এসব, টাকা কটা রাখ।'

মা আবার খুব ঠাণ্ডাভাবে বলল, 'থাক মেজদি, এখন দরকার নেই।'

সে তার মাকে চেনে, বোধহয় মেজপিসিও চেনে। মার এই বলা থেকে পরিষ্কার, এ বিষয়ে চূড়ান্ত রায় এটাই, এর কোনো নড়চড় হবে না। হাতে টাকা কটা ধরে রেখেই মেজপিসি বলল, 'তাহলে একটা কাজ কর, ছেলে দুটোকে নিয়ে তুই আমার ওখানে চল। কোনো পুরুষমানুষ বাড়িতে নেই, একা-একা কি থাকবি?'

কথাটা শুনে তার প্রচণ্ড রাগ হলেও চুপ করেই রইল।

'কী বলো মেজদি! তোমার ভাই যে কোনো সময় আসতে পারে। আমি এখন বাড়ি তালা বন্ধ রেখে কোথাও যেতে পারি?

মেজপিসি কিছুটা হতভম্ভ হয়ে বলল, 'তাহলে?' মেজপিসি বোধহয় ভেবে এসেছিল, তাদের জন্য কিছু একটা করবে। শেষে কিছুটা মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'তাহলে ছোটটাকে আমি নিয়ে যাই।' এই প্রস্তাবে ছোটোর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু অনুমতি দেবার মালিক মা। মার দিকে করুণ মুখ করে তাকিয়ে রইল ছোট। মা মেজপিসিকে বলল, 'সোমবার স্কুল আছে, কাল রাতের মধ্যে পাঠিয়ে দিও।'

এই বিকেলটায় তার কিছু করার নেই। বন্ধুরা সব সিনেমায় গেছে, কাজেই বাইরে বেরিয়ে কোনো লাভ নেই। মা গেল গা ধুতে, আর সে একটা চেয়ার বাইরের বারান্দায় টেনে নিয়ে গিয়ে বসল। প্রচণ্ড গরম ঘরে, বাইরে তাও একটু হাওয়া থাকে। তাদের বারান্দাটা একদম রাস্তার ওপর, ওখানে বসে রাস্তা দেখে, রাস্তার লোকজন দেখেই সময় কেটে যায়।

সেখানে বসেই তার প্রথম নজরে এল। এখন ছটার সময় আকাশে রোদ না থাকলেও যথেষ্ট আলো। সূর্য ডোবার মুহূর্তে আকাশটা কেমন লাল হয়ে এসেছে। মাথার ওপর ভেসে থাকা সাদা মেঘের কয়েকটা টুকরোর পশ্চিমমুখী প্রান্তগুলো হালকা কমলা রঙে উজ্জ্বল। এমন সময় তার চোখে পড়ল, নতুন বাড়ির বারান্দায় সোনার মতো ঝকঝকে পেতলের রডের উপর ভর দিয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে পশ্চিম দিকে, ঠিক যেখান দিয়ে সূর্যটা 'কাল আসব' বলে নেমে যাচ্ছে। দক্ষিণ দিক থেকে আসা হাওয়ায় তার কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুলগুলো উড়ছে। একটা সাদা লম্বা জামা পরা, হাত দুটোর ওপরে জামাটায় কুচি দেওয়া, ফুলে উঠেছে। কর্নেল চ্যাটার্জির মেয়ে। যাকে এর আগে সে দু-একবারই মাত্র দেখেছে, যার মধ্যে বাড়তি কিছু বৈশিষ্ট্য এর আগে সে খুঁজে পায়নি। আজ সে প্রকৃতপক্ষে তাকে আবিষ্কার করল। একবার তার মনে হল, ছোটবেলায় দেখা কোনো একটা ছবির সঙ্গে এর মিল আছে। কিন্তু উজ্জ্বল কমলা রঙের আকাশের নীচে একটা সোনালি আভায় মুড়ে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে সে এর আগে কখনও দেখেনি। তার কেমন জানি

মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীটায় আর কেউ নেই—কেবল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা ছাড়া এবং সে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্যই।

সে যখন প্রথম তাকিয়েছিল, তখন তার মনে হয়েছিল সব মিলিয়ে বিষয়টা খুব সুন্দর। এই বিকেলের সোনালি আলো, তাতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা মাই হেভেনের বারান্দায় আরো উজ্জ্বল মেয়েটা। কিন্তু আস্তে-আস্তে তার চেতনার থেকে বাকি সব কিছু মিলিয়ে গেছে, শুধু আছে মেয়েটা। না, ওর থেকে সুন্দর আর কিছু এর আগে সে দেখেনি। কাপাশ তুলোর গাছটা তাকে একটা চিরস্থায়ী দুঃখবোধ দিয়ে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার বদলে সে পেয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী জিনিস। সে বিস্মিত, কেন একে সে আগে দেখেনি?

গায়ত্রী যে দিন তার হাত ধরেছিল, তার ভীষণ ভাল লেগেছিল। কিন্তু আজকের অনুভূতিটা তার থেকে অনেক তীব্র, কিন্তু সেটা কেবল ভাল-লাগা নয়, তার সঙ্গে মিশে আছে ভয়ানক একটা যন্ত্রণা। সে জানে না, একে কী বলে। কিন্তু তার ভীষণ ইচ্ছে করছে একবার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, একবার কথা বলতে, একবার হাতটা ধরতে। সে জানে আঙুলগুলো খুব নরম আর ঠাণ্ডা, সে জানে কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই পাওয়া যাবে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ—তার ভীষণ ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার বড় হওয়ার প্রথম দিনে সে জানে, এটা অসম্ভব। অথচ ইচ্ছেটাকে সে তাড়াতে পারছে না। তার এই পনেরো বছরের জীবনটার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে এই প্রলয়ঙ্কর ইচ্ছের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই, আর সত্যি সত্যি সে তা চায়ও। সে নিশ্চিত তার বড় হয়ে ওঠার গোটা সময়টা জুড়ে সে যা চেয়েছিল তা সে পেয়ে গেছে। এই মেয়েটি—এর জন্যই সে এতদিন বেঁচে ছিল, এর জন্যই সে বেঁচে থাকবে। এরকম একটা অনুভূতি যে আছে, এরকম একটা অনুভূতি যে তার হতে পারে, এটাই সে কোনো দিন জানত না। মেয়েটার সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রথম দিন সে চেয়েছিল, মেয়েটা যেন তাকে না দেখে ; কিন্তু আজ সে চাইছে, আর সে তীব্র ভাবে চাইছে মেয়েটা তার দিকে একবার অন্তত তাকাক। আকাশের উজ্জ্বল রং কখন মিলিয়ে গেছে, কখন দক্ষিণের আকাশকে ঢেকে ফেলেছে কালো মেঘ, তা সে কিছুই জানে না। সে দাঁড়িয়ে আছে প্রতীক্ষায়, সে নিশ্চিত একবার তার দিকে তাকাবেই। প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে যখন আর বারান্দায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না, তখনই সে কেবল ঘরে ঢুকল। এমনকী যার জন্য তার এই অপেক্ষা, সে যে কখন ঘরে ঢুকে গেছে, সেটাও সে খেয়াল করতে পারেনি, তার মনে হচ্ছে এখনও মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে কারণ এখনো তার দিকে তাকানো হয়নি।

বাইরে ঝড় আর বৃষ্টি আর ভেতরে লোডশেডিংয়ের অন্ধকারে সে একা বিছানায় শুয়ে থাকে। তার কল্পনাকে আজ সে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে, আজ রাতে সে বড় হতে চায় না, খুচরো পয়সার হিসেব সে করতে চায় না। আজ রাতে তারা কেবল দুজন, বাকি পৃথিবী ঝড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

হাওয়ার গতি ঠিক কতটা, সেটা বোঝা যাচ্ছে সামনের একটা ডায়াল দেখে। একটা ডায়াল দেখাচ্ছে, প্লেনটা এখন উড়ছে বাইশ হাজার ফিটের ওপর দিয়ে। বাইরের তাপমাত্রা নাকি মাইনাস বারো ডিগ্রি। সামনে আর ওপরের প্যানেল জুড়ে থাকা অসংখ্য সবুজ রঙের আলোকিত ডায়ালে ফুটে উঠছে নানা সংখ্যা। কয়েকটা ডায়ালের ওপর কাঁপছে

কাঁটাগুলো। সামনে র‍্যাডারের বড় পর্দাটার ওপর ঘুরে যাচ্ছে একটা সবুজ আলোর রেখা। এসব কোনো কিছুই সে চিনত না, সুমনদা তাকে চিনিয়ে দিয়েছে। হাতে ফলের রসের গ্লাসটা নিয়ে সে এখানে ঢুকেছিল। সেটা খাবার কথা ভুলে সে মুগ্ধ হয়ে এসব দেখছিল। এটাই তার প্রথম প্লেনযাত্রা এবং এটাই তার প্রথম কক্‌পিটের অভিজ্ঞতা। সুমনদা ছাড়াও আর একজন পাইলটও আছে। মোটরগাড়ির গোল স্টিয়ারিংটা কেটে অর্ধেক করলে যেমন হয়, সে রকম দুটো স্টিয়ারিং দুজন পাইলটের সামনে। দুজনেই গাঢ় নীল রঙের স্যুট আর টুপি পরেছে, কাঁধে সোনালি বিল্লা। ওপরের একটা মাইক্রোফোন থেকে ক্রমাগত শোঁ-শোঁ আওয়াজ আর কী সব কথা ভেসে আসছে, আর একজন যে পাইলট সে কানে দুটো বড় হেড ফোন লাগিয়ে বোধহয় সে সব কথার উত্তর দিচ্ছে। সে বসে আছে একজন পাইলটের ঠিক পেছনে ছোট একটা চেয়ারে। সামনের কাচের মধ্য দিয়ে সে গোটা আকাশটা দেখতে পাচ্ছে। আকাশটা আকাশি আর সবুজ মেশানো—ঠিক রোজকার আকাশের মতো নয়। নীচে ধোঁয়া-ধোঁয়া সবুজ পাহাড়। সুমনদাই দেখিয়ে দিল, সামনে যেগুলোকে সাদা মেঘ বলে মনে হচ্ছিল আসলে সেগুলো বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো। নীচে সাদা রেখার মতো একটা নদী দেখা যাচ্ছে। সে একবার ভাববার চেষ্টা করে, কেন সে এখানে? সে কোথায় যাচ্ছে? কোনোটার উত্তরই সে জানে না। তার চেয়েও বড় কথা, সে জানতেও চায় না। তার ভালই লাগছে—সারা জীবন এভাবে থাকতেও সে রাজি। তার পকেট ভর্তি চকলেটগুলো এতই ভাল খেতে যে, অতীতের কোনো কিছুর সঙ্গেই তার তুলনা করার কোনো অর্থ হয় না।

সুমনদা বলল, 'দেখো, এবার আমরা নামব'। প্লেনটা থেকে পাহাড়টা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। প্লেনটা উড়ে যাচ্ছে সার-সার পাহাড়ের ওপর দিয়ে, আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীটার সাথে চলছে একটানা লুকোচুরি। সামনের দিকের আকাশটার একটা বড় অংশ জুড়েই কেবল বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ো। পাশের জানালা দিয়ে লাল টালির চাল দেওয়া সাদা-সাদা বাড়িঘরও দেখা যাচ্ছে, একদম খেলনার মতো। প্লেনটা এখন আরো নেমে এসেছে, বাঁ দিকের পাহাড়ের চুড়োটা এত কাছে যে তার ভয় হচ্ছে প্লেনটায় ধাক্কা না লাগে। প্লেনটা ডান দিকে বাঁক নিতেই নতুন দৃশ্য তার চোখের সামনে খুলে গেল।

বরফে ঢাকা পাহাড়টা যেখানে এসে শেষ হয়েছে সেখানে একটা লেক। এরকম নীল রঙের লেক এর আগে সে কখনো দেখেনি। লেকটার একটা দিক ঘন সবুজে ঢাকা, বোধহয় জঙ্গল ; আর একটা দিক ঢালু ঘাসে ঢাকা প্রান্তর। লেকের জল ছুঁয়ে প্লেনটা নামছে। সামনে তীরচিহ্ন দেওয়া রানওয়েটা, আর তার দুপাশে একটানা লাল টিউলিপের খেত। আগুনে লাল রঙের টিউলিপে মোড়া রানওয়ের ওপর একটা লম্বা ছুট দিয়ে প্লেনটা এসে দাঁড়িয়ে গেল।

নামার পর বাইরে এসে সে প্রথম প্লেনটা দেখল। ধপধপে সাদা রাজহাঁসের মতো, ছোট্ট একটা প্লেন। যারা প্লেন থেকে নামল, তারমধ্যে একমাত্র মেজপিসেমশাইকেই সে কেবল চেনে। বাকিদের সে কখনো দেখেনি এর আগে। কিন্তু একগাদা অপরিচিত লোকের মধ্যে সচরাচর তার যে রকম অস্বস্তি হয়, সেটা তার হচ্ছে না। কারণ সে তো এদেরই লোক। তার বয়সী কেউই নেই। আকাশে একফোঁটা মেঘ নেই, কিন্তু কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। প্লেনটা এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে তার সামনেই লাল টালি দেওয়া একটা বড় বাড়ি, ছাদ

ছাড়া গোটাটাই কাচের। সামনে নানা রঙের পতাকা উড়ছে। তাদের নিতে এসেছে হুড খোলা কতগুলো সাদা গাড়ি, হইহই করে সবাই তাতেই উঠল।

যে জায়গাটায় তারা এসে নামল, সেটা লেকের ঠিক ধারে বিশাল একটা সবুজ মাঠ। মাঠটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গল। তারা গিয়ে বসল মাঠের এক পাশে কতগুলো রঙিন ছাতার নীচে রাখা সাদা চেয়ারে, মাঝখানে একটা করে গোল টেবিল।

মাঠে কী একটা খেলা হচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে খেলোয়াড়রা হাতে লম্বা মতো একটা লাঠি নিয়ে ছোটাছুটি করছে। মেজ পিসেমশাইয়ের সঙ্গে সে যে টেবিলটায় গিয়ে বসল, সেখানে আগের থেকেই দুজন বয়স্ক সাহেব বসেছিল। তার একবার মনে হল এটা বোধহয় বিদেশ। লাল রঙের ইউনিফর্ম এবং পাগড়ি পরা একজন বেয়ারা এসে ট্রেতে করে কী সব রেখে গেল গ্লাসে। একটা গ্লাস তার দিকে এগিয়ে দিয়ে পিসেমশাই বলল, 'এটা তোমার'। গ্লাসে হালকা গোলাপি রঙের কোনো একটা ফলের রস। টেবিলের বাকি তিন জনের গ্লাসের পানীয়র রঙ সোনালি। সে জানে ওগুলো মদ, যা তার মতো বয়সীদের খাওয়া উচিত না। এমনকী সুমনদা তার থেকে কত বড়, সেই সুমনদাও বন্ধুদের সাথে মদ খায় লুকিয়ে লুকিয়ে। বড়দের খাওয়া উচিত কি না, সেটাও সে ঠিক জানে না। কারণ তাদের বাড়ির ঠিক পেছনে কলোনির যে বাড়িটা সেখানে হারানদা রোজ রাতে মদ খেয়ে এসে চেঁচামেচি করে, বউটাকে মারধর করে। মা বলে, মদ খেলে নাকি মানুষ জানোয়ার হয়ে যায়। অথচ মেজ পিসেমশাই প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরে, হাত মুখ ধুয়ে মদ খায়। তাকে তো কেউ খারাপ বলে না। অবশ্য পিসেমশাই কোনো চেঁচামেচি করেন না। বরং বেশ হাসিখুশি থাকেন। এমনিতে খুবই রাশভারি গম্ভীর লোক, তারা একটু এড়িয়েই চলে, কিন্তু ওই সময় খুবই ভাল।

সে এই সব বিষয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে খেলাটার দিকে নজর দিল। প্রথমেই তার যেটা অদ্ভুত লাগল, ঘোড়াগুলোর লেজে কেমন বিনুনি বাঁধা। সে বেশ মজা পেল। যে মাঠটায় খেলা হচ্ছে সেটা বিশাল, অনায়াসে দুটো ফুটবল মাঠ তার ভেতর ঢুকে যায়। গোল পোস্টের মতো আছে দু-দিকে, কিন্তু মাথার ওপরের পোস্টটা নেই। সে পিসেমশাইকে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, ঘোড়ার লেজে কেন বিনুনি বাঁধা।

পিসেমশাই একটু হেসে বললেন, 'দেখো, প্রত্যেক প্লেয়ারের হাতে লম্বা একটা করে স্টিক আছে, ওগুলোকে বলে ম্যালেট। বলটা মারতে গিয়ে ঘোড়ার লেজের সাথে যাতে স্টিকটা জড়িয়ে না যায়, এর জন্য ঘোড়ার লেজটা ওভাবে বাঁধা আছে।'

বলটাকে সে এতক্ষণে খেয়াল করল। ক্রিকেটের বলের থেকে বড়, কিন্তু ফুটবলের থেকে অনেক ছোট। আর অদ্ভুত এক রকমের টুপি পরে খেলোয়াড়েরা ঘোড়ার পিঠে বসে স্টিকটা দিয়ে হকির মতো করে বলটা মারছে। কিন্তু খেলোয়াড়ের সংখ্যা খুবই কম, সে গুনে দেখল দু-দিকে চার-চার করে মাত্র আট জন খেলছে. একটা দল পরেছে কালো কলার দেওয়া কমলা রঙের জার্সি, আর একটা দলের জার্সির রঙ হালকা হলুদ। সবারই হাঁটু পর্যন্ত জুতো, আর হাঁটুতে নি-ক্যাপের মতো কী একটা জড়ানো। এমনকী ঘোড়াগুলোরও সামনের পা দুটো অনেকটা পর্যন্ত কাপড় দিয়ে মোড়ানো রয়েছে। খেলোয়াড়দের এক হাতে স্টিক আর একটা হাতে ছোট একটা করে চাবুক। ঘোড়াগুলো কলকাতার রাস্তায়

গাড়ি টানে যেগুলো, সেগুলোর মতো হাড় জিরজিরে না, রীতিমতো স্বাস্থ্যবান, টগবগ করছে। গা চকচক করছে, বোঝা যায় ঘোড়াগুলোকে ভালই যত্ন করা হয়।

সে এবার খেলাটা বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রথমেই খটকা গোলপোস্ট আছে কিন্তু গোলকিপার নেই। সে না জিজ্ঞাসা করে পারল না। পিসেমশাই বললেন, 'এই খেলায় কোনো গোলকিপার থাকে না, কারণ হাত দিয়ে বল ধরার কোনো সুযোগ এ খেলায় নেই। আর দেখো প্লেয়ারদের জার্সিতে নম্বর দেওয়া আছে, এক থেকে চার নম্বর। এক নম্বর যার, তার কাজ হল গোল করা। দুই যে, ফুটবলের ভাষায় তাকে তুমি বলতে পারো —অ্যাটাকিং মিডিও। এর কাজ হল, মাঝমাঠ থেকে বল ধরে এক নম্বরকে দেওয়া, প্রয়োজনে নিজে গোল করা। তিন নম্বর যে, সে হল টিমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার। সে বিপক্ষের আক্রমণ সামলায় আবার নিজের আক্রমণ শুরু করে। আর চার নম্বর হল টিমের স্টপার কাম গোলকিপার, তার কাজ হল বিপক্ষকে গোল করতে না দেওয়া। শুরু করলে তুমি আস্তে-আস্তে সব জেনে যাবে। প্রথম প্রথম তোমাকে এক নম্বরে খেলতে হবে, ওখান থেকেই নভিস্‌রা খেলা শুরু করে।'

সে মনে মনে ভাবল, সে কী করে খেলবে, সে তো ঘোড়ায় চড়তে পারে না। ছোটবেলায় ময়দানে একবার ঘোড়ায় চড়েছিল। কিন্তু সে ঘোড়াগুলো তো ছোট ছোট, আর এত জোরে ছোটেও না। টেবিলের উল্টোদিকে বসে থাকা সাহেব তাকে কী সব জিজ্ঞাসা করল ইংরাজিতে। কিন্তু সে কথার কোনো মানে বুঝল না, আর তা ছাড়া বুঝলেই বা কী, সে তো আর ইংরেজিতে উত্তর দিতে পারত না। এই ফাঁকে কমলা জার্সির দলটা একটা গোল দেওয়ায় সে সাহেবের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে খেলার দিকে তাকিয়ে রইল। তার এখন সত্যি সত্যি লজ্জা লাগছে। আকাশে রোদ কিছুটা কমে এসেছে, কোথা থেকে কিছু মেঘ জমতে শুরু করেছে। যদি সাহেব আবার কিছু জিজ্ঞাসা করে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি পিসেমশাইকে প্রশ্ন করল—'কার সাথে কার খেলা হচ্ছে?'

পিসেমশাই বললেন—'এ দুটোই লোকাল টিম। যদি পারো দেখবে আর্জেন্টিনা আর ইউ এস এ-র খেলা। আর্জেন্টিনা হল ওয়ার্ল্ড চাম্পিয়ান।'

সে ফুটবলে ব্রাজিলের ভক্ত, জিজ্ঞাসা করল—'ব্রাজিল কেমন খেলে?'

'ব্রাজিল? না ব্রাজিলের বিশেষ নাম ডাক নেই।'

'আর আমরা?'

'আমরা, মানে ইন্ডিয়া? না, আজকাল খুব খারাপ অবস্থা। অথচ আমরাই খেলাটা পৃথিবীকে শেখালাম। আমাদের টিম ছিল ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরাও গেছে আর আমাদেরও সব কিছু গেছে।'

কোথা থেকে একটা কুকুর এসে ঢুকেছে টেবিলটার নীচে। সে নীচু হয়ে কুকুরটা দেখে। সে খুব অবাক হয়ে যায়, একদম কলকাতার রাস্তার নেড়ি কুত্তার মতো। ঠাণ্ডায় কুকুরটা ঠকঠক করে কাঁপছে।

পিসেমশাই অবশ্য থামেননি, 'আর ভাল খেলবেই বা কী করে। সে রকম ঘোড়া কই? ঘোড়া তৈরি হয় আর্জেন্টিনায়।' সে মনে-মনে ভাবে ঘোড়া আবার তৈরি হয় কী করে?

সে কাকের ডাক শুনে খুব অবাক হল। এখানেও কাক আছে? কাকগুলো এসে বসেছে টেবিলগুলোর পেছনে। বোধহয় ফেলে দেওয়া খাবারদাবারের লোভে।

কখন যেন আকাশটা মেঘে ঢেকে গেছে। রোদ আর নেই, কেমন যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে চারিদিকটা। অদ্ভুত চেহারার রঙচঙ মাখা কতগুলো মেয়ে এসে বসল তাদের পাশের টেবিলে। তারা তাদের টেবিলের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করছিল। এই প্রথম এখানে এসে তার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে। তাদের টেবিলে বসে থাকা দুজন সাহেবের মধ্যে একজন টলতে-টলতে উঠে এগিয়ে যায় পাশের টেবিলটার দিকে। তার ভয় হয়, এবার বোধহয় একটা ঝামেলা হবে। সাহেব একটা মেয়ের হাত ধরে টানতে শুরু করে—তারপর চেঁচাতে থাকে একদম হারানদার মতো। মেয়েটা একদম খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে তুমুল হাততালি। সে ভাবল, বোধহয় গোল হয়েছে। কিন্তু মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখে, কখন যেন খেলা শেষ হয়ে গেছে। মাঠটা ঢেকে যাচ্ছে নীল নীল কুয়াশায়।

পিসেমশাই চেয়ার ছেড়ে উঠে আসেন, তার হাতটা ধরে বলেন, 'চলো, এবার তোমার ট্রেনিং শুরু হবে।'

সে পিসেমশাইয়ের পেছন পেছন উঠে আসে। কুয়াশায় ঢাকা মাঠটা পেরিয়ে তারা ঢুকে পড়ে জঙ্গলে। সেটা স্যাঁতস্যাঁতে ভেজাভেজা একটা জায়গা, ওপরের পাতা থেকে টপটপ করে জল পড়ছে। পা ডুবে যাচ্ছে ভেজা পচা পাতায়। হাততালির আওয়াজ তখনও পাওয়া যাচ্ছে। আকারহীন ঘন সবুজ পাতায় ঢাকা চারিদিক, কেমন যেন শ্যাঁওলার সোঁদা গন্ধ। সে বোঝে এই জঙ্গলে সূর্যের আলোর সঙ্গে-সঙ্গে আনন্দও বিদায় নেয়।

সে শুধু পিসেমশাইকে জিজ্ঞাসা করে, 'পিসেমশাই, ভিয়েতনামে এই খেলাটা হয়?' পিসেমশাই কোনো উত্তর দেন না।

জঙ্গল পেরিয়ে তারা এল পাহাড়ের ঢালে গোটাটা সবুজ লতায় মোড়া একটা বাড়িতে। বাড়িটা কাঠের।

দোতলায় একটা ঘরে তাকে ঢুকিয়ে পিসেমশাই বললেন, 'এখানেই তুমি থাকবে।' তারপর বাইরের থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন।

সে চুপচাপ বসে থাকে বিছানায়। ঘরটা ভীষণ ঠাণ্ডা, তার শীত লাগছিল। সে গায়ে দেবার কিছু একটা খুঁজছিল, কিন্তু কিছুই পেল না। সামনের দেওয়ালে লাগানো কাঠের আলমারি থেকে পেল মায়ের সেই পুরনো চাদরটা, যেটা সে দোকানে যেতে হলে গায়ে জড়িয়ে নেয়। চাদরটা জড়িয়েও তার ঠাণ্ডা বিন্দুমাত্র কমছে না। সে প্রাণপণ দরজাটায় ধাক্কা মারে, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ নেই। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে! বাইরে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। সে বিছানাটায় উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে আর মনে-মনে কামনা করে, বৃষ্টিটা থামুক। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে, সে অনুভব করে তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। অনেকক্ষণ সে কিছু খায়নি। বাড়িতে ফিরে যাবার ইচ্ছাটা তার প্রবল হয়ে ওঠে।

বৃষ্টির তুমুল আওয়াজ ছাপিয়ে কানে আসে রেলের হুইসেল, একবার নয় পরপর অনেকগুলো। সে তড়াক্ করে উঠে বসে বিছানায়, তাহলে কী বাবাদের স্ট্রাইক মিটে গেছে? বাবা কি ফিরে এসেছে? নাকি বাবারা হেরে গেছে? তার দুশ্চিন্তা হয়, বাবা যদি না ফেরে মা তবে একা থাকবে। লজ্জায় সে বালিসে মুখ লুকিয়ে রাখে, কারণ সেই তো এখানে আসতে চেয়েছে, আর আসার সময় সে কোনো কথাই ভাবেনি।

বারান্দায় বেরিয়ে এলেই ঘড়ির কাঁটার মতো অপরিবর্তনীয় নিয়মে সে প্রথমেই তাকায় নতুন বাড়ির দোতলার বারান্দায় দিকে। না আজও কেউ নেই। গত দু-দিন সে একবারও কাউকে বারান্দায় আসতে দেখেনি। কিন্তু লেসের সাদা পর্দার ভেতর দিয়ে আবছায়ায় কয়েক বার সে বুঝেছে, যাকে সে দেখতে চায় সে ঘরেই আছে। তার ভয় হল তবে কি বুঝে ফেলেছে, বারবার কেন সে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়? একটা উৎকণ্ঠা ক্রমশ তাকে গ্রাস করছে। গরমের ছুটি, স্কুলে যাবার কোনো প্রশ্ন নেই। কী করে সে তাকে দেখবে? অন্য কোথাও গেলে তো গাড়িতে যায়, এক ঝলক হাওয়ার মতো চলে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা তখন তো কর্নেল সঙ্গে থাকে। অন্য কারোর সঙ্গে সে তাকে দেখতে চায় না। সে চায়—কর্নেল চ্যাটার্জির মেয়ে থাকুক একা এবং অন্যমনস্ক, আর সে শুধু দু-চোখ ভরে তাকে দেখবে।

নতুন বাড়ির লোহার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো উর্মি। তার একটা আশা হল, উর্মির সাথে কথা বলে তার খবর পাওয়া যেতে পারে, তার কথা শোনা যেতে পারে। পাড়ার মেয়েরা এখন নতুন বাড়িতে যায়, যদিও যার কাছে যায় তাকে সে কখনও অন্য কারোর বাড়িতে যেতে দেখেনি। ও বাড়ির থেকে বেরিয়ে উর্মিকে যেতে হবে তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে, আর সেই সুযোগে সে আলাপটা জমানোর চেষ্টা করে। 'কোথায় গিয়েছিলি রে উর্মি?'

'আহা ন্যাকা, দেখিসনি যেন কোথায় গিয়েছিলাম।'

সে গলাটাকে যথাসাধ্য নরম করে বলে, 'না-না, জিজ্ঞাসা করছিলাম সকালবেলা পড়াশুনা ফেলে কী করতে গিয়েছিলি?'

উর্মি রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'ওরে আমার দাদাঠাকুর! তোর কী দরকার, আমি কী করতে গিয়েছিলাম? তোর সামনে হায়ার সেকেন্ডারি, তুই-বা পড়াশুনা ছেড়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কী করছিস রে?'

'সে তুই বুঝবি না, একগাদা ট্রিগোনোমেট্রি করে আমি এখন রিলাক্স করছি।'

'ঠিক আছে তুই রিলাক্স কর, আমি কাটি।'

'আহা দাঁড়া না। ওটা কী বই রে তোর হাতে?'

বইটার মলাটটা তার দিকে ঘুরিয়ে দেখায় উর্মি। বইটার নাম 'হাক্‌লবেরি ফিন', আর লেখকের নাম 'মার্ক টোয়েন'। লেখকেব নামটা বোধহয় সে কখনো শুনেছে, কিন্তু বইটার নাম তার কাছে একদম নতুন। বইটা নির্ঘাত নতুন বাড়ি থেকে আসছে। সে বিষয়টা নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে পড়ে।

'দে না বইটা পড়ি।'

'না বস্‌, তোমাকে দেবার জন্য আমি বইটা নিয়ে আসিনি।'

'দে না, পড়ে তো আবার তোকে ফেরত দেব।'

'আহা, আমি তিশির কাছ থেকে নিয়ে এলাম নিজে পড়ব বলে।'

'এটা আমায় দে, তুই বরং আর একটা চেয়ে নিয়ে আয়।'

'ধ্যাত, তা হয় নাকি? তাছাড়া তিশির কাছে বাংলা বই বিশেষ নেই, সবই ইংরেজি।'

'তাহলে তুই বাড়ি গিয়ে ভাল করে ইংরেজি শেখ, যাতে বাকি বইগুলো পড়তে পারিস। আমাকে এই বইটা দিয়ে যা।'

ঘাড় নেড়ে উর্মি ভেঙিয়ে ওঠে, 'তুই ভাল করে ইংরেজি শেখ না।'

'আরে আমি ইংরেজি শিখে কী করব? তোর বড়লোক বন্ধু তো আর আমাকে তার বই পড়তে দেবে না।'

'দেখ, বাজে কথা বলবি না, তিশি খুব ভাল মেয়ে।'

সে অবশেষে সফল, যে আলোচনাটা সে চাইছিল, উর্মিকে সেই আলোচনার মধ্যে টেনে আনতে পেরেছে। সে প্রাণভরে শুনতে চায়, সে তিশি নামের মেয়েটির কথা আরো শুনতে চায়, পারলে সারা দিন ধরে।

'সে তো ভাল বলবিই। তোদের গল্পের বই পড়তে দেয়, আইসক্রিম খাওয়ায়। তোরা পাড়ার সব মেয়েরা নতুন মেয়েটার চামচা হয়ে গেলি?'

উর্মি চটে গিয়ে বলে ওঠে, 'অসভ্য'।

হ্যা-হ্যা করে হাসতে-হাসতে সে বলে—'আচ্ছা তোরা চামচা না তো কী? এই যে তোরা দল বেঁধে মেয়েটার বাড়ি যাস, মেয়েটা যায় তোদের কারুর বাড়ি?'

'আহা, সে ও কী করবে? ওর বাবা খুব কড়া—বেরতে দেয় না। জানিস তো মেয়েটা না খুব ভাল—বেচারার মা নেই তো। সারা দিন একা থাকে, আমরা গেলে খুব খুশি হয়। ওরা যে এত বড়লোক, তার জন্য একটুও অহংকার নেই।'

উর্মিকে চটিয়ে রাখতে পারলেই আলোচনাটা চালানো যাবে। সে উর্মিকে আবার খোঁচা দিল, 'আচ্ছা তোরা যে যাস, তোদের সঙ্গে বাংলায় গল্প করে না ইংরেজিতে গল্প করে রে?'

তার উদ্দেশ্য সফল, যথেষ্ট রেগেই উর্মি বলল—'নিজেকে তুই কী ভাবিস রে চাঁদু? ও বেচারি সারা জীবন চণ্ডীগড়ে পড়াশুনা করেছে তাই বাংলায় কাঁচা। তোর এরকম হলে কী দশা হত, তা আমার জানা আছে।'

'আরে বাংলায় কাঁচা তো কী হয়েছে, আমার কাছে পাঠিয়ে দিস আমি পড়িয়ে দেব'।

'ওরে আমার পণ্ডিত রে! তুই পড়াবি? টেস্টে কত পেয়েছিস বাংলায়?'

'আরে যা-যা, ওরকম কত ইংরেজি জানা ন্যাকা মেয়ে দেখলাম', সে ভেঙিয়ে ওঠে, 'বাংলা জানি না', শোন, বলবি—একা একা স্কুলে যেতে, পাড়ার মোড়ে ফুচকা খেতে, স্কুলের গেটে হজমি খেতে, দেখবি এক মাসে বাংলা শিখে গেছে।'

উর্মি এবার সত্যি-সত্যি রেগেছে, মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে—'দেখ, যাকে চিনিস না, জানিস না, তার সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথা বলিস কেন রে? তিশি তোর কী ক্ষতি করেছে?'

একবার ভাবল বলবে, 'তিশি আমার সর্বনাশ করেছে', তারপরই নিজেকে নিবৃত্ত করল। এখন উর্মির রাগ কমাতে হবে। একগাল হেসে বলল, 'না-না তোকে রাগাচ্ছিলাম।'

উর্মির রাগ তখনো পড়েনি, বলল, 'না, তুই খুব খারাপ।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি খুব খারাপ। তোদের নতুন বন্ধুই কেবল ভাল।'

উর্মিটা খুব ভাল মেয়ে, এতেও আবার দুঃখ-দুঃখ মুখ করে বলল—'আমি কী তাই

বলেছি?'

কিন্তু এখন তার একটাই উদ্দেশ্য, ঊর্মিকে জপিয়ে বইটা হাতানো। কেবল একটা বিষয় তাকে ঠিক করতে হবে—বইটা সে এখন নেবে, না ঊর্মির পড়া হয়ে গেলে নেবে? এখনই নিলে প্রায় তার হাতের ছোঁয়া সে পাবে, এমন-কী তার গন্ধও বইটাতে লেগে থাকতে পারে। আর বইটা পরে নিলে তার সামনে একটা সুযোগ আসবে ফেরত দেবার সময় বইটার ভেতরে অন্তত একটা চিঠি পাঠানোর। তার সঙ্গে যোগাযোগ করার এটাই একমাত্র সুযোগ। সে দ্বিতীয় রাস্তাটাই বেছে নিল।

তিশির সঙ্গে সে কীভাবে কথা বলবার সুযোগ পাবে, সেটা সে ভেবে পায় না। কথা না বলে তো মনের কথা জানানো যায় না! তিশি পাড়ার অন্য মেয়েগুলোর মতো রাস্তায় বেরয় না। স্কুলে যাবার সময় বেরোয় কিন্তু তার সঙ্গে থাকে মাঝবয়সী একজন নেপালি মহিলা, তাকে এড়িয়ে কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা, সুযোগ পেলেও যে তিশি তার সঙ্গে কথা বলবে তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু কেন জানি তার মনে হয়—তিশি তার সঙ্গে কথা বলবে। বাড়ি থেকে বাসস্ট্যান্ড—স্কুলের বাস ধরতে, আর বাস থেকে নেমে—বাড়ি ফিরতে, দু-মিনিট দু-মিনিট চার-মিনিট এই সময়টুকুই সে আর তিশি পাশাপাশি হাঁটতে পারে। তাকে এই চার মিনিটেই কিছু একটা করতে হবে। বহুদিন সে দু-জনের পেছন পেছন গেছে, কিন্তু বিন্দুমাত্র সুযোগ সেখানে পায়নি। অন্য সময় হয় তিশি চলন্ত গাড়িতে অথবা দোতলার বারান্দায়, যে দুটো জায়গার কোনোটাতে কখনো সে পৌঁছতে পারবে না।

তার কল্পনায় প্রতিদিন তিশি অসংখ্য বার বিপদে পড়ে—কখনো মস্তান, কখনো গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট—আর প্রতিবারেই সে হাজির হয় বীরের মতো তিশির রক্ষাকর্তা হিসেবে। কিন্তু বাস্তবে এসব কিছুই হয় না, কর্নেল চ্যাটার্জির মেয়ে তার ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। পাড়ার অন্য বাড়ির দরজা তার জন্য খোলা, কিন্তু কর্নেল শুধু তাকে কেন, কাউকেই এই সুযোগ দেবে না। লোকটা পাড়ার কারোর সঙ্গেই মেশে না, পাড়ার লোকরা তাকে দেখে কেবল গাড়িতে। মাই হেভেনের সামনের রেলিংয়ে কী এক ধরণের লতানো গাছ লাগানো হয়েছে। রেলিংটা আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছে সবুজ লতায়—বাড়িটা ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে গোটা পাড়াটার নজর থেকে। এমনকী সেই সবুজ লতা যখন টুকটুকে ছোট লাল ফুলে ভরে যায় তখনো মাই হেভেন কারোর জন্য বন্ধুত্বের হাসি হাসে না।

গরম-কালে রাতে তিশির ঘরে আলো জ্বলে, হাওয়াতে উডতে থাকা পর্দার ওপাশে কখনো কখনো তিশিকে এক ঝলক দেখা যায়। সে টেস্ট পেপারকে অনন্ত অপেক্ষায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার বারান্দার কোণে। তার মনে হয়, এই মাই হেভেন একটা অভিশপ্ত দুর্গ ছাড়া কিছু নয়, তার তিশি সেখানে বন্দিনী রাজকন্যা। কিন্তু সেই দুর্গে ঢোকার পথ তার জানা নেই। ওই উড়ন্ত পর্দার ওপারে এক ঝলক তিশিকে দেখা, আপাতত এতেই সে খুশি। প্রতিটি রাতে সে আরো খুশি হয়, আরো যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়। এই খুশি আর যন্ত্রণার সহাবস্থানে সে ক্ষতবিক্ষত হয়, কিন্তু একবারের জন্যও ক্লান্তি বোধ করে না।

তার বন্ধুরা এখন ঘনঘন প্রেমে পড়ছে। তবে তার অধিকাংশই একপক্ষীয়। একেক দিন তাদের আড্ডা ভরে ওঠে বিফল মনোরথ কোনো প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাসে, কোনোদিন বা এক

মিনিট কথা বলতে পারা, সর্বাধিক একসঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবার সাফল্যের আনন্দে। সবাই জানে সবার মনের কথা। পাড়ার মেয়ে, বন্ধুর বোন, বোনের বন্ধু বা রাস্তায় দেখে ভাল লেগে যাওয়া—মনে-মনে প্রেমে পড়তে কোনো বাধা নেই। জগৎটাই যেন প্রেমময়—আর প্রেম ছাড়া জীবন বৃথা। এ নিয়ে সবারই কোনো না কোনো কথা আছে, তারও আছে। কিন্তু সবাই সবার কথা বলতে পারে সে কিছু বলতে সাহসই পায় না। পাড়ায় নতুন আসা সুন্দরী একটা মেয়ে, কাজেই তিশির প্রসঙ্গ বারবারই ওঠে। কিন্তু সেখানে সবাই একটা ঐকমত্যে পৌঁছে গেছে—'বড়লোকের ডাঁটিয়াল মেয়ে, আমাদের কোনো চান্স দেবে না'। যার কথা ভাবার সাহস কেউ পায় না, তার কথা ভেবেই তার সারা দিন চলে যায়। তার মাঝেমাঝে মনে হয়, এটা বোধহয় সে একটা অপরাধই করছে। অতএব বন্ধুদের প্রেম সংক্রান্ত আলোচনায় সে নীরব শ্রোতা। এমনকী এর জন্য বন্ধুরা তার পেছনেও লাগে। আরো ঘনিষ্ঠ যারা, যেমন অন্তু বা বাবাই, একা থাকলে তাকে জিজ্ঞাসাও করে, 'সত্যি কথা বল, কাউকে তোর ভালবাসতে ইচ্ছে করে না?' সে চুপ করে থাকে, তার আর তিশির জগতে কাউকে সে ঢুকতে দিতে চায় না।

কিন্তু উর্মির বই দেবার নাম নেই। শেষে থাকতে না পেরে এক দিন সকালে উঠে সে চলেই গেল উর্মিদের বাড়িতে। বাইরের থেকে ডাকাডাকি করাতে উর্মি বেরিয়ে এল কিছুটা বিস্মিত হয়েই। বইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করতে একদম লম্বা জিভ বার করে বলল, 'এই রে, একদম ভুলে গেছি।'

তার চোখের সামনে কে যেন সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়েছে। সে কোনোক্রমে কেবল এইটুকু বলতে পারল—'ফেরত দিয়ে দিয়েছিস?' সে জানে না, তার মুখ-চোখে কিছু ফুটে উঠেছিল কি না, উর্মি প্রায় কিছুটা বিস্মিত হয়েই জবাব দিল—'না-না, ফেরত দিইনি, তোকে দিতে ভুলে গিয়েছি।'

বইটা তার হাতে দেবার সময় উর্মি সাবধান করে দেয়, 'দেখবি তিশি যেন জানতে না পারে।'

সে বলল, 'কী করে জানবে, তিশির সঙ্গে তো আমার আলাপ নেই। আলাপ থাকলে তবে তো বলার কথা আসে।'

দু-দুবার করে 'আলাপ' কথাটা সে বলেছিল একটাই আশা নিয়ে, যদি উর্মি বলে—'ওমা তোর সঙ্গে তিশির আলাপ নেই? চ, আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।' উর্মি তার মনের কথা বুঝতে পারল না। মনে মনে উর্মির ওপর প্রচণ্ড রেগেই উঠল। কিন্তু এ নিয়ে উর্মিকে কিই বা বলবে? অতএব বইটা নিয়ে সে হাঁটা লাগাল। উর্মিই চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কী রে, ও কী রে, বইটা কবে ফেরত দিবি বললি না?'

'পড়া হয়ে গেলেই ফেরত পাবি।'

'না-না, অত আহ্লাদ না। পরশুদিন ফেরত দিবি।'

'কি যা তা বলছিস। এত মোটা বই দুদিনে শেষ হয় নাকি?'

'না-না, দেখ অন্যের বই ; তাড়াতাড়ি ফেরত দিবি। ঠিক আছে আরো দু-দিন সময় দিলাম। রবিবার সকালে আমি তিশিদের বাড়ি যাব, যাবার সময় তোর বাড়ি থেকে বইটা নিয়ে নেব। ঝোলাবি না কিন্তু।'

সে সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়িয়ে রওনা দিচ্ছিল, হঠাৎই তাকে পেয়ে বসল একটা অদম্য ইচ্ছা—উর্মিকে সে সব কথা বলবে। উর্মিই একমাত্র পারে তাকে তিশির কাছে পৌঁছে দিতে। উর্মি প্রায় ওদের ঘরে ঢুকে গেছে, সে পেছন থেকে ডেকে ওঠে। উর্মি ফিরে তাকায়। কিন্তু উর্মি ফিরে তাকানো মাত্র সে বুঝল, যে কথা বলবে বলে সে উর্মিকে ডেকেছিল—মরে গেলেও সে কথা সে কাউকে বলতে পারবে না। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে উর্মি জিজ্ঞাসা করল—'কী বলছিস?', থতমত খেয়ে 'না, কিছু না' বলে সে উল্টো দিকে হাঁটা লাগাল। উর্মি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেটা সে পেছনে না তাকালেও জানে। সে শুধু বইটাকে আঁকড়ে ধরে মাথা নীচু করে ফিরে আসে। তার কেন জানি মনে হচ্ছে বইটা জীবন্ত একটা কিছু। ভীষণ সুন্দর, কিন্তু ভীষণ পলকা, সামান্য আঘাতেই যা ভেঙে যাবে।

রাস্তায় আসতে-আসতে সে কেবল বইটার মলাটটা উল্টেছিল। প্রথম সাদা পাতাটায় গোটা গোটা অক্ষরে একটা নাম লেখা আছে—'সীমন্তী চ্যাটার্জি'। কেউ বলেনি, কিন্তু সে জানে ওটাই তিশির ভাল নাম, কেউ বলেনি কিন্তু সে জানে ওটাই তিশির হাতের লেখা।

ঘরে ঢোকা মাত্র সে বইটা লুকিয়ে ফেলে টেবিলের একদিকে রাখা তার বইখাতার স্তূপের মধ্যে। পর মুহূর্তেই সে ভাবে, বইটা সে কেন লুকোল? এটা তো একটা গল্পের বই ছাড়া কিছুই নয়। এটা তার হাতে দেখলে কেই বা কী মনে করবে? কিন্তু হাজার যুক্তি থাকা সত্ত্বেও সে সাহস করে বইটা আর একবার বার করতে পারল না। তার কেন জানি মনে হচ্ছে, বইটা তার হাতে দেখলে আর কেউ না বুঝুক, মা ঠিক বুঝে ফেলবে। সে ঠিক করে নেয়, সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবেই বইটা বার করবে। সামনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা কাজেই সে আজকাল অনেক রাত পর্যন্ত জাগে। তার আর একটা জিনিসই দরকার—একটা ভাল সুন্দর কাগজ, যেটাতে সে চিঠিটা লিখবে। অনেক ভেবেও সে ঠিক করতে পারে না, ভাল কাগজ সে কোথা থেকে পাবে। তার নিজের কাগজ মানে তো পাতি কাগজ, যা সে দিস্তা দরে লালার দোকান থেকে কিনে আনে। তাতে আর যাই লেখা যাক, এই চিঠি অন্তত লেখা যায় না। সুন্দর নীল রঙের হালকা ছবি আঁকা প্যাড সে একমাত্র দেখেছে ঋতুদির কাছে। কিন্তু ঋতুদি মানে তো মেজপিসির বাড়ি ; কবে সে যাবে? কী বলেই বা ঋতুদির কাছে প্যাড চাইবে? সে অনেক ঝামেলা। বড় ঘরের তাকে বাবার একটা ডায়েরি আছে, সেটা বেশ ঝকঝকে। কিন্তু ডায়েরির সব পৃষ্ঠাতেই দুটো করে তারিখ দেওয়া, তাতে হবে না। অনেক ভেবে সে ঠিক করল, কেমিস্ট্রি প্র্যাক্টিকাল খাতার একটা পৃষ্ঠাতেই চিঠিটা লিখবে। খাতাটা একদম নতুন। আর সে যেহেতু চিঠিটা বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে দেবে কাজেই আলাদা কোনো খামের দরকার নেই।

সারাটা দিন আর সন্ধেটা সে কাটাল টানটান উত্তেজনার মধ্যে, আজ রাত তার কাছে একটা বিশেষ রাত। আজ রাতে সে আর তিশি বসবে মুখোমুখি, আজ রাতে তিশির সঙ্গে প্রথম কথা হবে। আজ সারাদিন একবারও তিশির দেখা পায়নি। আর বিকেল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তিশির ঘরের জানালা বন্ধ, একবারও খোলেনি। আজ সারা সন্ধে বাংলা বই নিয়ে সে স্রেফ বসে থেকেছে, এক লাইনও পড়েনি। টেবিলের উল্টো দিকে বসে ছোটটা চিৎকার করে কী সব পড়ছিল, তাও তার কানে যায়নি। সে শুধু মনে মনে নিজেকে তৈরি করেছে আসন্ন রাতের জন্য।

বড় ঘরের দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র সে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, অপেক্ষা করে থাকে ওই ঘরের লাইট নেভার জন্য। এক একটা মিনিট যেন এক একটা যুগ। এক সময় অবশেষে লাইট নেভে। এবার সে সন্তর্পণে স্তূপ থেকে বার করে আনে বইটা। এই প্রথম সে বইটা ভাল করে দেখল। নীল মলাটে একটা ছেলের ছবি, ছোট একটা নৌকো বাইছে। সে করব না করব না করেও, বইটা খুলে নাক ঠেকিয়ে গভীরভাবে একবার গন্ধ শুঁকল—যদি তিশির গন্ধ পাওয়া যায়। তারপর বইয়ের পৃষ্ঠায় নিজের গালটা ঠেকাল। বৃষ্টির জন্য ঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ, তাও একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবধানে ঠোঁটদুটো এনে ঠেকাল বইয়ের পৃষ্ঠার সেই জায়গাটায় যেখানে তিশি নিজের হাতে নাম লিখেছে। এবং ঠিক সেই মুহূর্তে কোনো আগাম জানান না দিয়েই তার চেনা পৃথিবীটা চারপাশ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নরম মসৃণ গালে হালকা ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, উড়ে এসে পড়ছে দু-একটা চুল—আর সে মরুভূমির মতো হাজার বছরের তৃষ্ণা নিয়ে টেনে নিচ্ছে সব কিছু। তার বুকের কাছটায় একটা অসম্ভব ব্যথা হচ্ছে।

প্র্যাক্টিকাল খাতাটা সে টেনে নেয় যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস নিয়েই। আর কোনো কাজ সে না পারুক, অন্তত এই কাজটা সে ভাল পারে। জীবনে অনেকবার সে অনেক বন্ধুর হয়ে প্রেমপত্র লিখে দিয়েছে। এ ব্যাপারে তার যথেষ্ট সুনাম আছে বন্ধুমহলে। অন্যের হয়ে যে কাজ সে এতবার করেছে, নিজের জন্য সে কাজ সে পারবে না?

খাতাটা খুলে পেনের খাপ খোলা পর্যন্ত কাজটা তার সহজই মনে হচ্ছিল। প্রথম দশ মিনিট সে পেনটা খুলে চুপ করে বসে রইল, খাতায় একটি কালির আঁচড়ও না দিয়ে। এই প্রথম দশ মিনিটে তার একমাত্র উপলব্ধি, কাজটা কেবল কঠিন না, বোধহয় অসম্ভব। সে যা ভেবে রেখেছিল তার সবটাই গেল গুলিয়ে। অন্যের হয়ে চিঠি লিখে দেওয়া সহজ, কিন্তু তাকে তো লিখতে হবে তিশিকে। প্রতিটা শব্দ হবে তিশির সঙ্গে মানানসই, প্রতিটা শব্দ তার গত কয়েক মাসের আনন্দ আর যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলবে—এই ভাষা বোধহয় তার জানা নেই।

চিঠিতে সে কী বলে লিখবে? তিশি না সীমন্তী? না কি কিছু লিখবে না? সীমন্তী নামটা সে আজই জেনেছে, নামটা যেন অনেক দূরের কারোর। আর কিছু না লেখার একটা বিপদ আছে। কোনো ভাবে যদি চিঠিটা তিশির হাতে পড়ার আগে উর্মির হাতে পড়ে? আর উর্মি যদি ভাবে, চিঠিটা সে উর্মিকেই লিখেছে? ছি-ছি, সেটা একদম কেলেঙ্কারি হবে। তার থেকে তিশিই ভাল।

কিন্তু শুধু তিশি দিলে তো হবে না, তার আগে কিছু একটা লিখতে হবে। 'প্রিয়তমা' লিখবে? না-না, ওটা একদম পাতি। ইংরাজিতে লিখবে 'মাই লাভ'? না, তিশিকে দেওয়া চিঠিতে সে ইংরেজিতে কোনো কথা লিখবে না। ইংরেজিটা তো তিশির নিজের ভাষা, যদি যে তিশিকে মুগ্ধ করতে পারে তবে বাংলাতেই পারবে। 'আমার তিশি', এটা খুব একটা খারাপ না। কিন্তু ভয় হচ্ছে প্রথম চিঠিতে এরকম একটা সম্বোধন দেখে তিশি রেগে যেতে পারে, সে নিজে যাই মনে করুক আসলে তিশি তো এখনও তাকে ভাল করে চেনেই না। তাপসের মামাতো বোনের প্রেমে পড়েছিল অন্তু, প্রথম চিঠিটা লিখে দিয়েছিল সে। সেটাতে লিখেছিল,

'কলকাতার সেক্সপিয়ারের জুলিয়েট'। এটা নিয়ে বন্ধুমহলে বেশ হইচই হয়েছিল। এরকম কিছু একটা লিখবে? পরমুহূর্তেই চিন্তাটা বাতিল করল। ব্যাপারটা কেমন একটু বেশি নাটকীয়, যাত্রা যাত্রা হয়ে যাবে। অনেক ভেবেও সে ঠিক করতে পারল না, 'তিশি'র আগে সে কী লিখবে। শেষে ভাবল, সামনে কিছুটা জায়গা খালি রেখে আপাতত শুধু তিশি লিখে চিঠিটা শুরু করা যাক, পরে ভেবে আগের কথাটা বসানো যাবে।

প্রথম লাইন দুটো সে লিখে ফেলল ঝড়ের গতিতে—'পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ ছাড়া আর কি কিছু তোমার চোখে পড়ে না? যদি কখনো আকাশ ছেড়ে মাটির দিকে তাকাতে, তবে দেখতে একজন তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।'

লেখার পর তার গা গুলিয়ে উঠল নিজের হাতের লেখা দেখে। তার হাতের লেখা ভাল না, এ নিয়ে সারা জীবন সে স্কুলে আর বাড়িতে গালাগাল শুনেছে—সে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু আজ সে প্রথম অনুভব করল, সত্যিই তার হাতের লেখাটা জঘন্য। তার হাতের লেখা আর তিশির সৌন্দর্য দুটো যেন দু-মেরুতে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে তো এর কোনো পরিবর্তন সে করতে পারবে না, কাজেই এটাকে সে ভাগ্যের মার বলেই ধরে নিল। আবার সে ভাল করে লাইন দুটো পড়ল। প্রথম বার পড়ে মনে হল ভালই হয়েছে, বেশ নতুনত্ব আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বার পড়ে মনে হল, কেমন যেন একটু ন্যাকা ন্যাকা হয়েছে। একজন পুরুষ হিসাবে এভাবে লেখা ঠিক হবে না। তিশি যেন মনে না করে যে, সে করুণা ভিক্ষা করছে।

অতএব প্রথম পৃষ্ঠাটা ছিঁড়ে ফেলে সে পরের পৃষ্ঠাতে শুরু করল।

রাত দুটো নাগাদ যখন সে আর চোখ খোলা রাখতে পারছে না, তখনই সে শুতে গেল। রেখে গেল এক রাতে অর্ধেক খরচ হওয়া কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল খাতা আর এক লাইনও না লেখা একটা গোটা চিঠি।

শনিবার রাতে সে যখন চিঠিটা শেষ করেছে, তখন তার চোখ ফেটে জল আসার মতো অবস্থা। চিঠির তলায় সে কী লিখবে? চাঁদু? তার নামটা এত খারাপ সে আগে কখনও বুঝতে পারেনি। মা বাবার ওপরেই তার প্রচণ্ড রাগ হল। একটা ভালবাসার চিঠির নীচে প্রেমিকের নাম কিনা চাঁদু! চিঠিতে সে কী লিখেছে তা আর তিশি পড়বে না, ওই চাঁদু দেখেই ছিড়ে ফেলে দেবে। আর একটা রাস্তা হল, ডাক নামের বদলে তার ভাল নামটা লেখা। কিন্তু সেটাই বা আর এমন কী উন্নত? 'চন্দ্রশেখর'ও একটা বস্তাপচা নাম, দাদু ঠাকুরদাদের এরকম নাম হয়। আর চন্দ্রশেখর লেখার একটা বিপদও আছে। চিঠিটা পেয়ে নিশ্চয়ই তিশি উর্মিকে জিজ্ঞাসা করবে, 'চন্দ্রশেখর কে'? সে ঠিক নিশ্চিত না, উর্মি তার ভাল নামটা ঠিক খেয়াল করতে পারবে কি না। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে 'চাঁদু'ই লিখল।

সকালে তার ঘুম ভেঙেছে অনেক আগে, কিন্তু বিছানা থেকে না উঠে সে শুয়েই রইল। মা'র বাথরুমে যাওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণ পরেই বড় ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ, সে চোখ বুজেই সমস্তটা টের পায়। বাথরুমের টিনের দরজাটা বন্ধ হবার আওয়াজ পাওয়া মাত্র সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। বড় ঘরে উঁকি মেরে দেখল, বাবা অঘোরে ঘুমচ্ছে। মশারিটা খুব আস্তে তুলে সে হাতটা ঢোকালো মার বালিশের নীচে এবং যা চাইছিল সেটা পেয়ে গেল—আলমারির চাবিটা। এরপরের কাজটাই সবচেয়ে কঠিন, আলমারিটা খোলা। আলমারিটা খুলতে গেলেই খ্যাঁচ করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ হয়, তার সবচেয়ে

ভয় এখানেই। আওয়াজে যদি বাবা জেগে যায়, সে হাতেনাতে ধরা পরে যাবে। আর সাত সকালে আলমারি খুলে কী করছিল, এ প্রশ্নের কী জবাব সে দেবে? অন্য সময় যা হয়। এখন যেন তার থেকে বেশি আওয়াজ করে আলমারিটা খুলল। সে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, বাবার ঘুম ভাঙ্গেনি। মার শাড়ির স্তূপের ভেতর থেকে জিনিসটা খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগল না। স্ফটিকের মতো কাজ করা একটা শিশি, মেজোপিসি মাকে দিয়েছিল, পিসেমশাই আমেরিকা থেকে নিয়ে এসেছিল। আলমারিটা খোলা রেখে সে এক ছুটে ছোট ঘরে। তারপর বইয়ের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে কাগজটার উল্টো পিঠে দুবার স্প্রে করল। এটাই তার জানা সবচেয়ে ভাল গন্ধ। গন্ধে ভোরবেলার রঙটাই যেন পাল্টে গেল। তার আশা তার জঘন্য হাতের লেখা আর হাস্যকর নামের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে দেবে এই আমেরিকান পারফিউম। চাবিটা মায়ের বালিশের তলায় রেখে দিয়ে এসে সে আবার শুয়ে পড়ল। এখনো একটা কাজ তার বাকি আছে, তাকে এখন ভাবতে হবে, চিঠিটা পেয়ে তিশি কী করবে।

তিশি কি খুশি হবে, না কি রেগে যাবে? তিশি কি ঊর্মির হাত দিয়ে কোনো চিঠি পাঠাবে, নাকি তার সঙ্গে রাস্তায় ডেকে কোনো কথা বলবে? কিন্তু সব চিন্তার মধ্যে বারবার চলে আসছে একটা স্মৃতি—বাঁ কানটা সজোরে টেনে কর্নেল চ্যাটার্জির চাপা গর্জন—'এটা কী হ'ল'। চিন্তাটা কিছুতেই তাড়াতে না পেরে, এক সময় বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়ল।

সারাটা সকাল সে ঊর্মির অপেক্ষায় কাটাল। মা একবার দোকানে যেতে বলেছিল, 'একটা অঙ্ক কিছুতেই মিলছে না' বলে সে সেটাও কাটিয়ে দিয়েছে। রবিবার সকালের আড্ডাতেও সে যায়নি। ঊর্মি ডাকছে ভেবে দু-একবার বাইরে ছুটে এসে দেখেছে, কেউই তাকে ডাকেনি। তার ধৈর্যের বাঁধকে প্রায় ভেঙে ঊর্মি এল সাড়ে এগারটায়।

ঊর্মি তাকে ডাকছিল রাস্তা থেকে। বইটা হাতে নিয়েই সে বারান্দায় বেরুল। অভ্যাসবশতই তার চোখ গেল নতুন বাড়ির বারান্দার দিকে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিশি। সে সারাটা দিন ধরে চায়, তিশি বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকুক। কিন্তু সে স্বপ্নেও ভাবেনি, তিশি এখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তার কেমন যেন সবটা গুলিয়ে গেল। তিশি দেখবে সে বইটা ঊর্মিকে দিচ্ছে, আর সেই বইয়ের ভেতর চিঠিটা। কেন যেন মনে হচ্ছে, তার সব গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল।

ঊর্মি জিজ্ঞাসা করল, 'বইটা পড়েছিস। দারুণ না?' সে এ কথার আর কী উত্তর দেবে, কারণ বইটার এক লাইনও সে পড়েনি। মার্ক টোয়েন নামক জনৈক লেখক হাক্‌লবেরি ফিন সম্পর্কে কী লিখেছে, তা সে বিন্দুমাত্র জানে না। কারণ তার কাছে এটা কোনো বই না, এটা তার স্বপ্নে পৌঁছনোর সিঁড়ি। কিন্তু তিশিকে বারান্দায় দেখে সে এতটাই হতচকিত যে সে বুঝে উঠতে পারছে না, তার কী করা উচিত। একবার ভাবল কী এসে-যায় তিশি দেখলে, সে তো তিশিকেই চিঠিটা লিখেছে? কিন্তু সব যুক্তিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে একটা চরম অযৌক্তিক লজ্জা। ঊর্মি ততক্ষণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বইটা নেবার জন্য। বইটা এখন দেবে না, এ কথা আর বলা যায় না। মরিয়া হয়ে সে বলল, 'দেখ ঊর্মি, তোর বন্ধু দেখছে।' ঊর্মি পেছনের দিকে তাকাল। আর সেই সামান্য সুযোগেই সে চিঠিটা বার করে নিয়েছে বইটার ভেতর থেকে, ঢুকিয়ে দিয়েছে প্যান্টের পকেটে।

ঘরে ঢোকবার আগে সে আর একবার তাকাল তিশির দিকে। এবং এই প্রথম সে দেখল,

তিশি তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরে ঢুকে সে শুয়ে পড়ল খাটে। তার কোনো দুঃখ নেই, তার কোনো কষ্ট নেই, তার কোনো যন্ত্রণা নেই, তার কোনো হতাশা নেই, সে শুধু অনুভব করছে, তার সারা শরীর জুড়ে অসম্ভব ক্লান্তি। একবার তার মনে হল, সে বোধহয় কেঁদে ফেলবে। কিন্তু কান্নাটাও গলার কাছে এসে আটকে আছে। সে এত ক্লান্ত যে কাঁদতেও পারছে না। পকেটেই পারফিউমের গন্ধ-ভরা চিঠিটাকে রেখে রবিবার সকাল সাড়ে এগারটার সময় সে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

ঘুমটা হঠাৎই ভাঙল। প্রথমেই সে যেটা অনুভব করল, তা হল চারিদিকটা অসম্ভব অন্ধকার। এই একটা জিনিসকে তার বড় ভয়। এক ফোঁটা আলো দেখতে না পেলে তার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। প্রতি শীতকালে এই নিয়ে ছোটোর সঙ্গে তার ঝামেলা ছিল অবধারিত। তাদের ঘরে কোনো ডিমল্যাম্প ছিল না, কাজেই শীতকালের রাতে দরজা জানালা সব বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দিলে তার দম বন্ধ হয়ে আসত। তাই সে জানালার একটা পাল্লা খুলে শুত। ছোটটার আবার অসম্ভব শীত, ঐ একটা জানালার পাল্লা খোলা থাকলেও নাকি ও শীতে একদম জমে যাবে। এই নিয়ে রোজ রোজ ঝামেলা লেগেই থাকত।

মাথার পাশে বাঁ হাতটা দিয়ে সে টর্চটাকে একবার অনুভব করল, আর ডান হাত দিয়ে পাশে শোয়ানো রাইফেলটাকে। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। শুরু হয়েছিল কাল সন্ধ্যায়, বোধহয় তারপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও থামেনি। সে বোঝবার চেষ্টা করল, হঠাৎ ঘুমটা ভাঙল কেন। আশেপাশে যারা ঘুমোচ্ছিল, তারা কেউ উঠেছে বলেও মনে হচ্ছে না। বাইরেও একমাত্র বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বুকের কাছে লেপটে থাকা রাইফেলটাকে অভ্যাসবশতই সে একবার হাত বুলিয়ে অনুভব করে। এই এ কে ৪৭ রাইফেলগুলো চাইনিস্ মেইড। ভাঁজ করে রাখা যায় বলে যে কোনো অবস্থায় ব্যবহার করা সুবিধা, আর বয়ে নিয়ে যাওয়াও সহজ। এই যুদ্ধে এগুলোই তাদের প্রধান হাতিয়ার। তারা প্রায় রিভালবারের মতো এগুলোকে সবসময় সঙ্গে-সঙ্গে রাখে। সে একবার ভাবল রাইফেলটাকে তুলবে কি না। কিন্তু গুলি চালানোর মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি। শুধু তার ঘুমটা ভেঙেছে, তবে ভেঙেছে একটা অস্বস্তি নিয়ে। সে জানে কোনো কারণ না থাকলেও, যুদ্ধে এই অস্বস্তিটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে শুয়েছিল দরজার দিকে পা দিয়ে, রাইফেলটার মুখটাও সেদিক করা। সে একটা আঙুল দিয়ে ট্রিগারটাকে তুলে দেয় সেমি অটোমেটিক পজিশনে। টর্চটা টেনে বার করে মাথার নীচের পলিথিনের বান্ডিলটার তলা থেকে। কিন্তু টর্চটাকে না জ্বালিয়ে সে চুপ করে থেকে অপেক্ষা করে। যদি কোনো আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে থাকে তবে আওয়াজটা আবার হবে। সে অন্ধকারে চোখটাকে সইয়ে নেবার চেষ্টা করে।

যে ঘরটাতে তারা জন দশেক শুয়ে আছে সেটাতে দরজা বলে কিছু নেই। দরজাটা যেখানে থাকার কথা কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে কিছুই ছিল না। বৃষ্টির ছাট আসবে এই ভয়ে একটা মোটা পলিথিন দরজার ফাঁকা জায়গাটায় তারা টাঙিয়ে নিয়েছে। আসলে রাত কাটানোর জন্য ঘর পাওয়া যেতে পারে এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা তারা ভেবে আসেনি।

এক বছর আগে এখানে গ্রাম ছিল। কিন্তু গ্রামটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। এই কাজটা শত্রুপক্ষ করছে বছর দু-এক ধরে। এর আবার কেতাবি নাম—'স্ট্র্যাটেজিক

হ্যামলেট'। আসলে দু-বছর আগেও যুদ্ধের চেহারাটা এ রকম ছিল না। এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত কিছু লড়াই হচ্ছিল। ওদের খবর কাগজগুলো লিখছিল, 'উগ্রপন্থীদের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা'। কিন্তু দু-একটা জেলা তারা দখল করে নেবার পর, বিষয়টা অন্য দিকে মোড় নেয়। প্রথমে শত্রুপক্ষ পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে হারানো এলাকা দখল করার চেষ্টা করে, দু-একটা শহর দখল করেও নেয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে দাঁত ফোটাতে পারেনি। এরপর থেকে দু-পক্ষই কৌশল পাল্টেছে। শত্রুপক্ষ যুদ্ধ চলছে এরকম জায়গায় শহরগুলোকে ঘাঁটি করে বসে আছে, আর তারাও সরাসরি শহরাঞ্চল দখল করার চেষ্টা করছে না।

একটা কথা তাদের পাখি পড়ার মতো শেখানো হয়—শত্রু যখন আক্রমণ করছে, তখন নিজের শক্তি বাঁচিয়ে রেখে পিছিয়ে এসো ; শত্রু যখন চুপচাপ বসে তাকে ক্রমাগত উত্ত্যক্ত করে যাও, যাতে সে ঘাঁটি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয় আর শত্রু যখন পালাচ্ছে, তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে দেবার চেষ্টা কর। কাজেই শহর দখল না করলেও হামলার কাজ তারা একদিনের জন্যও বন্ধ রাখেনি। এ ব্যাপারে শত্রুর পাল্টা ব্যবস্থা হল 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'। এ ব্যাপারটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, আশেপাশের গ্রামগুলোর জোরেই তারা শহরের ওপর হামলা চালায়। এটা ঠেকানোর জন্য অপরপক্ষ যেটা করেছে, সেটা হল শহরের কয়েক মাইলের মধ্যে যে সমস্ত গ্রামগুলো আছে সেগুলোকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। ওরা যা করে তা হল, হঠাৎ একদিন গ্রামটাকে ঘিরে ফেলে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টার নোটিস দেয়, গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার জন্য। যারা পালাতে পারে তারা ভাগ্যবান, তা না হলে গরু-শুয়োরের মতো ধরে এনে শহরের ক্যাম্পে রেখে দেয়। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা এই ক্যাম্পগুলোরই নাম হল 'স্ট্র্যাটেজিক হ্যামলেট'। দু-একজন ভাগ্যবান যারা এই ক্যাম্প থেকে পালাতে পেরেছে, তাদের কাছ থেকে এই স্ট্যাটেজিক হ্যামলেটের যা বিবরণ শুনেছে, তাতে মনে হয় নরকও বোধহয় এর থেকে ভাল। আর যারা গ্রাম ছাড়তে চায় না, তাদের জন্য বরাদ্দ গুলি। আর সব শেষে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ভবিষ্যতের মানুষের পড়ার জন্য এ রকম হাজার-হাজার ট্র্যাজেডি তৈরি হয়েছে তাদের দেশের মাটিতে গত দু-বছর ধরে। আর একাজ করেছে তার দেশের মানুষই। প্রথম প্রথম যখন সে পড়েছে যে, জাতি বা ধর্ম নয় সবচেয়ে বড় হল মানুষের শ্রেণী পরিচয়, তার কেমন খটকা লাগত। মনে হত কথাটা বোধহয় ঠিক না। এই যুদ্ধটা এত কাছ থেকে না দেখলে হয়ত খটকাটা সারা জীবন ধরেই থেকে যেত। কিন্তু একটা দেশের মানুষ তার নিজের দেশের মানুষকে এভাবে খুন করছে, এতেই বোঝা যায় শ্রেণীবোধের কাছে বাকি সব ঠুনকো।

এই হ্যামলেটের ফলে অনেক ক্ষতির মধ্যে একটা বিষয়ে তাদের লাভ হয়েছে। শত্রুপক্ষ কাছাকাছি চলে এলেই এখন গ্রামের মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে, তাদের মুক্তাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। আর তার মধ্যে যারা বয়সে জোয়ান তারা এসে নাম লেখাচ্ছে তাদের বাহিনীতে। এদের সম্পর্কে প্রথম দিকে হাইকমান্ড কিছুটা সতর্ক থাকতে বলেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এদের সম্পর্কে কোনো সন্দেহ অমূলক। ভিটেমাটি হারানো কৃষক এরা, শত্রু সম্পর্কে এদের ঘৃণায় কোনো খাদ নেই। বাঘের বাচ্চার মতো লড়ে। কিন্তু আবেগটা বেশি, যুক্তি কম, কাজেই কখনো-কখনো একটু ইনডিসিপ্লিন্ড হয়ে পড়ে। কিন্তু তারা বিষয়টা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, একশ পারসেন্ট খাঁটি পেশাদার সৈন্য কোথা থেকে পাবে?

এই গ্রামটা উচ্ছেদ হয়েছে প্রায় বছর দেড়েক আগে, একদম প্রথম দিকে। তাদের সঙ্গে যে দুটো স্থানীয় ছেলে এসেছে তারা কেউ এই গ্রামের ছেলে না, আশেপাশের কোনো গ্রামের। তাদের কাছ থেকেই শোনা, যেহেতু একদম প্রথম দিকের ঘটনা গ্রামের লোকেরা অনেকে বিশ্বাসই করেনি সত্যি-সত্যিই এভাবে উচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। অনেকেই গ্রাম ছেড়ে যায়নি। নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এখানে লোক মারা হয়েছে। এই গ্রামের ঘটনা নিয়ে বিদেশের কাগজপত্রেও হইচই হয়েছে—কিন্তু তাতে তাদের শত্রুপক্ষের কিছু যায় আসে না। এখন এটা একটা পোড়ো গ্রাম ছাড়া কিছুই না।

কাল দুপুরে যখন তারা এসে এখানে পৌঁছেছে, তখন আকাশটা থমথম করছিল। একফোঁটাও হাওয়া ছিল না। গোটা পরিবেশটাই যেন কেমন। মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায়, যেখানে এখনো জঙ্গল হয়ে যায়নি, মালপত্র নামিয়ে রেখে তাদের গোটা দলটাই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, বসেও পড়েছিল দু-একজন। এর একটা কারণ, গুমোট গরমে ভারী মালপত্র বয়ে নিয়ে এসে সবাই ছিল ক্লান্ত। আর দ্বিতীয় কারণ বোধহয় গ্রামটা। হয়ত যেখানে তারা দাঁড়িয়ে আছে, সেটাই হয়েছিল বদ্ধভূমি। যেখানে আশি বছরের বৃদ্ধা থেকে পাঁচ বছরের শিশু সবাইকেই গুলি করে মারা হয়েছিল।

বিষণ্ণ আকাশের নীচে গ্রামটা যেন একটা নিরানন্দ অভিশপ্ত জায়গা। গোটা গ্রামটাই প্রায় জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। তার মধ্যে তেলাকুচ লতায় ঢাকা পোড়া বাঁশের খুঁটি এখানে-ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। একপাশে কেবল একটা অক্ষত কুয়ো। তার একবার মনে হল, একটা চাপা দুর্গন্ধ কোথা থেকে যেন আসছে। খোলা আকাশের নীচে লাশগুলো পড়ে ছিল, হয়ত শেয়ালে কুকুরে সে সব লাশ এদিক-ওদিক টেনে নিয়ে গেছে—কিন্তু যাই হোক না কেন, দেড় বছর পরে তার গন্ধ থাকবে না। আসলে গন্ধটা তার কল্পনা।

গ্রামটা তার অতীত, তার থমথমে গুমোট আবহাওয়া, এই সব কিছু নিয়ে তাদের ওপরেও কেমন যেন একটা ছাপ ফেলে দিয়েছে। বাকি কাজগুলো তারা সেরেছিল মেশিনের মতো, প্রয়োজনের বাইরে কেউ বোধহয় একটা কথাও বলেনি। আর বিকেল পড়ে আসতেই শুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি।

যে ঘরটায় তারা আছে, যে কোনো কারণে সে ঘরটাই কী করে যেন অক্ষত থেকে গেছে। শুধু দরজা-জানালাগুলো পরে কেউ খুলে নিয়ে গেছে।

চোখটা এতক্ষণে সয়ে এসেছে। সে প্রথমেই যেটা বুঝতে পারে যে অন্ধকার যতটা ভেবেছিল ততটা নয়, বরং দরজায় ঝোলানো পলিথিনের ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোও দেখা যাচ্ছে। বোধ হয় ভোর হচ্ছে, আকাশ মেঘে ঢাকা থাকায় ততটা আলো হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যে জিনিস সে আবিষ্কার করল, সেটা হল, মাথা বাদ দিয়ে তার গোটা শরীরটা চুপচুপে ভিজে। ওপর দিয়ে সারা রাত ধরে কোথা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা জল তার গায়ে পড়েছে, সে টেরও পায়নি। এই কারণেই সে ওঠার চেষ্টা করল। উঠতে গিয়ে বুঝল সারা রাত জলে ভিজে শরীরটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আছে। ঘরটার মধ্যে গাদাগাদি করে তারা জনা শুয়ে আছে, দুজন সারা রাত বাইরে পাহারায় থাকার কথা। উঠে আসতেই আওয়াজটা সে স্পষ্ট শুনতে পেল। বৃষ্টি একটু কমে এসেছে, কিন্তু সেই বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যেও সে পরিষ্কার শুনতে পেল, কেউ একটা হালকা পায়ে ঘরটার সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল। যারা পাহারা দিচ্ছে, তারা কেউ নয়, কারণ তারা বুট পরে আছে। এটা বুট-পরা পায়ের আওয়াজ নয়।

অল্প জমা জলের ওপর দিয়ে কেউ খালি পায়ে দৌড়ে গেলে যেমন একটা ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজ হয়, আওয়াজটা সেরকম।

এই গ্রামে তারা ঘাঁটি গেড়েছে একশ পারসেন্ট নিশ্চিত হয়ে যে, এই গ্রামের ধারে-কাছে কেউ আসে না। হাইওয়েটা এই গ্রাম থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে, তাদের একটাই কাজ, আচমকা সেটার ওপর একবার হামলা চালানো। কিন্তু কাকপক্ষীও যদি আগে টের পেয়ে যায়, তবে গোটাটা বরবাদ হয়ে যাবে। কিন্তু কাউকে জানান না দিয়ে কেউ আসবেই বা কী করে? যারা পাহারা দিচ্ছে, তারা কি ঘুমিয়ে পড়ল? রাইফেলটা সে হাতে তুলে নিয়েছে। এত গাদাগাদি করে তারা শুয়েছে, অন্য কারুর ঘুম না ভাঙিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছানোটাও বেশ কঠিন। কিন্তু এখনো অন্যের ঘুম ভাঙানোর মতো কিছু ঘটেনি। ভেজা শরীরটা টানতে-টানতে সে দরজার কাছে এসে চুপ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, যদি পায়ের আওয়াজটা আর একবার পাওয়া যায় তবে সে আন্দাজ করতে পারবে, যার পায়ের আওয়াজ সে কোথায় আছে। না, আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। এবার খুব সাবধানে সে রাইফেলের নলটা দিয়ে পলিথিনের পর্দাটা ফাঁক করে বাইরের দিকে তাকাল। যেটুকু আলো ফুটেছে তাতে বাইরেটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টি খুব সামান্যই পড়ছে। একটা ঠাণ্ডা জোরালো হাওয়া বইছে বাইরে। কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। পায়ের আওয়াজ সে নিশ্চিতভাবে শুনেছে, কাজেই আশেপাশে কেউ না কেউ আছেই। হঠাৎ করে না বেরিয়ে সে পর্দাটা আরো কিছুটা ফাঁক করল। এবার সামনের গোটা চত্বরটাই সে দেখতে পাচ্ছে। একজন ঘাঘু 'জনযুদ্ধের সৈনিক' এর মতো সে ট্রিগারে হাত রেখে গোটা এলাকাটা সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তার নজর বাঁ দিকে জামরুল গাছটার দিকে পড়তেই সে খেয়াল করল, গাছটার নীচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। সেটা কোনো জন্তুও হতে পারে বা কোনো মানুষও হতে পারে। তার দৃষ্টিটাকে আটকে দিচ্ছে মাঝখানের একটা বুনো তুলসীর ঝোপ। সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বলে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না। পলিথিনের পর্দাটার আড়ালে সে এবার উঠে দাঁড়াল। এবার সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কোনো জন্তু না, মানুষই, গাছটার তলায় উবু হয়ে কিছু একটা কুড়োচ্ছে। সে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল, রাইফেলটাকে জামরুল গাছের দিকে তাক করে। সে বেরিয়ে এল, কোনো আওয়াজ হয়নি, কিন্তু মানুষটা উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে ফিরে তাকাল।

রাইফেলের নলটা সে নামিয়ে নিয়েছে। কারণ জামরুল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে। এই মৃত্যুর প্রা[illegible]রের মতো গ্রামে, এই তুমুল বর্ষার কাকভোরে মেয়েটা কোথা থেকে এল? একটা ময়লা মতো জামা পরে আছে। জামার নীচের প্রান্তটা শক্ত করে হাতে ধরে আছে, বোধহয় কোচোড়ে জামরুল রেখেছে। সে অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে, আর মেয়েটা তার দিকে। এত দূর থেকে কিছু বোঝা যায় না, তবুও তার মনে হল মেয়েটার চোখ দুটো সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সেই চোখে কোনো ভয় নেই, আছে বিস্ময়, আর আছে বোধ হয় বহু যুগের জমানো দুঃখ। সে মেয়েটার দিকে দু-পা এগিয়ে গেল। মেয়েটা তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল এক পা, আর পেছোতে গিয়ে বোধহয় একটা জামরুল কোচোড় থেকে পরে গেল। তার দিক থেকে দৃষ্টি এক চুল না সরিয়ে মেয়েটা তার ডান হাতটা নামিয়ে সেই জামরুলটা তোলার চেষ্টা করছে। মেয়েটি তাকে ভয় পাচ্ছে, ভয়টা ভাঙিয়ে দিতে হবে। সে গলাটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'খুকি, তোমার

নাম কী? কী করছ এখানে?'

কাল সন্ধ্যার পর সে এই প্রথম কথা বলল এবং বলতে গিয়েই বুঝল, তার নিজের কণ্ঠস্বরের ওপর তার এই মুহূর্তে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। এই নিস্তব্ধ ভোরে তার কথাগুলো ফেটে পড়ল গোটা গ্রামটার ওপর। মেয়েটা সঙ্গে-সঙ্গে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সামনের ঢালু জমিটার প্রান্তে, যেখান থেকে সে এবার ছুট লাগাতে পারে। মেয়েটা পালাবে এটা বুঝতে পেরে সে শেষবার চেষ্টা করল, এবার সত্যি সত্যি গলাটাকে স্বাভাবিক রেখে সে বলল, 'ভয়ের কিচ্ছু নেই, এসো না।'

মেয়েটা কী বুঝল জানি না, পেছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগাল। কোচোড় থেকে জামরুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। শেষবার যখন মেয়েটা তার দিকে তাকাল তার মনে হল, মেয়েটাকে এর আগে সে কোথাও দেখেছে। কোথায় দেখেছে তার মনে নেই, কিন্তু মেয়েটা তার ভীষণ চেনা। অথচ তার বিচারবুদ্ধি বলছে, মেয়েটাকে আগে দেখবার বা চেনবার কোনো সম্ভাবনা নেই। শুধু এই গ্রাম কেন, এই জেলাতে সে এই প্রথম। আর মেয়েটা নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে এখানে আসেনি। কিন্তু সে নিশ্চিত মেয়েটাকে সে আগে দেখেছে এবং সে মেয়েটাকে চেনে। তার মনে হল, কোনো মূল্যে মেয়েটাকে আটকানো দরকার। সেও মেয়েটার পেছনে ছুটল।

বৃষ্টির জমা জলে পেছল একটা জঙ্গলে ভর্তি জমির ওপর দিয়ে সে ছুটল, আর তার হাত দশেক আগে মেয়েটা। মেয়েটার ছোটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, জায়গাটা তার চেনা। কিন্তু সে জায়গাটা চেনে না, তার ওপর সারা রাত ভেজা জামা-কাপড় পরে তার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আছে। মেয়েটা দৌড়চ্ছে খালি পায়ে, সে একটা ভারি বুট পরে। ফলত মেয়েটার সঙ্গে তার দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে লাগল। সে মরিয়া হয়ে দুবার চেঁচাল, 'এই দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ভয় পেও না, আমি তোমাকে কিচ্ছু করব না।' তার কথা মেয়েটা শুনতে পেয়েছে কি না সেটাও সে বুঝতে পারল না, কারণ মেয়েটার দৌড়ের গতি একবিন্দুও কমল না।

সে কতক্ষণ ধরে ছুটছে বা কোথা দিয়ে ছুটছে কিছুই সে দেখছে না, সে শুধু দেখছে মেয়েটার উড়ন্ত ফ্রকের প্রান্তটা। অনবরত গাছের ডাল আর পাতা এসে তার মুখে লাগছে, তাকে দৌড়তে হচ্ছে মাথাটা নীচু করে। কিন্তু মেয়েটা দৌড়চ্ছে যে কোনো কিছু তাকে স্পর্শও করছে না। সন্ধ্যামণির ঝোপটা মেয়েটা পার হয়ে গেল একটা ফুলও না মাড়িয়ে, শেয়ালকাঁটার গাছগুলোর ওপর দিয়ে এমনভাবে গেল, যেন শরীর বলে ওর কিছু নেই। আর সে ছুটছে ক্ষতবিক্ষত হয়ে, প্রতিটি পা সে ফেলছে হাজারটা শঙ্কা নিয়ে।

কিন্তু পায়ের তলার পেছল ভাবটা আর নেই। এখানে বোধহয় বৃষ্টি হয়নি। কারণ কোথা থেকে যেন শিমুলতুলো উড়ে আসছে। একটা-দুটো নয়, হাজার হাজার। আর সেই-সেই অপার্থিব প্রান্তরের ওপর দিয়ে মেয়েটা ছুটছে। সে এখন চাইছে দাঁড়াবার দরকার নেই, মেয়েটা শুধু একবার তার দিকে ফিরে তাকাক। এতক্ষণ মেয়েটার ফ্রকটাকে মনে হচ্ছিল ময়লা সাদা, কিন্তু এখন সে দেখছে ওটা আসলে আকাশি নীল। নাশপাতি রঙের আকাশের নীচ দিয়ে সে দৌড়চ্ছে, কেন দৌড়চ্ছে সে জানে না, এমনকি কখনো কখনো মনে হচ্ছে আসলে মেয়েটাও নেই। কিন্তু এই দৌড়ে থামানোর ক্ষমতাও তার নেই।

এক সময় সে বোঝে কখন যেন তারা একটা পাহাড়ি এলাকায় চলে এসেছে, যদিও

কোনো ম্যাপে এরকম কোনো পাহাড়ের অস্তিত্বের কথা নেই। একটা পায়েচলা পথ দিয়ে তারা উঠে আসে যে জায়গাটায় সেখান থেকে আবার পথটা নেমে গেছে সামনের নদীটার দিকে।

অনেকক্ষণ দৌড়ে সে এখন ক্লান্ত, আর সে দৌড়তে পারছে না। একটা প্রাগৈতিহাসিক পাথরে হাত রেখে সে হাঁফায়, আর মেয়েটা সোজা ছুটে নেমে যায় নদীর দিকে। তারপর নদীর জলে পা ডুবিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাত ভরে নদীর জল নেয়, তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে জল গড়িয়ে আবার ফিরে যায় নদীর কাছেই আর মেয়েটা খিলখিল করে হেসে ওঠে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হেসে ওঠে নদী, হেসে ওঠে আকাশ। নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া অর্জুন গাছটার পাতায়-পাতায় ঝলসে উঠছে ফসফরাস। মেয়েটা ধীরে-ধীরে এসে দাঁড়ায় অর্জুন গাছের নীচে, তারপর নিঃশব্দে, নিঃশেষে মিলিয়ে যায় প্রতিটি পাতায়। বুকটা তার ব্যথা করে ওঠে অভিমানে। তাকে কেউ চিনতে পারল না। এই নদী, এই অর্জুন গাছ, এই প্রাগৈতিহাসিক পাথর সবই তার চেনা। সেই ঊষালগ্ন থেকে। কিন্তু আজ সে এখানে এসে দাঁড়িয়েছে অনাহুতের মতো। কেউ তাকে একবার বললও না—'এতদিন আসনি কেন?'

সে ফিরে চলল। না, কিছুতেই সে আর কাঁদবে না।

কলেজে যাবার সময় গায়ত্রীদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সে একবার হাঁক পাড়ে, 'কী রে গায়ত্রী, যাবি নাকি?' ওদের বাড়িটা প্রায় বাসস্ট্যান্ডের ওপরেই। কোনো দিন ভেতর থেকে আওয়াজ আসে, 'এক মিনিট দাঁড়া, আসছি।' আর কোনো দিন ওপরের বারান্দা থেকে গলা বাড়িয়ে গায়ত্রী বলে, 'তুই আজ চলে যা, আমার দেরি হবে'।

গায়ত্রীদের বাড়িটা বোধহয় তাদের পাড়ার সবচেয়ে পুরোনো বাড়ি, সরু বারান্দাটার ওপরে কার্নিসটা থেকে পলেস্তরা অনেক জায়গায় খসে গিয়েছে। মাঝে-মাঝে ভয় হয় এই বোধহয় ভেঙে পড়ল গোটা বারান্দাটা। কিন্তু বারান্দাটার একটা কোণকে ঢেকে ফেলেছে বিশাল একটা জুঁইফুলের গাছ। পাশের গলি থেকে লতানো গাছটা উঠে গেছে বাড়ির ছাদ পর্যন্ত। বাড়িটার সমস্ত রূপহীনতাকে ঢেকে দিয়েছে এই একটা জুঁইগাছ।

গায়ত্রীর মা দীর্ঘদিন থেকে অসুস্থ, প্রায় বিছানাতেই শোয়া। বাবাও রিটায়ার করেছেন, অনেক বয়স। গায়ত্রীর বোন বুড়ি, ক্লাস নাইনে পড়ে। গায়ত্রীর দাদা বাবুদা আর তার বউ দুজনই চাকরি করে, সকালবেলাই বেরিয়ে যায়। গায়ত্রী বাড়ির রান্নাবান্না করে, মাকে চান করিয়ে, খাইয়ে—তারপর কলেজে রওনা হয়। বুধবার সকাল সাড়ে নটায় ফিজিক্স প্র্যাক্টিকাল, ও ক্লাস গায়ত্রীর কোনোদিনই প্রায় করা হয় না।

যেদিন গায়ত্রী যাবে বলে, সে গিয়ে অপেক্ষা করে বাসস্ট্যান্ডে। কলেজে ঢুকে তার

একটাই ক্ষতি, যাবার পথে তিশির সঙ্গে তার আর দেখা হয় না। সপ্তাহে একদিন তার ক্লাস সাড়ে নটায়, আর বাকি কদিন পৌনে এগারোটায়। আর তিশির স্কুলের বাস আসে পৌনে দশটা থেকে দশটার মধ্যে। আগে বেরোলে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। সে তো একা নয়, গায়ত্রী আর অন্তুও তাদের কলেজে পড়ে, একই ক্লাসে। তিশির সঙ্গে দেখা না হওয়াটাকে সে এখন ভবিতব্য হিসাবেই ধরে নিয়েছে। বরং একদিক থেকে তার ভালই হয়েছে, আগে সে জানত কখন তিশির সঙ্গে দেখা হবে। যতক্ষণ দেখা না হচ্ছে ততক্ষণ একটা ভয় থাকত, যদি দেখা না হয়। এখন তিশির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হঠাৎই, কোনো আগাম জানান না দিয়েই। এতে আনন্দ আরো বেশি।

সে আর গায়ত্রী একসঙ্গে গেলেও, অন্তু আগেই চলে যায়। ওর অনার্সের ক্লাস আগে শুরু হয়। অন্তু অনার্সের ক্লাস করে, আর সে যায় পাসের ক্লাস করতে—এটা সে এখনো মনে-মনে মেনে নিতে পারেনি। লেখাপড়ায় সে কোনোদিনই আহামরি কিছু নয়। হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন, খুব খারাপ হলেও একটা হাই সেকেন্ড ডিভিশন না পাবার কথা সে ভাবতেও পারেনি। এমনকী পরীক্ষা দিয়েও তার এটা তার মনে হয়নি। খুব ভাল হবে না এটা সে অবশ্য পরীক্ষা দিয়েই বুঝেছিল। আসলে ওভাবে পরীক্ষা দেওয়া যায় না। বাংলা ফার্স্ট পেপারের পরীক্ষা পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। মাস্টারমশাইরা বেশ কড়া গার্ড দিচ্ছিল। তিনটে স্কুলের সিট একসঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু টিফিনের সময় স্কুল গেটে 'যুগ যুগ জিও' স্লোগান এবং পরপর দুটো বোমা। সেকেন্ড পেপার থেকে মাস্টারমশাইরা খাতা দেবার সময় আর খাতা নেবার সময় ছাড়া আর পরীক্ষা হলে ঢোকেননি। পরীক্ষার হলে একটু-আধটু কথা বলতে পারলে ভালই হয়, কিন্তু যা হচ্ছিল তা এক কথায় বীভৎস। ওদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় দিব্যেন্দু পরীক্ষার মাঝপথেই কাঁদতে-কাঁদতে বেরিয়ে গিয়েছিল। ওর খাতাটা কে যেন মাঝখান থেকে ছিঁড়ে দু-টুকরো করে দিয়েছিল।

সে পেয়েছিল চারশ বাহাত্তর, যাকে কোনোক্রমে সেকেন্ড ডিভিশন বলা যায়। এই নম্বর নিয়ে অনার্স পাওয়া যায় না, সে অনার্স পায়ওনি।

কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে বাবার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। সেই বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে এ-কলেজ ও-কলেজ ঘুরে অ্যাডমিশনের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সে অবশ্য আশাও করেনি কোনোদিন বাবা এসব বিষয়ে মাথা ঘামাবে। কিন্তু তার খারাপ লেগেছিল, গোটা ব্যাপারটা নিয়ে বাবার উদাসীনতা। এই যে সে চারশ বাহাত্তর পেল, এটাও যেন স্বাভাবিক। সে জানে আর কেউ না বুঝুক, অন্তত মা তার দুঃখ বুঝেছিল।

সেও সুমনদার মতো সেন্ট জেভিয়ার্সে ফিজিক্স অনার্স নিয়ে পড়বে—এই স্বপ্নটা সে একা একাই দেখেছিল। এখন তার মনে হয়, সে ভাগ্যবান, স্বপ্নটার কথা সে কাউকে বলেনি। স্বপ্নটা তার একার, তাই স্বপ্নভঙ্গটাও তার একারই থেকেছে। চারশ বাহাত্তর এবং বি. এস্‌সি (পাস)-টাকে সে তার ভবিতব্যই ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সহনশীল তিক্ত বোধটাকে অসহ্য করে তুলেছে অন্তুর অনার্স পাওয়াটা, কারণ অন্তুর নম্বর চারশ পঁয়ষট্টি।

যাদের ধরে অন্তু ম্যাথ্‌স অনার্স যোগাড় করল তাদের কাছে যাওয়ার কথা সে ভাবতেও পারে না, তাদের বন্ধু গ্রুপের কেউই পারে না। কোনো আলোচনা ছাড়াই কতগুলো অলিখিত নিয়ম তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অরুণদার চায়ের দোকানে না যাওয়া, পাড়ার কালীপুজোর প্যান্ডেলটা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা, রাত আটটার পর পাড়ার মোড়ে না দাঁড়ানো। অন্তু

অবলীলাক্রমে এই বাধাগুলো টপকে গেল স্রেফ ম্যাথ্‌স অনার্সের জন্য। অথচ অন্তুদের গলির দেওয়ালেই রক্তমাখা হাতের ছাপটা ছিল। সে ঠিক নিশ্চিত না, কেন অন্তুর দেখানো পথে সে গেল না। ভয়ে? রাগে? না কী অসীমদার জন্য?

কলেজে যে দিন অ্যাডমিশন ছিল, সে দিন তাদের কলেজের অফিসের কাউন্টারে যাবার আগে হাজিরা দিতে হচ্ছিল কাউন্টারের বাইরের একটা টেবিলে। সেখানে জমা দিতে হচ্ছিল দশ টাকা, আর বিনিময়ে পাওয়া যাচ্ছিল প্রধানমন্ত্রীর ছবিআলা 'গৈরিক অভিনন্দন' সহ তিন রঙা কার্ড। যারা টেবিলে বসেছিল তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে ফিরে আসছিল তার পরিচিত ভয়ের অনুভূতি। সন্দেহভাজনদের জন্য চলছিল জেরা। তার চোখের সামনেই একটা ছেলেকে টানতে-টানতে বার করে দেওয়া হল। ছেলেটা ভয়ে-ভয়ে বলছিল, 'আমার দাদা পলিটিক্স করে, বিশ্বাস করুন আমি করি না।' ছেলেটাকে একটা থাপ্পড় মারা পর্যন্ত সে দেখতে পেয়েছিল। তাবপর করিডোরটা ঘুরে ছেলেটাকে নিয়ে যাবার পর আর কিছু সে দেখতে পায়নি। পালিয়ে যাবার ইচ্ছেটা দমন করে সে কোনো মতে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু সেই আতঙ্কটা তার এখনও রয়ে গেছে। কলেজে ঢুকতে গেলে ইউনিয়ন রুমের সামনে দিয়ে ঢুকতে হয়, ওই জায়গাটা দিয়ে যাবার সময় নিজের অজ্ঞাতেই তার হাঁটার গতি বেড়ে যায়। শুধু তিন তলায় কেমিস্ট্রি ল্যাবের ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর ছুরি দিয়ে কেটে কে যেন লিখে রেখেছিল—শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা ঘটায় বিপ্লব। ওই একটা চিহ্ন ছাড়া গোটা কলেজই 'স্বাভাবিক'।

অন্তু আগের মতোই তাদের বন্ধু, কিন্তু একটু যেন কেমন। কলেজে অন্তুর আড্ডা অন্যদের সঙ্গে। অন্তুর আড্ডা ইউনিয়ন রুম অথবা কমনরুমে। আর তার আড্ডা ক্যান্টিনে। কখনো কখনো অন্তু তাদের আড্ডায় এসে বসে, কিন্তু সে কখনো অন্তুর আড্ডায় যায় না।

কলেজে পড়ার দুটোই বাড়তি সুবিধা—এক হচ্ছে ক্লাস কাটা আর একটা হল ক্যান্টিন। পাসের ক্লাস মানে এমনিতেই প্রায় গোয়াল। ড্যাম্পের কালো ছোপ ধরা প্রায় অন্ধকার ঘরে বহু দূরের ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে স্যারেরা কী বলে, সেটা খুব চেষ্টা না করলে বোঝা সম্ভব না। আর সে চেষ্টা করে দেখেছে খুব একটা লাভও হয় না। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি তাও একটু চেনাশোনা—কিন্তু ম্যাথ্‌স একদম হিব্রু, ক্যালকুলাস একদম অন্য জগৎ। সুমনদার কাছ থেকে ম্যাথ্‌স পাসের যে বইটা যোগাড় করেছিল বাড়িতে সেটা খুলেও সে বিশেষ কিছু উদ্ধার করতে পারল না। দুর্বোধ্য পড়াশুনা আর পেছনের দরজা দিয়ে অনবরত কেটে পড়ার স্রোতে ভেসে যাবার আকর্ষণ, সে দ্বিতীয় রাস্তাকেই প্রায় পাকাপাকি বেছে নিল। কেমন যেন একটা আধা অন্ধকার সারাক্ষণ ঘিরে রাখে কলেজটাকে। বর্ষার সময় গোটা কলেজটা থাকে ভেজাভেজা, মনে হয় সবটা শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে আছে। শুধু ফিজিক্স ল্যাবের বড় জানালার ঠিক বাইরে রাস্তার ওপরের কদমফুল গাছটায় তখন ফুল ফোটে। ল্যাবের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ফুলগুলো প্রায় ছোঁয়া যায়। ফুলগুলো ভীষণ সুন্দর।

শুক্রবার প্রথম ক্লাস ম্যাথ্‌স পাস, দশটা চল্লিশে। গায়ত্রীকে ডেকে সে যখন বাস স্টপে এসে দাঁড়াল, তখন তার ঘড়িতে ঠিক দশটা পাঁচ। ঘড়িটা এখন তার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। বছরখানেক আগে মেজ পিসেমশাই সিঙ্গাপুর থেকে এনে দিয়েছিল। সে 'ছোট' বলে তাকে ঘড়িটা পড়তে দেওয়া হত না। অথচ তাদের ক্লাসের অনেক ছেলেই

ক্লাস নাইন থেকেই স্কুলে ঘড়ি পরে আসত। কিন্তু মা তাকে পরতে দেয়নি একটাই কারণে, যেহেতু ঘড়িটা বিদেশী, এবং যেহেতু বিদেশী সেহেতু অবশ্যই দামি, এবং দামি ঘড়ি একটা স্কুলের 'বাচ্চা'র পরা উচিত না। আর এখন সে যেহেতু চারশ বাহাত্তর পাওয়া কলেজ, ছাত্র কাজেই সে এখন ঘড়িটা পরতে পারে। ঘড়িটা একটু অদ্ভুত—উজ্জ্বল নীল রঙের ডায়ালে কালো দুটো কাঁটা, কোনো সেকেন্ডের কাঁটা নেই, কোনো সংখ্যাও লেখা নেই। ঘড়িটা খুবই সুন্দর, সে বোঝে তার এই কালো টিংটিঙে কবজিতে ঘড়িটা ঠিক মানায় না। কিন্তু যাই হোক, ঘড়িটা নিয়ে বন্ধুমহলের আলোচনা সে উপভোগই করে।

গায়ত্রী বলেছে দাঁড়াতে, কাজেই সে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ালে অবশ্য বোর হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, আড্ডা দেবার লোক সবসময়ই পাওয়া যায়। আজ পেল সমরকে। সমর তাদের বন্ধু হলেও এক ক্লাস ওপরে পড়ত। গতবার ইংরেজিতে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিল, এবার আর পরীক্ষাই দেয়নি। কিন্তু সমর পাড়ার হিরো। সমরই আশেপাশের অঞ্চলের একমাত্র ছেলে, যে ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে। টানা দু-বছর টালিগঞ্জ অগ্রগামীতে খেলছে। গতবছর কীভাবে যেন ইস্টবেঙ্গলকে সমর একটা গোল দিয়ে দিয়েছিল। যদিও তাদের পাড়ার অধিকাংশই ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার, কিন্তু পাড়ার ছেলে বড় ক্লাবকে গোল গিয়েছে, ব্যাপারটা তাদের ভালই লেগেছিল। কিন্তু এবার টিমে সমর বিশেষ চান্স পাচ্ছে না, এইসব নিয়েই কথা হচ্ছিল। সমর দুঃখ করে বলছিল, রাজস্থান থেকে ভাল অফার পেয়েও নেয়নি। কিন্তু যাদের কথায় পুরোনো ক্লাব-প্রীতি দেখিয়ে রাজস্থানে যায়নি, এখন তারাই কলকাঠি নেড়ে সমরকে বাদ দিয়ে দিচ্ছে। জুনিয়ার বেঙ্গল ক্যাম্পে ডেকে সাত দিন পরে বাদ দিয়ে দিয়েছে। সমরই বক্তা, সে শ্রোতা। সমর বলছিল, খেলার মাঠে নাকি খুব নোংরা পলিটিক্স হয়। ও আরো দু-বছর দেখবে, তার মধ্যে যদি কিছু না হয়, তবে মাঠ ছেড়ে বাবার কালীঘাটের দোকানে বসে যাবে। সমরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সোয়া দশটা। এখনও যদি গায়ত্রী চলে আসে তাহলেও প্রথম ক্লাসে পার্সেন্টেজটা দিতে পারে।

গাড়ির হর্নটা একদম কানের কাছে বাজাতে সে প্রায় চমকে উঠেছিল। পেছনে ফিরে তাকাতেই আকাশি ফিয়াট, এবং সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই সে দেখে নিয়েছে, ড্রাইভারের পাশের সিট ফাঁকা, অর্থাৎ তিশি নেই। চালক কর্নেল চ্যাটার্জি। গাড়িটা অবশ্য তাকে লক্ষ করে হর্ন দেয়নি। সরু গলির মুখে উল্টোদিক থেকে একটা রিকশ ঢুকছে, গাড়িটা আটকে গেছে তাতে। গাড়িটাকে জায়গা করে দিতে সে আর সমর সরে আসল নর্দমার দিকে। গাড়িটা প্রায় তাদের গা ঘেঁষে। তিন বছর পর সে আর কর্নেল চ্যাটার্জি আবার দু-ফুটের মধ্যে। কর্নেল সামনের দিকে তাকিয়ে, আর সে ড্রাইভারের গেটের একদম পাশে। লোকটাকে সে একদম কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এক অষ্টমীর সকালে লোকটাকে দেখে তার যা মনে হয়েছিল, এখনও তার ঠিক একই কথা মনে হল—লোকটা ভীষণ সুন্দর। শুধু তার সমস্ত পুরুষালি সৌন্দর্যের মধ্যে একটা বাড়তি কঠোরতা, একটা অসম্ভব অহংকারী ভঙ্গি এনে দিয়েছে মাঝখান থেকে কাটা ভারী চিবুকটা। ওই একটা জিনিসই দেখিয়ে দিচ্ছে, লোকটা অন্য গ্রহের। সাদা হাফ সার্টের ওপরের বোতামটা খোলা, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে লোকটার বুক আর কাঁধের পেশিগুলোর একটা অংশ। তার কেন যেন মনে হল, পৌরাণিক গ্রিকদের চেহারা বোধহয় এ রকম ছিল। ডান হাতটা স্টিয়ারিংয়ের ওপর

রাখা—কবজিতে সাদা ডায়ালের একটা ভারী ঘড়ি। সে মুহূর্তের মধ্যে ভেবে নেয়, এরকম একটা হাতেই নীল ডায়ালের ঘড়িটা মানায়। রিকশটা একটু সরে যেতে ডান দিকে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়িটা আর একটু তার গা ঘেঁষে এগিয়ে এল। চালক তাকাল তার দিকে। তিন বছর পর চোখাচোখি। কিন্তু সে তাকানোতে তিন বছরের আগের কোনো ছাপ নেই।

মাসখানেক আগে আলমারি গোছাতে গিয়ে মা বার করেছিল সেই আমেরিকান পারফিউমের শিশিটা। দীর্ঘদিন থাকতে-থাকতে পারফিউমটা উবে গেছে, পড়ে আছে শিশিটা। কর্নেল চ্যাটার্জিকে সে ঘৃণা করে, এই তিন বছরে অসংখ্য মুহূর্তে সে লোকটাকে কল্পনায় চরম শাস্তি দিয়েছে। ঘৃণা আর ক্রোধকে সে রেখে দিয়েছিল। আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে পারফিউমের শিশির মতো আবরণটা পড়ে আছে, আসল ঘৃণাটা আর নেই। এমনকী চোখাচোখি হবার পর লোকটা যদি তার দিকে তাকিয়ে একবার হাসত, সে বোধহয় খুশিই হত।

গায়ত্রী এল ঠিক দশটা বাইশে, একগাল হাসি দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে।

'সরি, দেরি হয়ে গেল।'

'সরি? ফার্স্ট ক্লাসটা গেল।', একটু রাগ দেখিয়ে সে বলল।

'আহা, রাগ করিস কেন, লোকে বান্ধবীদের জন্য কত কিছু ত্যাগ করে। তুই না হয় পি এম-এর একটা ক্লাস ত্যাগই করলি।'

'ধ্যাৎ, তুই কি বান্ধবী না কি।'

'সে কী রে, আমি তোর বান্ধবী না?'

'দূর, তুই কেন বান্ধবী হবি, তুই হলি পাড়ার মেয়ে।'

'কেন রে এক পাড়ায় থাকলে বান্ধবী হওয়া যায় না? অন্য পাড়ার মেয়ে দেখলে তোরা ছেলেগুলো কেমন হ্যাংলার মতো করিস। আমার কথা বাদ দে। পাড়ায় তো কত ভাল মেয়েও আছে।'

'তোর কী বক্তব্য, বেপাড়ার ছেলেরা আমাদের পাড়ার মেয়েদের পাত্তা দিচ্ছে না, তাই পাড়ার ছেলেদেরই ব্যাপারটা দেখা উচিত'।

'বাজে কথা বলিস না, তোদের কে পাত্তা দেয় রে? দু-দিন আগেও জামা-কাপড় না পরে সব ঘুরে বেড়াতিস, তোদের দেখলে এখনো হাসি পায়।'

'আর তোরা কী করতিস?'

গায়ত্রী এবার চেঁচায়, 'এক থাপ্পড় মারব, অসভ্যতা করবি না।'

সে ভয় পাবার ভঙ্গি করে কিছুটা দূরে সরে গিয়ে হ্যা-হ্যা করে হাসে। গায়ত্রীও শেষে তার হাসিতে যোগ দেয়। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গলাটা নামিয়ে বলে, 'জানিস, টিঙ্কু না লাইনের ওপারের একটা ছেলের সঙ্গে রোজ লেকে যাচ্ছে।'

সে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'খবরটা বাসি, এই ছেলেটা গত ছ-মাসে টিঙ্কুর তিন নম্বর। টিঙ্কু যদি হায়ার সেকেন্ডারিতে পাস করে আমি কান কেটে ফেলে দেব।'

'ধ্যাৎ, তুই খুব বাজে। টিঙ্কুর ওপর তোর রাগ আছে বলে তুই যা খুশি বলছিস। মোটেই টিঙ্কু অত খারাপ মেয়ে না। প্রেম তো করতেই পারে একজন। হাতের কাছে কিছু নেই, লেক ছাড়া কোথায়ই বা যাবে? আর এতে অন্যায়েরই বা কী আছে।'

'ও, ব্যাপারটা যখন ভালই তবে কলেজে গিয়ে আর কাজ কী?'

নাক-টাক কুঁচকে গায়ত্রী বলল, 'ধ্যাৎ, কোনো ভদ্রলোক লেকে যায় এ সব করতে।'

সে হাসতে-হাসতে বলে, 'তাহলে কোথায় যাবি তুই প্রেম করতে?'

গায়ত্রী এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর নীরবে একবার হাসে। গায়ত্রীর একটা গজদাঁত আছে, হাসলে বড় মিষ্টি লাগে। সেই মিষ্টি হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে রেখেই গায়ত্রী উত্তর দিল, 'আমি কোথায় যাব জানিস না? সকাল হলে রান্না করতে, আর বিকেল হলে টিউশনিতে।'

গায়ত্রীর হাসি সত্ত্বেও আকাশের কোণে কালো বিষণ্ণ মেঘ জমেছিল।

বাসটায় যথেষ্ট ভিড়। গায়ত্রী পা-দানির দ্বিতীয় সিঁড়িতে, সে একদম তলারটায়। তার পেছনে লোক ঝুলছে। পেছনের থেকে গায়ত্রীর গায়ে কেউ যাতে ধাক্কা না মারে এর জন্য গোটা চাপটা সে সামলাচ্ছে। গায়ত্রীর খোঁপাটা একটু আলগা হয়ে নেমে এসেছে পিঠের ওপর। খোঁপাটার দু-পাশ দিয়ে সাদা ব্লাউজের ভেতর থেকে পিঠের রোগা হাড় দুটো উঁচু হয়ে আছে। কন্ডাকটারের গায়ের ঘামের তীব্র গন্ধের মধ্যেও গায়ত্রীর গায়ের পাউডারের গন্ধ তার নাকে আসছে। ওই দুটো রোগা হাড়, আর পিঠের ওপর নেমে আসা খোঁপাটাকে পেছনের চাপ থেকে রক্ষা করতে-করতে সে অনুভব করে গায়ত্রীর শেষ হাসিটা একটা বিষণ্ণতার আবরণ হয়ে চারিদিকে কেমন ছড়িয়ে আছে। গায়ত্রীর কি মনে আছে, কীভাবে তার হাত ধরে গাযত্রী বলেছিল—'চাঁদু তুই খুব ভাল ছেলে'? তার যখন মনে আছে, গায়ত্রীও নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি। হঠাৎ তার মনে হল গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবে, এক্ষুনি জিজ্ঞাসা করবে—গায়ত্রী কী বলতে চেয়েছিল? গায়ত্রী কি তার জন্য একান্ত কিছু কথা বিষণ্ণ হাসির আড়ালে রেখে দিয়েছে?

দশটা পঞ্চান্নতে তারা কলেজ গেটে, দশটা চল্লিশের ক্লাসে ঢোকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, অতএব ক্যান্টিন। তারা সচরাচর বসে ক্যান্টিনের একদম পেছনের টেবিলটায়, পাশেই বেসিনটা থাকায় নেহাত দায় না পড়লে কেউই বিশেষ ওই টেবিলে বসে না। এবং এই সুযোগে ওটাই তাদের আড্ডার পার্মানেন্ট জায়গা। সে ভেবেছিল এখন টেবিলে কেউ থাকবে না, কিন্তু দূর থেকেই দেখল শুভব্রত একা বসে আছে। শুভব্রত কেমিস্ট্রি অনার্সের ছেলে, ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব একসঙ্গে পাসের ক্লাস করার দৌলতে।

ওদের দেখে শুভব্রত হাফ ছেড়ে বাঁচল, বেচারা বোধহয় একা বোর হচ্ছিল।

বসতে-বসতে সে বলল, 'তোর জন্যই ক্যান্টিনে আসলাম শুভ, চা বল।'

'প্লিস্, ছেড়ে দে মাইরি, বাড়ি থেকে এ মাসের টাকা আসেনি। আমিও বসে আছি তক্কে তক্কে কাউকে জক মারব বলে। ভেবেছিলাম বাংলা অনার্সের মেয়েগুলোকে পেয়ে যাব, ওদের দয়ার শরীর, বললেই চা-টা খাওয়ায়। আজ তুইই চা-টা বল।'

গায়ত্রী বলল, 'দাঁড়া, আমি চা বলছি, সবে টিউশনির টাকা পেয়েছি।'

'তবে সঙ্গে চপও বল।' বলে কোনো সুযোগ না দিয়ে শুভ নিজেই চেঁচিয়ে অর্ডার দিয়ে দিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'ক্লাসে যাসনি?'

'সকাল নটা থেকে অনার্স প্র্যাকটিকাল, তারপর পি এম-এর ম্যাথস্ পাস, জাস্ট করা যায় না রে চাঁদু।'

গায়ত্রী বলল, 'বাজে বকিস না, রোজই তো এক কথা বলিস। অনার্স পেয়েও যখন ম্যাথ্স-এ ব্যাক পাবি তখন বুঝবি।'

আদপেও বিব্রত না হয়ে শুভর জবাব, 'এর সম্ভাবনা ব্যাপক। আমি তো ভাবছি প্রিন্সিপালকে গিয়ে বলব, অনার্স না পারলে অনার্স কেটে দেওয়া হয়, আমি পাস পারছি না, আমার পাস কেটে দেওয়া হোক।'

তাদের হাসির মধ্যেই টেবিলে এসে বসল শালিনী আর গৌতম। শালিনী জিওগ্রাফিতে অনার্স, গৌতম তাদের মতোই বি এস-সি পাস।

শালিনীকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'তুইও পেছনের দরজা দিয়ে কেটেছিস?'

ভুরু কুঁচকে শালিনী জিজ্ঞাসা করে, 'কেন? ওরা কাটতে পারলে আমি পারব না কেন, মেয়ে বলে?'

গৌতম বলল, 'মেয়ে বলে না, তোকে পি এম একটু নেকনজরে দেখে বলে। সারাক্ষণই তো দেখি তোর দিকে তাকিয়েই পড়ায়। ক্লাসে তোকে না দেখে যদি আবার খোঁজ করে?'

শালিনী এসব কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, 'একটা ছেলে যা-যা কাজ পারে সব আমি করে দেখাব। গৌতম, দে না তোর সিগারেটটা, দুটো টান দিই।'

'না গুরু, মায়ের ব্যাগ হাতানো পয়সায় সিগারেট খাচ্ছি। তোমার পৌরুষ প্রমাণের জন্য সেটা দান করতে পারব না। খেতে ইচ্ছা করলে নিজের বাপের কাছ থেকে নিয়ে খেয়ো।'

'আমার বাবা? তোদের থেকে অনেক স্পোর্টিং। আমি খেতে চাইলে ঠিক দেবে। শোন, আমি তো বাবা-মার একমাত্র চাইল্ড। অনেক বড় হওয়া পর্যন্ত আমাকে বাবা কেবল ছেলেদের জামা-কাপড়ই কিনে দিত। আমি তো এখনো বাড়িতে পাজামা-পাঞ্জাবি পরি।'

'কলেজেও পরে আয় না, কে ঠেকাচ্ছে?' সে আর না বলে পারল না।

শালিনী অসম্ভব স্মার্ট, 'হ্যাঁ আমি পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আসব। বল, তুই আমার সালোয়ার-কামিজগুলো পরে আসবি?'

এবার শুভ বলল, 'না-না ওকে কেন, ওগুলো বরং সেকেন্ড ইয়ারের অতীশকে দে। আর তুই বললে সালোয়ার-কামিজ কেন অতীশ শাড়ি-ব্লাউজ পরতেও রাজি হবে।'

গোটা টেবিলটা হাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি থামিয়ে শালিনীই বলল, 'হ্যাঁর, ভীষণ ন্যাকা। সেদিন লাইব্রেরির সামনে দিয়ে একা-একা যাচ্ছি, হঠাৎ আমাকে ধরে বলে, 'শালিনী তোমার যদি নোট বা কোনো কিছু দরকার হয়, তবে আমাকে বোলো।'

এবার চেঁচিয়ে উঠল গৌতম, 'এই সুযোগ শালিনী, বল, নিশ্চয়ই নোট নেব, একশবার নোট নেব, তবে সে নোট যেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার হয়।'

গৌতমের পিঠে শালিনীর কিল, কিন্তু তারা পাঁচজনই হেসে গড়াগড়ি। শুভ বলল, 'দেখ শালিনী, অতীশকে অগ্রাহ্য করিস না। ওর মতো একনিষ্ঠ প্রেমিক তুই আর পাবি না। তুই তো বলিস আই পি এস হবি। সেই পরীক্ষায় তুই পাস করবি কি না জানি না। তবে চেষ্টা চরিত্র করলে একটা কনস্টেবলের চাকরি তুই যোগাড় করতে পারবি। তখন অতীশ তোর কত কাজে লাগবে। তুই যখন ডিউটিতে যাবি অতীশ তোর লাঠি-ঠাটি গুছিয়ে দেবে। তুই ভাত খেতে বসলে পাশে বসে হাওয়া করবে, 'এটা খাও, ওটা খাও' বলবে। তারপর তুই ডিউটিতে চলে গেলে ছাতে উঠে বড়ি দেবে, আচার শুকোবে। বিকেল হলে গা ধুয়ে

জানালার শিক ধরে অধীর আগ্রহে তোর ফেরার পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তুই ডিউটি থেকে ফিরে হাঁক পাড়বি, 'কই গো পুঁটির বাবা, লুঙি-টুঙি দাও।'

সম্মিলিত হাসির আওয়াজটা এমনই হল, গোটা ক্যান্টিনটাই ফিরে তাকাল তাদের টেবিলের দিকে।

গায়ত্রীই বলল, 'শুভ, তুই গল্প-টল্প লেখ, তোর নাম হবে।'

হাসি থামিয়ে শুভ বলল, 'কে বলল তোকে লিখি না। গল্প লিখি, কবিতা লিখি।'

'ও মা, আমাদের কোনো দিন বলিসনি তো?'

'বলল, সব স্টক একদিনে ছাড়তে হয়? এসব প্রতিভা ক্রমশ প্রকাশ্য।'

শালিনী বলল, 'একদিন আমাদের পড়া'।

'দেখ, আমার লেখা পড়ার কিন্তু রিস্ক আছে।'

শালিনী বিস্মিত, 'গল্প কবিতা পড়ায় আবার রিস্ক কি রে? বল না বাবা, দর বাড়াচ্ছিস।'

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে শুভ চেয়ারটা দোলাতে-দোলাতে মুচকি-মুচকি হাসল কিছুক্ষণ। তারপর বলে উঠল,

লিখেছিস কী যে এক কবিতা
যা নিয়ে পাড়ায় এত হল্লা?
যাকে দেখি, সেই বলে 'ছেলেটা
ছিল ভাল আজ গেছে গোল্লায়।'
লিখেছিস বটে এক কবিতা
পুলিস করছে তোকে তল্লাশ...

কবিতাটা হঠাৎই থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বল, কার কবিতা?'

গৌতম বলল, 'সুকান্তের?'

শালিনী জিজ্ঞাসা করল, 'তোর নিজের?'

'দূর-দূর' এরকম কবিতা লিখতে পারলে কী আর দীপকদার ক্যান্টিনে বসে গেঁজিয়ে সময় কাটাতাম। কবে মিসায় তুলে নিয়ে যেত।'

গায়ত্রী হঠাৎ লাজুক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের?'

টেবিল চাপড়ে উঠে শুভ বলল, 'কারেক্ট, এর জন্যেই তো গায়ত্রী তোকে আমার এত পছন্দ।'

শালিনী বলল, 'আমি ভাবছিলাম মঙ্গলাচরণ। ওঁর 'জননী যন্ত্রণা' পড়ে আমি একদম মুগ্ধ। ভাল কবিতা দেখলেই আমার মনে হয় মঙ্গলাচরণের।'

এই ধরনের আলোচনায় সে বড় অসহায় বোধ করে। এই আলোচনাগুলোতে সে কোনোভাবে অংশগ্রহণ করতেই পারে না। নিজের বাংলা সিলেবাসের বাইরে রবীন্দ্রনাথের আফ্রিকা আর মার আলমারিতে হলুদ হয়ে আসা গল্পগুচ্ছের কয়েকটা গল্প ছাড়া আর কিছু পড়েছে বলে সে মনে করতেই পারে না। তাদের বাড়িতে অন্য কোনো গল্পের বইও আসে না, কেবল মা কাদের কাছ থেকে যেন পুরোনো শারদীয়া বই নিয়ে আসে। তার থেকে কখনো কখনো দু-একটা উপন্যাস সে পড়েছে। কিন্তু তাদের আড্ডায় সে সব উপন্যাসের প্রসঙ্গ

কখনোই ওঠে না। যেমন রমাপদ চৌধুরীর 'পিকনিক' পড়ে তার বেশ ভালই লেগেছিল। পিকনিক নিয়ে তাদের আড্ডায় কখনো কোনো আলোচনা হয়নি, কখনও হবে বলেও তার মনে হয় না। আর নিজের থেকে এ আলোচনা করার কোনো সাহস তার নেই। সমরেশ বসুর দু-একটা উপন্যাস সে এভাবেই পড়েছিল। কিন্তু তাদের আড্ডায় সমরেশ বসুর যে সব উপন্যাস নিয়ে আলোচনা হয় সেগুলো তার পড়া কোনো উপন্যাস নয়। সমরেশ বসুর জগদ্দল নিয়ে তাদের আড্ডায় খুবই উত্তেজনা। শালিনীর কাছে বইটা আছে, বলেছে তাকে পড়তে দেবে।

গল্প, কবিতা, উপন্যাস বা সিনেমা নিয়ে কোনো আলোচনা হলে, তার ভূমিকা হয়ে যায় নিছক শ্রোতার। নিজেকে নিয়ে সে তখন ভীষণ লজ্জায় পড়ে যায়। কিন্তু আলোচনাগুলো শুনতে তার খুবই ভাল লাগে, মনে হয় এক অন্য ধরণের আনন্দের রাজত্বের কথা বলা হচ্ছে, যে জগতে তার এখনও প্রবেশাধিকার নেই। হয়তো কোনোদিন এই অধিকার সে পাবে, কিন্তু সে দিন কত দূরে তা সে জানে না।

বন্ধুদের সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের 'সিটি লাইট' দেখে সে সমানভাবে সবার মতো উচ্ছ্বসিত হতে পেরেছিল। আবার মৃণাল সেনের 'কোরাস' দেখে সে ভীষণ বোর হয়েছে। তার সব সময় মনে হয়, যে কোনো একটা বিষয় বন্ধুরা দেখতে পায় অনেক গভীর পর্যন্ত, কিন্তু সে বড় জোর তার বাইরের আবরণটুকু বুঝতে পারে।

মেট্রোতে 'সানফ্লাওয়ার' দেখে বেরিয়ে শালিনী আর শুভর তুমুল ঝগড়া। হল থেকে বেরিয়ে শুভ একটা চারমিনার ধরিয়ে মন্তব্য করল,-'অসহ্য'। সে হাঁটছিল দলটার একদম পেছনে। শেষ দিকে হলে বসে তার পক্ষে কান্না চাপাটা প্রায় কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। 'পথের পাঁচালি'র পর এই প্রথম একটা সিনেমা দেখে সে প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। বন্ধুরা কী মনে করবে, এই ভয়ে সে তার কান্না আপ্রাণ চেষ্টায় চেপে রেখেছিল। কিন্তু হল থেকে সে বেরিয়েছে একটা বৃষ্টিভেজা ভারী-ভারী মন নিয়ে। শুভর এই 'অসহ্য' কথাটা এতই আচমকা, সে প্রায় হতভম্ব হয়ে গেল। এ ব্যাপারটা নিয়ে শুভর সঙ্গে তর্ক করার সাহস তার নেই। শালিনী খুব নরম গলাতে বলল, 'শুভ' তুই ঠিক বলছিস না।'

শালিনীর দিকে না তাকিয়েই শুভ বলল, 'তোর অন্য কিছু মনে হতেই পারে, কিন্তু আমার কাছে গোটা ব্যাপারটাই অসহ্য। একটা চরম অপরাধকে আড়াল করার জঘন্য চেষ্টা ছাড়া কিছুই না।'

শুভর এই মন্তব্যের কোনো মাথামুণ্ডুই সে বুঝতে পারল না। কোনটা 'চরম অপরাধ', কেই বা তা আড়াল করছে—কোনোটাই সে ধরতে পারল না। একজন ইতালিয়ান, যে তার বউকে অসম্ভব ভালবাসে, যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মারাত্মক আহত অবস্থায় তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচায় একটি রাশিয়ান মেয়ে। যুদ্ধ শেষ হয় কিন্তু সে আর ফেরে না। কিন্তু তার ইতালিয়ান স্ত্রী তাকে আপ্রাণ খুঁজতে-খুঁজতে এসে হাজির হয় রাশিয়াতে এবং আবিষ্কার করে, যার জন্য সে এতদিন অপেক্ষা করে আছে, যাকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে সারা পৃথিবী, সেই মানুষটির প্রাণ বাঁচিয়েছে যে রাশিয়ান মেয়েটি, তাকে বিয়ে করে পাকাপাকি ভাবে রাশিয়াতেই রয়ে গেছে। এর মধ্যে শুভ এত কিছু খুঁজে পেল কী করে?

শালিনী বলল, 'সোজা একটা ব্যাপারকে বড় জটিল করে ভাবাটা তোর অভ্যাস শুভ।'

'আসলে একটা সোজা ব্যাপারকে দেখেও না দেখাটা তোদের অভ্যাস। একজন

সোভিয়েত মেয়ে চোখের সামনে তার সব কিছুকে ধ্বংস হতে দেখেও সব অপরাধ ভুলে একজন ফ্যাসিস্ট সৈন্যকে ভালবেসে ফেলল? এর একটাই উদ্দেশ্য—ফ্যাসিস্টদের অপরাধকে আড়াল করা।'

'বাজে বকিস না শুভ। রাশিয়ানরা বইটার জয়েন্ট প্রোডিউসার। রাশিয়ানরা খারাপ কিছু পেল না, আর কলকাতায় বসে তোর চোখেই সব ধরা পড়ল।'

'এক্ষেত্রে একটাই কথা আমার বলার আছে। এখনকার রাশিয়ানদের চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে এমন কী রাশিয়াকেও দেখতে আমরা রাজি নই।'

'ফ্যাসিস্টদের মধ্যে একজন অনিচ্ছুক মানুষ থাকতে পারে না? ফ্যাসিস্টদের মধ্যে সবাই হিটলার বা মুসোলিনি?' শালিনী যথেষ্ট রেগেছে। 'রাজনীতি বাদ দিয়ে একজন ভালবাসতে পারে, এই সহজ কথাটা যে বোঝে না, সে মানুষকে বোঝে না, ভালবাসা বোঝে না এবং আমার ধারণা রাজনীতিও বোঝে না।'

রেগে গেলে তুমি বলাটা শুভর অভ্যাস।

'না-না শালিনী, বিষয়টা তুমি গুলিয়ে দিও না। যে কোনো মানুষ যে কোনো মানুষকে ভালবাসতেই পারে। তাতে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সিনেমা বা সাহিত্যে যখন একটা চরিত্র দেখানো হচ্ছে, তখন ধরে নিতে হবে তার মধ্যে তার মতো সমস্ত চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে। তুমি পৃথিবীর যে কোনো বড় সাহিত্য দেখো, সেক্সপিয়ার থেকে সোমেন চন্দ, এই বিষয়টা থাকবেই।'

'আমি তোর সঙ্গে একমত নই।'

'আমার সঙ্গে একমত হতে হবে না, অন্তত গোর্কির সঙ্গে একমত হও। আর তা যদি না হও, তাহলে তোমার সঙ্গে আলোচনা করতে আমি রাজি নই।'

এরপর তর্কটা এমন জায়গায় চলে গেল, যার সঙ্গে তাল রাখা তার কর্ম না। হাজারটা উপন্যাস নাটক, সিনেমার আর লেখকদের নাম বৃষ্টির মতো পড়তে শুরু করল। যেগুলো পড়া দূরে থাক, অধিকাংশের নামই সে কোনোদিন শোনেনি।

দুপুরবেলা এসপ্ল্যানেডের ফুটপাতে যথেষ্ট ভিড়, একসঙ্গে পাশাপাশি এতজন হাঁটা যায় না। সে কিছুটা পিছিয়ে হাঁটছিল, পাশে গায়ত্রী। গলাটা নামিয়ে সে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর কেমন লাগল?' গায়ত্রী মাথা নীচু করে হাঁটছিল, মাথা না তুলেই বলল, 'ভাল লেগেছে'।

গায়ত্রীর উত্তরে সে আশ্বস্ত হয়, অন্তত গায়ত্রী তার মতোই ভেবেছে।

এই আলোচনাগুলোর সময় গায়ত্রীও মাঝেমাঝে কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়, গায়ত্রীকে দেখে সে তখন বিস্মিত হয়। বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের নাম সে কখনও শোনেইনি। গায়ত্রী কেবল নামটাই জানে না, তার কবিতাও জানে। ননীমাধব দে লেনের সীমাবদ্ধ আকাশে টিউশন, দুবেলার রান্না, মায়ের বেডপ্যান আর বাবার চশমা খুঁজতে খুঁজতে গায়ত্রী কখন এই আলোকিত জগৎটায় ঢুকে পড়ল তা সে জানতেই পারেনি। কলেজে ঢোকার পর, যাতায়াতের পথে আর ক্যান্টিনের আড্ডায় সে নতুন করে গায়ত্রীকে আবিষ্কার করছে। সে ভাবার চেষ্টা করে, তিশি কি কবিতা পড়ে?

শুভ তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পড়াশুনো করে, সে নিজে শুভর গুণমুগ্ধ। সহপাঠী

হলেও সে সবসময় বিনাবাক্যে শুভর কথা মেনে নেয়। কিন্তু আজ শালিনীর সঙ্গে শুভর তর্ক শুনতে শুনতে সে ভাবছিল, বেশি জানা কি মানুষকে জটিল করে দেয়? 'সানফ্লাওয়ার' দেখার পর অন্তত একবারের জন্য তার মনে হল, শুভর মতো অত কিছু না জানাটা বোধহয় একদিকে ভাল, সহজ জিনিসকে সহজ করে বোঝা যায়।

শালিনী বলল, 'কলেজ ম্যাগাজিনে দে না তোর লেখাগুলো, সবাই পড়ুক'।

শুভ গৌতমের দিকে তাকিয়ে নাটকীয়ভাবে বলল, 'বলে কী রে! কলেজ ম্যাগাজিন? এ তো মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই 'দেশের সুস্থিতি ভঙ্গকারী বিদেশী চর'। একথা জানে না ৭২-এর পর থেকে আমরা এসব আবর্জনা বর্জন করেছি।'

'আহা, ম্যাগাজিন ফান্ডে টাকা দিই না?' ঝাঁঝিয়ে উঠল শালিনী।

গলাটা একদম নামিয়ে গৌতম বলল, 'ম্যাগাজিন ফান্ড কি ম্যাগাজিনের জন্য রে পাগল? ওটা রাত নটার পর কালীঘাটে 'জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ' চালানোর জন্য। আর তুই যদি খুব চাপাচাপি করিস তবে একটা ম্যাগাজিন বার করতে পারে। তার কভারে থাকবে 'এশিয়ার মুক্তি সূর্যে'র ছবি, ভেতরে বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা কেলে মন্টুর আত্মজীবনী, আর ব্যাক কভারে—কথা কম কাজ বেশি।'

হাসল সবাই, কিন্তু সাবধানে, যাতে হাসিটা অন্য টেবিলে না পৌঁছয়।

গায়ত্রী বলল, 'অত ঝামেলার কী দরকার। আয় না আমরাই একটা ম্যাগাজিন বাব করি।'

শুভ বলল, 'তুই এডিটর হবি, যাতে পুলিশ এসে তোকে ধরে।'

'অ্যারেস্ট হবার যোগ্যতা কি একমাত্র তোরই আছে?', শুভর চোখের দিকে চোখ রেখে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল।

কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে শুভ বলল, 'সরি গায়ত্রী, আমি এভাবে বলিনি। আয়াম জাস্ট জোকিং। তবে তোর আইডিয়াটা ভাল। ইন ফ্যাক্ট আমি নিজেও কয়েক দিন থেকে এরকম একটা কথা ভাবছিলাম। শুধু বসে-বসে গেঁজিয়ে কোনো লাভ নেই। তবে চাইলেই তো আর ম্যাগাজিন বার করা যায় না। টাকা-পয়সা লাগে, একটা অর্গানাইজেশন লাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা এই সময় একটা ম্যাগাজিন বার করার অনেক রিস্ক আছে—কজন সে রিস্ক নিতে রাজি আছে?

শালিনী রীতিমতো উত্তেজিত, 'রাখ তো ওসব, চ আমরা বার করব। আর আমি আগেই বলে রাখছি, আমি ম্যাগাজিনের ফিল্ম ক্রিটিক হব। 'দিবা রাত্রির কাব্য' দেখে আমার একদম মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভাব, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আর অঞ্জনা ভৌমিকের চন্দ্রকলা নাচ! আরে ওর থেকে তো রবীন্দ্রজয়ন্তীতে পাড়ার বাচ্চাগুলো ভাল নাচে।'

'আর ঠিক এর জন্যই ম্যাগাজিনগুলো বেরোনোর আগেই উঠে যায়।', শালিনীর দিকে ইঙ্গিত করে গৌতমের মন্তব্য।

'জীবনে তো গুড ফর নাথিং কিছু মন্তব্য করা ছাড়া আর কোনো কাজই তোকে দিয়ে হল না।', শালিনীর জবাব।

শুভ খুব কড়া করে গৌতমের দিকে তাকাল, 'গৌতম শালিনীর পেছনে লাগিস না। শালিনী আমাদের ম্যাগাজিনের ফিনান্সার হবে। ও যা লিখতে চায় লিখতে দে।'

'আমি ফিনান্সার? কোথায় ঠিক হল রে? তোমরা সব আঁতলামো করবে, আর তা

ছাপানোর পয়সা আমি দেব?'

'আহা শালিনী রাগ করিস না। তুই ছাড়া আমাদের আর কে আছে বল? তোর বাবা এত বড় আই এ এস অফিসার, কত মাইনে, তার ওপর আবার উপরি।'

'শুভ খুব খারাপ হবে, কথায়-কথায় বাবা তুলবি না।'

'তোলবার মতো বাবা তো তোরই একমাত্র আছে। ঠিক আছে, তোর যখন আপত্তি তখন মেসোমশাইকে বাদ দিচ্ছি। কিন্তু বল, প্রতি শনিবার আই আই টি থেকে তোর নামে নীল খামে চিঠি আসে। তুই দু-দিনের জন্য আমাদের মধ্যে এসেছিস, এরপরই তো বরের গাড়ি করে চলে যাবি। আমাদের কি আর তোর মনে থাকবে? তাই বলছিলাম ভবিষ্যতের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়দের একটু সাহায্য তোর করা উচিত।'

শালিনীকে রাগানোটা তাদের একটা নিয়মিত কাজ। এতক্ষণ সে চুপ করেই ছিল, সুযোগটা হাতছাড়া না করে সে বলল, 'আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হব, আর অঞ্জনা ভৌমিকের বদলে চন্দ্রকলা নৃত্যটা তুই করবি।'

'একটা থাপ্পড় মারব চাঁদু। এই যে শুভ, আমি বলে দিলাম টাকা দেবার কথা ভাবব একটা কন্ডিশনেই, ম্যাগাজিনে চাঁদুর কোনো লেখা থাকবে না।'

'চিরকাল আমার কপালটা খারাপ, বলল গৌতম আর তুই রাগ করলি আমার ওপর। তবে তোর প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত। আমি তো এমনিতেই লিখব না। আমি হব ম্যানেজার।'

শুভ বলল, 'শালা আমাদের পুলিসে ধরবে আর তুমি ফাঁকতলে কেটে যাবে, ও সব ধান্দা ছাড়।'

সে আঁতকে উঠল, 'তুই পাগল শুভ, আমি লিখব? বাংলায় পাস মার্ক পাবার মতো রচনা লেখা পর্যন্ত আমার দৌড়। আমারে পেটে বোমা মারলেও কোনো লেখা বেরোবে না।'

ঝাঁঝিয়ে উঠল শালিনী, 'তুই কোথাকার কে রে, যে তোকে একদম নোবেল প্রাইজ পাবার মতো লেখা লিখতে হবে? আর তোরা বাঙালি যুবক, তোদের নাকি গোঁফ গজানোর সঙ্গে-সঙ্গে কবিতা বেরোয়। তোর তো ভালই গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে। আজ রাত থেকেই কবিতা লেখা প্র্যাকটিস করবি।'

'হিসেবে তোর ভুল হল শালিনী', বলল গৌতম, 'বাঙালি যুবকের শুধু গোঁফ গজায় না, সঙ্গে-সঙ্গে প্রেম গজায়। কবিতার সঙ্গে গোঁফের কোনো ডায়রেক্ট সম্পর্ক নেই। আমি অনেক মাকুন্দ কবিকে জানি। কবিতার সঙ্গে ডায়রেক্ট সম্পর্ক হল প্রেমের। কিন্তু আমাদের চাঁদু তো ফিজিকালি ফিট, বাট মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড্। ওর গোঁফ গজিয়েছে কিন্তু প্রেম গজায়নি। মেয়ে দেখলে ওর ঠ্যাং কাঁপে, মেয়ে দেখলেই ওর ভক্তিভাব আসে, মাতৃভাব আসে।'

আক্রমণই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়, 'দেখ গৌতম বাতেলা মারিস না, তোর মতো এখানে-ওখানে হাফ্‌সোল খেয়ে আসার থেকে প্রেম না করা অনেক ভাল।'

'তুই এসব বুঝবি না চাঁদু, নাদান আছিস। প্রেমের জগতে 'ফেইলিওর ইস্ দ্য পিলার অব্ সাকসেস', তোর সাহস থাকলে একবার প্রেমে পড়। না হয় এক্সপেরিমেন্টালি শালিনীর প্রেমেই পড়। আই আই টি অনেক দূরে, কেউ জানতে পারবে না।'

শালিনী হাসল খিলখিল করে, 'ঠিক আছে চাঁদু প্রেমে পড়া পর্যন্ত তোকে আমি অ্যালাও করব, কিন্তু তার বেশি না।'

গৌতম আবার যোগ করল, 'ওতে আরো ভাল হবে। কে না জানে ব্যর্থ প্রেমেই কবিতা আরো ভাল জমে। দেখ না, আয়ান ঘোষের লিগালি ম্যারেড বউয়ের সঙ্গে কেষ্ট ঠাকুরের ব্যর্থ প্রেম, এই এক সাবজেক্ট নিয়ে গোটা দেশ দু-হাজার বছর ধরে কবিতা লিখে যাচ্ছে।'

সবাই হাসল হো-হো করে, কেবল গায়ত্রী হাসল কি না সেটা সে বুঝতে পারল না। গায়ত্রী আর সে পাশাপাশি বসে আছে। গায়ত্রী হেসেছে কি না সেটা দেখতে হলে ঘুরে গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকাতে হয়। তার কেমন জানি ভীষণ লজ্জা লাগল।

এরা তো জানে না, গায়ত্রীও জানে না—প্রতিটা রাত জুড়েই সে থাকে এক প্রেমের রাজ্যে, এক কবিতার রাজ্যে। সেখানে প্রবেশাধিকার কেবল তার আর তিশির। মাটি পর্যন্ত এলানো সাদা লেসের পোশাকে সর্বাঙ্গ মুড়ে একটা মেঘের চালচিত্র নিয়ে তিশি নীরবে নেমে আসে। তিশির প্রতিটি পদক্ষেপ তার জানা। হালকা গোলাপি নিটোল তিশির পায়ের পাতাটাও সে চেনে, জানে তার স্পর্শ, জানে তার স্বাদ। কিন্তু এ কবিতা লেখার ভাষা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু আজ সকালে ভীড়ে ঠাসা প্রাইভেট বাসে গায়ত্রীর ছাপা শাড়িতে ঢাকা শীর্ণ গলা আর পিঠ—এই কবিতার ছন্দপতন? নাকি নতুন কবিতা, রাতটাই ছন্দপতন? সে জানে না।

ফেরার পথে গায়ত্রীর তাড়া থাকে। কলেজ থেকে ফিরে রাতের রান্না করে আবার টিউশনিতে ছুটতে হয়। বাসে ভিড়ও ছিল না। গায়ত্রী লেডিস সিটে, আর সে কনডাক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে। ওদের বাড়িতে ঢুকবার মুখে গায়ত্রী বলল, 'এক মিনিট দাঁড়া চাঁদু, তোকে একটা জিনিস দেব।'

সে দাঁড়াল গায়ত্রীদের বাড়ির সামনে। এই সময় গায়ত্রীর বাবা রোয়াকে বসে থাকেন। তাকে দেখা মাত্র ধরলেন, 'হাতে করে কী নিয়ে যাচ্ছিস রে চাঁদু?'

এই হল মেসোমশাইয়ের বাতিক। রাস্তা দিয়ে যেই যাক, তাকে ধরে এই একই কথা জিজ্ঞাসা করেন। তারা বন্ধুরা যখন দল বেঁধে সামনে দিয়ে যায়, মেসোমশাইকে খেপানোর জন্য তারা চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে, আমার হাতে কী আছে কাউকে বলব না। রেগে গিয়ে মেসোমশাই বিড়বড়ি করে বলেন 'বলবি না তো বলবি না, আমি কি তোদের জিজ্ঞাসা করেছি'। আজকে অবশ্য বেশিক্ষণ তাকে মেসোমশাইয়ের সামনে দাঁড়াতে হল না। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে গায়ত্রী বেরিয়ে এল হাতে খবর কাগজের মলাট দেওয়া একটা বই নিয়ে। 'বইটা পড়িস, প্রথমবার যদি পড়ে ভাল না লাগে তবে আর একবার পড়িস, দেখবি ভাল লাগবে।'

'খুকু ওকে কী দিলি?', মেসোমশাই ভীষণ উত্তেজিত।

'কিছু না একটা অঙ্কের বই', বলেই গায়ত্রী বাড়ির ভেতরে। আর মেসোমশাইকে কোনো সুযোগ না দিয়ে সে দ্রুত পা বাড়ায়।

রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে সে পাতা উল্টে-পাল্টে বইটা দেখে—একটা কবিতার বই, নাম 'বাবরের প্রার্থনা', কবির নাম শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষের নামটা তার চেনাচেনা, কলেজের আড্ডায় হয়ত শুনেছে, কিন্তু 'বাবরের প্রার্থনা' এটা সে এই প্রথম দেখল। আজকের

ক্যান্টিনের আড্ডার ফল এটা। তার অসহায়ত্ব একমাত্র গায়ত্রী বোঝে।

হঠাৎ মনে হল, সেও যদি গায়ত্রীর হাত ধরে এক বার বলতে পারত, 'গায়ত্রী, তুই খুব ভাল মেয়ে', তাহলে তারও বোধহয় ভাল লাগত। আসবার সময় সে দেখেছে, গায়ত্রীদের জুঁইগাছে অল্প-অল্প ফুল ফুটেছে।

বাড়ি ঢুকতে-ঢুকতে কানে গেল মা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। রান্নাঘরের সামনের চাতালটায় ছোট বসে আছে, গোটা হাঁটুটা রক্তে মাখামাখি। মা বোধহয় ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে রক্তটা মুছবার চেষ্টা করছে, সঙ্গে চিৎকার। কিন্তু যার জন্য চিৎকার সে চুপ, মুখে ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই। মায়ের চিৎকার থেকে বিষয়টার কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, মারপিট করতে গিয়ে ইটের ওপর পড়ে গিয়ে এই কাণ্ড। ছোট চিরকালই কিছুটা চুপচাপ। কিন্তু বোধহয় একই ঘরে থাকার কারণে তার সঙ্গেই ছোট কিছুটা কথাবার্তা বলত। কিন্তু ছোটটা যত বড় হচ্ছে, তার সঙ্গেও কথাবার্তা কমে আসছে। বোঝা যাচ্ছে ছোট বড় হচ্ছে। ক্লাস নাইনটা বড় কথা নয়। জুলফির নীচের চুলগুলো ক্রমশ শক্ত হচ্ছে, ঠোঁটের ওপরে রেখাটা আরো কালো হয়ে আসছে। কী করে যেন ছোটটার চেহারা তার থেকে অনেক ভাল, এখনৌ লম্বায় তাকে ছাড়িয়ে গেছে। আগে মাঝে-মাঝে তাকে বলে তার সার্টগুলো পরত ছোট, এখনো পরে তবে না বলেই। অবশ্য তুলনামূলকভাবে ভাল যে দু-একটা সার্ট, সেগুলো নেয় না।

রক্তের পরিমাণ দেখে সেও কিছুটা ঘাবড়ে যায়। উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী রে, কী করে হল?'

ছোট কোনো উত্তর দেয় না। মা-ই বলে, 'কী করে আর? মাস্তানি করতে গিয়ে। সারাদিন একটাই তো কাজ।'

মা পুরনো কাপড় দিয়ে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলে ছোট উঠে দাঁড়ায়, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাটা ফেলে। মা তাকে বলে, 'চাঁদু, ওকে হেম ডাক্তারের ওখানে নিয়ে গিয়ে একটু টিটেনাস দিয়ে দে না, কোনো নোংরায় গিয়ে এভাবে পাটা কেটে এসেছে।'

'কোনো দরকার নেই' বলে ছোট ঘরে ঢুকে যায়, শুরু হয় মায়ের আর এক প্রস্থ চিৎকার।

হাত-মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখে, রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে থালা নিয়ে ছোট রুটি-তরকারি খাচ্ছে। খাওয়া শেষ হলে থালাটা রান্নাঘরের সামনে রেখে প্যান্টে হাত মুছতে-মুছতে ছোট বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে, মা বলে উঠল, 'চললেন বাবু রাজ্য জয় করতে।'

বিকেল আর দুপুরের মিলেমিশে যাওয়া এই সময়টাতে তার ঘরের লাগোয়া পুবের দিকে ছোট বারান্দায় গিয়ে বসা যায়। সারা সকাল রোদে পুড়ে বারান্দাটা দুপুর থেকে ছায়ায় বিশ্রাম করে। আর নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এমনিতেই রোদের তেজ অনেক কম।

'বাবরের প্রার্থনা' নিয়ে সে এসে বসল বারান্দায় রাখা কাঠের চেয়ারে। বইটার আগাগোড়া শুধু কবিতাই। এতগুলো কবিতা সে পড়ে উঠতে পারবে, এ ভরসা তার নেই। কারণ আধুনিক কবিতার কোনো মাথামুণ্ডু আছে বলে তার মনে হয় না। প্রথম থেকে না মাঝখান থেকে, কোথা থেকে শুরু করবে এটাই সে ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

রান্নার কাজ সেরে মা যে কখন এসে তার চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সে টের পায়নি।

'কী পড়ছিস রে চাঁদু?', মার কথাটা শুনে সে প্রায় চমকে উঠেছিল। যেন নিষিদ্ধ কোনো কাজ করছে এভাবে থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে সে বলে উঠল, 'কিছু না মা, একটা কবিতার বই।'

বিকেলের আলোর মতো একটা সুন্দর হাসিতে মার মুখটা আলোকিত হয়ে গেল। কোনো হারিয়ে যাওয়া প্রিয় জিনিস বহুদিন পরে খুঁজে পেলে মানুষ বোধহয় এভাবে হাসে।

'তুই কবিতার বই পড়ছিস? আগে কখনও দেখিনি তো?'

সত্যি কথা বললে বলতে হয়, সে এখনো পড়েনি, সবে পড়বে কি না ভাবছে। কিন্তু সত্যি কথা বললে যদি আলোর মতো হাসিটা হারিয়ে যায়, তাই সে কথাটার কোনো উত্তর না দিয়ে মাথাটা পেছনের দিকে হেলিয়ে মার বুকে মাথাটা ঠেকিয়ে গভীর ভাবে শ্বাস নিয়ে মার গন্ধটা নেবার চেষ্টা করল।

'পড় কবিতা পড়, দেখবি ভাল কবিতা পড়লে মনটা খুব ভাল থাকে।'

' মা তুমি ছোটবেলায় কবিতা পড়তে?'

'আমাদের গ্রামে তো এ সবের চল বিশেষ ছিল না। কিন্তু আমাদের জ্যাঠতুতোদাদা, তোরা অবশ্য তাকে দেখিসনি, নানা রকমের কবিতার বই, প্রবাসী, ভারতবর্ষ এই সব কলকাতা থেকে আনাত। সেগুলো পড়তাম। তারপর একবার ঠিক হল, পুজোর সময় আমরা সবাই নটীর পূজা করব। দাদাই সব আমাদের শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছিল। রিহার্সাল টিয়ার্সাল দিয়ে আমরা সব তৈরি। বেঁকে বসল আমাদের ঠাকুমা, 'কী ঘরের মাইয়ারা সবার সামনে নাচব? কিছুতেই না'। আর আমাদের বাড়িতে ঠাকুমাই শেষ কথা। আমরা কেঁদে কেটে একশা, দাদা রাগ করে দু'দিন খেলই না, কিন্তু কিছুতেই ঠাকুমাকে রাজি করানো গেল না। আমি আর তোর মেজমাসি আমরা দুজনে খুব কবিতা পড়তাম। এখনো মনে আছে—

'যখন ডাকিলে তুমি কুঞ্জবনে
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল,
জানি না কী ভাবছিলে অন্যমনে,
তোমার দুয়ার কেন বন্ধ ছিল?'

'আচ্ছা মা, আজকাল তো তুমি আর কবিতা পড় না?'

'দূর পাগল, এখন কী আর সে সব করা যায়, আর সব বোধহয় ভুলেই গেছি।'

'তাতে কী হয়েছে, পড়লে আবার সব মনে পড়বে। ভাল যখন লাগে তখন পড় না কেন?'

'কে এনে দেবে বল? তোর বাবাকে তো আর বলা যাবে না—কবিতার বই এনে দাও। এখন তুই বড় হয়েছিস, এক এখন তোকে বলতে পারি। কিন্তু এখনকার কবিতা আর ভাল লাগবে না। আসলে সব কিছুরই তো একটা সময় থাকে। রান্নার হাঁড়ি ঠেলতে-ঠেলতে আমার সে সব সময়গুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল।'

এত তাড়াতাড়ি বিকেলের আলোটাকে মুছে দিতে সে চায় না। মরিয়া হয়ে সে বলল, 'না-না, আমি তোমাকে কবিতার বই এনে দেব।'

'এই রে ডাল বসিয়ে এসেছিলাম, বোধহয় পোড়া লাগল।' মা ছুট লাগাল রান্না ঘরের দিকে।

প্রথম যে কবিতাটা সে বাছল, তার নাম : 'ধ্বংস করো ধ্বজা'। শব্দগুলো চেনাচেনা,

কথাগুলো চেনাচেনা, কিন্তু কবিতাটা ধরাছোঁয়ার বাইরে। পরের কবিতা সে বাছল, 'পুরোনো গাছের গুঁড়ি'। গোটা বিষয়টা আগের মতো। 'সেদিন অনন্ত মধ্যরাত'—কবিতাটা পড়ে সে কিচ্ছু বুঝল না। 'পথের বাঁকে'—প্রথম একটা কবিতা যার একটা মানে সে বুঝতে পারল। কিন্তু একটা পুরনো গাছের আত্মকথা ছাড়া অন্য কোনো অর্থই সে এই কবিতা থেকে খুঁজে পেল না। কবিতাটা কেনই বা ভাল লাগবে, কেনই বা খারাপ লাগবে? গায়ত্রী বলেছে, প্রথমবার পড়ে ভাল নাও লাগতে পারে। 'জীবনবন্দী'—আবার কিছু বোঝা গেল না। পরের কবিতা যেটা সে বাছল, সেটার নাম দেখেই সে বাছল। বইটার যা নাম, কবিতাটারও সেই নাম : 'বাবরের প্রার্থনা'। প্রথম চারটে লাইন সে পড়ল খুব মনোযোগ দিয়ে। এই প্রথম কবিতার কয়েকটা লাইন তার কল্পনায় একটা ছবি এঁকে দিল। দিগন্তজোড়া প্রান্তরে এক বৃদ্ধের নামাজের দৃশ্য, হাওয়ায় উড়ছে তাঁর সাদা দাড়ি। বৃদ্ধের সব আছে কিন্তু তার সঙ্গে আছে এক সর্বব্যাপী রিক্ততা। পরের লাইনগুলোর মানে সবটা সে ধরতে পারেনি। কিন্তু সে অনুভব করে কবিতার প্রাণের খুব কাছে সে চলে এসেছে। কিন্তু খুব ঠিকভাবে সে সেটা ধরতে পারছে না। সেটাকে খুঁজে পাবার জন্য গোটা কবিতাটা সে এক নিশ্বাসে শেষ করেছে। যা খুঁজছিল তা সে খুঁজে পায়নি, কিন্তু এই প্রথম পেয়েছে কবিতা পড়ে ভাল লাগার অনুভূতি।

পরের কবিতা সে বাছল—'কিছু না থেকে কিছু ছেলে' 'বাবরের প্রার্থনা' বোধহয় দুর্বোধ্যতার পর্দাটা সরিয়ে দিয়েছে। সে কবিতাটা বোঝে, অনুভব করে এবং কবিতাটার সঙ্গে একমত হয়। কিন্তু 'হাসপাতালে বলির বাজনা'র ভেতরেই সে নিজেকে আবিষ্কার করে। এ কবিতা তার অসীমদাকে নিয়ে লেখা। বহুদিন পরে তার মনে পড়ল, অসীমদা যেদিন চলে গেল, সে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে সে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল।

'চাপ সৃষ্টি করুন'—একদম সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, কী করা উচিত, কোন দিকে যাওয়া উচিত। কবিতা এখানে যেন শাসন করার চাবুক। হঠাৎ তার মনে হল, প্রথম যে কবিতাটা পড়েছিল সেই কবিতাটায় আবার ফিরে যাওয়া দরকার।

'ধ্বংস করো ধ্বজা' যেন তার জন্য দরজা খুলে রেখেছিল।

'আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
এখনই
বলতে চাই, চুপ

তবু
বলতে পারি না। আর তাই
নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।'

এ তো 'চাপ সৃষ্টি করুন' নয়। একজন মানুষ, তার যা বলা উচিত, তার যা করা উচিত, তা করতে না পেরে নিজের অসহায়ত্বে নিজে রক্তাক্ত হচ্ছে। এ তো তার নিজের কথা। তাহলে কি এই আলাদা-আলাদা কবিতাগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে? পরম্পরা আছে, আছে নীচ থেকে ওপরে ওঠার কথা। 'ধ্বংস কর ধ্বজা' থেকে 'চাপ সৃষ্টি করুন', এ তো হাজার মাইল পার হয়ে আসা। তার আর অসীমদার মধ্যে যতটা দূরত্ব, এই দুটো কবিতার

মধ্যে ফারাক ঠিক ততটাই।

সে তখন নিজেই এক কলম্বাস—একটা নতুন মহাদেশের সামান্য আভাস পেয়েছে। পরের যে কবিতাটা সে পড়ল, তার নাম, "মার্চিং সং"। কিছু কথা তারা বন্ধুরা যখন আলোচনা করে, আলোচনা করার আগে তারা একটু দেখে নেয় আশেপাশে কেউ আছে কি না। তখন তারা কথা বলে যথাসম্ভব গলাটা নামিয়ে। কারণ সবার স্মৃতিতেই অন্তুদের দেওয়ালে রক্তমাখা হাতের ছাপ, মাঝরাতে সি. আর. পির বুটের আওয়াজ, চাঁদা না দেওয়ায় পাড়ার প্রৌঢ় মেসোমশাইয়ের বেধড়ক মার খাওয়ার দৃশ্যের টুকরো, মোড়গুলোতে সন্ধেবেলার যুগ যুগ জিও অন্ধকার, একটা পাথরের নীচে চাপা থাকার অনুভূতি। ওরা সবাই জানে এ সব নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করাটা নিরাপদ নয়। পুলিস তুলে নিয়ে যাবার পর ফিরে না আসার গল্পগুলো ভয়ানক বিশ্বাসযোগ্যভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। পাড়ার আড্ডা হলে শম্ভুর কথায়, 'মা কালীর দিব্যি বলছি, কোনোদিন জামানা পাল্টাবে না...।', আর কলেজের ক্যান্টিনের আড্ডায় শুভর নীচু গলায় হুঁশিয়ারি, 'তৈরি থাক, মানুষ চিরকাল এভাবে মুখ বুজে থাকবে না'। এই সব কিছুই নীচু গলায় ঘনিষ্ঠদের মধ্যে চারিদিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলার কথা। আর "মার্চিং সং"-এ আরো বিপজ্জনক কথা বলা হয়েছে একটুও ভয় না পেয়ে, ব্যঙ্গ করে, অবজ্ঞা করে। কবির কী সাহস! গায়ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, এই শঙ্খ ঘোষ ভদ্রলোক কে? জেলে আছে না পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে? এইসব কবিতার জন্যই কি গায়ত্রী বইটাতে খবরের কাগজ দিয়ে মলাট দিয়ে নিয়েছে? কবিতাটার পৃষ্ঠাটা বন্ধ করে সে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিল, প্রায় একটা সহজাত সতর্কতামূলক ব্যাপার। আর ঠিক তখনই তার চোখে পড়ল, তিশি আসছে।

তিশি আসছে, গলির মোড় ছাড়িয়ে সোজা তার বারান্দার দিকে। ওদের বাড়িতে যাবার রাস্তাটা তাদের বারান্দার সামনে দিয়েই গেছে। নভেম্বরের প্রায় বিকেলের ননী মাধব দে লেন তার সমস্ত রঙ পাল্টে নিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। নিজের ভাগ্যকে সে নিজেই বাহবা দিল। কী ভেবে যেন খুলব-খুলব করেও গায়ের গেঞ্জিটা সে কলেজ থেকে ফিরে খোলেনি। যদি খুলে ফেলত তাহলে এক্ষুনি তাকে বারান্দা ছেড়ে ঘরে ফিরে যেতে হত ; তিশির সামনে সে মরে গেলেও খালি গায়ে বসে থাকতে পারবে না।

তিশিও আজ অন্য রকম, যেন অনেকটা বড় হয়ে গেছে। এই প্রথম সে তিশিকে শাড়ি পরতে দেখল। কমলা হলুদ রঙের চওড়া পাড়ের একটা হালকা সবুজ শাড়ি। এই শাড়িটা কি তিশির মার শাড়ি? যে নেপালি মহিলা তিশির সঙ্গে থাকে, সেও আজ সঙ্গে নেই। আজ তিশি একা। এ সময় এভাবে ফেরা মানে তিশি আজ স্কুলে যায়নি। সামনে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা, বোধহয় অন্য কোথাও পড়তে গিয়েছিল। হাত দিয়ে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরা একটা সাদা রঙের ফাইল। আর বিকেলের সূর্য তাদের ছাদ টপকে সোজা গিয়ে পড়েছে তিশির মুখের ওপর। প্রথমে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে, তারপর অন্য হাতটা কপালে ঠেকিয়ে সেই সূর্যকে সামলাবার চেষ্টা করছে বেচারা। এই শীর্ণ ভাঙাচোরা রাস্তার দু-প্রান্তের দুই বিন্দুতে সে আর তিশি, আর কেউ নেই।

কোথায় সে যেন পড়েছিল—চিন্তা হল আসলে এক ধরণের তরঙ্গ। একজনের চিন্তাতরঙ্গ অন্যের চিন্তার ওপর প্রভাব ফেলে। যারা হিপ্‌নোটাইস করে, আসলে তারা তাদের জোরালো চিন্তার তরঙ্গ দিয়ে অন্যের চিন্তা তরঙ্গকে নিস্তেজ করে দেয়। শালিনী একদিন

বলেছিল—একজন ছেলে আমাদের থেকে কী চায়, তাকানো দেখলেই আমরা বুঝতে পারি। এ সবই যদি ঠিক হয়, তবে তিশিকে তার এই ভীষণভাবে চাওয়াটা সেটা কী, তিশি অনুভব করে না? তাহলে তিশির দিক থেকে তার কোনো সাড়া নেই কেন? নাকি তার আর তিশির দুটো জগৎ এতটাই আলাদা, এক জগতের মনের ভাষা আর এক জগৎ বোঝেই না? কী করবে সে, এই ফাঁকা রাস্তায় বারান্দার রেলিং টপকে সোজা তিশির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, বলবে—দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। অসম্ভব, সে মরে গেলেও পারবে না। আর তিশি যদি বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে বলে—কী কথা? সে কী উত্তর দেবে? বলবে—আমি তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে না পেলে আমি বাঁচব না। এর থেকে হাস্যকর আর কিছু হয় না। তার থেকে চিন্তার তরঙ্গ দিয়ে যদি বলা যেত, যদি বলতে পারত—একবার তিশি এসে দাঁড়াক তার পাশে, তারপর সে গোটা দুনিয়াকে দেখে নেবে। তিশি কি কেবল এই ভাববে—সে একটা কেরানির ছেলে, তার নম্বর চারশ বাহাত্তর, সে অনার্স পায়নি, সে কোনো দিন আকাশি ফিয়াটে চড়বে না? আর, সে কর্নেল চ্যাটার্জির মেয়ে, মাই হেভেনের ওপরে তার ঘর? একবারও ভাববে না, সে কতটা ভালবাসতে পারে?

হঠাৎ তিশি একবার থমকে দাঁড়াল। দু-পা এগোল একটু-একটু খুঁড়িয়ে, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল। চটিটার থেকে পাটা বার করার চেষ্টা করছে তিশি। এখান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, পা আর চটির মাঝখানে কাঁকর কিংবা ইটের টুকরো ঢুকেছে। কিন্তু চটিটা স্ট্র্যাপ দেওয়া, সহজে টুকরোটা বেরোচ্ছে না। এক হাতে ফাইল, পাটা তুলে আর এক হাতে তিশি স্ট্র্যাপটা খোলার চেষ্টা করছে। এই কাজটা করতে-করতে তিশি তাকাল চারিদিকে, এবং তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সেই চোখে কোনো অহংকার নেই, আছে একটু লজ্জা আর অস্বস্তি। এই সময় পাশে কেউ থাকলে তার হাতে ফাইলটা ধরতে দিয়ে সহজেই স্ট্র্যাপটা খুলে ফেলা যায়। এবং এই মুহূর্তেই সে ভুলটা করল, বইটা হাত থেকে রেখে উঠে দাঁড়াল। সে যদি উঠে না দাঁড়াত, তাহলে তিশি মনে করত, সামনে আছে বলে সে ঘটনাটা দেখছে, এই পর্যন্ত। কেউ কখনো অপরিচিত কাউকে চটি খুলতে সাহায্য করার জন্য ছুটে যায় না। তিশি আর তার দিকে তাকায়নি। টুকরোটা বার করে তিশি যখন তার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একবারও মাথা তুলল না, বোধহয় তার সঙ্গে চোখাচোখি যাতে না হয়, তার জন্যই। তার মনে হল, সে যদি উঠে না দাঁড়াত তাহলে তিশি তার অস্বস্তিটাকে হালকা করতে তার দিকে তাকিয়ে একবার হাসতেও পারত, লজ্জাতেই হাসত। আর সে পেয়ে যেত গোটা ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

নিজেদের বাড়ির সামনে গিয়ে তিশি একবার লেটার বক্সে উঁকি দিল, তারপর গেট ঠেলে ভেতরে মিলিয়ে গেল, সঙ্গে নিয়ে গেল তার গোটা বিকেল এবং সম্ভবত সন্ধ্যাটাও।

এরপর শূন্য চোখে সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর কিছু করবার নেই। সামান্য যন্ত্রণায় কাতর তিশি ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে, যখন স্ট্র্যাপটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে খোলার চেষ্টা করছিল, ঘাড়টা সামান্য কাত করে তখন তিশির চুলটা এসে মুখের একটা দিক ঢেকে দিয়েছিল—এ রকম অসংখ্য ছোট ছোট টুকরো-টুকরো দৃশ্য তার চিন্তাকে ঘিরে অনবরত পাক খেয়ে যাবে। এগুলোই তার আনন্দের একমাত্র উৎস, এগুলো নিয়েই সে এতদিন বেঁচে আছে। আর এই টুকরো দৃশ্যগুলো এক সময় নিজেদের মিশিয়ে ফেলে, কখন যেন বাস্তবের বেড়া ডিঙিয়ে ছুটে পালায় অবাস্তবের প্রান্তরে। তখন আকাশের রঙ পাল্টে

যায়, সে নিজেও বোঝে না, কোনটা বাস্তব আর কোনটা কল্পনা। ননীমাধব দে লেন আর কলেজের ভিড়ে ঠাসা ক্লাসরুম থেকে সে তখন ছুটি নেয়। কারণ বাস্তবের মাটিতে সে কখনো তিশিকে পাবে না।

কিন্তু কতদিন সে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াবে। কতদিন সে একটা মানুষ দুটো জীবন একসঙ্গে কাটাবে? কাঠের ঘোড়ায় দুলতে-দুলতে রঙিন আকাশের নীচে নিজেকে নিয়ে হারিয়ে যাওয়া—সেই ছোটবেলায়। তারপর এতগুলো বছর কেটে গেছে, সে নিজেকে পাল্টাতে পারেনি, পাল্টাতে চায়ওনি। কিন্তু এই নভেম্বরের বিকেলে, আজকেই তার প্রথম মনে হচ্ছে, এই পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা অপরাধবোধ আছে। আজই হঠাৎ কল্পনার জগতের দরজায় দাঁড়িয়ে সে বিব্রত। সে যা চেয়েছে, কোনো দিনও পাবে না। বাস্তবে সে তা পাবে না বলে নিজের মধ্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে অন্য একটা জগৎ বানিয়ে নিয়েছে। সে আবার অনুভব করে কর্নেল চ্যাটার্জির প্রতি তার আছে একটা অসম্ভব তীব্র আকর্ষণ। তার চওড়া কবজির হাতটা অবহেলায় পড়ে থাকে স্টিয়ারিংয়ের ওপর, সাদা কলারের টি সার্ট, হালকা পারফিউমের গন্ধ—একটা আলোকিত দুনিয়ার মানুষ, যেখানে তার প্রবেশ নিষেধ। সে কেন তার যা চাওয়া তা জোরের সঙ্গে চাইতে পারে না? সে কেন অসীমদা বা শুভর মতো হয় না? 'বাবরের প্রার্থনা' পড়ে রইল অবহেলায়। 'হাসপাতালে বলির বাজনা' আর "মার্চিং সং" নেমে আসা সন্ধ্যায় বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতর থেকে ধাক্কা দিচ্ছে—'ধ্বংস করো ধ্বজা',

> 'আমি বলতে চাই, নিপাত যাও
> এখনই
> বলতে চাই, চুপ
>
> তবু
> বলতে পারি না। আর তাই
> নিজেকে ছিঁড়ে ফেলি দিনের পর দিন।'

এই প্রথম সে ফিরে তাকাল নিজের দিকে। তার সমস্ত সত্তায় তখন আগামী লড়াইয়ের আভাস। আজই প্রথম মোকাবিলা তার নিজের সঙ্গে নিজের। এই লড়াইয়ে তাকে নামতেই হবে, নামতে হবে গায়ত্রীর জন্যই। কী করে গায়ত্রীর সামনে গিয়ে সে দাঁড়াবে? সে তো অপবিত্র। যতক্ষণ না সে তিশিকে বিদায় দিতে পারছে, যতক্ষণ না সে তার রঙিন আকাশের জগৎকে দু-পায়ে মাড়িয়ে শেষ করে না দিতে পারছে, ততক্ষণ সে অপবিত্র।

কিন্তু তিশিকে বাদ দিয়ে সে কী করে বেঁচে থাকবে? তিশিকে বাদ দিয়ে গোটা দিনটা সে কাটাবে কী করে? তার যেটুকু আনন্দ, যেটুকু মুক্তি তা তো তিশিতেই—একে বাদ দিয়ে তার অস্তিত্বটাই তো অর্থহীন। গায়ত্রীকে সে ভালবাসতে পারবে, গায়ত্রী তার জীবনকে পরিপূর্ণতা দেবে। কিন্তু গায়ত্রী মানে তো রঙিন আকাশের জগৎকে চিরবিদায় জানানো। তা কী করে সম্ভব, তার নিজের আকাশ তো অসম্ভব বিবর্ণ। এই বিবর্ণতাকে সহ্য করার ক্ষমতা গায়ত্রী তাকে দিতে পারে, আকাশকে রঙিন করতে পারে না। অথচ এভাবে বেঁচে থাকাটা বোকামি, যা প্রায় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। তাকে লড়াই করতে হবে। কিন্তু কী করে লড়তে হয়, তাও সে জানে

না। তার সমস্ত লড়াইও রঙিন আকাশের নীচে। একমাত্র গায়ত্রীই পারে তাকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিতে। সে চিরবিদায় জানাতে চায় তিশিকে। আর সে সম্ভাবনার কথা ভেবে সে ক্ষতবিক্ষত হয়, রক্তাক্ত হয়—সন্ধ্যাও ঠিক সময় হাজির হয় তার চোখের জলকে অন্ধকারের পর্দায় ঢেকে গোটা পৃথিবী থেকে আড়াল করতে। এক সময় সে ক্লান্ত হয়, তিশির ঘরে সাদা লেসের পর্দার ওপারে এক আলোকিত ঘরে পা পর্যন্ত লোটানো গোলাপি গাউন পরে তিশি পরীক্ষার পড়া পড়ছে, এ রকম একটা কল্পনার হাতে সে নিজেকে সঁপে দেয়। এমনকী গাউনের হালকা গোলাপি রঙের সঙ্গে তিশিব অনাবৃত হাতের বাকি অংশর রং মিশে গেছে সেটাও সে দেখতে পায়। সে বোঝে আজ সন্ধ্যায় সে হেরে গেছে। কিন্তু হেরেও সে তৃপ্ত, কারণ আলোকিত লেসের পর্দার ওপারে তিশি আছে। আব তিশি থাকলেই সে আছে। এভাবেই গত কয়েকটা বছর সে বেঁচে আছে।

রাতে খাবার পর সে আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। চারমিনারের প্যাকেট থেকে সাবধানে একটা সিগারেট বার করে ঘরের দিকে পিঠ করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরায়। তারপর মুখ তুলে তাকায় তিশির ঘরের দিকে—সেখানে এখনো আলো জ্বলছে। তিশি শুয়ে পড়লে একটা নীল রঙের ডিমলাইট জ্বলে, সেটা সে এখান থেকে বুঝতে পারে।

ছোট কখন এসে পেছন দাঁড়িয়েছে, সে খেয়ালই করেনি। কথাটা বলতে সে বুঝল ছোট তার পেছনে দাঁড়িয়ে। গত কয়েক বছবে ছোটর গলাটা অনেক ভারী হয়ে গেছে। 'পুলকদা বলেছে দেবব্রত সরকার বলে একজন তোর সঙ্গে কলেজে দেখা করবে, তার সঙ্গে রেগুলার যোগাযোগ রাখবি।'

প্রথমে সে কিছু বুঝতেই পারল না। বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন পুলকদা?'

ছোটর গলায় চাপা বিরক্তি, 'আমাদের পাড়ার পুলকদা, পুকুরপাড়ের।'

পুকুরপাড় বলা মাত্র সে ধরতে পারল। পুলকদা মানে তার বন্ধু তিলকের দাদা। কিন্তু সে তো পাঁচ বছর ধরে পাড়া-ছাড়া। তিলক বলে, তারাও জানে না পুলকদা কোথায় আছে। পুলকদা হায়ার সেকেন্ডারিতে বাংলায় লেটাব পেয়েছিল। আশেপাশের পাড়ার লোকেরাও এর জন্য পুলকদাকে চিনত। তিলকের কাছে শুনেছে, পুলকদার বাংলা টেস্টের দু-পেপারের খাতা নাকি স্কুলে এখনো রাখা আছে। কিন্তু ছোট পুলকদাকে পেল কোথায়? প্রশ্নটা করলে ছোট তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

তার প্রথম অনুভূতিটা অসম্ভব আনন্দের। পুলকদারা যখন পাড়া-ছাড়া হল, তখন সে ক্লাস এইটে পড়ে, একদম বাচ্চা ছেলে। কিন্তু পুলকদা তার কথা মনে রেখেছে। এত গুরুত্ব সে কখনো আশাই করেনি। তার ব্যাপারটার তাও মানে বোঝা যায়, কিন্তু ছোট? তার থেকে চার বছরের ছোট ভাই, এখনো প্রায় হাফ প্যান্টই পরে। একই খাটে তারা দুজন শোয়, কিন্তু সে তাকিয়ে দেখেনি ছোট কতটা বড় হয়ে গেছে। পুলকদার সঙ্গে ছোটর যোগাযোগ আছে, এবং যোগাযোগটা এমনই যে, সে জানতে চাইলেও ছোট তাকে জানাল না, পুলকদার সঙ্গে তার কোথায় দেখা হয়েছে।

তিশির ঘরে এখনো আলো জ্বলছে কি না সেটা না দেখেই সে ঘরে ফিরে আসে। কেমন যেন একটা ভাল লাগা, কেমন যেন একটা উত্তেজনা সে অনুভব করছে। রাতে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না।

চোখটা সবে লেগেছে। তার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল।

আওয়াজটা তার চেনা। ভেতর পর্যন্ত নাড়া দেওয়া একটা শব্দ, শব্দটার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর একটা অনুভূতি। এই প্লেনগুলো বোধহয় ওড়ে না, আকাশের ওপর দিয়ে গড়াতে-গড়াতে আসে, রক্তহিম করা একটা আওয়াজ করে। যে সব জায়গায় অ্যান্টি এয়ার ক্র্যাফ্‌ট কামান বা সারফেস টু এয়ার মিসাইল বিশেষ থাকে না, সেই জায়গায়তেই এই প্লেনগুলোকে ওরা পাঠায়। আর পাঁচটা যুদ্ধের প্লেনের তুলনায় এগুলো ওড়ে অনেক শ্লথ গতিতে। কিন্তু একটা প্লেনে মৃত্যুর এত উপকরণ থাকতে পারে, তা ভাবা যায় না। দেখতেও ভয়ঙ্কর—নাক থ্যাবড়া এক একটা অতিকায় হাঙরের মতো প্লেনগুলো যেন উড়ে আসে সরাসরি নরক থেকে। ওগুলোকে প্লেন না বলে গোলাবারুদের উড়ন্ত গোডাউন বলাই ভাল। একটা প্লেনই কয়েকটা গ্রামকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে। ওরা প্লেনগুলোকে ডাকে কালা কুত্তা বলে, কাগজে কলমে এগুলোর নাম এ ১০ থান্ডারবোল্ট।

গ্রামটার কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে গত কয়েক দিন ধরে তুমুল লড়াই চলছে। শত্রুরা ভেবেছিল কয়েকটা বিচ্ছিন্ন গেরিলা গ্রুপের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করছে, কিন্তু যখন ওরা বুঝেছে তাদের প্রস্তুতি অনেক বেশি, তখন যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু যুদ্ধের সামনে না থেকে ফ্রন্টলাইনের কয়েক কিলোমিটার পেছনে একটা নির্জন স্কুলবাড়িতে সে পড়ে আছে এক অদ্ভুত জ্বরের জন্য। প্রতিদিন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসছে, আর জ্বর যখন কমছে সে এতটাই কাহিল হয়ে পড়ছে যে হাঁটা-চলার ক্ষমতাও তার থাকছে না। এর জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ফ্রন্টের পেছনে। একজন বৃদ্ধ তার দেখাশুনা করে, একজন ডাক্তার তাকে দেখে যাবে এমন একটা কথা হয়ে আছে।

জ্বরটা কিছুক্ষণ আগে কমেছে। এই সময় তার নিজেকে মনে হয় শিরদাঁড়াহীন একটা মাংসপিণ্ড, সামান্য নড়াচড়ার ক্ষমতাও তার থাকে না। কিন্তু ভয়ঙ্কর আতঙ্ক তাকে বার করে এনেছে বাইরের উঠোনে। একটা কদাকার উড়ন্ত ছায়া তাকে অতিক্রম করে যাবার পর মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ল মাটিতে। তার প্রথম অনুভূতি—দুটো কানে তীব্র একটা যন্ত্রণা। যন্ত্রণাটা রইল, কিন্তু মুছে গেল তার শব্দের অনুভূতি। গোটা পৃথিবীটা হঠাৎ শব্দহীন হয়ে গেছে তার কাছে। মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় সে তাকাল সামনের দিকে। একটা শিরিষ গাছ আর ঝুপড়ি উঠোনটার ওপারে। যেন ওপরে থাকা কোনো দেবতার উদ্দেশে প্রণতি জানাতে শিরিষ গাছের পাতাগুলো সব একসঙ্গে মুখ তুলে ধরল আকাশের দিকে এবং পরমুহূর্তে গোটা গাছটা জ্বলে উঠল, আগুনও ঊর্ধ্বমুখী। একটা আগুনের গোলা মাথা তুলছে ঝুপড়িটার মাথা বরাবর। তারপর আগুন একদম নিঃশব্দে ঢেকে দিল গোটা ঝুপড়িটাকে। ঝুপড়ির চালটা ভেতর থেকে আসা একটা বাতাসের স্তম্ভের চাপে খুলে গেল। মাঝখান থেকে খড় অথবা অনুরূপ কোনো জিনিস আগুনকে সঙ্গে করে আকাশের দিকে ছুটে গেল। গোটাটাই শব্দহীন।

আগুনে ঢেকে যাওয়া ঝুপড়িটার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছেলেটা। সারা গায়ে ছোট ছোট আগুনের শিখা। শিখাগুলোর রঙও আলাদা, কিছুটা যেন নীল। পেট্রলিয়াম জেলিতে একটা জীবন্ত মানুষকে পুড়তে এই প্রথম সে দেখছে। ছেলেটা চেঁচাচ্ছে কি না তা সে বুঝতে পারছে না। ছেলেটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল উঠোনটার মাঝখানে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে

আবার উঠবার চেষ্টা করল। আর উঠতে গিয়ে ছেলেটা দেখতে পেল তাকে। তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে কী যেন একটা বলার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই চুলগুলো পুড়ে গেছে—মনে হচ্ছে গত শতাব্দির কোনো লোলচর্ম বৃদ্ধ। ছেলেটা মাটিতে ভর দিয়ে কিছুটা উঠল। এবার সে দেখল কেবল আগুন না, ছেলেটার পেটটা ফেটে গেছে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে লাল সাদা নাড়িভুঁড়ি। এই অবস্থায় ছেলেটা ঘষটে-ঘষটে তার দিকে এগিয়ে আসছে। সমানে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মাঠের ওপারে নারকেলগাছের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে আরো একটা প্লেন। সে মাটি থেকে উঠে ছুটল, প্রচণ্ড ভয়ে সে ছুটল। সে অবশ্য জানে না কার ভয়ে—প্লেনগুলোর, নাকি আধপোড়া জ্বলন্ত নাড়িভুঁড়ি বার করা ছেলেটির আলিঙ্গনের ভয়ে?

যেখান দিয়ে সে ছুটছে সেটা মাঠ না জঙ্গল, নাকি রাস্তা—কোনো বোধই তার নেই, কতক্ষণ সে ছুটেছে তাও সে জানে না। শুধু অনেকক্ষণ পর সে নিজেকে আবিষ্কার করে প্রায় অন্ধকার একটা লম্বা করিডোরের মধ্যে। তার মনে হচ্ছে, এটা একটা হাসপাতাল। মামুর শ্বাশুড়ির ক্যান্সার হয়েছিল। মাকে নিয়ে সে দেখতে গিয়েছিল ক্যান্সার হসপিটালে। গোটা ওয়ার্ডটায় কেমন একটা গা গোলানো চিমশে পচা গন্ধ। মামুকে জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিল, ওটা নাকি গ্যাংগ্রিনের গন্ধ। সে এই করিডোরটায় গ্যাংগ্রিনের গন্ধ পাচ্ছে। একটা করিডোর শেষ হয়ে যায়, মোড় ঘুরলে আর একটা একই রকম করিডোর, সেখানেও একই রকম গন্ধ, একই রকম অন্ধকার। একের-পর-এক একই রকম করিডোর। কতক্ষণ সে এভাবে ছুটছে, তার মনে নেই। এখন তার ভয় হচ্ছে এই করিডোরের জঙ্গল থেকে সে বোধহয় আর বের হতে পারবে না। কিন্তু একটা করিডোরের শেষে অবশেষে সে একটা বন্ধ কাচের দরজার ওপাশে আলো দেখতে পায়। বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ হাঁফায় তারপর দরজাটায় ধাক্কা দেয়।

দরজাটা খুলে যায়, আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁপুনি ধরানো একটা ঠাণ্ডা হাওয়া। এ রকম ঘর সে সিনেমায় দেখেছে—একটা বিশাল টেবিল আর তার চার দিকে গদি আঁটা ভারী ভারী চেয়ার। পা দেওয়া মাত্র ঘন নীল নরম কার্পেটে তার পা ডুবে যায়। ঘরটায় আলো কিছুটা কম। কিন্তু লম্বা টেবিলের ওপারে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে সে এতটাই চেনে যে হাজার মাইল দূর থেকে সে ঠিক চিনে নেবে—কর্নেল চ্যাটার্জি। লোকটা সোজা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এই প্রথম কর্নেল তার দিকে তাকিয়ে হাসল—সে হাসিতে কোনো শত্রুতা নেই। সে এখনো হাঁফাচ্ছে, কতক্ষণ ছুটেছে সে নিজেই জানে না। তার কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। এতক্ষণে তার খেয়াল হল টেবিলটার ওপর বড় একটা কিছু সাদা কাপড়ে ঢাকা। সে আশ্বস্ত হয়, যাই হোক অবশেষে সে একজন চেনা মানুষকে খুঁজে পেয়েছে। কর্নেলের পাশে গিয়ে সে দাঁড়ায় তারপর বলে, 'যাক, আপনাকে অন্তত এখানে খুঁজে পেয়েছি।'

একটা হাত বাড়িয়ে কর্নেল তার কাঁধটা শক্ত করে ধরে। হাতটা বাড়ালে তার চোখে পড়ে চওড়া কবজিতে জ্বলজ্বল করছে নীল ডায়ালের ঘড়িটা। কর্নেলের কাঁধের ওপর দিয়ে সে দেখতে পায়, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটুকরো খয়েরি কালো আকাশ।

গমগম করে ওঠে কর্নেলের গলা, 'আমরাও তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি। কাম অন মাই বয়।'

'আই প্রেপোস হিস নেইম ইন আওয়ার বোর্ড।' কাঁপাকাঁপা একটি মহিলার গলা শুনে সে চমকে তাকায়। বিশাল টেবিলের একটা অন্ধকার কোণে রঙচঙে জামা পরে বসে আছেন একজন বৃদ্ধা। তার বয়স বোধহয় কয়েক শতাব্দী। আধা অন্ধকার আর আলো হোঁচট খাচ্ছে তার অজস্র বলিরেখায়, শুধু জ্বলজ্বল করছে লাল লিপস্টিক। কর্নেল চ্যাটার্জি হাততালি দিয়ে ওঠে। যদিও ঘরে কেউ নেই, তবুও আরও কয়েকটা হাততালির আওয়াজ শোনা যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলের মাঝখানের সাদা কাপড়টা সরিয়ে হাততালি দিতে দিতে উঠে বসে আধপোড়া ছেলেটা, এখনো নাড়িভুঁড়িগুলো ছড়িয়ে আছে।

সে অনুভব করে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে আবার জ্বরটা আসছে, সে তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। সে ঢলে পড়ে কর্নেলের বুকে। ছেলেটার নাড়িভুঁড়ির সঙ্গে বেরিয়ে এসেছে অর্ধেক হজম হওয়া খাবার, কর্নেলের পারফিউমের গন্ধকে ছাপিয়ে নাকে আসে তার দুর্গন্ধ।

সে জ্ঞান হারায়। জ্ঞান হারাবার আগে বোঝে—কোনোদিনও সে কবিতা লিখতে পারবে না।

সে ছিল কেমিস্ট্রি ল্যাবে। সাড়ে চারটা পর্যন্ত ল্যাব, তখন বড় জোর বাজে সাড়ে তিনটে। প্ল্যাটিনাম ওয়ার টেস্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। প্ল্যাটিনামের প্লেটিং করা তারটার মুখে সল্টটা একটু লাগিয়ে বার্নারের আগুনে ধরলে আগুনের শিখাটার রঙ পাল্টে যায়। সেই রঙ দেখে বোঝা যায় সল্টটাতে কোনো মেটাল আছে। আগুনের শিখাটার রঙ পাল্টালে একবার সেটা খালি চোখে দেখতে হয়, তারপর দেখতে হয় নীল কাচের মধ্যে দিয়ে। কোন মেটালে কী রঙ হবে, সেটা লেখা আছে বইয়ে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে তার জ্ঞান এতই কম যে, সে একদম গলদঘর্ম হচ্ছে। রঙটা বেশিক্ষণ থাকে না, কাজেই একসঙ্গে রঙ দেখা এবং বই দেখা বেশ কঠিন। কিন্তু বিরক্তিকর এই কাজটা করতে সে কিছুটা বাধ্য হয়েছে ভয়ে। বি এস-সি (পাস)-এর ছাত্রদের কাছে কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিকাল সব সময়ই আতঙ্কের কারণ। পাস করাটা অনেক সময়ই লটারির টিকিটে প্রাইজ পাবার মতো। পরীক্ষার দিন কপালে খারাপ সল্ট পড়ল তো তুমি গেলে, সামনের বছরের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হও। এমনিতেই পরীক্ষা হবে ছ-মাস পরে, পরীক্ষার পর রেজাল্ট বেরোতে আরো এক বছর, এরপর যদি সাপ্লিমেন্টারি পাও তবে তিন বছরের বি এস-সি কোর্স পার করতে ছ-বছর।

'অত মনযোগ দিয়ে দেখবার কিছু নেই, ওটা কোবাল্ট।'

ল্যাবে প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যে হাইড্রোজেন সালফাইডের দুর্গন্ধে গোটা মাথাটা ভারী হয়ে আছে। কানের কাছে এই পাকামোটা কে করছে সেটা দেখবার জন্যে সে মাথা তুলল। পেছনে দাঁড়িয়ে শুভ এবং মন্তব্যটা তারই। শুভ কেমিস্ট্রি অনার্সের ছেলে। ওরা যখন-তখনই ল্যাবে ঢুকতে পারে।

'শিঘ্রি আয়, কাজ আছে।'

'দাঁড়া, দেখছিস না কাজ করছি?'

'হাসাস না চাঁদু, কে কবে রে পাস প্র্যাকটিকাল এত মনোযোগ দিয়ে করেছে? ছাড়, আল্টিমেটলি তো পরীক্ষার সময় সেই বেয়ারাকে টাকা দিয়ে সল্টের নাম বার করতে হবে।'

সে মৃদু আপত্তি জানায়।

'ঠিক আছে, পনের মিনিটের আল্টিমেটাম দিলাম। আমি ক্যান্টিনে আছি।'

আধ ঘণ্টা পরে শুভকে সে আবিষ্কার করল তাদের পুরোনো টেবিলে। সঙ্গে একটা ছেলে। ছেলেটিকে আগে কখনো দেখেছে বলে মনে হয় না। রোগা মতো , দাঁতগুলো উঁচু, চশমা পরা। কিন্তু ছেলেটির সবচেয়ে লক্ষণীয় হল, এখনো বিশেষ ঠাণ্ডা পড়েনি, কিন্তু ভারী একটা মাফলার গলায় জড়িয়ে রেখেছে। চেয়ার টেনে টেবিলে বসার সময় তার মনে হল ছেলেটির বয়স তাদের থেকে কিছুটা বেশিই হবে।

তাকে দেখিয়ে শুভ বলল, 'দেবুদা, এই হল আমাদের চন্দ্রশেখর অর্থাৎ চাঁদু।'

ছেলেটি বসে ছিল কিছুটা কুঁজো হয়ে ; এবার সোজা হয়ে বসায় সে বুঝল, ছেলেটি যথেষ্ট লম্বা। প্রথম আলাপের কোনো সৌজন্যমূলক হাসি ছাড়াই ছেলেটি সরাসরি তাকাল তার চোখের দিকে, 'আচ্ছা, তুমিই রাজশেখরের দাদা? পুলকদা আমাকে তোমার কথা বলেছে।'

ছেলেটি তার গলার স্বরকে কিছুটা কৃত্রিম ভাবে ভারী করার চেষ্টা করে।

তার এই নতুন পরিচয়ে সে নিজই কিছুটা বিস্মিত। পাড়াতে অনেকেই ছোটকে চেনে চাঁদুর ভাই বলে। কিন্তু পাড়ার বাইরের এই অপরিচিত ছেলেটির চোখে সে হল 'রাজশেখরের দাদা'।

শুভ বলল, 'চাঁদু, এই হল আমাদের দেবুদা। কলেজের আউটগোয়িং স্টুডেন্ট।'

শুভর দেবুদা এবার গলাটা কিছুটা নামিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'বলো, কী ভাবছ?'

কেউ যদি কথা বলার সময় সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাহলে তার ভীষণ অস্বস্তি হয়। আর প্রশ্নটার উত্তরই বা সে কী দেবে? সে চুপ করেই থাকে।

তার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে দেবুদা বলল, 'একটু তো কাজকর্ম করতে হয়।'

শুভ তাড়াহুড়ো করে বলে উঠল, 'দেবুদা, চাঁদু আমাদের অনেকটা হেল্প করছে। আগেই তোমাকে ম্যাগাজিনের ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছিলাম। ম্যাগাজিনটাকে সামনে রেখে আমরা ছেলেমেয়েদের বড় একটা গ্রুপকে ধরে ফেলতে পারব।'

'কিন্তু এর মধ্যে থেকে একটা কোর গ্রুপ তোমাদের তৈরি করতে হবে। তারা বসেই গোটা প্ল্যানিংটা করবে।'

শুভ উত্তর দিল, 'কেন আমি কয়েক জনের নাম পাঠিয়ে দিয়েছি, তুমি দেখোনি?'

'সে নাম আমি দেখেছি, কিন্তু শুধু নামে তো হবে না, এদের নিয়ে বসতে হবে। কবে বসবে, ডেট বলো।'

'বোসো, পরশু দিন কলেজের পরে বোসো', তারপরই তার দিকে তাকিয়ে শুভ জিজ্ঞাসা করল, 'চাঁদু, পরশু দিন, ঠিক আছে?'। তার কোনো সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই শুভ কথা চালিয়ে গেল, 'কিন্তু কোথায় বসবে?'

ছেলেটি বলল, 'সেটা আমি কাল জানিয়ে দেব। কিন্তু যেখানেই হোক কলেজে নয়,

বাইরে।'

গোটা কথোপকথনটাই চলছে তার সামনে, যে বিষয়ে চলছে, সেক্ষেত্রে সেও একটা ব্যাপার। কিন্তু তার কথা বলার কোনো সুযোগই আসেনি। সুযোগ এলেও সে কিছু বলত, এমনটা নয়। কিন্তু কেন যেন তার মনে হচ্ছে, শুভ চায় না, সে কিছু বলুক। শুভ কি ভয় পাচ্ছে সে বেফাঁস কিছু বলে ফেলবে?

শুভ কোন রাজনীতি করে সেটা সে বোঝে, তার প্রতি তার সমর্থন আছে, আছে অসীমদার সময় থেকেই। কিন্তু এই রাজনীতি সে নিজে করবে, এ রকম কোনো সম্ভাবনার কথা সে কখনো ভাবেনি। কিন্তু এ ব্যাপারটায় তার মতামত চাওয়া হয়নি, ধরে নেওয়া হয়েছে সেও আছে এর মধ্যে। কেন? সে 'রাজশেখরের দাদা' বলে? নাকি শুভর বন্ধু বলে? শুভ বোধহয় এর জন্য চাইছে না, সে কিছু বলুক। আর তার কেন জানি না শুভর এই দেবুদাকে ভাল লাগছে না। কেন, সেটা ঠিক পরিষ্কার না তার কাছে।

দেবুদা টেবিল ছেড়ে উঠে গিয়ে আবার ফিরে এল। গলাটা যথা সম্ভব নামিয়ে বলল, 'তোমাদের লিস্টে একটি মেয়ের নাম আছে, তার বাবা চিফ্ মিনিস্টারের সেক্রেটারিয়েটের অফিসার। কোর গ্রুপে একে রাখা যাবে না।'

শুভ বলল, 'কী বলছ দেবুদা! তুমি শালিনীকে চেনো না। ভীষণ ভাল মেয়ে আর প্রচণ্ড প্রোগেসিভ।'

'মেয়েটিকে চিনবার আমার দরকার নেই, আমরা রাইটার্সের অফিসারদের চিনি। পুলিসকে ইনফর্মেশন দিলে ওদের প্রোমোশন হয়।'

শুভ আবার প্রতিবাদ করল, 'না-না, শালিনী এ রকম নয়। দরকার হলে তুমি নিজে কথা বলো।'

ভুরু কুঁচকে দেবুদা বলল, 'যেটা বললাম, সেটাই সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না। তোমার বন্ধুত্বের থেকে কমরেডদের জীবন আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান।'

অদ্ভুত কুঁজো হয়ে ছেলেটি যখন বেরিয়ে গেল, শুভ দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে কাঁধটা ঝাঁকাল, তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে হঠাৎ উঠে পড়ল, বলল, 'তুই বোস, আমি এক্ষুনি আসছি।'

ক্যান্টিন আস্তে-আস্তে ফাঁকা হয়ে আসছে। অবশ্য বন্ধ হবে না, কারণ কিছুক্ষণ পরে ইভিনিং সেকশনের ছেলেরা আসতে শুরু করবে। শুভ উঠে যাবার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ইউনিয়নের এক দল ছেলে ক্যান্টিনে ঢুকল। আবার একটু পরেই বেরিয়ে গেল, কিন্তু তার মনে হল ওরা কিছু খুঁজছে। সে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে আসে। রাস্তায় বেরিয়ে তার মনে হল, কাজটা সে ভাল করল না, তাকে খুঁজতে শুভ আবার ফিরে আসতে পারে।

তাহলে পরশু দিন শুভ তাকে নিয়ে যাবে কোর গ্রুপের মিটিং'য়ে। এখন তার কাছে. পরিষ্কার ম্যাগাজিনটা নিয়ে শুভ কেন এত উঠেপড়ে লেগেছে। কেন বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে আসছে তাদের আড্ডায়। প্রথম-প্রথম যেটা মনে হচ্ছিল তাদের কয়েকজনের ব্যাপার, শুভ সেটাকে একটা বেশ বড় ব্যাপার করে তুলেছে। কিন্তু সে কী করবে? ম্যাগাজিনে তার বিশেষ কিছু করার নেই। আর শুভদের পার্টিতে গিয়েও তার কীই

বা করার আছে? পাড়া বা কলেজে কোথাও পার্টির নাম উচ্চারণ করার সাহসও কারোর নেই। কিন্তু পার্টি করা মানে তো অসীমদা, আবার অসীমদার সঙ্গে দেখা হওয়া। এই আকর্ষণই বা সে অস্বীকার করবে কী করে? তা সত্ত্বেও প্রতি মুহূর্তে তাকে তাড়া করে অস্তুদের গলিতে রক্তমাখা হাতের ছাপ, সি. আর. পি-র বুটের আওয়াজ। পাড়ার মোড়ে কল্যাণদার সঙ্গের ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকালে ভয়ে তার গলা শুকিয়ে আসে। আর এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে কলেজের ইউনিয়ন রুম।

পাথরের মতো চারিদিকটা বুকের ওপর চেপে বসে আছে। ভয়হীন নিশ্বাস নেবার একটুও জায়গা কোথাও নেই। সে চায়, সে ভীষণভাবে চায়—এই সব কিছু শেষ হোক। তা একমাত্র হতে পারে পার্টি ফিরে এলেই। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব? কে বদলাবে দিনগুলো? আবার নতুন করে কারা রক্ত ঢেলে দেবে? আর যেই হোক সে নয়। শুভরা যা করবে তার প্রতি তার সমর্থন একশ ভাগ। কিন্তু নিজেকে শুভদের পাশে দাঁড় করিয়ে সে কখনো ভাবেনি। এর জন্য সে নিজেকে কখনো তৈরি করেনি।

কিন্তু পার্টি তাকে ডেকেছে, সে ডাককে সে কী করে অস্বীকার করবে? সে যখন ছোটো থেকে বড় হচ্ছে—সে দেখেছে, সে জেনেছে, পাড়ায় তাদের একটাই পার্টি। এই পার্টিটাকে সে চিনেছে পাড়ার রাস্তায় ধুলোবালি মেখে খেলা করতে-করতে, এই পার্টিটাকে সে চেনে পাড়ার চেনাশোনার গণ্ডির মধ্যে, পাড়ার বিবর্ণ দেওয়ালে আলকাতরায় লেখা কথাগুলোর মধ্যে। সে জানে পার্টিটা তাদেরই। সে আর তার বন্ধুরা এখন পার্টিটাকে অনুভব করে অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে। পার্টির সে নীতি জানে না, রাজনীতি জানে না, জানে অসীমদা, সুবীরদা, পুলকদা আর শুভর মধ্য দিয়ে। পার্টিকে সে চেনে স্বপ্নে, জেনারেল গিয়াপের ছবিতে, তার কল্পনার জনযুদ্ধে। সেই পার্টি তাকে ডেকেছে ; দেবুদাকে তার যতই খারাপ লাগুক, শালিনী সম্পর্কে তার মন্তব্যে যতই রাগ হোক, এই ডাককে এড়িয়ে যাওয়া তার পক্ষে ভীষণ কঠিন। সবাইকে সে অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু ছোট? তার চোখে সে চিরকাল ছোট হয়ে যাবে, যদি এ ডাকে সে সাড়া না দেয়।

বাসে ঝুলতে-ঝুলতে তার মনে হল হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা।

বোধহয় ঘুম আর জাগার মাঝামাঝি একটা স্তরে সে রয়েছিল। হাওয়াটা ঠাণ্ডা, কিন্তু বাইরে চড়া রোদ। ভোরবেলা আর সন্ধ্যার পর থেকে গায়ে কিছু একটা দিতে হয়। নদী থেকে যে হাওয়াটা উঠে আসে সেটা সারা গায়ে ঠাণ্ডা একটা প্রলেপ দিয়ে যায়। আর যে দিন হাওয়া থাকে না একটা হালকা কুয়াশার চাদরে চারিদিকটা ঢাকা পড়ে। একটা দোকান ঘরের পেছনের চালার নীচে বাঁশের কঞ্চির তৈরি একটা লম্বা বেঞ্চে সে শুয়ে আছে। সকাল বেলায় সে সোয়েটারটা গায়ে চাপিয়েছিল সেটাই পাকিয়ে নিয়ে বালিশ করে নিয়েছে। সারা দিন ধরে বিশুদ্ধ একটা ছুটি। ফ্রন্ট থেকে বহু দূর।

জায়গাটা শহরও না, গ্রামও না। থাকার মধ্যে আছে একটা বড় নদী, তার ওপর একটা রেল ব্রিজ আর একটা সরকারি কারখানা। যারা পরিকল্পনা করেছিল, তারা বোধহয় ভেবেছিল জায়গাটাকে একটা নতুন শিল্পাঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলবে। তার প্রথম ধাপ হিসাবে এই সরকারি কারখানাটা তৈরি হয়েছিল। তারপর যা হবার, তাই হয়েছে, কলকারখানা আর বিশেষ কিছু হয়নি। টিমটিম করে চলছিল এই একটা কারখানাই। এক সময় যে সব চওড়া

ঝক্‌ঝকে রাস্তা তৈরি হয়েছিল, এখন তা খানাখন্দে ভর্তি ; রাস্তার আলো বারো আনাই জ্বলে না—সব মিলিয়ে শহর-শহর হাবভাব নেওয়া একটা গ্রামই রয়ে গেছে জায়গাটা।

যুদ্ধ কাছাকাছি আসামাত্র কারখানা বন্ধ করে ম্যানেজাররা পালিয়েছে। সবারই ধারণা ছিল জায়গাটা নিয়ে তুমুল লড়াই হবে। কারখানাটা একটা ব্যাপার, এছাড়া জায়গাটার ওপর দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা রেললাইন আর ন্যাশনাল হাইওয়ে গেছে। কিন্তু বিনা বাধাতেই জায়গাটা তারা দখল করেছে, তারা ঢোকবার এক দিন আগেই শত্রুপক্ষ জায়গাটা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এই কারখানাটা চিরকালই তাদের পার্টির শক্ত ঘাঁটি। লড়াই শুরু হবার পর এখানকার পার্টি কমরেডদের একটা বড় অংশই চলে গিয়েছিল ফ্রন্টে। ফ্রন্টে কারখানার কাজ জানা কমরেডদের সবচেয়ে বেশি দরকার। কিন্তু যারা থেকে গিয়েছিল তারাও অবশ্য কম যায় না। যুদ্ধটা নদীর ওপারে আসার পর, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে এখানকার লোকজন কারখানার চাবিটাবি নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে চলে গিয়েছিল আশেপাশের গ্রামে। যাবার সময় জেনারেল ম্যানেজারের বাংলো আর দুটো পেট্রল ট্যাংকারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায়। সকালবেলায় কোনো সমর্থ পুরুষকে এখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনজন বৃদ্ধ আর বার-তের বছরের একটা ছেলেকে শত্রুরা পরের দিন চৌরাস্তার মোড়ে সকাল বেলায় প্রকাশ্যে গুলি করে মারে আর ঘরে-ঘরে ঢুকে মেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। দুপুর বেলায় তাদের গানবোটগুলো শহরটার ওপর হামলা শুরু করে, আর বিকেলের মধ্যে ওরা শহর ছেড়ে চলে যায়। বোধহয় কারখানাটা আর রেল ব্রিজটাকে বাঁচানোর জন্যই এখানে সরাসরি যুদ্ধটা শত্রুপক্ষ এড়িয়ে গিয়েছিল। ওরা ভেবেছিল দুদিন পরে শহরটা আবার ওদের হাতে চলে আসবে। ফ্রন্টটাকে ওরা সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল পাঁচ কিলোমিটার দক্ষিণে। কিন্তু সেখানেও ওরা দাঁড়াতে পারেনি। কাজেই তারা নদীর এপারে পা রাখার কয়েক দিনের মধ্যেই ফ্রন্ট পিছিয়ে গেছে অন্তত পঞ্চাশ কিলোমিটার। আর এর মধ্য দিয়ে তারাও পেয়ে গেছে কাগজে-কলমে প্রথম মুক্ত শিল্পাঞ্চল। যুদ্ধের হিসাবে বিষয়টা যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাদের মনের জোর বাড়ার ক্ষেত্রে। হোক না, একটা মাঝারি সাইজের কারখানা, গোটা দশেক লেদ আর গোটা চারেক গ্যারেজ, কিন্তু শিল্পাঞ্চল তো।

দুটো অ্যান্টিএয়ারক্র্যাফ্‌ট ব্যাটারিসহ তাদের বাহিনীটাকে এখানে রেখে দেওয়া হয়েছে বিমান হানা থেকে ব্রিজটাকে রক্ষা করার জন্য।

কারখানার যারা ফ্রন্টে যায়নি তারা সবাই ফিরে এসেছে। কাগজ-কলমে কারখানাটা খুলেছে যদিও কাজকর্ম কিছুই হয় না, খুব শিগগির হবেও না। কাঁচামাল নেই, আর জিনিসপত্র তৈরি করেও লাভ নেই—গোটা বাজারটাই কলকাতায়, মাল পাঠাবে কী করে ? কারখানার ইউনিয়ন একটা প্রস্তাব তাদের কাছে দিয়েছে—একটু চেষ্টা করলে এই কারখানাতে ছোটখাট অস্ত্র, যুদ্ধে লাগে এ রকম কিছু যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব। মাইনে লাগবে না, ন্যূনতম মজুরি দিলেই হবে। এ ব্যাপারটায় তাদের কিছু করার নেই, প্রস্তাবটা তারা পাঠিয়ে দিয়েছে হেড কোয়ার্টারে। তবে ফ্রন্টের এত কাছে কারখানা খোলার ঝুঁকি বোধহয় এক্ষুনি নেওয়া হবে না। ভবিষ্যতে প্রস্তাবটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হতে পারে।

কারখানার গেস্ট হাউসটা তাদের এখানকার ঘাঁটি। নদীর একদম ওপরে বাগানেঘেরা চমৎকার দোতলা বাংলো একটা। এক সময় ঘুষখোর অফিসার আর অর্ডার সাপ্লায়ারদের

লীলাক্ষেত্র ছিল, এখন ছেঁড়াখোড়া ইউনিফর্ম পরা লিবারেশন আর্মির থাকার জায়গা। যে ঘরটার কার্পেটের ওপর তারা গাদাগাদি করে ঘুমোয় তার একদিকের দেওয়ালে বিশাল একটা পেইন্টিং ; ঝড়ের মধ্য দিয়ে একটা মেয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ছবিটা তার ভীষণ ভাল লাগে। এখানে রাতে কোনো কারেন্ট থাকে না, হ্যারিকেন জ্বলে, তাই ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে শুয়ে-শুয়েই অনেকক্ষণ ধরে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর ছবিটার দিকে তাকালেই তার গায়ত্রীর কথা মনে পড়ে।

এখানে তারা ঘাঁটি করার পর থেকে একটানা প্রায় বিশ্রামই চলছে, শুধু রুটিন কিছু কাজ। কোনো ঝামেলা নেই, যুদ্ধ নেই, এমনকী যুদ্ধের কোনো সাড়াশব্দও নেই। রেলব্রিজটার ওপর হামলা হবে এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে তারা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষেব কোনো প্লেনের ছায়াও আকাশে দেখা যায়নি। রেল চলাচল বন্ধ, শুধু হাইওয়ে দিয়ে সৈন্য ভর্তি ট্রাকগুলো ছুটে গেলে বোঝা যায়, কোথাও একটা যুদ্ধ চলছে। গতকাল এক কোম্পানি ট্যাঙ্ক ফ্রন্টের দিকে গেল, অনেকক্ষণ ধরে তাদের গুমগুম করা আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তারপর সব নিস্তব্ধ, মাঝে-মাঝে শুধু অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বেলে হাঁসের ডাক।

গেস্ট হাউসের লনে সকাল থেকে কারখানার লোকজনরা ভিড় করে, কোনো কাজকর্ম ছাড়াই। লনের এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে তাদের সঙ্গে গল্প করে। তাদের ভাঙাচোরা জিপ আর ট্রাকগুলো মেরামতি করে দেয়। কারখানা থেকে তেল এনে দেয় তাদের রাইফেল পরিষ্কার করার জন্য। আশপাশের গ্রাম থেকে সবজি, হাঁসের ডিম, এসবও যোগাড় করে আনে, এমনকী ওদেব রিক্রিয়েশন ক্লাব থেকে একটা ক্যারাম বোর্ডও এনে দিয়েছে তাদের খেলার জন্য।

এই অলস সকালে সে এসে বসেছিল নদীর ধারে, এখন শুয়ে শুয়ে তার চোখ প্রায় জড়িয়ে আসছে। সামনের ডান দিকে ঘাট, এ সময় লোকজন স্নান করতে আসে। অল্পবয়সী একটা মেয়ে বাচ্চার হাত ধরে ঘাটের দিকে নামতে চাইছে। কিন্তু কেন জানি বাচ্চাটা নামতে চাইছে না, বোধহয় ঠাণ্ডা জলে স্নান করতে আপত্তি। মাথায় ঘোমটা দেখে মনে হচ্ছে, মা আর ছেলে। বাচ্চাটার একটা হাত শক্ত ধরে মেয়েটা ঢালু ঘাট দিয়ে নামছে আর বাচ্চাটা আপ্রাণ বাধা দেবার চেষ্টা করছে। এক সময় বাচ্চাটা মাটিতে শুয়ে পড়ল। হ্যাঁচকা টানে ঘোমটা খুলে গেছে। নীচু হয়ে বাচ্চাটাকে টেনে তুলে মা মারল একটা থাপ্পড়। বাচ্চাটা এবার তারস্বরে কাঁদছে, হাওয়াতে কান্নার আওয়াজটা ভেসে আসছে। এরপর হিড়হিড় করে টেনে বাচ্চাটাকে দাঁড় করানো হল জলের একদম ধারে। বাচ্চাটার উচ্চকিত কান্নাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে দক্ষ হাতে জামা-কাপড় খুলে দিয়ে মাথায় তেল মাখানো হল। সে গোটাটা দেখছে এবং হারিয়ে যাচ্ছে অসম্ভব সুখের অথচ বুকের কোণে ব্যথা-ধরানো একটা স্মৃতির অতলে। শুধু সেখানে কোনো নদী নেই, আছে ননীমাধব দে লেনের বিবর্ণ বাড়ির উঠোনে একটা জং ধরা টিউবওয়েল। কিন্তু জল একই রকম স্বচ্ছ, একই রকম ঠাণ্ডা।

নদীটার পার থেকে বেশ কিছুটা দূরে বিশাল একটা চরা। এখানকার লোকদের কাছে শুনেছে পাঁচ বছর আগেও চরাটা ছিল না। এখন চরাটায় রীতিমতো চাষবাস হয়। এ সময় বোধহয় ফসল কাটা হচ্ছে—কয়েক দিন থেকেই দেখছে নৌকোতে করে কাটা ফসল নিয়ে আসা হচ্ছে। এখনো লাল পতাকা লাগানো ছোটো মতো নৌকো লাগানো আছে চরার গায়ে। চরার ওপার দিয়ে নদীর মূল স্রোতটা গেছে। যেখানে সে শুয়ে আছে সেখান থেকে চরার

ওপার দিয়ে যাওয়া নৌকোগুলো দেখা না গেলেও তাদের উঠে থাকা পালগুলো দেখা যায়। চরায় ধান কাটা, ভেসে যাওয়া জেলে নৌকোর পাল, এমনকী স্নান করতে না-চাওয়া বাচ্চাটার জেদি কান্না, সবই শান্তির টুকরো-টুকরো ছবি। এ রকম সময় তার ভাবতে ভাল লাগে—যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। এই দেশটার আকাশ-মাটি-জল সব কিছু তাদের হবে। একটা চূড়ান্ত জয়ের পর সে ফিরে যাবে ননীমাধব দে লেনে, যেখানে মাই হেভেনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিশি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। সে অসীমদাকে বলতে পারবে—সে সত্যি সত্যি জেনারেল গিয়াপের মতো হতে পেরেছে। অবশেষে সে কবিতা লিখতে পারবে।

দেওয়ালগুলোতে খুব শীত, আর
চারপাশ বড় অন্ধ ;
তুমি আসবে কি, আসবে না তুমি?
পথ কি এখনো বন্ধ?

ভরসন্ধ্যায় বুটের আওয়াজ
মাঝরাত্তিরে হল্লা—
আচমকা সব চুপ এরপর
মরা যেন গোটা তল্লাট

কত রাত যায় অসহায়তায়
কত দিন যায় কান্নায়,
ওগো তুমি এসো, একবার এসে
বলো, এইভাবে আর না

এসো হাত ধরো, দেখো এ শরীর
অপমানে কত শীর্ণ ;
একা আমি নই, তাদের জন্য
অভ্যাসে যারা বীর নয়

তুমি আসছ কি, আসবে না তুমি?
পথ কি এখনো বন্ধ?
যদি হয়, তবে ভেঙে ফেলো, আমি
তোমার বিরহে অন্ধ।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলেনি। গায়ত্রী পড়া শেষ করে, একবার উৎসুক চোখে শুভর দিকে তাকিয়েছিল। তারপর সেও মাথা নীচু করে এক দৃষ্টে তাকিয়ে কবিতা লেখা ফুলস্কেপ কাগজটার দিকে। শালিনী প্রথম হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে নিল। বোধহয় কবিতাটা আর একবার পড়ল। তারপর গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'গায়ত্রী, এটা তোর

প্রথম কবিতা হতেই পারে না। তুই নির্ঘাত আগেও লিখেছিস। দুরন্ত হয়েছে। এই প্রথম তোকে হিংসে হচ্ছে রে গায়ত্রী।'

শালিনীর কথাটা শুনে সে অনুভব করল, সে যেন মাঝখানের নীরবতার মুহূর্তগুলোতে দমবন্ধ করে বসেছিল। শালিনীর কথায় সে দম ছাড়তে পারল। গায়ত্রীর কবিতার নয় যেন তার নিজের পরীক্ষা চলছিল। কবিতাটা তার ভাল লেগেছে না লাগেনি তা বড় কথা না। কিন্তু সে বুঝেছে কবিতাটার প্রতিটা শব্দে, প্রতিটি ছত্রে মিশে আছে গায়ত্রী। আজকে তাদের টেবিলে অনেকে আছে; তাদের নিজেদের গ্রুপ ছাড়াও সেকেন্ড ইয়ারের কুশল, ফার্স্ট ইয়ার ইংলিশের দিগন্ত, সঙ্গে দিগন্তের এক বন্ধু, যার নাম সে জানে না। কিন্তু এই কবিতা সে যতটা বুঝেছে আর কেউ অতটা বুঝবে না। গোটা কবিতা জুড়ে ননীমাধব দে লেনে গায়ত্রীদের পেছল উঠোন, ঝুলে অন্ধকার রান্নাঘর, চিরঅসুস্থ মাসিমার বিষণ্ণ মুখ, বুড়ির ছোট হয়ে যাওয়া ফ্রক, আর এই সব কিছুকে অস্বীকাব করে গায়ত্রীর উজ্জ্বলভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা। সে নিশ্চিত না তার জন্যও কোনো কথা গায়ত্রী বলেছে কি না। আজ থেকে বহু দিন আগে গায়ত্রীর বলা একটা কথার মানে বুঝতে না পেরেও একাট গোটা সন্ধ্যা ভরে উঠেছিল অদ্ভুত ভাল লাগায়। আজকেও সে রকম একটা না-বোঝা কথা মিশে আছে কবিতাটায়, কিন্তু সেদিনের মতো ভাল লাগা নয় সে অনুভব করছে কেমন এক বিষণ্ণতা।

গায়ত্রীর কবিতা তখন কুশলের হাতে। কুশল তার উল্টো দিকে বসে, তার জন্য সরাসরি কুশলের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারছে—কবিতাটা কুশলের ভাল লেগেছে। শুভ হাত বাড়িয়ে কবিতাটা নিল, তারপর কবিতাটার দিকে চোখ রেখেই আর এক হাতে প্যান্টের পকেট থেকে দোমড়ানো চারমিনারের প্যাকেট বার করে না জ্বালিয়েই একটা সিগারেট ধরে রইল ঠোঁটে। গায়ত্রী কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা তাকিয়ে আছে শুভর দিকে। শালিনীও তাই। সে শুভর ঠিক পাশে বসে, যেখান থেকে সে শুভর মুখটা পুরোপুরি দেখতে পাচ্ছে না। এটা সবাই বোঝে যে যাই বলুক শেষ সিদ্ধান্ত নেবে শুভ।

শালিনীই জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে শুভ, চুপ করে কেন? ভাল লাগেনি?'

কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে শুভ প্রথম সিগারেটটায় আগুন দিল, তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'না ভাল, ভালই হয়েছে', তারপর সোজা গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা গায়ত্রী, তুই ঠিক কী বলতে চেয়েছিস, কার জন্য অপেক্ষা, কোনো ব্যক্তির জন্য না অন্য কিছুর জন্য?'

'আমি যা বলার তা আমার কবিতাতেই বলেছি।' খুব স্পষ্ট করে কথাগুলো গায়ত্রী উচ্চারণ করল।

'তা হয় তো ঠিক, কিন্তু কবিতাটা পড়ে কারোর মনে হতে পারে এটা একটা বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতা।'

টেবিল থেকে গায়ত্রী কাগজটা তুলল, তারপর ভাঁজ করল খুব সাবধানে।

শালিনী বলল, 'আমরা কি কোথাও ঠিক করেছি যে প্রেমের কবিতা লিখব না।'

শুভ উত্তর দিল, 'আমি কিন্তু তা বলিনি।'

গায়ত্রী ভাঁজ করা কাগজটা ব্যাগের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়াল। শুভ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'প্লিস্ গায়ত্রী...'

কলেজের গেটের কাছে সে গায়ত্রীকে ধরে ফেলল। গায়ত্রীর হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না যে, সে খুব রেগেছে। আসলে গায়ত্রী হঠাৎ কেন এভাবে উঠে চলে এল, সে ঠিক বোঝেনি। আর সে নিজে কেন গায়ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এল, সেটাও সে জানে না। যারা টেবিলে ছিল তারাও গায়ত্রীর বন্ধু, তারা তো কেউ আসেনি।

গায়ত্রী কোনো কথা বলেনি, কিন্তু দেখেছে যে সে সঙ্গে সঙ্গে আসছে। ট্রাম লাইন পার হল গায়ত্রী। ওপারেই বাস স্টপ। ফেরার পথে তারা বাস ধরে এখান থেকে। গায়ত্রী বাসস্টপে দাঁড়াল না, ফুটপাত ধরে হাঁটতে শুরু করল। গায়ত্রী কোথায় যাচ্ছে, সে জানে না। এখন বোধহয় সে কথা জিজ্ঞাসা করেও লাভ নেই। তাকে গায়ত্রী ডাকেনি, সেই এসেছে সঙ্গে। সে কোনো কথা না বলে গায়ত্রীর পাশে-পাশে হাঁটছিল। প্রথমে গায়ত্রী যতটা জোরে হাঁটছিল আস্তে-আস্তে সে গতি কমে আসছে। গায়ত্রীর হাতে সব সময় একটা রুমালে থাকে, গায়ত্রী হাঁটছে রুমালে নাকটা চেপে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বুঝতে পারে, আসলে গায়ত্রী কাঁদছে। কান্নার বেগ যত বাড়ছে, হাঁটার গতি তত কমে আসছে। এই দুপুরে বড় রাস্তায় অনেক লোক, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে মাথা নীচু করে গায়ত্রী হাঁটছে তাই কান্নাটা কেউ লক্ষ করছে না, কিন্তু পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে বুঝতে পারছে। সে আস্তে আস্তে গায়ত্রীর কাঁধে তার হাতটা রাখল।

গায়ত্রী যেন তার এই স্পর্শটার জন্যই অপেক্ষা করেছিল। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে পড়ল, তার মুখের দিকে তাকাল কান্নাভরা চোখ দুটো নিয়ে। তারপর ভেঙে পড়ল কান্নায়।

হয়ত দু-চার জন লোক দাঁড়িয়েই পড়েছে রাস্তায়। কিন্তু সে আর এ সব খেয়াল করছে না। গায়ত্রী বোধহয় বহুদিন কাঁদেনি। বহুদিনের জমে থাকা যন্ত্রণা আর দুঃখের সমস্ত গভীরতা নিয়ে গায়ত্রী কাঁদছে। গায়ত্রী কেন কাঁদছে সে জানে না। তবু এই ভরদুপুরে কলকাতার ব্যস্ততম এই রাজপথ তার বিশাল জনস্রোত নিয়ে বিলীন হয়ে গেছে। বহু যুগের জমে থাকা এই কান্নাকে চালচিত্রে নিয়ে জেগে আছে কেবল সে আর গায়ত্রী। কতক্ষণ গায়ত্রী কেঁদেছে সে হিসাব তার নেই। এক সময় কান্না থেমেছে, সে আর গায়ত্রী আবার হাঁটতে শুরু করেছে।

কথা গায়ত্রীই শুরু করল, 'দাদারা চলে যাচ্ছে।'

গায়ত্রীর দাদা মানে বাবুদা, আর দাদারা মানে বাবুদা আর তার বউ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছে লেকটাউনে, সামনের মাসে চলে যাবে।'

কথাটা এতটাই আকস্মিক এবং কথাটার ফল গায়ত্রীর জীবনে এতটাই মারাত্মক যে, সে বুঝে উঠতে পারল না, গায়ত্রীকে সে কী বলবে। গায়ত্রীদের বাড়িতে আর্নিং মেম্বার আর গার্জিয়ান বলতে গায়ত্রীর দাদা আর বৌদি। গায়ত্রীর বৃদ্ধ বাবা, চির-অসুস্থ মা, আর ছোটো বোন বুড়ি। দাদার আলাদা হয়ে যাওয়া মানে গায়ত্রীদের খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ানো। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত গায়ত্রী শুধু এর জন্য কাঁদছিল না।

দুজনে চুপ করে বেশ কিছুটা হাঁটবার পর সেই জিজ্ঞাসা করল, 'ঝগড়াঝাটি হয়েছিল?'

'না, কে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করবে? আর, বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হলে তো আমার সঙ্গে হবে। আমার সঙ্গে বৌদির কোনো দিনও ঝগড়া হয়নি।'

'তাহলে হঠাৎ, এ রকম সিদ্ধান্ত?'

'আসলে হঠাৎ কিছু না। দাদা চিরকালই এ রকম। ও চায় না বৃদ্ধ বাবা মা আর বোনদের

দায়িত্ব নিতে। একবার চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে আলাদা হয়ে যেতে পারলে, বাকি জীবনটা ওদের সুখেই কাটবে। দুজনে চাকরি করে, ওদের আর কী চিন্তা।'

'এটা কার কথা, বাবুদার না তার বউয়ের?'

'বৌদিকে আমি কোনো দোষ দিই না। নিজেরা একটু ভাল থাকবে, এটা তো বৌদি চাইতেই পারে। যদি দাদা নিজে বিষয়টা না বোঝে, অন্য বাড়ির মেয়ে হয়ে সে কেন বুঝতে যাবে?'

'বাবুদা এসব কবে বলল।'

'পরশু দিন সকালে। বাবাকে গিয়ে বলে এসেছে।'

'মেসোমশাই কী বলল?'

'বাবা আর কী বলবে! বলল, মা-বাবার কথা ভাবতে হবে না, যাওয়ার সময় বোন দুটোর জন্য একটু বিষ কিনে দিয়ে যাস। এসব কথা শুনে দাদা খুব রাগ-রাগ ভাব দেখাল। বলল, সংসারের টাকা-পয়সা যা লাগবে তা নাকি ওই দিয়ে যাবে। শুধু অফিসে যেতে সুবিধা হবে বলে নতুন ফ্ল্যাটে যাচ্ছে।'

পায়ে-পায়ে তারা অনেকটা চলে এসেছে। সেই বলল, 'চ, এক কাপ চা খাই।'

রেস্টুরেন্টটায় পর্দা ঢাকা কয়েকটা খোপ থাকলেও ওরা বসল বাইরের টেবিলে। আর কোনো লোকজন নেই, রেস্টুরেন্টে কাউন্টারের লোকটা তারস্বরে ট্রানজিস্টার চালিয়ে ক্রিকেটের রিলে শুনছে। শীতের মধ্যেও এতটা হেঁটে রীতিমতো গরম লাগছে। গায়ত্রী ওর চোখের জলে ভেজা রুমালটা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

সে বলল, 'যাই হোক সংসার চালানোর টাকাটা তো অন্তত দেবে।'

গায়ত্রী অদ্ভুতভাবে হাসল। রেস্টুরেন্টের পুরোনো পর্দার থেকেও বিবর্ণ সেই হাসি—'হ্যাঁ তা বলেছে। কিন্তু আমি জানি শেষমেশ কী হবে। প্রথম কয়েক মাস দেবে। তারপর বলবে বৌদির শরীর খারাপ, নামী ডাক্তার দেখাতে হবে, দামি ওষুধ কিনতে হবে, এর জন্য এ মাসে কম দিলাম। তারপর বলবে লোন নিয়ে ফ্ল্যাট কিনেছি সেই ধার শোধ করতে হচ্ছে, আর অতটাও দিতে পারছি না। আমার নিজের দাদা, আমি নিজে চিনি না ওকে?'

তার নিজের পরিবারের ওপরও আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের একটা ধূসর ছায়া সব সময় লেগে থাকে। কিন্তু নিছক বেঁচে থাকা নিয়ে কোনো সমস্যার মুখোমুখি সে কখনো হয়নি। এই প্রথম কাছের থেকে একজন মানুষকে দেখছে, যার অস্তিত্বটাই একটা অন্ধকার খাদের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সে অসহায়ের মতো জিজ্ঞাসা করল, 'কী করে চালাবি?'

'এটাই তো দু-দিন ধরে ভাবছি। আরো কয়েকটা টিউশনি জোগাড় করে নেব। বুড়িকেও বলেছি টিউশনি দেখ। আসলে আর দুটো বছর যদি সময় পেতাম, সামলে নিতে পারতাম। বি এস-সিটা হয়ে গেলে ঠিক কিছু একটা যোগাড় করে নিতাম। তবে যাই হোক, কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। এ তো আর গল্প-উপন্যাস না, যে না খেতে পেয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াব। কিছু একটা ব্যবস্থা ঠিক করে নেব।'

একটু আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যে গায়ত্রী কাঁদছিল, এ গায়ত্রী সে গায়ত্রী না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে কাঁদছিলি কেন?'

তার প্রশ্ন শুনে গায়ত্রী অদ্ভুত ভাবে হাসল, আর সে হাসিটা মুখ থেকে না মুছেই বলল,

'কেন কাঁদছিলাম তা যদি সবাই বুঝত তাহলে আর কাঁদতে হত না। আসলে কী জানিস। ভীষণ ভয় লাগছে, কারণ সবটাই আমাকে সামলাতে হবে। বিপদে পড়লে কার কাছে যাব? যদি কেউ একটু কাছে থাকে, কিছু করতে হবে না, যদি একটু ভরসা দেয়, তাহলেই ঠিক পেরে যাব।'

গায়ত্রী শেষ কথাগুলো উচ্চারণ করেছে, নাকি তার চোখের ওপর চোখ রেখে নিঃশব্দে বলেছে, তা সে ঠিক নিশ্চিত না। কারণ গায়ত্রী তার চোখের দিকে তাকিয়েছিল গোটা পৃথিবীর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে। আর সে চোখ সরিয়ে সিগারেটে আগুন দিতে গিয়ে গোটা কতক দেশলাই কাঠি নষ্ট করেছে।

রাসবিহারীর মোড় থেকে বাস ধরেছিল তারা দুজন এক সঙ্গে, ঘড়িতে তখন পৌনে চারটে। আজই তার পার্টির মিটিংয়ে যাবার কথা। শুভ বলেছে তার জন্য দেশপ্রিয় পার্কের উল্টোদিকের ম্যাগাজিনের দোকানের সামনে দাঁড়াবে ঠিক চারটের সময়ে। বাসটা যখন দেশপ্রিয় পার্ক পার হচ্ছে, সে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করেনি শুভ তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে কিনা।

বাস থেকে নেমে সে আর গায়ত্রী কোনো কথা বলেনি। বাড়ির দরজায় এসে গায়ত্রী শুধু বলেছিল, 'কাল বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়াস, আমি আসব।'

জীবনে এই প্রথম গায়ত্রী চলে গেলে তার কেমন ফাঁকাফাঁকা লাগছিল, কেমন যেন কষ্ট হচ্ছিল। গায়ত্রী যদি আরো অনেকক্ষণ তার সঙ্গে থাকত, তার ভাল লাগত।

যেদিন বাবা রাতে ফেরেনি, সেদিন সে অনুভব করেছিল হঠাৎ সে বড় হয়ে গেছে। আজকের বিকেলটা অনেকটা সে রকম। সেকেন্ড ইয়ারে উঠবে সে, কাজেই নতুন করে বড় হবার অনুভূতি তার হচ্ছে না। কিন্তু পৃথিবীটা আজকের দুপুরের পর থেকে কেমন যেন অন্য রকম। চারদিকটা কেমন যেন ভারী, আগের মতো হালকা নয়। নিজে সে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে সেটা সে নতুন করে বুঝতে চাইছে। ট্রামরাস্তার ফুটপাথে গায়ত্রীর কান্না আর চায়ের দোকানে গায়ত্রীর চোখের গভীরতা তাকে ভাবাচ্ছে, জীবনটা সে যে রকম ভেবেছে, জীবনটা সে রকম নাও হতে পারে। পালিয়ে যেতে তার ভাল লাগে, কিন্তু কত দিন সে পালাবে—এবার সত্যি-সত্যি ভাবার সময় এসেছে।

এ রকম একটা বিকেলে আড্ডায় গিয়ে বসার ইচ্ছা তার হল না। শুধু একটাই কথা তার বারবার মনে হচ্ছে—শুভ তার জন্য অপেক্ষা করবে। আজ তাদের কোর গ্রুপের মিটিং, এই প্রথম পার্টি তাকে ডেকেছিল। আজ সকাল পর্যন্ত সে নিশ্চিত ছিল না, সে শেষ পর্যন্ত এই মিটিংয়ে যাবে কিনা। কারণ তার ভেতর থেকে পালিয়ে যাওয়াটা কখন মাথা চাড়া দেবে, সে নিজেও জানে না। কলকাতার এই বিবর্ণ আকাশ কখন যে তার রঙ পাল্টে রঙিন হয়ে উঠবে, সে জানে না। আর যখন তা হবে সে তখন অন্য রাজ্যের, অন্য জগতের মানুষ। সে তখন ফিরেও তাকায় না তার আসল জীবনের দিকে। কিন্তু আজ তো সে পালায়নি, বরং সে চেষ্টা করেছে গায়ত্রীর লড়াইকে অনুভব করতে। পার্টি কি তাকে আর একবার সুযোগ দেবে না?

বারান্দার চেয়ারে সে বসেছিল। গোটা পাড়াটাই প্রায় তার চোখের সামনে দিয়ে ঘরে ফিরছে। কেউ যাবার সময় তার দিকে তাকিয়ে হেসেছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে দুটো কথা বলেছে, কোনোটাই তাকে আজ স্পর্শ করেনি। এমনকী বাবার বন্ধু মিত্রকাকুর সঙ্গে

সন্ধ্যার অন্ধকারে মোড়ে দাঁড়িয়ে ছোট এত কী কথা বলছে—এটাও তাকে বিন্দুমাত্র বিস্মিত করেনি।

এই শীতের সন্ধ্যায় কোথাও না পালিয়ে সে মগ্ন হয়ে আছে নিজের চিন্তায়। মাই হেভেনের আলোকিত জানালার দিকে সে একবারও তাকায়নি। গায়ত্রীর টিকে থাকার লড়াইয়ের পাশে তার অসহায় উপস্থিতি তাকে বাধ্য করেছে বাস্তবের পৃথিবীতে তার স্থানাঙ্ক নির্ণয়ে। আর সেই চিন্তা তাকে আরো অসহায় করে দিচ্ছে। লড়তে-লড়তে গায়ত্রী লড়াই করতে শিখেছে, লড়াইয়ে গায়ত্রীর ভয় নেই, শুধু একটু কাউকে পাশে পাবার ইচ্ছা। কিন্তু সে তো কোনো দিন বাস্তবের লড়াইয়ে নামেইনি। লড়াইকে তার আজন্ম ভয়। ভয় অন্তুদের গলিতে রক্তমাখা হাতের ছাপে, ভয় সি-আর-পির বুটের আওয়াজে, ভয় তার গায়ত্রীকে। ভয়ের বিরুদ্ধে তার একটাই হাতিয়ার—পালিয়ে যাওয়া। কখনো মাই হেভেনের সন্ধ্যায় আলোকিত জানালার ওপারে উড়ন্ত লেসের পর্দার আড়ালে, কখনো রূপকথার মতো আবছা সুদূর আর রঙিন অসীমদার দেখানো স্বপ্নে। অসীমদা তাকে লড়াই শেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তো তার কাঠের ঘোড়া থেকে নামতেই পারেনি। নিজের জীবনের রংহীনতার দুঃখ সে ভুলেছে আকাশের গায়ে নানা রং লাগিয়ে।

মাস কয়েক আগে বাবার বন্ধুরা রাতে অফিস থেকে বাবাকে ট্যাক্সিতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। অফিসে হঠাৎ বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবাই বলল, কিছু না, দু-দিন বিশ্রাম নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু পাড়ার একমাত্র ডাক্তার, রায় ডাক্তারবাবু দেখেশুনে বলেছিলেন—মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক, ভয়ের কিছু নেই, কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে। সাবধানে থাকা মানে বাবা দিন তিনেক অফিসে যায়নি। তারপর সেই সকাল আটটা থেকে রাত আটটা।

যদি কাল বাবার সত্যি কিছু হয়। কী করবে তারা? মার কাছ থেকেই সে জানে, বাবার নামে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও সেই অ্যাকাউন্টে টাকা-পয়সা বিশেষ নেই। বাবার কিছু হলে অফিস থেকে টাকা-পয়সা কিছু পাওয়া যাবে কি না তা সে জানে না। কিন্তু বাবা চাকরি করা অবস্থাতে যা পায়, তাতেই তাদের কোনো মতে চলে, কাজেই বাবা না থাকলে যদি কিছু পাওয়াও যায় তাতে সংসার চলবে না। সে উঠবে সেকেন্ড ইয়ারে আর ছোট মাধ্যমিক দেবে। আরো অন্তত দু-বছর তার বি এস-সি পাস করতে। আর পাস করলেই বা কী। বাবার বকা খেয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে গিয়ে কার্ড করিয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে যে কিছু হয় না, তা সে জানে। শম্ভুর দাদার নাকি পনের বছরের পুরোনো কার্ড, কিন্তু একটা কলও আসেনি। অন্তুর মতো হলে চাকরি পাওয়া যায়, কিন্তু সে তো তা হতে পারবে না।

গায়ত্রীর মতো তাকে যদি গোটা সংসারের হাল ধরতে হয়, তবে সে কী করবে? সে নিজেই জানে না কী করে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়, সে কোনো যোগ্যতায় গায়ত্রীকে বলবে, 'আমি তোর পাশে আছি'। গায়ত্রী কি তাকে চেনে না? নাকি সাহায্য চাওয়ার নামে গায়ত্রী তাকে লড়াইয়ের পথে নামাতে চেয়েছে? গায়ত্রী কি বোঝে তিশি নামের একটা কল্পনার আশ্রয়ই তার পালাবার শ্রেষ্ঠ জায়গা? তার মুখ-চোখে কি কখনও তিশির প্রতি মুগ্ধতা, তিশিকে না পাবার গভীরতম যন্ত্রণার ছাপ ফুটে বেরোয়? যে গভীরতা গায়ত্রীর চোখে, তার সামনে কি তার গোপনতম কথাকে আড়াল করতে পেরেছে? সে বুঝেছে কল্পনার রাজত্ব থেকে একক শক্তিতে সে বেরিয়ে আসতে পারবে না। কাল সকালে বাসস্ট্যান্ডে গায়ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হবে। কাল সকালেই সে গায়ত্রীকে বলবে, 'আমি ঠিক

বেরিয়ে আসব, তুই যদি পাশে থাকিস'। একটা দীর্ঘযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হতে-হতে অবশেষে সে জিতেছে। সে ক্লান্ত কিন্তু সুখী। মাই হেভেনের দোতলার কোণের ঘরে আলো জ্বলছে, এই প্রথম একটা রাত, ওদিকে সে তাকায়নি। ভয়ে, যদি সে আবার হেরে যায়।

গায়ত্রী বলে ওদের জুঁইগাছে যখন ফুল ফোটে, তখন নাকি সন্ধেবেলায় ঘর থেকেই তার গন্ধ পাওয়া যায়। সে ভাববার চেষ্টা করে সেই জুঁইফুলের গন্ধ মাখা এই সন্ধ্যায় মাটিতে মাদুর পেতে গায়ত্রী পড়ছে। আকাশ আজ কালো, কোনো অপবিত্র অশুভ রঙের ছাপ তাতে নেই, কিন্তু সেই আকাশে আছে বেনারসি শাড়ির মতো অসংখ্য তারার কাজ। অঙ্ক করতে করতে অন্যমনস্ক গায়ত্রী গুনগুন করে গাইছে--

তোমায় গান শোনাবো তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখো
ওগো ঘুম ভাঙানিয়া ..

চিরকালই সে রাস্তা থেকে গায়ত্রীকে ডেকেছে। কিন্তু আজ কেন জানি তার বাধোবাধো ঠেকছে, কেমন যেন লজ্জা লজ্জা লাগছে, ভয় হচ্ছে কে কী মনে করবে। কিন্তু তার মুশকিল আসান করে দিল বুড়ি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে। সে মুখ তুলতেই বুড়ি বলল, 'দিদি তৈরি হচ্ছে', তারপর একটু থেমে, 'আজ কোনো সিনেমায় যাবে গো চাঁদুদা?'

সে হাসি আর কপট বিরক্তি মিশিয়ে বলল, 'কী বলছিস?'

'আহা, আমি যেন জানি না, অর্ধেক দিন তোমরা কলেজে কেটে সিনেমা দেখতে যাও।' বলে বুড়ি একদম হেসে অস্থির। বুড়িটা সারাক্ষণ হাসে আর বকবক করে, গায়ত্রীর মতো চুপচাপ নয়। সে হঠাৎ আবিষ্কার করে, বুড়িটা দেখতে বড় সুন্দর হয়েছে।

'পাকামো করলে মারব এক থাপ্পড়', এই বলে সে হাঁটা দিল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। বুড়ি আবার হেসে গড়াগড়ি।

বাসস্ট্যান্ডে এখন প্রচুর ভিড়। তবে ভিড়টা উল্টোদিকে বেশি, কারণ অফিসপাড়ায় বাসগুলো ওইদিক দিয়ে আসবে। তাকেও ওদিক থেকেই বাস ধরতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না গায়ত্রী আসে সে এ পাশেই দাঁড়ায়, কারণ ওদিকটায় রোদ। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ালে আড্ডা মারার জন্য কাউকে-না-কাউকে পাওয়া যায়। আজ সে সে-রকম কাউকে পেল না। শচীনের চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে যুগান্তর পড়া যায়। কিন্তু কী ভেবে সে একা-একা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে রইল।

তাকে পাশ কাটিয়ে তিশি যখন তার দু-হাত সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে---তখনই সে তিশিকে খেয়াল করল। আকাশি পাড়ের একটা সাদা তাঁতের শাড়ি, কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো চুল একটা সাদা রঙের ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা। চুলের নীচে ডান দিকের কাঁধের যেটুকু অনাবৃত তা যেন গোলাপি মার্বেলে তৈরি। কাঁধে একটা কালো কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ। সে হাত বাড়ালেই প্রায় তিশিকে ছুঁতে পারে। সে যেন মন্ত্রমুগ্ধ, সামনে দাঁড়ানো তিশি ছাড়া গোটা পৃথিবীটাই তার দৃষ্টি থেকে তখন মুছে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার বারবার মনে হচ্ছে আজকে তিশির সঙ্গে তার দেখা না হলেই ভাল হত। যদি সে আগে দেখতে পেত তিশি আসছে সে অন্তত এখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু তিশিকে এত কাছে দেখে চলে যাবার সব শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। সে চলে যেতে চায়, তিশির থেকে অনেক দূরে চলে যেতে চায়।

কী একটা বাস এসে সামনে দাঁড়াতে তিশি এগিয়ে গেল বাসের ফার্স্ট গেটের দিকে। বাসটায় অসম্ভব ভিড়। সেলিমপুরের তপু বাসের ফার্স্ট গেট থেকে পড়ে গিয়েছিল, পায়ের ওপর দিয়ে পেছনের চাকা চলে যায়। এরপর থেকে সে ভয়ে ভিড়-বাসের ফার্স্ট গেটে ওঠে না, এমন কী কাউকে ফার্স্ট গেটে ঝুলতে দেখলে তার কেমন একটা ভয় হয়। সে কী করবে, ছুটে গিয়ে তিশিকে ফার্স্ট গেট থেকে সরিয়ে আনবে? সে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল তিশির দিকে। তার সমস্ত উৎকণ্ঠাকে নস্যাৎ করে তিশি বাসটায় উঠতে পাড়ল না। তিশি আজকাল মাঝে মাঝে গাড়ি ছাড়া রাস্তায় বেরোয়, কিন্তু এখনো বোধহয় কলকাতার রাস্তায় ভিড় বাসে ওঠবার কৌশলটা আয়ত্ত করতে পারেনি। কাঁধ থেকে ব্যাগটা একটু নেমে এসেছিল। ব্যাগটা ঠিক করতে-করতে তিশি তার পুরোনো জায়গায় ফিরে এল, একবার ঘড়িটার দিকে তাকাল। সে আর তিশি এখন মুখোমুখি। একবার চোখে চোখ হল, কিন্তু তাকে দেখে তিশির মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। কিন্তু সে আবিষ্কার করল, এই প্রথম তিশি একটা কালো টিপ পরেছে। তার চেনা তিশি কেমন অন্যরকম। কিন্তু এই 'অন্যরকম'টা আরো আকর্ষণীয়, তার পক্ষে আরো ভয়ঙ্কর। খুব ছোটবেলায় এক বারই সে পুরী গিয়েছিল। তার প্রায় কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে সে বালি দিয়ে একটা দুর্গ বানিয়েছিল, অনেকক্ষণ ধরে, খুব যত্ন করে। বানানো শেষ করে সে যখন দাঁড়িয়ে উঠে ভাল করে দুর্গটা দেখছিল, তখনই একটা ঢেউ এসে তার দুর্গ ভেঙে দিয়েছিল। সে এত দুঃখ পেয়েছিল যে, ভ্যাঁ করে কেঁদে দিয়েছিল। তার কান্না দেখে মা হাসতে-হাসতে বাবাকে বলেছিল, 'দেখো তোমার বোকা ছেলের কাণ্ড'। কাল বিকেল থেকে সে বোধহয় এ রকম একটা দুর্গই বানিয়েছিল। এই ভিড় বাসস্ট্যান্ডে বাস ধরতে না পেরে তিশি ফিরে আসছে তার ভুরুর কোনে সামান্য বিরক্তির চিহ্ন নিয়ে, তাও কী সুন্দর! প্রথম সমুদ্র স্রোতেই তার বালির দুর্গ ভেঙে যাচ্ছে, আর এখন সে কাঁদতেও পারবে না।

কলকাতার ভিড়ে যে তিশি অভ্যস্ত নয় তা প্রতিপদেই বোঝা যাচ্ছে। পরের বাসের জন্য তিশি দাঁড়াল ভিড় থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে, প্রায় রাস্তার মাঝখানে। সেও এসে দাঁড়াল ভীড়ের সামনে এমন জায়গায় যেখানে তার আর তিশির মাঝখানে কেউ নেই। বাসটা ছিল ডবল ডেকার, বাধ্য হয়েই তিশি ফার্স্ট গেটে। কিন্তু গেটের কাছেই তিশি পৌঁছতে পারেনি। দুজন বাস থেকে নামছিল, আর রাস্তার ভিড়টা ঝাঁপিয়ে পড়েছে উঠবার জন্য, গেটের কাছে একটা বিচ্ছিরি ধাক্কাধাক্কি। তিশি একটু দূর থেকে হতাশ ভাবে বাসটার দিকে তাকিয়ে রইল।

তিশি আজ সকালের বাসস্ট্যান্ডে বড় বেমানান। মাই হেভেন, আকাশি ফিয়াট, স্কুলবাসের বাইরের জগৎ তিশির জন্য নয়। তাকে কিছু একটা এবার করতেই হবে। কারণ সে দেখে নিয়েছে বারবার ঘড়ি দেখার ফাঁকে ক্রমশ করুণ হয়ে আসছে তিশির মুখটা। সে একবার পেছনের দিকে তাকাল, না গায়ত্রী এখনো আসছে না। একমাত্র গায়ত্রীই তাকে বাঁচাতে পারে। গায়ত্রী এলে সে গায়ত্রীর সঙ্গে রাস্তাটা পার হয়ে দাঁড়াবে উল্টোদিকের বাসস্ট্যান্ডে। যতই ভিড় হোক তারা ঠিক বাসে উঠতে পারবে। কলেজে গিয়ে প্রথমেই সে ক্ষমা চাইবে শুভর কাছে, কালকের মিটিংয়ে না যাবার জন্য, কথা দেবে এবার থেকে সে পার্টির সব মিটিংয়ে যাবে। তাকে গায়ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই শিখতে হবে।

তৃতীয় বাসটা প্রাইভেট বাস। আগের দুটোর অভিজ্ঞতা থেকেই বোধহয় তিশি এগোল সেকেন্ড গেটের দিকে। সে অবশ্য আগেই ছুটতে শুরু করেছিল। সবার আগে গিয়ে সামনের

দিক থেকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেকেন্ড গেটের পেছনের দিকের হ্যান্ডেলের ওপর, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে সে ঝুলন্ত ভিড়টাকে ঠেলে দিল পেছনের দিকে। এর ফলে সামনের হ্যান্ডেল এবং সিঁড়িটা কিছুটা ফাঁকা হয়ে গেল। তাকে স্পর্শ করেই তিশি উঠে পড়ল বাসের দ্বিতীয় সিঁড়ি পর্যন্ত এবং গোটা ভিড়টার প্রচণ্ড চাপে সে ছিটকে গেল। বাসটা যখন চলতে শুরু করেছে সে হ্যান্ডেলটা ধরে আছে, কোনোমতে একটা পাও সে পাদানিতে দিয়ে দিতে পেরেছে। তিশি উঠে গেছে ওপরের ধাপে, কিন্তু তার আর তিশির মাঝখানে একটা গোটা ঝুলন্ত ভিড়।

বাস চলতে শুরু করার পর তার শুধু একটা কথাই মনে হল—গায়ত্রী এসে তাকে খুঁজবে এবং পাবে না।

যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে তিশি নামল প্রায় লড়াই করে। সে তখনোও হ্যান্ডেল ধরে বাইরে ঝুলছে। তিশি ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তার শাড়ির ভাঁজ ঠিক করছিল। বাসটা চলতে শুরু করেছে, বাসটার গতি যথেষ্ট বাড়ার আগেই সে হ্যান্ডেল থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। ভেতর থেকে কন্ডাক্টর চেঁচাল, 'দাদা ভাড়াটা'। সে কথাটা শুনতে পেয়েছে এরকম কোনো হাবভাবই দেখাল না। তিশি তখন হাঁটতে শুরু করেছে সামনের দিকে, সে হাত দশেক পেছনে। ফুটপাথটা এদিকে একটু ফাঁকাফাঁকা। সে ভয় পাচ্ছে, কোনো কারণে যদি তিশি পেছনে ফেরে তাহলে তাকে দেখতে পাবে। এবং এইখানে তাকে দেখলে তিশি কিছু একটা সন্দেহ করতে পারে। আরো ভয়, বাসটা যদি দাঁড়িয়ে যায় আর কন্ডাক্টার নেমে আসে তার কাছ থেকে ভাড়া আদায় করতে, তাহলে একদম কেলেঙ্কারি হবে। কিন্তু তার ভাগ্য ভাল, বাসটা না দাঁড়িয়েই চলে গেছে। তিশি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল। এবার তার কিছুটা সুবিধা হয়ে গেল, কেননা সামনে ক্যান্টিন, রাস্তার ওপর অনেক লোক, একগাদা ছাত্রছাত্রী। সে তিশির সঙ্গে দূরত্বটা বজায় রাখে। তিশি হাঁটছে খুব তাড়াতাড়ি, দেরি হয়ে গেলে লোকে যেভাবে হাঁটে, পেছনে ফিরে তাকানোর কোনো সম্ভাবনাই নেই। মেইন বিল্ডিংয়ের পোর্টিকোর নীচে একদল মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তিশিকে দেখে তারা চেঁচিয়ে উঠল হাসতে হাসতে। কী বলল, এটা সে এত দূর থেকে বুঝে উঠতে পারল না। তিশিকে নিয়ে গোটা দলটা এবার ভীড়ে ঘেরা নোটিশ বোর্ডের কাছে এগিয়ে গেল। তিশি ঢাকা পড়ে গেল ভীড়ে। সে এত দূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অ্যাডমিশন লিস্ট বেরিয়েছে, তিশি দেখতে এসেছে তার নাম আছে কি না। ভিড়ের মধ্য থেকে তিশিদের দলটা বেরিয়ে এল হাসতে-হাসতে। ওদের হাসি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ওরা যা দেখতে চেয়েছিল তা ওরা দেখেছে। গোটা দলটাই রঙিন, গোটা দলটাই উজ্জ্বল—কিন্তু তিশি এদের মধ্যে থেকেও আলাদা করে উজ্জ্বল, বোধহয় কালো টিপটার জন্য।

ক্রিম রঙের একটা অ্যাম্বাসাডারে উঠে ওরা যখন চলে গেল, তখন তার সামনে গোটা একটা দুপুর আর বিকেল এবং সে জানে না সে কী এখন করবে। তার থেকে বড় কথা, সে জানে না এখানে সে কেন এসেছিল। পায়ে-পায়ে সেও এসে দাঁড়াল অ্যাডমিশন লিস্টগুলোর সামনে। ভিড় ঠেলে সেও তন্নতন্ন করে লিস্টগুলো দেখতে লাগল। একদম কোণে কম্পারেটিভ লিটারেচারের লিস্টে ছ-নম্বরে সে নামটা দেখল—সীমন্তী চ্যাটার্জি। ভিড় ঠেলে সে যখন বেরিয়ে এল, তখন সে আরো বিষণ্ণ।

যাদবপুরে স্টেশনের উল্টোদিকের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সে দাঁড়াল। একবার মনে হল টিকিট কাটবে কি না। কিন্তু সে তো জানে না, কোথায় যাবে। সে তো জানে না, যেখানে সে যেতে চায় সেখানে কোনো ট্রেন যায় কি না।

কয়েকটা স্টেশনের পরে সে বসবার জায়গাও পেয়েছিল। বাইরের দৃশ্য, তাও যেন কেমন বিবর্ণ, ধান কাটার পর পড়ে আছে ধূসর মাঠ। কামরার ভেতরে একটা আকারহীন ভিড়। মাছের আঁশটে গন্ধকে ছাপিয়ে আসছে গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ। ট্রেনটা যখন থেমেছিল শেষ স্টেশনে তখনই সে নেমেছিল এবং দেখেছিল স্টেশনটার নাম লক্ষ্মীকান্তপুর। স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটা ভিড় বাজারের মধ্যে দিয়ে সে হাঁটতে শুরু করেছিল—কোথায় যাচ্ছে এবং কেন যাচ্ছে এগুলো না জেনেই।

'চাঁদু তুই যদি এখন আমায় না খাওয়াস, তবে তোর সঙ্গে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'বাজে বকিস না, কোথা থেকে খাওয়াব?'

'ওসব জানি না, তুই ম্যানেজার তোকেই খাওয়াতে হবে।'

'এমন সব কথা বলিস না! তুই জানিস না, টাকা-পয়সার কী অবস্থা?'

'না আমি জানি না, জানতেও চাই না। ওসব তুই আর তোর এডিটার শুভ জানে। আমি শুধু জানি এ মাসের হাত খরচের টাকা তোরা আমায় টুপি পরিয়ে নিয়ে নিয়েছিস।'

'শালা, তুই একা টাকা দিয়েছিস, বাকিরা দেয়নি? বন্ধুর মার ক্যান্সার বলে ঢপ দিয়ে মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসেছি।'

'এনেছিস, বেশ করেছিস, সেই টাকায় খাওয়া। সকাল থেকে এসে খেপ খাটছি তুই দু কাপ চা ছাড়া কিচ্ছু খাওয়াসনি।'

'এই, কাল সন্ধ্যায় তোদের খাওয়াইনি?'

'খাইয়েছিস, চামড়ার মতো পরটা আর আলুর খোসার তরকারি। টাকা-পয়সা কোনো ব্যাপার না, আসলে তুই একটা হাড় কিপটে। মরলে পরের জন্মে তুই হাড়গিলে হবি। এই জানলে আমি প্রেসের ঝামেলায় ভিড়তামই না।'

'ভিড়তামই না', সে ভেঙিয়ে ওঠে, 'পারমাণবিক পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আঁতলামো করবে তুমি, তার প্রুফ দেখে দেবে অন্য লোক?'

'চাঁদু আঁতলামো বলে ইনসাল্ট করিস না।' তারপরই একগাল হেসে, 'বলো গুরু, লেখাটা ভাল নামিয়েছি না?'

'হ্যাঁ, পাঁচ জায়গা থেকে চোতা মেরে হেভি নামিয়েছ, যাও এবার দু-কাপ চা বলে এসো।'

'আরে, এফিসিয়েন্টলি চোতা মারাটাও একটা আর্ট।'

আজকে তাদের ম্যাগাজিন বেরোবে। সে আর গৌতম এসে বসে আছে সকাল দশটা

থেকে প্রেসে। দপ্তরিখানা থেকে 'আধ ঘণ্টা'র মধ্যে চলে আসার কথা। এখন প্রায় দেড়টা, কিন্তু ম্যাগাজিনের দেখা নেই।

ম্যাগাজিনটার প্রথম কপিটা হাতে নিয়ে গৌতম ক্যান্টিনে ঢুকল চেঁচাতে-চেঁচাতে—'দিস ইস 'ক্যানভাস', আফটার কমিউনিস্ট ম্যানুফেস্টো, ইট ইস দ্য বেস্ট ডকুমেন্ট অব হিউম্যান ইমানসিপেসন।'

তাদের টেবিল ঘিরে তখন প্রায় ছোটখাট একটা ভিড়, সবাই বোধহয় ম্যাগাজিনের অপেক্ষায় বসে আছে। ভিড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল শুভ। দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে গৌতমের হাত থেকে ম্যাগাজিনটা কেড়ে নিয়ে, চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'ননসেন্স, ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন। ওরা খবর পেয়ে গেলে সব যাবে। চাঁদু ম্যাগাজিনগুলো কেমিস্ট্রি ল্যাবে অনাদিদার ঘরে নিয়ে যা, আমি বাকিদের নিয়ে আসছি।'

বেরিয়ে যেতে-যেতে সে একবার তাকাল গোটা ক্যান্টিনটার দিকে। ইউনিয়নের কেউ নেই। কিন্তু যারা আছে তারা সবাই প্রায় তাদের দিকে তাকিয়ে। এদের মধ্যে কেউ ওদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবে না তারই বা গ্যারান্টি কী?

প্রুফ দেখতে-দেখতে সব লেখাই তার অনেক বার পড়া। কিন্তু ছেপে বেরোনোর পর গোটাটাই কেমন অন্যরকম। ঠিকই ম্যাগাজিনে তার কোনো লেখা নেই, নেই গায়ত্রীর কবিতা। কিন্তু এই ম্যাগাজিনটা তার। পার্টির মিটিংয়ে না যাওয়া নিয়ে শুভ তাকে কিছু বলেনি। একটা গভীর অপরাধবোধ থেকে এব্যাপারে সে নিজের থেকে কোনো কথা শুভর সঙ্গে বলতে পারেনি। কিন্তু আর কেউ না জানুক সে জানে এই ম্যাগাজিনটার পেছনে আছে পার্টি। ম্যাগাজিনটার জন্য সে আপ্রাণ খেটেছে তার অপরাধ ক্ষালন করার জন্য। সেদিনের মিটিংয়ে আর কে-কে গিয়েছিল তাও সে জানে না। কাজেই বন্ধুদের মধ্যে আর কে-কে পার্টির সঙ্গে আছে সেটা সে জানে না। কিন্তু তার খুব জানতে ইচ্ছা করে। জানার কোনো সুযোগ তার নেই। জিজ্ঞাসা করাটা অনুচিত এটাও সে বোঝে। তার শুধু একটাই ভাবনা, সে যে পার্টির ডাকা মিটিংয়ে যায়নি এটা কি ওরা ছোটকে জানিয়ে দিয়েছে?

ম্যাগাজিনের দুটো কপি সে বাড়িতে নিয়ে যায়। একটা ম্যাগাজিন ঘরের টেবিলে এমনভাবে রেখে দেয় যাতে ছোটর চোখ পড়ে। আর একটা কপি দেয় মাকে। মা বলে, 'দূর পাগল, আমি কি এখনকার লেখা কিছু বুঝব?'

সে প্রতিবাদ করে, 'না গো, তুমি পড়ে দেখো, তোমারও ভাল লাগবে। আমরা অন্যদের মতো লিখি না।'

মা জিজ্ঞাসা করে, 'তুই কিছু লিখেছিস?'

এই প্রথম কিছু লিখতে না পারার জন্য তার দুঃখ হল। তার অক্ষমতার কথা জানলে মা বোধহয় কষ্ট পাবে। সে বলল, 'না মা, নানা কাজে এবারে লিখতে পারিনি। সামনের সংখ্যায় লিখব।'

রাতে শোবার জন্য ঘরে ঢুকবার আগে মার ঘরে উঁকি দিতে চোখে পড়ল, মা মশারির বাইরে টুলে বসে ম্যাগাজিনটা পড়ছে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখে পড়ল, ছোটর টেবিলে কাল রাতে ম্যাগাজিনটা যেভাবে পড়েছিল এখনো সে ভাবেই পড়ে আছে। কলেজে যাবার জন্য সে স্নান করতে গিয়েছিল,

ঘরে ফিরে এসে দেখল ঘরে ছোট নেই, ম্যাগাজিনটাও নেই। বাসস্ট্যান্ডে গায়ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে-করতে একটা কথাই ভাবছিল—ছোট কি তাকে ক্ষমা করবে? নাকি সারা জীবনের জন্যই ছোটর চোখে সে ছোট হয়ে রইল।

শনিবার এমনিতেই ক্লাস কম, দুপুর তিনটে নাগাদ ক্যান্টিন বেশ ফাঁকাফাঁকা। কিন্তু তাদের টেবিলে আড্ডা জমজমাট। এখন তাদের আড্ডা আর একটা টেবিলে ধরে না, আশেপাশের টেবিলগুলোও দখল হয়ে যায়। ম্যাগাজিনটা নিয়ে যারা জড়ো হয়েছিল তারা তো আছেই, অনেক নতুন ছেলেমেয়েও জুটে যাচ্ছে। শুভ এখন কলেজের হিরো, এমন কী অনেকের চোখে সেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। ক্যান্টিনে, করিডোরে অনেকে এখন ডেকে কথা বলে। বিষয়টা সে উপভোগই করছে।

তাদের আড্ডার টেবিল ছেড়ে সে আর শুভ বসেছে অন্য টেবিলে। বসেছে টাকা-পয়সার হিসাব নিয়ে। প্রেসে টাকা বাকি, কাগজের দামও বাকি। প্রেসের লোক শুভর চেনাশোনা, কিন্তু কাগজের লোক এর মধ্যে দুবার ক্যান্টিন পর্যন্ত হানা দিয়েছে। ম্যাগাজিন অনেকটাই বিক্রি হয়েছে, কিন্তু তার অধিকাংশরই দাম এখনো পাওয়া যায়নি। ম্যাগাজিনের টাকা মোটামুটি পেলেও দেখা যাচ্ছে শ-দেড়েক টাকা বাকি থেকেই যাচ্ছে। সে আর শুভ এই সব হিসেবপত্র নিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছিল।

তাদের আড্ডা থেকেও আস্তে আস্তে সবাই উঠে গেছে। শেষে যাবার আগে গায়ত্রী আর শালিনী তাদের টেবিলে এসেছিল। গায়ত্রী জানতে চাইছিল সে এখন বাড়ি যাবে কি না। সে জানিয়েছিল তার একটু দেরি হবে। শুভ হঠাৎ বলল, 'শালিনী তোর রুপোর চামচটা দিবি?'

শালিনী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কীসের চামচ?'

শুভ বলল, 'সেই রুপোর চামচটা, যেটা তুই মুখে নিয়ে জন্মেছিলি। পেলে ওটা বেচে ধার শোধ করতাম।'

শালিনী হেসে ফেলল, 'ওটা বেচতে আর কিছু বাকি রেখেছিস। মা আর বাবার কাছ থেকে আগামী ছ-মাস কোনো টাকা চাইতে পারব না। এমনকী গ্যাস দিয়ে ঠাকুমার কাছ থেকেও টাকা নিয়ে এসেছি।'

'শুধু ঠাকুমা? কেন তোর ঠাকুরদা, দাদু, দিদিমা, এঁরা কেউ বেচে নেই?' সে মন্তব্য করল, শালিনীকে রাগানোর জন্যই।

'কী আহ্লাদ রে, আমার চোদ্দো গুষ্টির কাজ যেন তোদের ম্যাগাজিনের জন্য টাকা জোগান দেওয়া।'

'হ্যাঁ, এভাবে যদি অতীতের পাপক্ষয় হয়।'

'এক থাপ্পড় মারব চাঁদু। আর তুই কথা বলিস কীরে, তুই যা প্রুফ দেখেছিস তোকে আবার বর্ণপরিচয় পড়াতে হবে।'

'সামনের সংখ্যার জন্য তো আই আই টি থেকে স্পেশাল প্রুফ রিডার নিয়ে আসছি।'

'যা-যা, আই আই টির লোকেরা এসব করে না।'

'তবে তারা কী করে, শুধু প্রেমপত্র লেখে?'

'শুধু প্রেমপত্র লিখবে কেন, তারা টেনিস খেলে, রেসিং কার চালায়।'

'তাহলে তুমি আর এখানে বসে ম্যাগাজিন করছ কেন? ঘরে গিয়ে ইকেবানা শেখো, সুচ-সুতো দিয়ে 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' লেখো গিয়ে।' বলেই তার মনে হল কথাটা একটু কড়া হয়ে গেল, শালিনী বোধহয় সত্যি-সত্যি রেগে যাবে।

শালিনী রেগেছে, কিন্তু সেই রাগ প্রকাশ না করেই বলল, 'যদি দু-ধরণের কাজই করি', তুই ঠেকাতে পারবি?'

তর্কের একটা নিজস্ব আকর্ষণী ক্ষমতা আছে। বলব না বলব না করেও সে বলে ফেলল, 'দুটো এক সঙ্গে হয় না।'

'হয় কি না ভবিষ্যতেই দেখা যাবে। তবে যদি আমার না হয়, তোরও হবে না চাঁদু। আসলে তুই আর আমি একই। কাল যদি তুই একটা ভাল চাকরি পাস, তোর বউও ইকেবানা শিখবে, সেলাই করে 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য' লিখবে, আর তুই আপ্রাণ চেষ্টা করবি টেনিস খেলা শিখতে।'

বিষয়টা প্রায় ঝগড়ার জায়গায় চলে যাচ্ছে। গায়ত্রীই সেটা আটকাবার চেষ্টা করে, 'তুই ঠিকই বলেছিস শালিনী। যে যাই বলুক আমরা সবাই মধ্যবিত্ত। আমরা বিপ্লব করব আর বড়লোক হব দুটো স্বপ্নই একসঙ্গে দেখি। বিপ্লব-বিপ্লব বলে লেখা আর বক্তৃতা দেওয়াটা সোজা কিন্তু নিজের জীবনে তা করে দেখানোটা খুব কঠিন। এই যে শুভ, নিজের বুকে হাত দিয়ে বলুক ও পেরেছে কিনা।'

'না পারিনি, গায়ত্রী ইউ আর কারেক্ট। কিন্তু আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি নিজেকে ডিক্লাস করার জন্য।'

ডিক্লাস কথাটা সে আগে কখনও শোনেনি। কিন্তু কথাটার মানে সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। শুভ বলে, 'তোদের ব্যাপার আমি জানি না। কিন্তু আমার কাছে বিষয়টা খুব পরিষ্কার। এই মধ্যবিত্ত জীবনটা থেকে আমার কিছু পাবার নেই। নিজেকে বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করতে না পারলে হতাশা ছাড়া এ জীবনটার থেকে আর কীই বা পাব? তুই চাঁদুর কথায় রাগ করিস না শালিনী। আসলে আমরা কেউই চাই না এভাবে হারিয়ে যেতে। বল, তোর মা, মানে আমাদের মাসিমা—কেবলমাত্র বড়লোকের বউ হয়ে খুশি?'

শালিনী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, 'ও প্রসঙ্গ থাক। তবে শুভ একটা ব্যাপারে আমি তোদের ওপর গ্রেটফুল। অন্যভাবেও যে.বাঁচা যায়, সেটা তোদের সঙ্গে মিশেই আমি জেনেছি। আমি এই জানাটাকে নষ্ট করব না, তাতে অনেক কিছু যদি ছাড়তে হয় তাও ছাড়ব। আর শুভ তোকে একটা কথা বলি, আমার বাবা আই এ এস অফিসার এটা আমার কোনো অপরাধ নয়, আর আমার বাবা নিজে...', বলে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার বলে, 'থাক্ সে সব তোরা বুঝবি না। আমি জানি তুই আমায় বিশ্বাস করিস না। কিন্তু আমি তোকে বিশ্বাস করি। চ গায়ত্রী, দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তারপর তার মাথায় একটা চাঁটি মেরে, 'রাগ কোরো না বাবা চন্দ্রশেখর', বলে শালিনী দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

শুভর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল শালিনীর একটা কথায় সে পুরো বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। শুভর এরকম হেরে যাওয়া চেহারা সে কখনো দেখেনি। তার প্রচণ্ড রাগ হল শুভর দাঁত উঁচু দেবুদার ওপর। সে নিশ্চিত শালিনীকে কেউই কিছু বলেনি। কিন্তু শুভর ব্যবহারে কোনো না কোনো আভাস নিশ্চয়ই শালিনী পেয়েছে। তবু শুভর মতো বুদ্ধিমান ছেলের পক্ষে সেটা খুবই অস্বাভাবিক। অন্তত এক্ষেত্রে বুদ্ধির লড়াইয়ে শালিনীর কাছে শুভ হেরে

গেছে। নাকি ওরা যা বলে সেটাই ঠিক—মেয়েরা সব বোঝে। কিন্তু শালিনীর শেষ বিষণ্ণ হাসিটা সে কিছুতেই দূরে সরিয়ে দিতে পারছে না। শালিনীর জন্য ভীষণ খারাপ লাগছে, লজ্জাও লাগছে। সেই আগ বাড়িয়ে খোঁচা মেরেছে শালিনীকে। আর এই মুহূর্তে যেটা তার সবচেয়ে খারাপ লাগছে, গায়ত্রী কী ভাবল তার সম্পর্কে। সে মনে-মনে ঠিক করে নেয়, সোমবার কলেজে এসে প্রথমেই শালিনীর কাছে সে ক্ষমা চাইবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভই প্রথম মুখ খুলল, 'বল চাঁদু, কোথা থেকে টাকাটা জোগাড় হবে?'

সে তার নীল ডায়ালের ঘড়িটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এটা বেচে দেব?'

'ভাগ্, বেচতে-ফেচতে হবে না। কোনো মতে এ মাসটা সামলে দে। সামনের মাসের গোড়ায় আবার সবার কাছ থেকে টাকা নিতে হবে। স্যারদের কাছ থেকেও টাকা নেব।'

'কোন স্যার তোকে টাকা দেবে?'

'তুই জানিস না, অনেকে দেবে, খুশি হয়ে দেবে।'

'সে তুই দেখ, যদি দেয় তবে তো ভালই। কিন্তু এ বারটা না হয় পার করলাম—সামনের সংখ্যায় কী করব?'

'এভাবেই চেষ্টা করব। লিট্‌ল ম্যাগাজিন মানে এই। প্রতি মুহূর্তেই তার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এখন ভেবে মাথা খারাপ করে কী লাভ? চ উঠি।'

ক্যান্টিনের কাউন্টারে বসে ছিল ক্যান্টিনের মালিক দীপকদা। শুভ চায়ের দাম জিজ্ঞাসা করাতে দীপকদা জানাল শালিনী তাদের চায়ের দাম দিয়ে গেছে। সে কাউন্টারের ওপর হাত বাড়িয়ে কৌটো থেকে মৌরি নেবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় কথাটা কানে গেল, 'ভাই, তোমার নামই শুভব্রত?'

কথাটা বেশ জোরেই বলা হয়েছে, গলাটা পরিষ্কার এবং ভারী। প্রশ্নকর্তা তাদের একটু দূরে ক্যান্টিনের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে। তার মনে হল ছেলেটাকে সে কোথাও দেখেছে, কিন্তু কোথায় দেখেছে সেটা সে খেয়াল করতে পারল না। কোঁকড়া চুল, টিকোলো নাক, দাড়ি গোঁফ কামানো আর চোখে একটা রিমলেস চশমা—সব মিলিয়ে চেহারায়, কথায়, তাকানো ভঙ্গিতে একটা তীক্ষ্নতা আছে। শুভ কোনো উত্তর দিল না।

প্রশ্নকর্তা ছেলেটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমিই তো এই কাগজটার এডিটার?

ছেলেটার হাতে তাদের ক্যানভাস, এবারই তার চোখে পড়ল। শুভ এখনো কোনো কথার উত্তর দেয়নি। কিন্তু ছেলেটার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

'না যথেষ্ট ইনোভেটিভ্, কভারে আবোল তাবোলের একুশে আইন।' তারপর বেশ গলা তুলে পড়তে শুরু করল,

'শিব ঠাকুরের আপন দেশে
আইন কানুন সব্বনেশে
কেউ যদি যায় পিছলে পড়ে
প্যায়দা এসে পাকড়ে ধরে
কাজির কাছে হয় বিচার,
একুশ টাকা দণ্ড তার।

বাঃ চমৎকার।'

ছেলেটা যা বলছে সবটাই হাসিমুখে। কিন্তু ক্যান্টিনের গেটটা আটকে যে তিন-চারজন এসে দাঁড়িয়েছে তাদের সে চেনে। এরাই সারাক্ষণ ইউনিয়ন রুম আলো করে বসে থেকে।

সি-আর-পি পাড়ায় ঢুকলে প্রথমে দূর থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসত।

'এডিটোরিয়ালটাও বেশ অর্থবহ।...গত পঁচিশ বছরে একচল্লিশটি পদক্ষেপের মধ্যে দিয়ে আমরা জাহান্নমের যথেষ্ট কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেয়াল্লিশতম পদক্ষেপে আমরা সরাসরি পৌঁছে গিয়েছি খোদ জাহান্নমেই'...না ভাইটি তোমার পেনের জোরের প্রশংসা করতেই হবে।'

দীপকদা তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। ক্যান্টিনে যে ক-জন ছিল সবারই চোখ এদিকে। তাদের মধ্যে দু-একজন উঠে আস্তে-আস্তে সরে যাচ্ছে ক্যান্টিনের পেছনের গেটের দিকে। ক্যান্টিনের ছেলেগুলো তাড়াহুড়ো করে টেবিল থেকে কাপ-প্লেটগুলো তুলে নিচ্ছে।

সি-আর-পির দলটা মোড় ঘুরলেই প্রথম বুটের আওয়াজটা পাওয়া যেত।

'আচ্ছা তোমরা যারা কাফ্‌কা আর ক্যামু পড়া ইন্টেলেকচুয়াল, স্টেট এন্ড রেভিলিউশন পড়ে কী তোমাদের এই ধারণা হয়েছে যারা স্টেট চালায় তারা ইডিয়েট, কিচ্ছু বোঝে না।' দুটো ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে তার আর শুভর মাঝখানে।

ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে আমরা বুঝতে পেরেছি তো—'উপরোক্ত লাইনে লেখক বেয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের কথা বলিতে চাহিয়াছেন?'

শুভ চোখ থেকে চশমাটা খুলে পকেটে ঢোকাবার চেষ্টা করছে।

বুট পরা পা দিয়ে যখন কাঠের দরজায় লাথি মারত গোটা পাড়াটা থরথর করে কাঁপত।

'তোমাকে মিশায় দিতে পারি। জেলখানায় বড় জোর হাত আর পায়ের জয়েন্টগুলো আর আঙুলগুলো ভেঙে দেবে। এমনিতে বা ওমনিতে ক্যারিয়ারের বারোটা বাজবেই। প্রথম অপরাধ, তাই মিশায় দেব না। কিন্তু...।'

শেষবারের জন্য বোধহয় ছেলেটা অস্তুদের দেওয়ালটা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল, অন্তত রক্তমাখা হাতের ছাপটা দেখলে তাই মনে হয়েছিল।

শুভর চশমাটা ছিটকে পড়ল অনেকটা দূরে। মাথাটা নীচু করে শুভ ঘুঁষিগুলো যাতে মুখে না পড়ে তার চেষ্টা করছিল। পেছনের দুটো ছেলে চুলের মুঠিটা ধরে মাথাটা তুলে ধরতে ঘুঁষিটা গিয়ে পড়ল সরাসরি নাকে। শুভর গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ, রক্তটা বেরোল প্রায় ফিন্‌কি দিয়ে। লাথিটা মারা হল পেটে। চুলটা ধরে আছে, তা সত্ত্বেও হাঁটু মুড়ে শুভ বসে পড়ল।

মনে হচ্ছে মাথার মধ্যে একটা বিস্ফোরণ হল। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'মারছ কেন, ওকে

মারছ কেন?' তারপর সর্বশক্তি দিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাথিটা লাগল ডান দিকের বুকের নীচে পাঁজরাটায়। তা সত্ত্বেও সে আপ্রাণ চেষ্টা করল শুভকে আড়াল করার। জামার কলারটা পেছন থেকে ধরে তাকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলা হল, সে গিয়ে পড়ল একটা টেবিলের ওপর। টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল মাটিতে। উঠে বসবার চেষ্টা করতেই সে অনুভব করল, একটা প্রলয়ঙ্কর ভয়। তার চেতনা জুড়ে কেবল সি আর-পির বুটের আওয়াজ, নাপামে ঝলসানো নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসা একটা বাচ্চা ছেলে। সে পালাতে চায়, এই সব কিছু ছেড়ে সে পালাতে চায়। সে চলে যেতে চায় বাড়িতে, একদম মার কাছে। অথচ পালাবার বিন্দুমাত্র শক্তিও তার নেই। তাই সে আর উঠবার চেষ্টা করল না।

শুভর ব্যাগটা মাটিতে পড়েছিল, ছড়িয়ে পড়েছিল বই-খাতাগুলো। সেগুলো সে গুছিয়ে নেয়। দীপকদা শুভকে ধরে বেসিনের সামনে নিয়ে গেছে, কাঁপা-কাঁপা হাতে শুভ কলের জল দিয়ে রক্তে মাখামাখি মুখটা ধুচ্ছিল। দীপকদা সমানে গজগজ করছে, 'কেন আসিস তোরা, কেন আসিস তোরা মরতে? সব কিছুর বারোটা বেজে গেছে, তোরা কয়েকজন কী করবি? এ দেশে কোনো মানুষ থাকে না, থাকে শুধু ভেড়ুয়ারা।'

অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না। শেষে দীপকদা বলল, 'হাসপাতালে চ।'

ঐ অবস্থায় শুভ বলল, 'পাগল তুমি, হাসপাতাল মানেই পুলিসের ঝামেলা, কিছুতেই না।'

নাকে একটা রুমাল চাপা দিয়ে সে আর দীপকদা শুভকে ধরাধরি করে নিয়ে এল উল্টোদিকের ওষুধের দোকানে।

একজন বৃদ্ধ কম্পাউন্ডার যত্ন করে শুভর নাকের চারপাশের জমে থাকা রক্ত পরিষ্কার করছিল, সে এসে দাঁড়াল দোকানটার বাইরে। সে এতটাই ক্লান্ত দাঁড়িয়ে থাকতেও তার কষ্ট হচ্ছে। সে বসে পড়ল পাশের সিঁড়িটায়। যেখানটায় লাথিটা লেগেছিল সেখানটায় তীব্র একটা ব্যথা।

শনিবারের বিকেলের কলকাতা তখন তার চোখের সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। অফিস ভাঙা ভিড়টা চলে গেলেও বাসে-ট্রামে যথেষ্ট ভিড়। পাশের সিনেমা হলে বোধহয় শো ভেঙেছে, ফুটপাথের ওপর দিয়ে আর একটা জনস্রোত। প্রচণ্ড সাজগোজ করা তিনটে মেয়ে হেসে একজন আর একজনের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ছে, পেছন-পেছন গোটা চারেক ছেলে। মাঝখানের মেয়েটা পেছনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ন্যাড়া মাথা, আবার কত রস!' খেয়াল করে সে এবার দেখল পেছনের ছেলেগুলোর মধ্যে সত্যি-সত্যি একটা ছেলে ন্যাড়া। মন্তব্যের পর মেয়েগুলো আরও হেসে ঢলে পড়ল, ছেলেদের দল থেকে কে একটা হিন্দি গানের কলি গেয়ে উঠল, বোধহয় সদ্য দেখা সিনেমার। উল্টোদিক থেকে আসছে এক ভদ্রমহিলা, সঙ্গে একটা বাচ্চা। বাচ্চাটা সমানে জিজ্ঞাসা করছে, 'বলো না মা, আন্টি কী বলল?' ভেতরে শুভকে টিটেনাস দেওয়া হচ্ছে।

তার কেন জানি মনে হচ্ছে, শুভদের হিসাবে ভুল হচ্ছে, মানুষ পরিবর্তন চায় না, চাইবার সাহস নেই। পরিবর্তন চাইলে বিনিময়ে কিছু দিতে হয়, কেউ কিছু দিতে রাজি না। একটা লজ্জাবোধ তাকে গ্রাস করছে। শুভকে যখন মারছিল সে বাধাও দিতে পারেনি। ঠিকই সে

একবার এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কেউ না জানুক সে তো জানে ভয়ে সে দ্বিতীয়বার যায়নি। এখনো সেই ভয়টা ভয়ঙ্করভাবে রয়ে গেছে। সে জানে না কাল ওরা কী করবে? যদি কলেজে ঢুকতে না দেয়?

এই নিরুদ্বেগ জনস্রোত, আর তার মতো সহযোদ্ধা নিয়ে শুভরা কত দূর যাবে? সে নিজের ওপর চূড়ান্ত বিরক্ত। বাস্তবের জগতে কোনো একবারও তার যা করার কথা তা সে করতে পারে না। কী হত সে যদি রুখে দাঁড়াত? অসীমদা তাকে বুঝিয়েছিল অস্ত্রের জোরটা বড় কথা না, জিতবে সে, সে লড়ছে ন্যায়ের জন্য। আর একবার বোঝে সে কতটা অযোগ্য। চারশ বাহাত্তর পাওয়া বি এস-সি পাস, জনৈক হরিপদ কেরানির ছেলে—এ জীবনে খেটেখুটে বড়জোর আর একটা হরিপদ কেরানি হবে। অন্তত একবারও যদি রুখে দাঁড়াতে পারত সে। শুধু শুভকে বাঁচাবার জন্য না, নিজের জন্য। আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে বলত—আমি ঘেন্না করি এ ভাবে বেঁচে থাকতে। আমি জানি না, কার জন্য আমি এত অকিঞ্চিৎকর, কার জন্য আমি এই আকারহীন জনস্রোতের একজন মাত্র, আমার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, আমার কোনো কৃতি নেই, আমার নিজের কোনো সৃষ্টি নেই, আমি কবিতা লিখতে পারি না। যদি পাই সেই শুয়োরের বাচ্চাদের, আমি দেখে নেব। তার আর কিছু ভাল লাগে না। সন্ধ্যার ছোঁয়া লাগা এই বিকেলে ওষুধের দোকানের সিঁড়িতে বসে দুটো হাঁটুর মাঝখানে মাথাটা রেখে সে কাঁদবার চেষ্টা করে। কিন্তু কান্নাও তার আসে না। সে কোথাও চলে যেতে চায়, অনেক দূরে, তার নিজের জীবন থেকেও অনেক দূরে, কাপাস তুলো ওড়া অন্য কোনো আকাশের নীচে।

'বুঝলে ইংরেজিতে এগুলোকে বলে মিডো, আমাদের দেশে বলে বুগিয়াল। একদম ঘাসে ঢাকা পাহাড়। দূর থেকে দেখতে একদম সবুজ লাগছে তো, কিন্তু কাছে গেলে দেখবে ঘাসের মধ্যে ফুটে আছে অসংখ্য বুনো ফুল। কোনোটাও খুব বড় না, ছোট-ছোট, কিন্তু অসংখ্য রঙের, এত রঙ তুমি কখনো দেখোনি। এই ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ওপরে, পাইন আর জুনিপারের বন। ওখানে নাকি কস্তুরী হরিণ থাকে, আমি অবশ্য দেখিনি কোনোদিন। যেখানে গাছের ওপর পাইনের ছায়া সারাদিন ধরে থাকে সেখানে এখানে-ওখানে বরফ জমে থাকে। পাথরের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে ঝরনার জল। বুনো ফুলগুলোর ওপর উড়ে বেড়ায় নীল প্রজাপতি। তুমি যদি চুপ করে শুয়ে থাক, পাথরের আড়ালে দেখবে বুনো ছাগলরা এসে ওখানে জল খাবে। ওদের বাচ্চাগুলো যে কী সুন্দর তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না! ঐ পাথর আর ঘাসের ফাঁকে সেই ফুলগুলো ফোটে। অবশ্য দেখা পাওয়া খুব কঠিন, মানুষ দেখলে ওরা লুকিয়ে পরে, হয় প্রজাপতি কিংবা শিশির হয়ে যায়।'

সে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কী করে দেখলে?'

'আমার মা যখন মারা গেল, বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি ওখানে একা-একা মাকে খুঁজে বেড়াতাম। মা মরে গেলে তা ভীষণ দুঃখ হয়, আর সত্যিকারের দুঃখ হলে মানুষ মানুষ থাকে না। সে হাওয়ার মতো হয়ে যায়, ঘাসের মতো হয়ে যায়। তখন ফুলগুলো দেখেছিলাম।'

একটা পুরোনো কাঠের ব্রিজের ওপর দিয়ে সে আর তিশি হাঁটছিল। পাহাড়ে ওঠার রাস্তাটা সামনের উইন্ডমিলটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে।'

'ফুলগুলো দেখে তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল লাগল, ভীষণ ভাল লাগল। ঐ ফুলগুলো থেকে সুন্দর আর কিছু তো পৃথিবীতে নেই। একবার ঐ ফুল দেখলে তোমার আর কোনো কিছু খারাপ লাগবে না। তুমি যে রকম চাও, সব কিছু সে রকমই হবে।'

'তিশি, আমাকে ফুলগুলো দেখাবে?'

'দেখাতে পারব না, কিন্তু যেখানে ঐ ফুলগুলো ফোটে সে জায়গাটা চেনাতে পারব। আসলে দুঃখ না পেলে তো ফুলগুলোর কাছে যাওয়া যায় না।'

বাইরের দিকে বিকেলটা কেমন যে দ্রুত মিলিয়ে আসছে। এখনও আলো আছে, কিন্তু কামরার ভেতরটায় আলো কমে এসেছে। গরম আর গুমোটে একমাত্র মুক্তি জানালাটা। শুভকে জানালার পাশটা ছেড়ে সে বসেছে ভেতরের সিটে। প্রচণ্ড ভিড় আর ঘামের গন্ধের জন্য কামরার ভেতরের দিকে সে বোধহয় একবারও তাকায়নি। অথচ এটা রিজার্ভ কামরা। সে প্রথমে রেগেই গিয়েছিল, শুভই তাকে শান্ত করেছে। এই ট্রেনের নাকি এটাই নিয়ম, কালনা বা নবদ্বীপ পর্যন্ত ভিড়টা এ রকম থাকবে, তারপর রাত্রিবেলায় ফাঁকা হয়ে যাবে। ব্যান্ডেলে এলে অনেক লোক নামল, কিন্তু উঠল তার দ্বিগুণ—কাজেই ভিড় আরো বাড়ল।

তবে আগের ভিড়টা ছিল প্রধানত শহুরে, কিন্তু ব্যান্ডেল থেকে যারা উঠল, তাদের জামাকাপড় আর কথাবার্তায় পরিষ্কার এরা অধিকাংশই গ্রামের। আর ত্রিবেণী ছাড়াবার পর বাইরের দৃশ্যপটেও শহরের চিহ্ন নেই। এই ডিসেম্বরের শুরুতেও গ্রাম কী সবুজ! অসংখ্য জলা আর পুকুরে বিকেলের আকাশের ছায়া, কিন্তু তাও যেন সবুজ। সবুজ মাঠ শেষ হলে গাছের সারি দিয়ে ঢাকা থাকে দিগন্ত। আর একটা প্রশ্ন নিয়ে ভেতরে-ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়—তারপর কী আছে? তার সব সময় মনে হয়, তারপর আছে তার না দেখা পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর জায়গা। সে সব সময় রাজি এক্ষুনি সেখানে রওনা হয়ে যেতে।

কিন্তু ভিড়টা অসহ্য। শুভর যেন এ সবে কিছু হয় না। ও দিব্যি সামনের সিটে বসা মাঝবয়সী লোকটার সঙ্গে এ বছরে ভাল যাত্রা কী-কী হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। আগের ভিড়টার তাও নিজস্ব একটা ডিসিপ্লিন ছিল, এ ভিড়টার সে সব কিছু নেই। একজন বুড়ি মতো মহিলা একটা খালি ঝুপড়ি নিয়ে তার পায়ের কাছে এমনভাবে বসেছে যে তার পা নাড়াবার কোনো উপায় নেই। ঝুপড়িটার মধ্যে কালো হয়ে আসা কয়েকটা ছোটো ছোটো কলা। বুড়ির সঙ্গে অল্পবয়সী একটা মেয়ে।

শালিনী নিজের হাতে স্যান্ডউইচ বানিয়ে নিয়ে এসেছিল, কিছু করার নেই বলে প্যাকেট থেকে তাই একটা বার করে খেতে শুরু করল। খেতে-খেতেই চোখটা পড়ল, বুড়ির সঙ্গী মেয়েটার দিকে। মেয়েটা তাকিয়ে আছে তার দিকে, বরং বলা ভাল তাকিয়ে আছে

তার খাওয়ার দিকে। কারোর খাবারের দিকে কেউ এভাবে তাকাতে পারে এই ধারণাই তার ছিল না। গলায় কণ্ঠার হাড়টা যেভাবে নড়ল একবার, তাতে বোঝা যায় যে, মেয়েটা ঢোক গিলল। সে যে বিষয়টা দেখছে মেয়েটা সেটাও খেয়াল করছে না। সে কাগজের প্যাকেটটা খুলে একটা স্যান্ডউইচ বার করে এগিয়ে দিল মেয়েটার দিকে। এবার যেন মেয়েটার সম্বিত ফিরল। লজ্জা পেয়ে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। তাকে কিছু বলতে হল না। এগিয়ে এল বুড়ি, 'বাবু ভালবেসে দিচ্ছে, নে না।'

সেও বলল, 'নাও'।

এখন যেন দুনিয়ার লজ্জা গ্রাস করেছে মেয়েটাকে, সে হাতটাকে একদম কাছে নিয়ে যাবার পর, চাদর থেকে কুণ্ঠিতভাবে হাতটা বার করে মেয়েটি স্যান্ডউইচটা নিল।

এতক্ষণে শুভর নজর পড়েছে ঘটনাটা। 'দে চাঁদু, ঠাকুমাকে একটা দে।'

' না বাবা, আমি বিধবা মানুষ এ সব আমি খাই না। তুমি বরং বাবা আমাকে একটা চা খাওয়াও।' বুড়ি যথেষ্ট স্মার্ট।

চাআলাকে চা বলে, শুভ এবার পড়ল বুড়িকে নিয়ে। কোথায় বাড়ি, কী বিক্রি করে, কলা কত দামে কেনে, কততে বিক্রি করে, স্টেশনে পুলিসকে কত দিতে হয়, স্টেশনের দাদাদেরই বা কত দিতে হয়, এই সব হাজার প্রশ্ন। ঠাকুমাও উৎসাহী আলোচক পেয়ে তার নানা সমস্যা নিয়ে পড়ল। কবে যেন প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার করার নামে পুলিস ধরে নিয়ে গিয়েছিল। পয়সা-কড়ি কেড়ে নিয়েছিল, তার সব কলা খেয়ে নিয়েছিল, সারা রাত থানায় রেখে দিয়েছিল, এমন কী 'গুখোরের ব্যাটারা' কিছু খেতে পর্যন্ত দেয়নি। সে অবশ্য এসব শুনছিল না, সে মেয়েটার খাওয়া দেখছিল। বোধহয় লজ্জার জন্যই, মেয়েটা খাচ্ছিল মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে। সে দেখতে পাচ্ছিল মেয়েটার গালটুকু। সেটার দ্রুত ওঠা পড়া দেখেই সে বুঝতে পারছিল কী গোগ্রাসে মেয়েটা খাচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে এই কামরার ভিড়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে কোনো পূর্ব পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। শুভ আর তার সদ্য অর্জিত ঠাকুমার আলোচনার মধ্যে আশেপাশের সবাই ঢুকে পড়েছে। এবং গোটা ব্যাপারটাতেই শুভ উৎসাহ দিচ্ছে। এমন সব মন্তব্য করছে, এমন সব প্রশ্ন করছে যে, তার প্রায় লজ্জাই লাগছে। উল্টোদিকের সিটে দুজন আর একজন মাঝখানটায় একটা টিনের বাক্সে বসে তিনপাত্তি খেলছে। এই তিন জন, ঠাকুমার নাতনি আর সেই কেবল চুপ, বাকি সবাই কিছু না কিছু বলছে। কিন্তু আলোচনাটা কিছুক্ষণ চলার পর সে লক্ষ করল, শুভ আলোচনাটাকে দক্ষ খেলোয়াড়ের মতো একটা দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। প্রায় সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, দেশের অবস্থা বেশ খারাপ, এ ভাবে বেশি দিন চললে আর বাঁচা যাবে না। এবার তার আবার ভয়-ভয়ই হচ্ছে। কে জানে প্লেন ড্রেসের পুলিস ভিড়ের মধ্যে আছে কি না? এখনও শুভর গালে স্টিচ্ ভাল করে শুকোয়নি। ছেলেটার ভয় ডর বলে কিছু নেই? সে একবার চাপা গলায় বলল, 'শুভ ছাড় না।'

তার এই কথায় বিন্দুমাত্র না দমে শুভ বলল, 'কী বলছিস চাঁদু? শুনলি তো, আঠার বছরের ছেলেকে জোর দিয়ে অপারেশন করে দিয়েছে। তোকে করলে তোর কেমন লাগত?' অর্থাৎ তার কথায় বিন্দুমাত্র পাত্তা দিতে শুভ রাজি না।

কথাটা ঘোরাবার জন্য সে বলল, 'হাওয়াটা ঠাণ্ডা, তোর ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'তুই জানালার পাশে বসবি? বস না।' সিট ছেড়ে শুভ উঠে দাঁড়াল। এরপর কথা বাড়িয়ে

কোনো লাভ নেই। সে তাকিয়ে রইল জানালার বাইরে। কখন যেন অন্ধকার এসে বাইরেটাকে ঢেকে দিয়েছে। পাশের খোপে মান্নাদের মতো গলা করে যে যেন গান ধরেছে, 'সুন্দরী গো, দোহাই দোহাই মান কোরো না,...'।

স্টেশনে আসবার পর থেকে শুভ যেন অন্য মানুষ। গত পনের দিন বিছানায় শোয়া শুভর সঙ্গে এ শুভর কোনো মিল নেই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলার দীপকদার কাছ থেকে টাকা ধার করে একটা ট্যাক্সিতে করে শুভকে সে নিয়ে গিয়েছিল শুভর মাসির নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে। ট্যাক্সিতে শুভ শুধু বলেছিল, 'মাসির ওখানে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলিস, খেলতে গিয়ে পড়ে গিয়ে এ সব হয়েছে।'

শুভর ডান দিকের ঠোঁটের ওপরটা তখন এতটাই ফুলে গিয়েছে যে কথা বলছে বেশ কষ্ট করে। কিন্তু সে প্রতিবাদ না করে পারেনি। 'সেটা যে সত্যি না, তা যে কেউ দেখলেই বুঝবে।'

'তাহলে বলিস, দুই ক্লাসে ফুটবল খেলা নিয়ে মারপিট হয়েছে।'

শুভর মাসির বাড়িতে কলিংবেল টেপার পর দরজা খুলে দিয়েছিলেন একজন মহিলা। যে কোনো লোকই তখন শুভকে দেখলে আঁতকে উঠবে। চোখ থেকে ঠোঁট পর্যন্ত ডানদিকটা একদম ফুলে ঢোল, গোটা শার্টটায় রক্তের শুকনো দাগ। দরজা খুলে দিলেন যে মহিলা তিনি কিছু বলেননি, শুধু শুভকে দেখে তার চোখটা একবার বিস্ফোরিত হল। যদিও জামাকাপড় যথেষ্ট ভালই পরে আছেন, কিন্তু বোঝা যায় পরিবারের কেউ নন, হয়ত বাড়ির কাজকর্ম করেন।

ফ্ল্যাটটা যথেষ্ট বড়, পেছনের দিকে শুভর ঘর। ঘরে ঢুকে শুভ বলল, 'তুই এবার যা চাঁদু, তোর অনেক দেরি হয়ে গেছে, বাড়িতে চিন্তা করবে।'

'দাঁড়া ওষুধগুলো তোর মাসিকে বুঝিয়ে দিয়ে যাই।'

'বাড়িতে এখন কেউই নেই। তোর চিন্তা নেই, আমি বুঝে নিয়েছি।'

'ধ্যাৎ, তুই বুঝে নিলে কী হবে। বাড়ির লোকদের না বুঝলে হয় নাকি?'

'না রে বাবা, এখানে আমাকেই বুঝতে হবে। যা, তুই কেটে পড়, অনেক রাত হয়েছে।'

সেদিন সে শুভর হাবভাবে কিছুটা বিস্মিতই হয়েছিল। আসলে শুভ ওদের নর্থ বেঙ্গলের বাড়ি সম্পর্কে অনেক কথা বলে। কলকাতায় শুভ পড়াশুনা করে এই মাসির বাড়িতে থেকে, কিন্তু মাসির বাড়ি সম্পর্কে শুভ কখনো কোনো কথা বলে না। এরপর প্রায় রোজই সে ওই বাড়িতে গেছে। তাতেই শুভ সেদিন কেন ওরকম করেছিল তা সে আন্দাজ করতে পেরেছিল। এর মধ্যে বার দুয়েক সে শুভর মাসিকে দেখেছে, মেমদের মতো ফরসা একজন মহিলা, তার সঙ্গে অবশ্য কোনোদিনই কোনো কথা হয়নি। প্রথম দিন যে মহিলা দরজা খুলে দিয়েছিল, শুভ যাকে ডাকে রানিদি বলে, তাকেই দেখেছে শুভর ঘরে আসতে, কখনো তাদের জন্য চা নিয়ে, কখনো শুভর জন্য খাবার নিয়ে। তারা বন্ধুরা এরপর দল বেঁধে গেছে ওই বাড়িতে, আড্ডাতে খুব চেঁচামেচি হলে শুভ বারবার চেঁচাতে বারণ করত। অথচ কলেজের আড্ডায় শুভই সবচেয়ে বেশি চেঁচায়। সেদিন সে আর গৌতম গিয়েছিল শুভকে দেখতে। হঠাৎ শুভ বলল, 'তোরা একটু আমার জন্য একটা হস্টেল দেখ না।'

গৌতম বলল, 'কেন রে, এই ছ-তলার ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে হস্টেলে যাবি কেন?'

'না রে, হস্টেলে অনেক সুবিধা, অনেকগুলো ছেলেকে এক সঙ্গে ধরা যায়।'

কথাটা হয়ত সত্যি, কিন্তু সে জানে শুভর হস্টেলে যাবার ইচ্ছার পেছনে এটাই একমাত্র সত্যি না। সে নিজেকে নিয়েই ভাবে। এখনো নিরানব্বই ডিগ্রি জ্বর হলেও সে একশ পার্সেন্ট মায়ের আন্ডারে। অনেক দিন জ্বর হয় না বলে তার মাঝেমাঝে দুঃখই হয়।

সেই বলেছিল শুভকে, 'যা কয়েকদিন বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নিয়ে আয়।'

শুভ বলল, 'না রে, এখন বাড়ি যাবার অনেক ঝামেলা। বড় উইক হয়ে গেছি।'

'চ, আমি তোকে গিয়ে দিয়ে আসব।'

শুভ কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ তার দিকে ঘুরে বলল, 'সত্যি যাবি চাঁদু? চ, দারুণ হবে। বাড়িতে গেলেই একদম ফ্রেশ হয়ে যাব।'

আসবার দিন তারা বন্ধুরাই গিয়ে শুভকে মাসির বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। সেদিনও সেই সময় শুভর মাসি ছিলেন না। ভেতরের ঘরে ইংরেজি গানের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, তাতেই মনে হল মাসতুতো দিদি আছে। গেটের মুখ থেকে, শুভ চেঁচাল, 'টুম্পাদি আমি চললাম।'

ইংরেজি গান ছাপিয়ে ভেতর থেকে ভেসে আসল, 'হ্যাভ এ প্লেসেন্ট জার্নি টুটুন।'

বন্ধুরা অনেকেই স্টেশনে এসেছিল। অনেক দিন পরে প্রায় কলেজের আড্ডার চেহারা। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত সবাই ছিল। শালিনী বলেছিল, 'তোর কোনো চিন্তা নেই শুভ, তুই না আসা পর্যন্ত আমিই ক্যানভাসের অ্যাকটিং এডিটার। এবার মারটা আমিই খাব ঠিক করেছি।'

কুশল বলল, 'আইডিয়াটা খারাপ না, তুই মার খেলে এই সেনসারশিপের বাজারেও খবর কাগজে এটা নিউজ হতে পারে।'

'তবে আমার মনে হয় খবরটা সিনেমার পাতায় বেরোবে।' গৌতমের মন্তব্য।

মুখে যতটা সম্ভব বিরক্তির ছাপ ফুটিয়ে শালিনী বলল, 'সব সময় বোকা-বোকা রসিকতা করিস না গৌতম। শুভ একা মার খাওয়াতে আমার খারাপ লেগেছে, আমি অন্তত মনে করি মারটা আমাদেরও খাওয়া উচিত ছিল। আমার তো চাঁদুকে হিংসে হচ্ছে।'

শালিনীর পেছনে লাগাতে গৌতমের কোনো ক্লান্তি নেই, 'আমার তো হিংসে হচ্ছে শুভকে, এ তো একদম

তোমার অঙ্গে লাগলে আঘাত,
ব্যথা বাজে মোর বুকে।

আমাকে তো শালা কেউ মারেও না।'

'দুঃখ করিস না, যেভাবে তুই হিস্ট্রির সুদেষ্ণার পেছন পেছন ঘুরছিস যে কোনো দিন তুই মার খাবি। সুদেষ্ণার দাদা ক্যারাটের ব্ল্যাক বেল্ট।' গায়ত্রী বলল।

'আগে বলবি তো গায়ত্রী, তাহলে হিস্ট্রির সুদেষ্ণাকে ছেড়ে জিওগ্রাফির কৃষ্ণকলিকেই টার্গেট করতাম।'

'কর কর, খুব ভাল হবে। কৃষ্ণকলির বাবা থানার ওসি।'

আর্তনাদ করে উঠল গৌতম, 'কিছু একটা কর শুভ, অন্তত নিরাপদে প্রেম করার জন্যই সমাজটা পাল্টা দরকার।'

'হ্যাঁ, নিরাপদে প্রেম করার জন্য, আর তোর মতো থার্ড ক্লাস এলিমেন্টের হাত থেকে

মেয়েদের বাঁচানোর জন্য সমাজ পাল্টানো দরকার।' এতক্ষণে শালিনী তার রাগ মেটাল।

ট্রেনটা ছাড়ার পর শালিনী জানালার সঙ্গে-সঙ্গে কিছুটা এগিয়েছিল। শুভকে বলছিল, 'প্লিজ, শরীরের যত্ন নিস। চিঠি দিস।'

মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটিয়ে শুভ বলল, 'আমার কিন্তু নীল খাম নেই।'

'তোর খামের কোনো রঙের দরকার হবে না।'

ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে এসেছিল। শেষ সময় শালিনীর মুখটা তার দেখা হয়নি।

শুভ বলল, 'ট্রেনটা থামলে আমার পেছন-পেছন সোজা ছুট লাগাবি. তা না হলে কিন্তু বাসে বসার জায়গা পাব না।'

'তোর সুটকেসটা আমায় দে।'

'কেন?'

'এ অবস্থায় তুই পারবি না।'

'আরে না-না, তুই জানিস না, এখানে এসে আমি একদম ফিট হয়ে গেছি। আসলে উৎসের কাছে এলে সব কিছুর শক্তি বেড়ে যায়। আমি তো এখন আমার উৎসের কাছে চলে এসেছি।'

বাসে তারা বসার জায়গা পেয়েছিল। হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা। কিন্তু সে মুগ্ধ হয়ে বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখছিল। শুভ সব সময় বলত, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ অনেক সুন্দর। এই প্রথম সে নর্থ বেঙ্গলে আসছে, তার মনে হচ্ছে কথাটা ঠিক। সে এই প্রথম চা বাগান দেখল। দূরে নীল-নীল পাহাড়, আর অসংখ্য ছোট-বড় নদী পার হয়ে তাদের লড়ঝড়ে বাসটা চলেছে। রাস্তাটা মাঝে-মাঝে চলেছে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। শুভ বলল, এসব রাস্তায় নাকি মাঝে-মাঝে বুনো হাতি বেরোয়। সে গভীর উৎসাহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে, যদি কিছু দেখা যায়। কিন্তু তার কপাল খারাপ, অসংখ্য হলুদ রঙের প্রজাপতি ছাড়া কিছুই সে দেখতে পায়নি। বাসটা মাঝে-মাঝে দাঁড়াচ্ছিল ছোটো ছোটো গঞ্জে। অসংখ্য সুপারী গাছে ঘেরা টিনের কতগুলো বাড়ি, দরমায় দোকান ঘর। একটা নদী পার হয়ে এ রকম একটা গঞ্জ আসতে শুভ বলল, এবার নামতে হবে।

বাসস্ট্যান্ড থেকে যে রিকশটা তারা নিয়েছিল, সেই রিকশআলার হাসি দেখেই বোঝা যায় যে শুভকে চেনে। রাস্তায় অসংখ্য লোক শুভর সঙ্গে কথা বলছে, শুভও হাসিমুখে তার জবাব দিচ্ছে, কারো কারোর সঙ্গে ডেকে কথা বলছে। সে বলেই ফেলল, 'তুই তো রীতিমত পপুলার রে এখানে।'

শুভ বলল, 'এখানে এটা কোনো ব্যাপার না। তোরা যারা কলকাতায় থাকিস তোরা ঠিক ব্যাপারটা বুঝবি না। এই একটা ছোটো জায়গায় সবাই তো সবাইকে চেনে। আমার ক্ষেত্রে আরো দুটো বাড়তি ব্যাপার আছে। এক, বাবা মা দু জনই টিচার, সবার কাছে আমি হয় মাস্টারমশাই অথবা দিদিমণির 'পোলা'। আর দ্বিতীয়টা হল আমি কলকাতায় থাকি। কলকাতা মানে সামথিং স্পেশাল। সবাই তোকে কেমন শ্রদ্ধাভক্তি করে দেখবি।'

যে বাড়িটার সামনে রিকশটা দাঁড়াল সেটা আর পাঁচটা বাড়ি থেকে আলাদা কিছু না। সামনের দিকটা টিনের, কিন্তু পেছনের দিকের অংশটা পাকা। সামনে বেশ কিছুটা বাগান

আর বিশাল একটা কাঁঠালগাছ। কাঠের গেটের দু-পাশে অপরাজিতার ঝোপ ফুলে একদম নীল হয়ে আছে। ভাড়া মেটাতে-মেটাতে শুভ বলল, দয়া করে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে আসল কেসটা বলো না।'

'কেন তুই যে বললি, তোর বাবা-মা পার্টির সমর্থক।'

'তাতে কিছুই যায়-আসে না। নিজের ছেলের ক্ষেত্রে এসব কনসিডার করে না। বিপ্লব খুব ভাল, কিন্তু সেটা পাশের বাড়ির ছেলে করুক, আমার ছেলে যেন এসব ঝামেলায় না জড়ায়।'

ডান দিকে কুয়োতলায় একজন বয়স্ক মহিলা বোধহয় জামা-কাপড় কাচছিল, তারা গেট খুলে ঢুকতেই এদিকে তাকাল। তারপর কী একটা প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল। তার চেঁচামেচি শুনেই বোধহয় বেরিয়ে এলেন আর একজন মহিলা। বলার দরকার নেই, সে দেখেই বুঝেছে ইনিই শুভর মা, শুধু শুভর মাসির মতো অতটা ফরসা নন।

এখনো বিকেলের আলো আছে। শুভ বলেছিল নদী দেখাতে নিয়ে যাবে। কিন্তু বিকেলের আলো থাকতে-থাকতে নদীর ধারে শুভ পৌঁছতে পারবে বলে তার মনে হচ্ছে না। রাস্তায় প্রায় যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাদের সবার সঙ্গেই শুভকে কথা বলতে হচ্ছে। যে যাই বলুক তিনটে প্রশ্ন কমন, এক, গালের ব্যান্ডেজটা কীসের, দুই, কলকাতার খবর কী, আর সঙ্গের ছেলেটি কে। সচরাচর কোনো অপরিচিত লোকের সামনে তার পরিচয় জানতে চাওয়াটা সবাই কিছুটা এড়িয়েই যায়, কিন্তু এখানে এসবের বালাই নেই। কথোপকথনগুলো যখন চলছে তাকে বোকার মতন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। শুভকে দু-এক বার তাড়াও সে দিয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। উল্টে শুভ বলল, 'দাঁড়া, এসব এখানে করতে হয়, তা না হলে গোটা শহরে রাষ্ট্র হয়ে যাবে—মাস্টারমশাইয়ের পোলার কলকাতায় গিয়ে পায়াভারী হয়ে গেছে। কলকাতার কেউ আমেরিকায় গেলে যা হয়, এখানে কলকাতায় গেলে তাই হয়।'

পাড়ার রাস্তা ছেড়ে তারা তখন বড় রাস্তায় পড়েছে। রাস্তার দু-পাশে টিনের চাল আর দরমার বেড়া দেওয়া দোকানপাট, বড়জোর দু-একটা দোকান পাকা।

প্রথম সে বোঝেনি হাঁকটা কোথা থেকে আসল, 'ও টুটুন কবে আইলা?'

দুটো দোকানের মাঝখানে এক চিলতে একটা দরমার ঘর। সামনে একটা বড় রাধাচূড়া গাছের আড়ালে পড়ে যাওয়া ঘরটার ওপরের বিবর্ণ বোর্ডটায় পার্টির নাম লেখা। দরজার পাশে তার থেকেও বিবর্ণ একটা লাল পতাকা একটা বাঁশের মাথায় লাগান। আওয়াজটা এসেছে পার্টি অফিসের ভেতর থেকে। শুভ বলল, 'আয়, তোকে একটা ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

সে বুঝল, নদী দেখার প্রোগ্রামের আজ এখানেই ইতি।

পার্টি অফিসের ভেতরটা বাইরের মতোই রংহীন। পেছনে একটা কাচ ভাঙা আলমারি। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর দুটো বেঞ্চ। দেওয়ালে চারটে ছবি, তার মধ্যে মার্কস আর লেনিনের ছবি সে চেনে। বাকি দুটো ছবি সে চেনে না। একটা ছবির তলায় লেখা 'শহীদ কমরেড বাবুল শর্মা', ছবিটা অস্পষ্ট এবং ধুলোয় ঢাকা। কোনো সময় ছবিগুলোতে মালা দেওয়া হয়েছিল, গাঁদা ফুলের মালাগুলো শুকিয়ে ঝুলছে। দেওয়ালে পুরনো হয়ে যাওয়া পোস্টার। একটা হাতে লেখা পোস্টার মনে হচ্ছে একটু টাটকা—'নভেম্বর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক'। ঘরে দুজন লোক, একজন বয়স্ক, চেয়ারে বসে। পরনের ধুতি এবং পাঞ্জাবি দুটোই

কোনো এক সময় সাদা ছিল। ভারী ফ্রেমের চশমাটা গাল ভাঙা রোগা মুখটায় কেমন জানি বেমানান। আর একজন কুচকুচে কালো। তার মনে হল লোকটি বোধহয় আদিবাসী। ঠাণ্ডা সত্ত্বেও পরে আছে একটা হাতকাটা গেঞ্জি আর খাকি হাফপ্যান্ট। শুভকে ডেকেছেন বয়স্ক ভদ্রলোক।

কোনো প্রশ্নের আগেই এবার শুভ উত্তর দিল, 'কানাইকাকু, এ হল চন্দ্রশেখর, কলকাতায় আমরা এক সঙ্গে পড়ি। ও কলকাতায় থাকে।'

এরপর যথারীতি দ্বিতীয় প্রশ্ন, 'গালে কী হইল?'

শুভ একবার পেছনে দরজার দিকে তাকিয়ে নিল, তারপর আসল ঘটনাটা বলল, বোধহয় এ যাত্রায় এ বিষয়ে এটাই শুভর প্রথম সত্য ভাষণ। বর্ণনার শেষে শুভর অনুরোধ, 'আপনি কিন্তু বাবা-মাকে কিছু বলবেন না, আসল ঘটনা আমি এখানে কাউকেই বলিনি। জানলে ওঁরা খুব অস্থির হবেন।'

ভদ্রলোক খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব খোঁজ নিলেন। কটা স্টিচ হয়েছে, ডাক্তার কী বলেছে, বিপদের কিছু আছে কি না। তাঁর সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে ফুটে বেরোচ্ছে একটা গভীর মমত্ববোধ, ব্যথা যেন শুভর লাগেনি লেগেছে তার নিজের। তারপর হাফপ্যান্ট পরা লোকটিকে বললেন, 'কলকাতার কমরেডরা আসছে, যা বাবা শুখরাম একটু চা কইয়া আয়।'

শুভর সঙ্গে থাকায় কমরেড আখ্যাটা তারও জুটে গেল।

'ঠিক আছে, তোমার বাবা-মারে কিছু কমু না কিন্তু আমার ধারণা খবরটা শুনলে তোমার বাবা-মা উৎকুণ্ঠিত হইব, কিন্তু দুঃখিত হইব না।'

'তা হয়ত ঠিক, কিন্তু শুধু-শুধু দুশ্চিন্তা করবেন।'

'আমি আশা করি তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাও নাই।'

শুভ একটা প্রাণখোলা হাসি দিল। তারপর সজোরে ঘাড় নাড়ল।

'আসলে আমাগো পথ তো এ রকমই। ফুল বিছানো পথে কখনো কমিউনিস্ট হওয়া যায় না। আর মধ্যবিত্তের কাছে এ কাজ আরো কঠিন। মধ্যবিত্তের বিপ্লব সাধনা বড় কঠিন। তুমি আমারে সত্যি কথা কও, অরা যখন তোমারে ঘিইরা ধরল তখন তোমার অনুভূতি কী হইছিল?

শুভ মাথা নীচু করে রইল কিছুক্ষণ, সে যেন ছাত্র—মৌখিক পরীক্ষায় উত্তর দিচ্ছে। তারপর মুখ তুলে সরাসরি তার কানাইকাকুর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয়'।

'তোমার তখন কী করতে ইচ্ছা করতাছিল?'

'পালাতে'।

'তুমি পালাও নাই, তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাও নাই, ছাইড়া দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করো নাই।'

শুভ মাথা নাড়ল।

'অথচ ভয়টাই তোমার স্বাভাবিক অনুভূতি, পালাইতে চাওয়াটাই তোমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তুমি যা করলা সেটাই অস্বাভাবিক। কেন?'

শুভ চুপ।

'তোমার কর্তব্যবোধের জন্য, নতুন মতাদর্শ তোমার মধ্যে যে নতুন মূল্যবোধের জন্ম দিছে তার জন্য। আমরা কমু, এই হইল ডায়লেক্টিকস্, এই হইল দ্বন্দ্ব—তোমার স্বাভাবিক

শ্রেণীবোধের সঙ্গে নতুন চেতনার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এইক্ষেত্রে তোমার নতুন চেতনা জিতল। কিন্তু এ লড়াই সবে শুরু, এ লড়াই সারা জীবনের। আমরা যারা মধ্যবিত্ত কমিউনিস্ট পার্টি করতে চাই, আমাগো যত শত্রু বাইরের তার থিকা বেশি ভিতরের।'

'চেষ্টা করছি, আপ্রাণ চেষ্টা করছি।'

'এই সচেতন চেষ্টাটাই বড় কথা। এই দেখ শুখরাম, ছয় মাস হইল বাগান থিকা ছাঁটাই। আজ সকালেও খাবার কিছু জুটছে কি না জানি না, রাতে কিছু জুটবে কি না তাও জানি না। কিন্তু লড়াইয়ে কোনো খামতি নাই। সত্যিকারের সর্বহারা, কোনো পিছুটান নাই। কিন্তু আমাগো তো হাজার পিছুটান। তবে তোমাগো একটা সুবিধা আছে। তোমরা হইলা ইন্টেলেকচুয়াল, গোটা দুনিয়ার জ্ঞানের ভাণ্ডার তোমাগো সামনে খোলা। সমাজ আর প্রকৃতির পরিবর্তনগুলো জানার সুযোগ তোমার সামনে আছে। এইগুলি জানলেই দেখবা সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান হইল ডায়লেস্টিকস্, যা হইল মার্কসবাদের মূলকথা। দেখো রবীন্দ্রনাথরে, কোনো দিনই তিনি মার্কসবাদী না অথচ হাজার পণ্ডিত যা বোঝে নাই সোভিয়েত ইউনিয়ন দেইখা তিনি ঠিক বুঝছিলেন। রাশিয়া যাইবার আগের লেখা দেখো আর ফিরা আসবার পর তার লেখা পড়ো, পার্থক্যটা নজরে পড়ব। ক্রিস্টোফার কর্ডওয়েল পড়ছ?'

বাইরে প্রথম শীতের সন্ধ্যা সামনের রাধাচূড়া টপকে হঠাৎই একরাশ অন্ধকার, গোটা দুয়েক হ্যাজাক আর বেশ কিছু লণ্ঠনের আলো নিয়ে হাজির। শুখরাম হ্যারিকেন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। শুভ বলল, 'না'।

'পড়, কর্ডওয়েলের ইলিউশন এন্ড রিয়েলিটি পড়ো, ক্রাইসিস ইন্ ফিসিক্স পড়। দেখবা জ্ঞান মানুষরে কেমন কইরা বিপ্লবের প্রথম সারিতে দাঁড় করায়। এত বড় একটা ইন্টেলেকচুয়াল স্পেনের সিভিল ওয়ারের লড়াইয়ে প্রাণ দিল। এইটা বোঝো, উন্নত চেতনা ছাড়া যে মধ্যবিত্ত, সে বিপ্লবের মোস্ট আনরিলায়েবেল অ্যালি। নিজের স্বার্থের বাইরে, নিজের লোভের বাইরে সে কিছু ভাবতে পারে না।' তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, 'তারপর কও, কলকাতার খবর কী?'

এ প্রশ্ন এখানে এসে বারবারই শুনতে হয়েছে। আর প্রত্যেক প্রশ্নকর্তাকেই শুভ নানা ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে, কলকাতার অবস্থা খুব খারাপ। এই প্রথম শুভ অন্য রকম কথা বলল, 'ভাল, ভাল কাজ হচ্ছে। যে সব অঞ্চল ছেড়ে আসতে হয়েছিল সেখানে নতুন কনটাক্ট হচ্ছে। নতুন লোকজন পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য অনেকটা কাজই হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে। তবে মানুষের ক্ষোভ যে জাগায় গেছে, রেল স্ট্রাইকের মতো আর কোনো বড় ঘটনা ঘটলে একদম স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফেটে পড়বে।'

'যাক তুমি তো ভাল খবর দিলা। বুঝলা, কলকাতা হইল হেড কোয়ার্টার, আমাগো ভবিষ্যতের পেট্রোগ্রাড। আমাগো দরকার শক্তিশালী হেড কোয়ার্টার, আর এর জন্য অগোও যত আক্রোশ কলকাতার ওপর। অরা চায় কলকাতারে প্রতিক্রিয়ার হেড কোয়ার্টার বানাইতে। কলকাতার ওপর আক্রমণের চেহারাটা কি সেইটা গোটা দেশ কেন প্রথম প্রথম আমরা যারা বাইরে থাকি আমরাও বুঝি নাই।'

এতক্ষণ ধরে যে প্রশ্নটা তার ভীষণ ভাবে মনে হচ্ছিল এবার সেই প্রশ্নটা সে করল, 'আপনারা এখানে প্রকাশ্যে পার্টির কাজ করতে পারেন? ওরা কিছু করে না?'

'চেষ্টা যে একদম করে না তা না, কিন্তু সব ক্ষেত্রে পাইরা ওঠে না। আসলে এইখানে

লড়াইয়ের চেহারা একটু আলাদা। আমাগো এখানে ট্র্যাডিশনাল সংগঠন হইল চা বাগান, সেইখানে লড়াইটা হয় অন্যভাবে। কৃষক বেল্টে লড়াইটা সবে শুরু হইল। কলকাতা আর তার আশেপাশের জেলাগুলিতে রাজনৈতিক সংগ্রামের যে তীব্রতা সেইটা এখনো এইখানে নাই। তবে ভবিষ্যতে হইব। আমরাও তার জন্য তৈরি হইতাছি। আমাগো সংগঠন ছোট কিন্তু যথেষ্ট মিলিট্যান্ট। টুটুন যাও না, বন্ধুরে লইয়া কোনো একটা বাগানে ঘুইরা আসো।'

'বুঝলি চাঁদু দেখার মতো। অর্গানাইস্‌ড মিলিট্যান্সি কাকে বলে বুঝবি।'

কানাইকাকু বলল, 'আর তোমরা যারা কলকাতার লোক আর একটা জিনিসও তোমাগো দেখবার আছে বাগানে—দারিদ্র। মানুষ কীভাবে বাঁইচা আছে তা নিজের চোখে দেইখা যাও। দারিদ্র তো তোমরা চেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পইড়া। আসলে তা কী, যাও নিজের চোখে দেইখা আসো।'

অত সুন্দর চা বাগানের আড়ালে এ রকম একটা ব্যাপার আছে তা তার কখনো মনে হয়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে শুভ বলল, 'কোনদিন যদি উপন্যাস লিখি, লিখব এই লোকটাকে নিয়ে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইংলিশে এম এ। কোনো একটা কলেজে পড়াতেন। পার্টিশনের সময় পার্টির লোকজনদের নিয়ে দাঙ্গা থামাতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন নিজের গোটা ফ্যামিলিটা খুন হয়ে গেছে। অন্য কেউ হলে বোধহয় পাগল হয়ে যেত। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর, শুধু সেই ঘটনা নিয়ে বলেন, সেই দিন থেকে নাকি ইমশনালি প্রোলেটারিয়েট হয়ে গেছেন। তারপর পার্টি করতে গিয়ে চাকরি গেছে। শেষে পুলিসের তাড়া খেয়ে বাংলাদেশ মানে তখনকার পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসেন এখানে। এইখানে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কানাইকাকু। তার আগে কমিউনিস্ট পার্টির নামও শোনেনি কেউ এখানে। এক-এক করে বাগানগুলোতে ইউনিয়ন করেছেন। জেলে গেছেন, মার খেয়েছেন, পুলিস কুকুরের মতো তাড়া করেছে। এখনো বাঁ কাঁধের নীচে একটা গুলি রয়ে গেছে। পুলিসের ভয়ে হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করাতে যেতে পারেননি। বেশি ঠাণ্ডা পড়লে বাঁ হাতটা নাড়াতে পারেন না। কিন্তু এই সব করতে করতে লোকটা এই অঞ্চলের মানুষের কাছে দেবতা হয়ে গেছে। দু-বেলা খাওয়া জোটে না, কিন্তু যদি শ্রদ্ধা বলিস এখানে কোনো মানুষ এত শ্রদ্ধা পায় না। চা বাগানের বড়-বড় সাহেব কথা বলে মাথা নীচু করে। বুঝলি রে চাঁদু, তোদের কফি হাউসের আঁতেলরা এদের নিয়ে কিছু লিখবে না। এদের নিয়ে লিখলে তো অ্যাকাডেমি পুরস্কার বা মস্কোর প্লেনের টিকিট, কোনোটাই পাওয়া যায় না। যদি বিপ্লব নিয়ে লেখেও তাহলে নায়ক হবে বড়লোকের ছেলে প্রেসিডেন্সির ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। এই শুখরামরা কী করে নায়ক হবে? আসলে আমাদের পার্টির ছেলেগুলো বস্তিতে অথবা উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকে। পুলিসের গুলি খাবার জন্যই তো এদের জন্ম—এদের নিয়ে কেউ লিখবে না। শালা, নতুন দেশ কেবল না, এগুলোকে সব তাড়িয়ে একটা নতুন ইন্টেলেকচুয়াল জেনারেশন তৈরি করতে হবে।'

বাড়িতে ফিরে শুভর মার সঙ্গে সে গল্প করছিল। মায়েদের কিছু সাধারণ প্রশ্ন থাকে মাসিমা তাকে সেই সব প্রশ্নই করছিলেন। বারবার খোঁজ নিচ্ছিলেন শুভর মার খাবার ব্যাপার নিয়ে, হয়তো মায়ের স্বাভাবিক উৎকণ্ঠা থেকেই। কিন্তু তার মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে তারা যে মিথ্যা কথাটা বলেছে সেটা উনি ধরে ফেলেছেন। খোঁজ নিচ্ছিলেন তাদের

বন্ধুদের সম্পর্কে, সে সবার কথাই বলেছে কিন্তু গায়ত্রী আর শালিনীর কথা বলেনি। মাসিমাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কলেজ তো কো-এডুকেশন?'

হঠাৎ শুভটা হাসতে শুরু করল হো-হো করে, তারপর বলল, 'ওরে চাঁদু, তুই বুঝলি না, মা আসলে জানতে চাইছে, আমাদের কোনো মেয়ে বন্ধু আছে কি না। শোন মা আমিই বলছি, আমাদের প্রচুর গার্ল ফ্রেন্ড, তারা সবাই খুব মডার্ন, সবার বব কাট চুল, হাতকাটা ব্লাউস আর হাইহিল জুতো ছাড়া কিছু পরে না—হয়েছে?' বলে আবার হাসতে-হাসতে গড়াগড়ি, এবার অবশ্য সেও হাসিতে যোগ দিয়েছে। আর মাসিমা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'কী অসভ্য হয়েছিস টুটুন, আমি কি তাই বলেছি?'

এতে শুভর হাসি আরো বাড়ল। আর শুভর হাসির মধ্যেই ঘরে ঢুকল ছেলেটি। বাইরের থেকে কোনো ডাকাডাকি না করেই সরাসরি ঢোকার মধ্যেই এটা প্রমাণিত এ বাড়িতে ছেলেটির প্রবেশ অবাধ। বয়স বোধহয় তাদের মতোই, কিন্তু চেহারা তাদের থেকে অনেক ভাল। পড়ে আছে একটা কোট, আর যেটা সবচেয়ে তার চোখে লাগল সেটা হল ছেলেটি মুখে প্রচুর ক্রিম লাগিয়েছে। এখনো কোট পরার মতো বা এতটা ক্রিম লাগানোর মতো ঠাণ্ডা পড়েনি।

আধশোয়া অবস্থায় থেকে উঠে শুভ বলল, 'আয় নন্দ, চাঁদু এ হল আমার ছোটবেলার স্কুলের বন্ধু নন্দ, আর নন্দ, এ হল আমার বড়বেলার কলেজের বন্ধু চন্দ্রশেখর, আমরা ওকে ডাকি চাঁদু বলে।'

ছেলেটি এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্চ না করে মাসিমাকে বলল, 'দিদিমণি চা খাব।'

শুভ বলল, 'তারপর তোর খবর কী রে।'

'আমার খবর ভাল, তোর খবর কী? বাজারে কে একটা বলল, তোকে নাকি কে মেরেছে? কোনো শালা রে?'

'কেন তুই তাকে মারতে যাবি?'

'সে দরকার হলে যেতে পাবি। কিন্তু কাকে মারতে হবে সেটা তো জানা দরকার?'

'আচ্ছা যদি নামটা বলি, তুই চিনবি?' শুভর মুখে প্রশ্রয়ের হাসি।

'আমার চেনার তো দরকার নেই, যারা মারবে তারা চিনলেই হল।'

'ও কী রে নন্দ, তুই তো একদম সিনেমার ভিলেনের মতো ডায়লগ দিচ্ছিস।' শুভ হাসছে বাচ্চাদের কথায় বড়রা যেভাবে হাসে, সেভাবে। 'আচ্ছা যদি বলি, তোর দাদার দলের লোকেরা মেরেছে তবে কী করবি?' তারপর তাকে লক্ষ, করে বলল, 'নন্দর দাদা আবার বড় লিডার, ব্লকের প্রেসিডেন্ট।'

'তাতে তো আরো সুবিধা, ওদের দলের লোক দিয়েই মার খাইয়ে দেব। টাকা দিয়ে ওদের কেনাই তো সবচেয়ে সহজ।'

'তোর এখন অনেক টাকা, না রে নন্দ?'

এবার ছেলেটি হাসল। হাসিটা একদম শিশুর মতো সরল। এতক্ষণ যে সব কথা বলছিল তার সাথে হাসিটা একদম মানায় না। এই হাসিটার জন্য এই নন্দকে তার বেশ ভাল লেগে গেল। নন্দ খুব লাজুক ভাবে বলল, 'জানিস টুটুন, আমি একটা জিপ কিনেছি।'

শুভ একদম লাফিয়ে উঠল, 'বলিস কী রে? তুই নিজে গাড়ি কিনেছিস?'

'সেকেন্ড হ্যান্ড। হাসিমারায় এয়ারফোর্সের ভাল-ভাল জিপ একদম জলের দরে বেচে

দেয়। লাইন করে একটা ম্যানেজ করেছি। একটু সারিয়ে নিয়ে একদম নতুনের মতো।'

'আরে সেকেন্ড হ্যান্ড হোক আর যা হোক গাড়ি তো। তাহলে মেসোমশাই তোর ওপর বেশ খুশি, তোকে গাড়ি কিনে দিল।'

'কোন মেসোমশাই? আমার বাবা? চেনো না কী জিনিস! আমি নিজের টাকায় কিনেছি। কন্ট্রাকটারিতে আমার এখন ভাল ইনকাম। ইরিগেশনের একটা কাজ ধরেছি, গাড়ি না থাকলে সাইটে রেগুলার যাওয়া-আসা বেশ কঠিন।'

'তুই তো পাক্কা বিজনেসম্যান হয়ে উঠলি। খাওয়া একদিন।'

'চ, একদিন আমার জিপ নিয়ে আশে-পাশে কোথাও, এক রাত থাকব, পরের দিন ফিরে আসব। হেভি জমবে।'

চা নিয়ে ঢুকলেন মাসিমা। এসেই পড়লেন নন্দকে নিয়ে। 'হ্যাঁ রে নন্দ, সেদিন তোদের দোকানের সামনে একজন বুড়ো মানুষকে ও রকম ধমকাচ্ছিলি কেন?'

'আপনি আবার দেখলেন কোথা থেকে?'

'আমি যেখান থেকেই দেখি, একজন বাবার বয়সী লোককে কেউ ওভাবে ধমকায়?'

'দিদিমণি, দোকানদারি করতে হলে একটু চেঁচামেচি করতেই হয়।'

মাসিমা একদম দিদিমণির মতোই ধমকালেন, 'বাজে কথা বলবি না। আমায় দোকানদারি দেখাচ্ছে! মানুষ হলি না।'

'সে আর মানুষ করতে পারলেন কই। মানুষ হলে কি আর এই চার আনার গঞ্জে দোকান চালাতাম? টুটুনের মতো কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করতাম।'

শুভ বলল, 'কাকে কী বলছ মা। নন্দ এখন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। কিন্তু আমি এসেছি খবরটা তোকে কে দিল?'

'সে খবর দেওয়ার লোকের অভাব নাকি। আর তোকে তো দেখলাম পার্টি অফিসে ঢুকলি।'

'ডাকলি না কেন?'

'কে যাবে বাবা জীবন্ত আগ্নেয়গিরি তোমার কানাইকাকুর কাছে?'

'কেন রে নন্দ, ঐ বুড়ো লোকটা তোর কী করেছে?'

'কী বললি? বুড়ো লোক? শোন, তোর কানাইকাকু, সেদিন দেখি ভরদুপুরে একা-একা শালবাড়ির দিক থেকে হেঁটে-হেঁটে আসছে। একটা ছাতাও সঙ্গে নেই, অথচ প্রচণ্ড রোদ। যে কোনো সুস্থ লোক বাসে করে আসত, কিন্তু তিনি তা করবেন না।'

শুভ বলল, 'বাসের পয়সা হয়তো ছিল না।'

'বাজে কথা বলিস না। এ লাইনের কোনো কন্ডাক্টার কানাইকাকুর কাছ থেকে ভাড়া চায় রে?'

'এর জন্যই বোধহয় পয়সা না থাকলে বাসে উঠতে পারে না।'

'যাক আসল গল্প শোন। আমার কষ্টই লাগল। ভাবলাম ছোটবেলায় অনেক জ্বালিয়েছি—পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছি, ঘুড়ির জন্য পার্টি অফিস থেকে আঠা চুরি করেছি। এবার একটু উপকার করি। গাড়িটা পাশে দাঁড় করিয়ে বললাম—উঠে আসুন, আমি ওদিকেই যাচ্ছি। আমাকে আগাপাশতলা মাপল, আমি যেন একদম, কী যেন বলে? হ্যাঁ, একদম শ্রেণীশত্রু! তারপর বলল—দরকার নেই। আমি বললাম—আসুন না, আমি আমার

দাদার পার্টি করি না। কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা নেড়ে আবার হাঁটা নাগাল। আমি আবার গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে পাশে দাঁড় করিয়ে বললাম—আমার বাবার ব্যবসার টাকায় গাড়িটা কেনা হয়নি, আপনি আসেন। খুব বিরক্ত হয়ে বলল—কইলাম তো তরে, কোনো দরকার নাই। বলেই হনহন করে হাঁটা দিল। আমারও গেল রোখ চেপে, আবার গিয়ে ধরলাম। বললাম—কোনো চুরির টাকায় গাড়িটা কিনিনি। আর আমিও চোর জোচ্চোর জুয়াড়ি না। তাহলে আমার গাড়িতে উঠবেন না কেন? এই সব বলাতে বোধহয় একটু লজ্জা পেল। বলল—না-না তার জন্য না, আমার সামনে একটু কাম আছে। আমি বললাম—আপনার কোনো কাম নাই। আমার গাড়িতে উঠবেন না বইলাই উঠতাছেন না। বলল—আরে না-না, হাঁইটা গ্যালে কত লোকের লগে দেখা হয়, কথা হয়। আমি বললাম—এই দুপুর রোদে কোনো লোক রাস্তায় থাকব আপনার লগে কথা কইবার জন্য? একটা হাসি দিয়ে বলল—তুই কিছুই জানস না, যারা এই রোদেও বাইরয় তাগো লগেই তো আমার কাম। আমি রাগি নাই, তুই আমারে লিফ্‌ট দিতে চাইছস আমি খুশি হইছি। যা বাড়ি যা অনেক বেলা হইছে, বউমা বোধহয় তর ভাত আগলাইয়া বইয়া আছে। আমি আর কী করি, বললাম—অন্তত ছাতাটা নেন। আমাকে বিদায় করতেই বোধহয় ছাতাটা নিল। কিন্তু অনেকটা চলে আসার পরেও লুকিং গ্লাসে দেখলাম, ছাতাটা নিয়েছে কিন্তু খোলেনি। যদি আবার কেউ কিছু ভাবে। কে সাধ করে এই লোকের সামনে পড়ে?'

শুভ বলল, 'যাক গে, তারপর বল তোর বউ, বাচ্চার খবর কী?'

সে শুভর প্রশ্ন শুনে অবাক। বলে কী শুভ, এই নন্দর বিয়ে হয়ে গেছে, এমন কি, বাচ্চাও হয়ে গেছে? এই প্রথম সে তাদের সমবয়সী কাউকে দেখল, যার বিয়ে হয়ে গেছে। কিন্তু যাকে প্রশ্ন করা সে তাতে খুব একটা গুরুত্ব দিল না। কেমন একটা দায়সারাভাবে জবাব দিল, 'যেমন থাকার তেমনই আছে।'

উত্তর দেবার ভঙ্গিতেই পরিষ্কার বিষয়টাকে নন্দ কোনো একটা বিশেষ ব্যাপার বলে মনে করে না।

কিন্তু তার কাছে এটা বেশ নতুন একটা ব্যাপার। রাতে সে আর শুভ শুয়েছিল দোতলায় ছাদের লাগোয়া একমাত্র ঘরটায়। সে আর না পেরে বলেই ফেলল, 'যাই বলো ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং।'

'কোনটা?'

'এই যে, নন্দ আমাদের বয়সী একটা ছেলে, বেশ বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেছে।'

'তুইও কর, কে আটকাচ্ছে।'

'আমি তো করতেই পারি, তুই করবি না?'

শুভ বলল, 'বাজে না বকে ঘুমো।'

'দেখ শুভ পার্টি করিস বলে সব সময় একটা পাকা-পাকা হাবভাব করবি? সত্যি কথা বল, ব্যাপারটা বেশ রোমান্টিক—কিশোরী বধূ।'

শব্দ না করে শুভ হাসল, তারপর বলল, 'দেওয়ালে লেখা থাকে দেখিস না—বাল্য বিবাহে পাপ আছে।'

'পাপ করাতেই তো বেশি আনন্দ।'

'তুই উচ্ছন্নে গেছিস চাঁদু।'

'সে তো আমি বহুদিন গেছি। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, তুই যাসনি কেন? পার্টির বারণ আছে?'

'ধ্যাৎ। আসলে চাঁদু তুই ব্যাপারটা যত রোমান্টিক ভাবছিস প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু ব্যাপারটা সে রকম না। নন্দর বউকে আমি একদিনই দেখেছি—ওদের বিয়ের দিন। সে বেনারসি আর গয়নায় জড়ানো একটা জবুথবু ব্যাপার—বেশ হাস্যকর। আর তেরো চোদ্দো বছরের মেয়ের সাথে তুই কিছু কমিউনিকেট করতে পারবি না। তোর তো ধারণা এ সবই অপরাজিতর শর্মিলা ঠাকুর।'

'বুঝলি শুভ এর জন্যই তোদের কিছু হয় না। দুনিয়ায় সব কিছুর মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার ছাড়া কিছুই দেখতে পাস না। প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপারটা বাদ দিয়ে ভাব, দেখ অনেক ব্যাপার তাতে ভাল লাগবে। তুই নিজেকে পরাজিত অপুর জায়গায় নিয়ে গিয়ে ভাব।'

'যা আমি নই তা ভেবে বোকার মতো আনন্দ পাবার কী দরকার? তবে তোকে আমি বলে দিচ্ছি আমি এখন এ নিয়ে তর্ক করব না, প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে।'

'আচ্ছা শুভ তুই কোনোদিন ভেবেছিস—ধর এই বাবা হওয়ার ব্যাপারটা—একদম থ্রিলিং।'

'তুই থামবি চাঁদু। অসম্ভব ভাট বকছিস।'

সে এবারে উঠে বসল, 'আরে আমি বাবা হবার জন্য বউয়ের সাথে শোয়ার কথা বলছি না। তুই বাবা হওয়া মানে, ইউ হ্যাভ ক্রিয়েটেড এ নিউ লাইফ। তার সাথে তোর সম্পর্ক, তার প্রতি তোর মমত্ব—তুই কখনো ভাবিস না শুভ?'

'এই সব ভাবতে-ভাবতে ঘুমো, দারুণ দারুণ স্বপ্ন দেখবি।'

সে এবারে হেসে ফেলল, 'এটাও তো তোদের সমস্যা। আমাকে স্বপ্ন দেখার জন্য ঘুমোতে হয় না, জেগেই দেখি।'

'জেগে স্বপ্ন দেখিস না, কোনো দিন রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়বি।' বলে শুভ উল্টো দিকে ঘুরে শুল, আর কয়েক মিনিটের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করল।

শুভ বলল, 'এই দেখ, এই আমাদের নদী। আমাদের ছোটবেলা, আমাদের বড় হওয়া সব কিছুর সাথে মিশে আছে নদীটা।'

এদিন দুপুরে খেয়েই তারা বেরিয়েছে। এখানে দুপুরবেলায় দোকানপাট সব বন্ধ থাকে, রাস্তায় লোকজনও অনেক কম। শীতের দুপুরে উঠোনে বসে রোদে চুল শুকনো কিছু মাঝবয়সী মহিলা, ঝিমিয়ে থাকা দু-একটা পাড়া, মাঠে রবারের বলে জমে ওঠা একটা ক্রিকেট ম্যাচ পার হয়ে একটা বাঁধে উঠতেই চোখে পড়ল নদীটা। বাঁধের থেকে নদীটা বেশ দূরে। মাঝখানটায় সাদা পাথর আর বালির বিশাল শুকনো চড়া পরে আছে নদীর অধিকারের সীমা জানানোর জন্য। অন্য পারের কাছ দিয়ে নদীটা বইছে। এপাশের পারের কাছে অল্প একটু জমে থাকা জল, সে জল শ্যাওলার সবুজ মেশানো কালো। তার পাশে ছোট কীসের যেন একটা খেত—সেটা ঢেকে গেছে সাদা সাদা ফুলে। নদীর ওপারটায় চা বাগান, সেটা ধাপে ধাপে ঘন সবুজের ঝোপ হয়ে উঠে গেছে অনেকটা, একটা টিলার মাথা পর্যন্ত। আর যেখানে সেটা শেষ হচ্ছে সেখানেই ধপধপে সাদা বাংলোটা। শুভ বলল ওটা বাগানের ম্যানেজারের বাংলো—সে অবশ্য জানে আসলে ওখানে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী

মানুষেরা থাকে। উত্তরের দিকে তাকালে নদী শেষ হয়ে নীল আর সবুজ মেশানো পাহাড়, সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার গায়ে কয়েক বছর আগে ধসের চিহ্নটা দূর থেকে লাগছে সাদা তিলকের মতো। আর এ সময় আকাশে চিল ওড়ার কথা, আর উড়ছেও কয়েকটা, অনেক নীচে নেমে।

শুভকে রাগাবার জন্য সে বলল, 'নদী কই রে, এ তো একটা নালা।'

শুভ সত্যি-সত্যি রাগল—'তা তো বলবিই, তোরা কলকাতার লোকেরা। জীবনে তো নদী কাকে বলে তা বুঝবার চেষ্টা করলি না। পুজোর বিসর্জন আর পকেটে পয়সা না থাকলে প্রেম করা ছাড়া গঙ্গাটার দিকে কোনো দিন কলকাতার লোকেরা তাকালও না।'

সে হো-হো করে হাসল। শুভ তাতেও দমল না—'বুঝবি না, বুঝবি না, দেখ ওই দিকে', হাত তুলে দূরে কোনো একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'প্রত্যেক শীতকালে ওখানে আমরা ছোটবেলায় পিকনিক করতে আসতাম। বকা খেলে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখানে এসে বসে থাকতাম। আর বর্ষাকালে যখন জল বেড়ে গোটা নদীটা ফুঁসত তখন ওই পারের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতাম জল কতটা বাড়ছে, আর ছুটে গিয়ে বড়দের খবর দিতাম। দোলের কয়েক দিন আগে থেকে চড়ায় এসে আটকে থাকা গাছের শুকনো ডাল নিয়ে যেতাম বুড়ির ঘর বানাতে। আর তাই করতে গিয়েই প্রথম পাইথন দেখেছিলাম, শীতের পর গাছের ডাল জড়িয়ে রোদ পোহাচ্ছে। একদিন সন্ধ্যা নামার ঠিক আগে দেখেছিলাম দুটো বাচ্চা নিয়ে একটা চিতাবাঘ বাগান থেকে নেমে নদীর পার দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে গেল। আসলে চা বাগানের ঝোপে চিতাবাঘেরা বাচ্চা দেয়। আর পুজোর পর ধান পাকলে তো প্রকাশ্যেই হাতিব পাল নদী পার হয়ে গ্রামের দিকে যায়। আমরা পারের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতাম। ৬৮-তে বন্যায় আমাদের বাড়িঘরও ভেসে গিয়েছিল, আমার সেটা খুব ভালভাবে মনে নেই, শুধু মনে আছে মায়েদের স্কুলে খিচুড়ি রান্না হত আর পাড়ার লোকেরা এক সাথে বসে খেতাম। কিন্তু একটা মজার ঘটনা মনে আছে। তখন আমাদের এখানে একমাত্র গ্রামাফোন রেকর্ড ছিল চ্যাটার্জিজেঠুর বাড়িতে, উনি ছিলেন জেলাকোর্টের বড় উকিল। মা'রা দল বেঁধে মাঝেমাঝে সন্ধেবেলায় চ্যাটার্জিজেঠুদের বাড়িতে গান শুনতে যেত, আমরা বাচ্চারাও সঙ্গে-সঙ্গে যেতাম। গানটান কী হত সেটা আমাদের খুব একটা আকর্ষণের ব্যাপার ছিল না, কিন্তু আকর্ষণের ব্যাপার ছিল চক্‌চকে পিতলের চোঙটা, আমাদের ধারণা অনুযায়ী যার ভেতর গায়ক-গায়িকারা লুকিয়ে বসে থেকে গান গায়। আর আকর্ষণ ছিল ভেতরে ক্রিম দেওয়া বিলিতি বিস্কুট, জেঠুর মক্কেল চা বাগানের সাহেবরা নাকি দিত। ও রকম বিস্কুট সারা জীবনে আর পাইনি রে। মজার ব্যাপার হল বন্যার সময় চ্যাটার্জি জেঠুদের বাড়ির একতলায় জল ঢুকল, যন্ত্রটা খেয়াল করে দোতলায় নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু রেকর্ডগুলো নিতে গেল ভুলে। জলের তোড়ে সেই রেকর্ডগুলো গেল ভেসে। বন্যা কমে যাবার অনেক পরে খেলতে গিয়ে চড়ার বালির মধ্যে গেঁথে যাওয়া অনেকগুলো রেকর্ড আমরা বাচ্চারা খুঁজে পেলাম এবং সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হল চালিয়ে দেখা গেল দু-একটা বাদে বাকিগুলো ঠিকই আছে। এখান থেকে তুই দেখতে পাচ্ছিস না, ব্রিজের ঠিক ওপারটাতেই আমাদের শ্মশান, ঠাম্মাকে ওখানেই নিয়ে এসেছিল। তার পরের বছরে ওই জায়গাতেই অলোকাদি ভেসে গেল, এখনো কেউ জানে না ভর সন্ধেবেলায় আলোকাদি কেন নদীতে নেমেছিল। কেউ বলে আত্মহত্যা, ছেলেমেয়ে হয়নি এই দুঃখে। বুঝবি না চাঁদু, নদীটা আমাদের কাছে কী। তোদের কলকাতায়

মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়, আমি তখন নদীর কথা ভাবি। নদীটা ছোটবেলা, আমার সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলো। চোখ বুজলেই নদী আমার কাছে চলে আসে।'

সে বলল, 'আসলে তোকে হিংসে হচ্ছে বলে তোকে রাগাবার জন্য বলেছি।'

হিংসে হওয়া ছাড়া তার আর কীই বা হতে পারে।

সকালে শুভদের রান্নাঘরের সামনের বারান্দাটায় বসে সে আর শুভ চা খাচ্ছিল। মাসিমা কখনো রান্নাঘরে কাজ করছেন, কখনো বাইরে বেরিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করছেন। বারান্দাটা যেখানে শেষ, সেখান থেকেই গাঁদাফুলের গাছগুলো শুরু। সামান্য শীত পড়াতেই ফুল এসে গেছে। গাঁদাফুলের সারিটার পরের গাছটার দিকে দেখিয়ে শুভ হঠাৎ বলল, 'মা তুমি বলে দিও না। আচ্ছা শুভ বলো, ওটা কী গাছ?'

সে এই প্রথম নজর করে গাছটাকে দেখল। খুব বেশি লম্বা না গাছটা, ভারী কিন্তু ছোট ছোট ঘন সবুজ পাতা। ফুল বা ফল কোনো কিছুই নেই। তার প্রথমে মনে হল, এটা বোধহয় কমলালেবু গাছ। কিন্তু বেফাঁস বলে আওয়াজ খাবার চেয়ে চুপ করে থাকাটাই তার ভাল। তাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে মাসিমা আর শুভ দুজনেই মুচকি-মুচকি হাসছে।

শুভ বলল, 'আচ্ছা তোকে আমি সাহায্য করছি। এক, এটা একটা ফুলের গাছ। দুই, অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালিই ফুলটা দেখেনি, কিন্তু ফুলটার নাম জানে।'

'আমিও তো বাঙালি, আর অল্পসল্প শিক্ষিত—এই কারণে আমিও আগে দেখিনি।'

'এটাই হল মজা, এই ফুলের উপর লেখা কবিতা নিয়ে দেশ তোলপাড়, অথচ ফুলটাই কেউ দেখেনি—ওরে কলকাতার বাবুমশাই—এ হল ক্যামেলিয়া।'

সে ক্যামেলিয়া পড়েনি। কিন্তু কবিতাটা সে ভীষণভাবেই জানে, ছোটবেলায় বহুবার কবিতাটা সে শুনেছে মা'র মুখে। সে জানে এটা তার মার প্রিয় কবিতা এবং এ সূত্রে কবিতাটা তারও একান্ত আপন।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'ফুল কই?'

মাসিমাই জবাব দিলেন, 'এখন ফুল ফোটে না, ফুটবে বর্ষার পর।'

কিন্তু মাকে সে তাহলে কী বলবে? সে এবার জিজ্ঞাসা করল, 'ফুলগুলো কেমন মাসিমা?'

শুভ বলল, 'দাঁড়া, আমি তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, ফুলটা কেমন। তুই দেশী গোলাপ দেখেছি?'

'গোলাপের আবার দেশী-বিদেশী কী?'

'দেখবি এক ধরণের গোলাপের পাপড়ি অনেক বেশি, অনেক বড় ; পাপড়িগুলো ফুলের ভেতরটা ঢেকে রাখে। সে রকম না। এক ধরনের গোলাপ হয় পাপড়ি অনেক ছোট, পাপড়িগুলো ছড়িয়ে থাকে—ফুলের ভেতরটা দেখা যায়। ক্যামেলিয়া দেখতে অনেকটা সে রকম, হালকা গোলাপি রঙের হয়। খুব সুন্দর একটা গন্ধ থাকে, কিন্তু একদম কাছে না গেলে পাওয়া যায় না।'

'আমাকে একটা চারা যোগাড় করে দে আমি নিয়ে যাব, কলকাতায় লাগাব।'

মাসিমা বলল, 'লাভ নেই, ওখানে বাঁচবে না। অনেকে চেষ্টা করেছে, বাঁচাতে পারেনি।'

প্রায় শেষ যুক্তির মতো সে বলল, 'আসলে আমার জন্য না, আমি চাইছি আমার মার জন্য, নিয়ে গেলে মা খুব খুশি হবে।'

'এর জন্যই তো বলছি, এত আশা করে নিয়ে যাবে তারপর গাছটা না বাঁচলে তোমার মা-ই সবচেয়ে দুঃখ পাবেন। তার থেকে তোমার মাকে নিয়ে সামনের পুজোর সময় চলে এসো, তখনও ফুল থাকে।'

তা যে সম্ভব না, সেটা কাউকে বলে কী লাভ? চায়েব কাপটা হাতে নিয়ে সে এক বিষণ্ণতায় ডুবে যায়। তাদের ননীমাধব দে লেনের বাড়িতে টিউবওয়েলের পাশে কেবল দুটো ফুল গাছ—একটা পেতি টগর। তার জীবনের মতই সেগুলো রুগ্ণ আর বিবর্ণ—মা সেগুলো ঠাকুরকে দেয়। আর একটা পুরোনো শিউলি গাছ আছে—ফুল সেটায় হয়, কিন্তু যত না ফুল হয় তার থেকে বেশি হয় শুঁয়োপোকা। তাদের বাড়ির প্রাচীরের ওপারে টিঙ্কুদের বাড়িতে একটা কামিনী ফুলের গাছ ছিল, সেটার ফুল ভরা দুয়েকটা ডাল তাদের উঠোনের ওপরে ঝুঁকে থাকত। কোনো-কোনো রাতে সেই ডালগুলো ভরে উঠত সাদা ফুলে, আর দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া দিলে কয়েকটা পাপড়ির সঙ্গে হালকা একটা গন্ধও চলে আসত তাদের নিরানন্দ উঠোনে। বাথরুমে যাবার নাম করে অন্ধকার উঠোন দাঁড়িয়ে সে জোরে জোরে শ্বাস নিত তাকে অনুভব করতে। পরের দিন প্রাচীরের ধারটা ভরে উঠত ঝরা পাপড়িতে। তারপর টিঙ্কুর বড়কাকা যখন আলাদা হয়ে গেল, তাদের আলাদা রান্নাঘব হল কামিনী গাছটা কেটে। বরং তার ছোটবেলার স্মৃতির সাথে অনেক বেশি মিশে আছে মাঠের কাপাস গাছটা, গরমের দুপুরে তার উড়ে যাওয়া তুলোগুলো। তারপর তো সেই মাঠেই উঠল 'মাই হেভেন'। মাই হেভেনের প্রাচীরে নাম না জানা লতানো গাছে উজ্জ্বল লাল রঙের ফুল হয়, সেগুলো তো তার জন্য না। ওগুলো প্রায় কর্নেল চ্যাটার্জির মতোই—সুন্দর কিন্তু অহংকারী। ওরা আসলে দুটো জগতের সীমানা নির্দেশ করে। জানিয়ে দেয় তার ওদিকে প্রবেশ নিষেধ।

তখন থেকেই তার শুভকে হিংসে হচ্ছে।

একটা বড় পাথরের ওপর বসে তারা দুজন নদীর জলে পা ডুবিয়ে দেয়। জলটা অসম্ভব ঠাণ্ডা, কিন্তু দ্রুত ছুটে চলা স্বচ্ছ জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকতে তার ভালই লাগছে। শুভ বলল জল যেখানে কিছুটা স্থির সেখানে ছোট ছোট মাছও দেখা যাবে। সে একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শুভ আবিষ্কার করল তাদের কারোর কাছেই সিগারেট নেই। শুভ বলল সে সিগারেট নিয়ে এক্ষুনি আসছে। সেও চাইছিল, একা হতে, কারণ জলের ছায়াতে সে দেখেছে আকাশ তার রঙ পাল্টাচ্ছে।

স্থির জলে তৈরি হয়েছে একটা ছোট ঘূর্ণি তার মধ্যে পাক খাচ্ছে ছোট একটা সবুজ পাতা। সে মুখ তুলে দেখতে পেল তিশিকে। আকাশ তখন কল্পনার ক্যামেলিয়ার পাপড়ির রং নিয়েছে। একটা লম্বা সাদা ফ্রক তিশিকে ঘিরে উড়ছে উত্তরের হাওয়ায়। মাঝখানে ছোট নদীটা ছুটে যাচ্ছে দূরন্ত গতিতে। তিশি তাকে দেখে হাসল, তারপর সামনের চা বাগানের গাছগুলোর মধ্যে তৈরি হওয়া পায়ে চলা রাস্তাটা দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেল ওপরের দিকে। একবার ঝোপে তার ফ্রকটা আটকে যাওয়ায় একটু দাঁড়ায়, তারপর সাবধানে ছাড়িয়ে নেয় সেটা। সাদা বাংলোটার একদম কাছে গিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একবার হাসে। এত দূর থেকে সে বুঝতে পারে সেই হাসিতে কোনো আমন্ত্রণ নেই, কিন্তু কোনো বিদায়ের আভাসও নেই। তিশি যেন বলতে চায়, সে আছে তার কাছাকাছি আগের মতো, চিরকালের

মতোই। তিশি মিলিয়ে যায় বাংলোর ভেতরে। আর সেই মুহূর্তে দূরের পাহাড়ের দিক থেকে ভেসে আসে মাটি কাঁপানো গুমগুম করা আওয়াজ। সে হেভি আর্টিলারির এই রক্তহিম করা আওয়াজটা চেনে। তাদের লুকোনোর জায়গাটা ওরা আন্দাজ করতে পেরেছে। এখন চেষ্টা করবে ভারী কামানের গোলায় জায়গাটা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। ট্রেঞ্চের ভেতরে মাটি কামড়ে পরে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। অভ্যাসবশতই সে মাথাটা নীচু করে।

'কী রে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?' শুভর কথায় সে মাথাটা তোলে। 'কী হল, ঘুম পেয়েছে নাকি?'

'না, এমনি ভাবছিলাম।' সে উত্তর দেয়।

'কী ভাবছিলি রে?'

শুভর হাত থেকে চারমিনারটা নিয়ে সে ধরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই ফাঁকা জায়গায় হাওয়াতে সেটা বেশ কঠিন কাজ। বাধ্য হয়েই সে শুভর সিগারেটটা নিয়েই নিজের সিগারেটটা ধরায়।

'কী রে বললি না, কী ভাবছিলি?' শুভ আবার জিজ্ঞাসা করল।

'কী আবার ভাবব, এমনিই। নাথিং স্পেসিফিক।'

'বাজে কথা বলবি না, মাথা নীচু করে যখন মানুষ ভাবে, তখন সে স্পেসিফিক কিছুই ভাবে।'

'বোর করিস না তো।'

'ঠিক আছে, তুই কী ভাবছিস তা জিজ্ঞাসা করে আমি তোকে বোর করব না, কিন্তু এ মুহূর্তে তোর কী ভাবা উচিত সে বিষয়ে আমার একটা সাজেশন আছে।'

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী সাজেশন?'

শুভ একটু চুপ করে থাকে, তারপর খুব স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে, 'তোর এখন গায়ত্রীর কথা ভাবা উচিত।'

সে প্রথমে ভাবল, কথাটা না বোঝার ভাণ করবে কি না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভাবল, সেটা করে কোনো লাভ নেই। বলার ভঙ্গি থেকেই সে বুঝেছে শুভ তাকে এড়িয়ে যেতে দেবে না।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কি এ কথাটা জিজ্ঞাসা করবি বলেই আমাকে নিয়ে এসেছিস?'

'এটা কিন্তু আমি যা বললাম তার উত্তর না।'

'আমি এর কী উত্তর দেব?'

'গায়ত্রী তোর কাছ থেকে কী চায় তা আমরা বুঝতে পারি, আর তুই তা বুঝিস না—না চাঁদু তুই এতটা বাচ্চা নোস।'

সে চুপ করে বসে থাকে। এই প্রশ্নটাকেই সে সবচেয়ে ভয় পায়। এখানেই তার সমস্ত শঠতা ধরা পড়ে যায়। সে জানে গায়ত্রী কোনোদিন তার কাছে কিছু দাবি করবে না। আর সে এতটাই অসৎ, ভেবেছে এটার আড়ালেই সে নিরাপদ থেকে যাবে। আজ শুভ তাকে ধরে ফেলেছে।

'চাঁদু তুই কি অন্য কাউকে ভালবাসিস?'

তার প্রথমে মনে হল শুভ তাকে এই নির্জন নদীর চরে নিয়ে এসেছে খুন করার জন্য।

সে অসম্ভব দ্রুততার সাথে মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল। এটা দেখেও সে বিস্মিত হল, সে কত অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলতে পারে। কিন্তু তার পরেই মনে হল, না সে কোনো মিথ্যা কথা বলেনি। তিশিকে সে ভালবাসে না, তার সাথে তিশির সম্পর্ক কখনো ভালবাসার সম্পর্ক না। তার সাথে তিশির সম্পর্ককে বর্ণনা করার মতো শব্দ আজও কোনো ভাষায় তৈরি হয়নি। এটা ভালবাসা না, এটা অন্য কিছু।

'তাহলে?'

'আমি গায়ত্রীর যোগ্য না।'

'বোগাস।'

'বিশ্বাস কর, আমি যা বলছি তা ঠিক। গায়ত্রী সব ব্যাপারে আমার থেকে অনেক বড়।'

'আমি যদি ভুল না বুঝি চাঁদু, গায়ত্রীই তো তোকে চাইছে?'

'কারণ গায়ত্রী আমাকে চেনে না।'

'চেনে, কারণ তোকে চেনাটা খুব একটা কঠিন না। আসলে সত্যি হল, তুই ভয় পাস। কেবল এ ব্যাপারে না, তুই সব ব্যাপারেই ভয় পাস। তুই একটা টিপিকাল মিড্‌লক্লাস।'

নদীর দিকে তাকিয়ে সে চুপ করে বসে থাকে। শুভ বলে যায়।

'তোকে গায়ত্রীর প্রয়োজন। আর তুই গায়ত্রীকে ফিরিয়ে দিতে চাইছিস। কাল যদি তুই এসট্যাবলিস্‌ড হোস। তোর যদি অনেক টাকা হয়, তুই, এই চন্দ্রশেখ চৌধুরী বড়লোকের ডল পুতুল মেয়ে বিয়ে করবি। হি ম্যানশিপ দেখিয়ে বেড়াবি। তোদের সবকিছুই তো মানিব্যাগের সাইজ দিয়ে ঠিক হয়।'

একবার মনে হল তার প্রতিবাদ করা উচিত, কিন্তু এ বিষয় নিয়ে সে শুভর সাথে কোনো তর্ক করতে চায় না—তাই সে চুপ করেই রইল। কিছুক্ষণ থেমে থেকে শুভই কিছুটা নরম হয়ে গেল। 'আমি তোকে খুব খারাপ ভাবে কথাগুলো বললাম, সরি। আমি জানি, তর্ক করে কারুর সাথে কারুর সম্পর্ক তৈরি করা যায় না। প্লিস্‌ চাঁদু, তুই একটু ভেবে দেখ।'

তার হঠাৎ মনে হল শুভকে সে সব কথা খুলে বলবে। একা-একা সে যে যন্ত্রণা বয়ে বেরাচ্ছে তা সে সব শুভর সামনে উজাড় করে দেবে। শুভ তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু, আর তার থেকে বড় কথা তার বন্ধুদের মধ্যে শুভকেই সবচেয়ে ভরসা করা যায়। শুভ তাকে তিশির বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে পারে, শুভ তাকে হাত ধরে গায়ত্রীর কাছে পৌঁছে দিতে পারে। সে জানে, সে যদি গায়ত্রীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চায়, গায়ত্রী তাকে ঠিক ক্ষমা করে দেবে। পরমুহূর্তেই তার মনে হয়, এ সবকিছুর মানে, তিশিকে চিরবিদায় জানানো। কিন্তু তিশিকে বাদ দিয়ে সে যে বাঁচতে জানে না। তিশির জন্যই সে আছে, তিশির প্রতি আকর্ষণই তার জীবনের তীব্রতম অনুভূতি। লড়াইটা তাকে নিজের মতো করেই করতে হবে। যদি নিজে-নিজে সে কোনোদিন তিশিকে বিদায় দিতে পারে, অস্বীকার করতে পারে কর্নেল চ্যাটার্জির অহংকারী অস্তিত্ব, অগ্রাহ্য করতে পারে মাই হেভেনের সাদা দেওয়ালগুলোকে— একমাত্র সেদিনই তার মুক্তি আসবে, সে কাঠের ঘোড়া থেকে নেমে নিজের পায়ে চলতে পারবে।

একটা পরিচিত ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা তাকে ঘিরে ধরে। পায়ের ওপর দিয়ে বয়ে চলা নদীটাও আর কোনো বিশেষ সাড়া জাগায় না। সে শুধু বলে, 'বিশ্বাস কর শুভ, আমি চেষ্টা করছি, আপ্রাণ চেষ্টা করছি।'

ফিরে আসার সময় তারা কেউই কোনো কথা বলেনি।

ঠিক ছিল তারা বেরোবে দুপুরে খাবার পর। কিন্তু বেরোতে-বেরোতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। এর জন্য অবশ্য দায়ী একমাত্র নন্দ। তার আয়োজন আর শেষই হয় না। কথা আছে তারা থাকবে দু-রাত। কিন্তু যা ব্যবস্থা করেছে তাতে তার ধারণা দু সপ্তাহ চলে যাবে। যেহেতু জঙ্গলে কিছুই পাওয়া যায় না এবং নন্দরা এখানকার সবচেয়ে বড় দোকানের মালিক কাজেই নন্দর জিপের পেছনটা হয়ে উঠেছে একটা ছোটখাটে গুদাম। এমন কী ওখানকার চৌকিদারেরা যদি ঠিকঠাক রাঁধতে না পারে তার জন্য একজন রান্নার লোককেও নন্দ চাপিয়ে নিয়েছে জিপের পেছনে। রাশিকৃত মালপত্র, ছ'টি জীবন্ত মুরগি এবং একটি জীবন্ত রাঁধুনিকে জিপের পেছনে চাপিয়ে তারা যখন রওনা হল তখন তিনটে বেজে গেছে। শুভ বলেছিল পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে, তহলে তারা যখন পৌঁছবে তখন দিনের আলো সামান্যই থাকবে।

জিপ চালাচ্ছে নন্দ নিজেই, নন্দর পাশে সে এবং একদম ধারে বসেছে শুভ। নন্দ যে গাড়িটা নিজে চালাচ্ছে এটা কিছুটা তাদের দেখানোর জন্যই। শুভ একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ড্রাইভারের কথা, নন্দ গম্ভীর মুখে বলল তার কোনো দরকার নেই। ঘণ্টাখানেক বড় রাস্তায় চলবার পর নন্দ গাড়ি থামিয়ে বলল, এবার তারা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকবে এবং তার আগে তারা একটু চা খেয়ে নেবে। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে তারা চা খেল, কিন্তু ভয় হচ্ছে দিনের আলো থাকতে থাকতে বোধহয় তারা আর পৌঁছতে পারবে না।

এরপর বড় রাস্তা ছেড়ে তারা নেমে আসল একটা কাঁচা রাস্তায়। অবশ্য জঙ্গলে ঢুকবার আগে রাস্তাটা অনেকখানি গেছে গ্রামের মধ্যে। বিকেলে রাস্তায় অনেক লোক। শুভ বলল, এরা অধিকাংশই নাকি রাজবংশী। গ্রাম ছাড়াবার পর ক্ষেতের পাশ দিয়ে, ধুলোর একটা ছোটখাট ঝড় তুলে চলেছে নন্দের জিপ। ক্ষেত অবশ্য এখন ফাঁকা, কেটে নেওয়া ধানগাছের ধূসর প্রান্তটুকু কেবল মাথা তুলে রেখেছে। একটু পরপরই ক্ষেতের পাশে গাছের ডালে বাঁধা মাচাগুলোই তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করছে। ধান পাকলে হাতীদের হাত থেকে তা বাঁচানোর জন্য গ্রামের লোক সারা রাত ধরে মাচায় বসে পাহারা দেয়। হাতি আসলে পটকা ফাটায়, ক্যানেস্তারা বাজায়—শব্দ করে সেগুলাকে তাড়াবার চেষ্টা করে। আওয়াজ পেয়ে গ্রামের লোকেরা মশাল টশাল জ্বালিয়ে বেরিয়ে আসে। সারা রাত ধরে নাকি হাতীর সাথে যুদ্ধ চলে।

তাকে এসব বোঝাচ্ছিল নন্দই। সে জিজ্ঞাসা করল, সে যুদ্ধে কারা জেতে। নন্দ বলল, কখনো মানুষ, কখনো হাতি।

'হাতির সাথে লড়তে গিয়ে মানুষ মরে না?'

'হ্যাঁ, তাও মরে।'

'কই খবরের কাগজে তো সে সব বেরোয় না?'

'এই অজ পাড়াগায়ে কয়েকটা লোক মরলে কার কী যায় আসে', নন্দ বলল, 'আর এ তো নতুন কিছু না, প্রতিবছরেই এ সব হয়। এখানকার মানুষের কাছে ব্যাপারটা খুব সিম্পল্—হাতি ধান নষ্ট করলে না খেয়ে মরবে, তার থেকে হাতির সাথে লড়াই করে ধানটা বাঁচানোর চেষ্টা করাই ভাল।'

'হাতি মরে না।'

'না-না, অত বড় হাতিকে মারবে কী করে? কিন্তু মাঝেমাঝে ক্ষেতে বুনো শুয়োরও আসে, সেগুলোকে মারবার চেষ্টা করে, আর একটাকে মারতে পারলে গ্রামে একদম উৎসব, প্রচুর মাংস পায়। বুঝলি টুটুন, আমাদের ওদিকে আমি বুনো শুয়োরের মাংস খেয়েছি—ভাল খেতে।'

রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেটা একটা পাথরে ভরা শুকনো নদীর খাত। নদীটা পার হয়ে তারা ঢুকে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে।

এই প্রথম সে কোনো জঙ্গলে ঢুকছে। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাতা তার কাছে নতুন। কোনো গাছের নাম সে জানে না, জানে না গাছের গায়ে গায়ে বেড়ে ওঠা লতাগুলোর নাম। কিন্তু সব মিলিয়ে দৃশ্যটা তার কাছে খুব চেনা লাগছে। এমনিতেই বিকেল অনেকটা গড়িয়ে গেছে, রোদের তেজ এসেছে কমে। একটানা বিশাল গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা রাস্তাটা কখনো প্রায় অন্ধকার, আবার কখনো একটু ফাঁকা পেলে এক ঝলক বিকেলের আলো। বড় বড় গাছের নীচে ঝোপগুলোতে সন্ধ্যামণির মতো সাদা-সাদা ফুল।

সে প্রায় দম বন্ধ করে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে যদি কোনো জীবজন্তু চোখে পড়ে। পথটা ঝরা শুকনো পাতায় পুরোপুরি ঢাকা পড়ে আছে। রাস্তার পাশে পড়ে থাকা পুরনো গাছের ডালপালাগুলোকে দেখে দূর থেকে মনে হয় যেন কোনো জন্তু। হঠাৎই সে আবিষ্কার করল চারিদিকের অদ্ভুত আওয়াজটা। পুজোর ঘরে ছোট যে ঘণ্টাগুলো থাকে তার আওয়াজ, কিন্তু একটা দুটো নয় হাজার-হাজার ঘণ্টার আওয়াজ। যতখানি চোখের দৃষ্টি যায় তার ঠিক ওপারেই নাটমন্দিরে কারা যেন ঘণ্টা বাজাচ্ছে, কোনো পুজো হচ্ছে।

বিস্মিত হয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ঘণ্টার মতো আওয়াজটা কীসের রে?'

নন্দ বলল, 'এক রকম ঝিঁঝি পোকার।'

সে কিছুটা হতাশই হল। ঝিঝি পোকার থেকে বরং অদৃশ্য নাটমন্দিরই ভাল। কিন্তু আওয়াজটার মধ্যে কেমন যেন একটা আশঙ্কা মিশে আছে, যেন কিছুর একটা পূর্বাভাস, একটু পরেই কিছু একটা হবে। অস্বস্তিটা কাটাতে সে শুভকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে তুই যে একদম চুপ করে গেলি?'

'উপভোগ করছি।'

'যাক তাও ভাল, উপভোগ করছিস, আমি ভাবলাম বিপ্লবের কথা ভাবছিস', নন্দ বলল।

হাসতে-হাসতে শুভ বলল, 'সেটাও ভাবছি। আইডিয়াল জায়গা। চারিদিকে ভুটান বর্ডার, আর জঙ্গল। আশেপাশের মানুষরা গরিব চাষী আর চা বাগানের শ্রমিক, রয়েছে মধ্যযুগীয় শোষণের মধ্যে। ভাল করে আগুনটা জ্বালাতে পারলে...।'

কথার মাঝখানেই নন্দ বলল, 'আশেপাশে কটা মিলিটারি বেস রয়েছে জানিস?'

'ওটা কোনো ব্যাপার না।'

'নকশালবাড়িতেও এটা ভেবেছিল।'

'নকশালবাড়িতে মিলিটারিও লাগেনি। আসল বিষয় হল মানুষকে জাগানো। সেটা না করতে পারলে কোনো বাড়িতেই কিছু হবে না। যদি গ্রাম আর বাগানগুলোতে তুই ঠিক মতো বেস তৈরি করতে পারিস তবে এই জঙ্গল তোর দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে যাবে।'

'তোর কি ধারণা গভর্নমেন্ট আঙুল চুষবে?'

'ভিয়েতনামে আমেরিকানরা কি চুষছিল?'

তর্কটা চলছে শুভ আর নন্দর মধ্যে, সে নীরব শ্রোতা। তার শুধু মনে হল শুভরও বোধহয় ছোটবেলায় একটা কাঠের ঘোড়া ছিল। কেন ওরা তর্ক করছে? তার তো কোনো যুক্তি তর্কের দরকার হয় না। চাইলেই সে হেভি আর্টিলারির গোলায় শুইয়ে দিতে পাবে উঁচু-উঁচু গাছের মাথাগুলো। এজেন্ট অরেঞ্জে শুকিয়ে দিতে পারে সমস্ত সবুজ। আগুন জ্বালিয়ে সব শেষ করে দিতে পারে। আর তা না চাইলে সামনের ঝরনার জল থেকে আকাশি নীল ওড়নায় ডেকে তুলে আনতে পারে তিশিকে। শুধু আকাশের রং একটু পালটে নিতে হবে।

তারা যখন পৌঁছেছিল তখন চারিদিক অন্ধকার। আরো কালো একটা স্তূপের মতো সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাটা, এক বিন্দু আলো কোথাও নেই। চৌকিদারকে খোঁজ করতে নন্দ অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে সে আর শুভ জিপ থেকে নেমে আসল। বেশ ঠাণ্ডা। শুভ বলল, 'নদীর আওয়াজ পাচ্ছিস?'

ভাল করে কান পেতে সে আওয়াজটা শুনল। একটা অবিশ্রান্ত ঝরঝর করে জল বয়ে যাওয়ার আওয়াজটা আসছে বাংলোটার ওপার থেকে। আওয়াজটা জোরালো, কিন্তু আলাদা করে খেয়াল না করলে চেনা যায় না। আকাশে তারার মেলা। নন্দর কোনো খোঁজ নেই। সে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েই জিজ্ঞাসা কবল, 'নন্দ কই রে?'

'বোধহয় চৌকিদারকে ম্যানেজ করছে।'

'ম্যানেজ কেন, বুক করেনি।'

'বোধহয় না।'

'সে কী রে? যদি বলে থাকতে দেবে না?'

'বলবে না। মাঝে-মাঝে ফরেস্ট অফিসাররা ফুর্তি করতে আসে, এছাড়া তো এসব বাংলো প্রায় ফাঁকাই পরে থাকে। আমরা এসেছি চৌকিদারের লাভ, পয়সা পাবে, ভাল খাওয়া দাওয়া পাবে।'

এতক্ষণ পরে একটা হ্যারিকেনের আলোকে এদিকে আসতে দেখা গেল। দূর থেকেই নন্দ চেঁচিয়ে বলল, 'শালা, এই ভর সন্ধ্যাতেই মাল খেয়ে আউট।'

শুভ বলল, 'হ্যাঁ, এটাই সরকারি সিদ্ধান্ত।'

তার মনে হল এত অন্ধকার সে কোনো দিন দেখেনি। কিছুক্ষণ আগেও আকাশে তারা ছিল, বোধহয় মেঘে সে তারাও ঢেকে গেছে। আজ নাকি অমাবস্যার পরের দিন, কাজেই হালকা মেঘের আড়ালে চাঁদও যে কিছুটা আলোর আভাস এনে দেবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাদের ঘরের লাগোয়া বারান্দাটায় সে আর শুভ দাঁড়িয়ে। বাংলোর পেছনে রান্নাঘর, কিন্তু এখান থেকে নন্দর ইনস্ট্রাকশন শোনা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা থাকলেও বাইরে দাঁড়াতে খারাপ লাগছে না। 'আউট' হওয়া চৌকিদার আর তার এক হাড় জিরজিরে অ্যাসিস্টেন্ট দুটো ঘর খুলে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, বাথরুমে জল দিয়ে গেছে। আর এক অদ্ভুত বাংলায় এই বাংলোর নাড়ি-নক্ষত্র জানিয়ে দিয়ে গেছে। ওদের কথামত বছরের এ সময়টায় প্রায় প্রতিদিনই হাতিরা বাংলোর আশেপাশে চলে আসে। এ কথা শুনেই রাত্রিবেলাতেই নদী

গাছ। সেগুলোতে ভীষণ সুন্দর সাদা আর বেগুনি রঙের ফুল, এ ফুলও আগে সে কখনো দেখেনি। রাস্তাটাও চলেছে নিজের খেয়ালে, কখনো একদম নদীর গা ঘেঁষে কখনো নদী থেকে অনেকটা ওপরে।

নদীর দিকে তাকিয়েই সে প্রায় হাঁটছিল। একটা পায়ে চলা পথ নদী থেকে সোজা উঠে এসে রাস্তাটা পার হয়ে ঢুকে গেছে গভীর জঙ্গলে। তার প্রথমেই মনে হল, কারা এই পায়ে চলা পথ দিয়ে যায়? নিশ্চয়ই জঙ্গলের জীবজন্তুরা। তার একটু ভয় ভয়ই করতে লাগল। নদীর খাতটাই বরং নিরাপদ। আর সামনেই প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো বিশাল একটা পাথরকে ঘিরে রাস্তাটা ঢুকে গেছে আরো গভীর জঙ্গলের ভেতর। পায়ে চলা রাস্তাটাকে আড়াআড়ি ভেঙে সে নেমে আসল নদীর খাতে। এখানটাতেও একটা ছোট বালির চড়া আছে, নদীটা সেই চড়ার পাশে অনেকটা শান্ত। সে এসে দাঁড়ায় নদীর একদম ধারে। তারপর বাঁ পাটা খুব আস্তে-আস্তে জলে ছোঁয়ায়। যতটা ঠাণ্ডা লাগবে বলে মনে হয়েছিল জল ততটা ঠাণ্ডা না। এবার ডান পাটা। জলের মধ্যে দু পা এগিয়ে যায়, জলের স্রোত তার পায়ে প্রায় আদর করে ধাক্কা দিয়ে দিচ্ছে। সে নীচু হয়ে জল ছোঁয়, তারপর হাতে করে নিয়ে জল ছুড়ে দেয় ওপরের দিকে। জলের ফোঁটাগুলো তার গায়েই এসে পড়ে। সে চেঁচিয়ে ওঠে—'এই শালা', তারপর চমকে তাকায় চারিদিক। না কেউ নেই। সে আবার জল ছোড়ে, হো-হো করে হাসে। আরো এক পা নদীর জলে নেমে সে ফিরে তাকায় ছেড়ে আসা জঙ্গলের দিকে। তারপর সিনেমায় যে রকম দেখায় সে ভাবে হাতদুটো মুখের পাশে জড়ো করে চেঁচায়, 'এই যে, আমি চন্দ্রশেখর, চাঁদু—আমি এখানে।' তার চেঁচামেচিতেই বোধহয় ওপারের জঙ্গল থেকে পায়রার মতো সবুজ কয়েকটা পাখি উড়তে শুরু করে। সে নদী ছেড়ে উঠে আসে বালিতে। চাদরটাকে ভাল করে জড়ায় তারপর ছুটতে শুরু করে। কিন্তু কতটাই বা সে ছুটবে, বালির চড়াটা ছোট, তারপর পাথর—তার ওপর দিকে ছোটা যায় না। সে এসে দাঁড়ায় গাছটার নীচে। গাছটা ভর্তি ছোট ছোট চকচকে সবুজ পাতা। এটা কি গাছ সে জানে না, কেন যেন মনে হল গাছটা বোধহয় অর্জুন গাছ। গাছটার ঠিক গোড়ায় বিশাল পাথরটা প্রায় একটা চাতালের মতো মসৃণ। দু-পা ছড়িয়ে সে এসে পাথরটার ওপর বসে। সামনেই নদীর ওপারে দুটো পাহাড় নীচে এসে মিশেছে। তৈরি হয়েছে আকাশের একটা নীল ত্রিভুজ। আর হঠাৎ গান গাইতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে তো গান গাইতে পারে না। ছোটবেলায় মা তাকে গান শেখানোর চেষ্টা করছিল। হারমোনিয়ামের সা-রে-গা-মা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু মা সেখানে না থেমে তাকে ইমনকল্যাণ শেখানোর চেষ্টা করেছিল, হয়নি তার। কিছুদিন পর মা'ও হাল ছেড়ে দিয়েছিল। গান না গেয়ে তার ভাল লাগত হাঁ করে মার গান শুনতে। রেডিওতে গান হলে মা তাকে রাগ চেনানোর চেষ্টা করত, সেখানেও সে বেশি দূর এগোয়নি। ইমনকল্যাণ ছাড়া আর সে মালকোষটা বড় জোর চিনতে পারে।

সে আরাম করে একটা সিগারেট ধরায়। অনেকটা হেঁটে আর একটু দৌড়ে সে ক্লান্ত। সিগারেটে দুটো টান দিতেই তার কেমন ঘুম পেয়ে গেল। আর ঘুম পাবার সাথে-সাথে অনুভব করল—সে খুব খুশি, সে এখন খুব ভাল আছে। আকাশের রঙ পাল্টায়নি, নীল আকাশেই সে খুব ভাল আছে। খুব ছোটবেলার পর এ রকম ভাল তার আর কখনো লাগেনি। জায়গাটা তার কেমন যেন চেনা লাগছে, মনে হচ্ছে আগেও সে এখানে এসেছে। কিন্তু সে জানে সেটা সম্ভব না। তার মনের একদম ভেতরে কোথাও এ জায়গাটা আছে, সে জানত

না। তার চিরকাল এখানে থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। এখনে থাকলেই সে সুখী। এই সুখের জন্য দ্বিতীয় কাউকে দরকার নেই। এই নদী, এই গাছ, এই পাহাড়, আকাশে উড়ে যাওয়া খয়েরি ডানার পাখিটা এই সব কিছু নিয়েই সে সুখী, এই সব কিছুর মতোই সে সুখী। এই সুখ পেতে তার তিশিকে দরকার নেই। এই কেবল বেঁচে থাকার মধ্যের সুখটাকে সে আজকেই আবিষ্কার করেছে। সে এই জায়গাটাকে চেনে কারণ এটাই তার উৎসস্থল, এটাই তার জন্মস্থান। প্রত্যেকটা মানুষ এ রকম নদী, পাহাড়, জঙ্গল আর অর্জুন গাছের নীচেই সৃষ্টি হয়। শহরের ইট-কাঠ-কংক্রিটের মধ্যে থেকে সে শুধু তার জন্মস্থানটাকে চিনতে পারে না। আর চিনতে পারলেই সুখ। তিশিকে যদি সে কোনোদিন স্পর্শ করতে না পারে, যদি তার বাকি জীবনটা কেটে যায় ব্যাগের ভেতরে টিফিন বাক্স নিয়ে ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিড়ের বাসে ঝুলতে-ঝুলতে—কী এসে যায়? সে দুঃখ পাবে, কিন্তু তার মানে কি সব শেষ? না, সে আবার এখানে ফিরে আসবে। নিজের ভেতরে নিজেকে স্পর্শ করার চেষ্টা করবে। তাহলেই আবার বেঁচে থাকা যায়, বেঁচে থাকার মধ্যেকার সুখটাকে আবিষ্কার করা যায়।

মুখে এসে রোদ পড়াতে তার ঘুমটা ভেঙে যাওয়া মাত্র তার খেয়াল হয়, সে কাউকে বলে আসেনি। ওরা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে। বাংলোয় ফিরে সে আশ্বস্ত হয়, না কেউই তার জন্য চিন্তা করেনি। নন্দ এখনও ঘুম থেকে ওঠেইনি, শুভ সবে উঠে দাঁত মাজছে। সে ঠিক করেই এসেছিল কাউকে সে কিছু বলবে না।

সারা দিনটা তার কাটলো নন্দর জিপে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন গার্ডকেও জোগাড় করেছিল, সেই ওদের সব চিনিয়ে দিয়েছিল। সবই খুব সুন্দর, সবই তার কাছে নতুন—কিন্তু কিছুই তাকে স্পর্শ করছিল না। সে মনে-মনে তার অর্জুন গাছের নীচেই সারাদিন কাটিয়ে দিয়েছে। তার শুধু একটাই ভয় ছিল, যদি সবাই মিলে সেখানে গিয়ে হাজির হয়, ওই জায়গাটা তার একান্ত আপন, কারোর সাথে সে ভাগ করে নিতে চায় না। বিকেল থেকে শুরু হল টিপটিপ করে বৃষ্টি। সে শোবার সময়ই ঠিক করে নিয়েছিল, কালকেও সে আবার একা-একা চলে যাবে।

ঘুম তার ঠিক সময়ই ভেঙেছিল, কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে বুঝল বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল সে। বারান্দায় দাঁড়ানো যাচ্ছে না বৃষ্টির ছাটে। আর সঙ্গে সে রকম কনকনে ঠাণ্ডা। সে আবার এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, কাল যেটা সে দেখেছে, সেটাও একটা কল্পনা, আসলে ওরকম কোনো গাছ নেই, নদী নেই, নেই কোনো বালির চর। বৃষ্টি সব কিছুকে মুছে দিয়েছে।

দশটা নাগাদ বৃষ্টি কমে এলেও আকাশটা একটা আনন্দহীন ছাই রঙ হয়ে রইল। দুপুরে খাওয়ার পর তারা রওনা হল ফেরবার জন্য। যাবার আগে সে একা এসে দাঁড়াল নদীর পারে, উত্তরের দিক থেকে নদীটা ছুটে আসছে অনেক জোরে, পাল্টে গেছে জলের রঙ। নীলের ওপর পড়েছে মাটি রঙের ছোপ। এখান থেকে তার অর্জুন গাছকে দেখতে পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই তা জেনেও সে তাকিয়ে রইল উত্তরে, যদি তাকে দেখা যায়। না কেউ নেই, সে নিজেকেই সান্ত্বনা দিল—আমি আবার ফিরে আসব।

সকালবেলায় পাড়াতেই সে খবরটা পায়—ইলেকশন ডিক্লেয়ার্ড হয়েছে। তার ক্লাস সাড়ে দশটায় কিন্তু শুভকে ধরবার জন্য সে দশটার মধ্যেই কলেজে চলে এসেছে। কিন্তু শুভ কোথাও নেই। কেমিস্ট্রি অনার্সের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল, শুভ কলেজেও আসেনি। একবার সে ভাবল শুভর মাসির বাড়িতে ফোন করে খোঁজ নেবে, অসুখ-বিসুখ করল কি না। পরে মনে হল সেটা করে লাভ নেই, খবরটা শুভও পেয়েছে, ও নিশ্চয়ই ওর পার্টির লোকদের সাথে কথা বলতে গেছে। কিন্তু শুভকে না পেলে গোটা ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। কলেজে বাইরের থেকে কিছু বোঝা না গেলেও, ভেতর-ভেতর একটা চাপা উত্তেজনা আছে। ইউনিয়ন রুমের সামনে দিয়ে সে দুবার গেছে, সেখানে অনেক ছেলে কিন্তু হই হট্টগোলটা অনেক কম। ক্যান্টিনের টেবিলগুলোতে কথা হচ্ছে একটু চাপা গলায়। তাদের টেবিলে ইলেকশন নিয়ে কোনো কথা হয়নি। কিন্তু অনেকেই এসে শুভর খোঁজ করছে। শুভ মার খাওয়ার পর অনেকেই যেন তাদের একটু এড়িয়ে চলেছিল—কিন্তু আজকের দিনটা একটু অন্যরকম। সারাদিন সে ক্লাসে যায়নি—শুভ এলেই যাতে ধরতে পারে। কিন্তু বিকেল হয়ে গেল শুভর দেখা নেই। সবাই চলে গেলেও সে আর শালিনী বসেছিল। তাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি, কিন্তু সে জানে শালিনীও বসে আছে শুভর জন্যই। সে আজকাল শালিনীর সামনে শুভর প্রসঙ্গ খুব একটা তোলে না, কেমন একটা অস্বস্তি হয়। শলিনী তার ঠাকুমার গল্প করছিল। কোনো মনোযোগ না দিয়েই সে কথাগুলো শুনছিল। এমন সময় শুভ ঢুকল। উস্কোখুস্কো চেহারা, কিন্তু দূর থেকে তাদের দেখে একগাল হাসল। কাছে এসে বলল, 'আমি একটা চান্স নিলাম, যদি তোদের কাউকে পেয়ে যাই। কিছু একটা বল, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।'

চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে শালিনীকে বলল, 'তুই এতক্ষণ কী করছিস?'

'তোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'বাড়িতে বকবে না, দেরি করছিস?'

'বকুক।'

'ও বাবা! হঠাৎ এত বিদ্রোহ?'

'তোর জন্য বকা খেতে হবে এটা ধরেই নিয়েছি।'

ক্যান্টিনের ছেলেটা চা দিতে এসেছিল, শুভ কী একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল। ছেলেটা চলে যেতে গলাটা নামিয়ে খুব আস্তে-আস্তে বলল, 'ঠিক করছিস না।'

অনেকক্ষণ কেউই কোনো কথা বলেনি। তারপর শালিনীই বলল, 'আমি তো কোনো অন্যায় করছি না।'

'বোধহয় অন্যায়।'

সে বসেছে ভেতরের দিকে চেয়ারে। তার মনে হচ্ছে এ আলোচনাটায় তার উপস্থিত থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু শুভ না উঠলে সে বেরোতে পারবে না। শালিনী বসেছে তার উল্টোদিকে। গোটা কথোপকথনটার সময় শালিনী টেবিলের দিকে চোখটা নামিয়ে রেখেছে, একবারও মুখ তোলেনি। একই ভাবে মাথাটা নামিয়ে রেখেই শালিনী বলল, 'ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

ইন্দ্রনীলকে সে চেনে না, কিন্তু নামটা জানে। খড়্গপুর আই আই টির ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। শালিনী নিজেই জানিয়েছিল, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা। এই নিয়ে বন্ধুরা অজস্রবার শালিনীর পেছনে লেগেছে। আজই সে প্রথম কথাটা শুনছে—ইন্দ্রনীলের সঙ্গে শালিনীর আর কোনো সম্পর্ক নেই। সে আজ শুনলেও শুভ কী আজ প্রথম শুনছে? শুভর মুখের দিকে তাকিয়ে সে তার প্রশ্নের কোনো জবাব পেল না। সে বলল, 'তোরা কথা বল, আমি চলি।'

শুভ বলল, 'তোর ওঠবার দরকার নেই, তুই আমাদের দুজনেরই বন্ধু।'

এভাবে বসে থাকাটা ঠিক না। সে বলল, 'না, আমি উঠি।'

এবার শালিনী বলল, 'বোস চাঁদু, আমরা কোনো নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি না।'

শুভ এবার শালিনীকে জিজ্ঞাসা করল, 'সম্পর্কটা ভাঙলি কেন? আমার জন্য?'

'তোর জন্য কেন হবে? আমার নিজের জন্যই। সমস্যাটা বেশ কিছু দিন ধরেই হচ্ছিল। এবার পুজোর সময় আমরা ফাইনাল কথা বলে দিই। আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছিলই। আসলে ইন্দ্রনীলের কোনো দোষ নেই। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমার আলাপ ক্লাস ইলেভেনে আমি যখন পড়ি। এর মধ্যে আমিই অনেকটা পাল্টে গেছি। ও আমার কাছ থেকে যা চায় তা আমি আর দিতে পারব না, আর আমি যা চাই তা ও কোনোদিনও হতে পারবে না। অনর্থক একটা সম্পর্ককে টেনে নিয়ে যাবার কোনো অর্থ হয় না, আমরা ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'তোর এই সিদ্ধান্ত বাবা-মা জানেন?'

'এ ব্যাপারটাকে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি, নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত আমি নিজেই নিতে পারি। আর ইন্দ্রনীলের কাছে আমি করুণা ভিক্ষা করিনি, তোর কাছেও করছি না। আমার কথাটা শুধু তোকে জানিয়েছি।'

কথাটা বলতে বলতে শালিনী উঠে দাঁড়াল।

শুভ বলল, 'বোস, তুই আমাকে ভুল বুঝছিস। আমি তোকে অসম্মান করছি না। তুই শুধু ভেবে দেখ, তোর আর আমার দুটো জগৎ একদম আলাদা, তুই কোনো জীবন থেকে এসেছিস, আর আমি একদম ছা-পোষা মাস্টারের ছেলে। আর আমি যে রাজনীতি করি তাতে আমার জীবনের গোটা বিষয়টাই অনিশ্চিত। জীবনটা হঠাৎ তৈরি হওয়া আবেগের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না শালিনী। আজ তুই যা ভাবছিস, কাল বাস্তবের ধাক্কায় তুই তো তা নাও ভাবতে পারিস। তখন কী হবে?'

'তুই যা বললি, তার প্রতিটি কথায় আমার প্রতি অসম্মান ফুটে বেরোচ্ছে। একমাত্র তোদেরই মনের জোর আছে, পার্সোনালিটি আছে, ডিটারমিনেশন আছে। আর আমি বড়লোক আই এ এস অফিসারের আদুরে মেয়ে', সবই—আমার কাছে খেলা, সবই তাৎক্ষণিক ইমোশন। আমাকে অপমান করার কোনো অধিকার তোর নেই। আমি যচ্ছি,

তোদের অনেক বিরক্ত করেছি—আই অ্যাম সরি, আর বিরক্ত করব না।'

টেবিল ছেড়ে উঠে গেল শালিনী। শালিনী সুন্দর, কিন্তু আজ শালিনীকে যত সুন্দর লাগছে এর আগে কখনো সে রকম লাগেনি। কলেজের বন্ধুরা শালিনী সম্পর্কে বলে, শালিনী নাকি দুভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারে, একটা হাসি আর একটা রাগ—এছাড়া শালিনী আর কিছু পারে না। আজ শালিনী রেগেছে, কিন্তু এই রাগ তারা কেউ দেখেনি। শালিনী যখন প্রায় ক্যান্টিনের গেটে, সে ফিসফিস করে বলল, 'কী করছিস শুভ, যা, ওর সঙ্গে যা।'

শুভ তার কথার কোনো উত্তর দেয় না, চুপ করে বসে থাকে দু হাতে মুখ ঢেকে। সেও অসহায়ের মতো চুপ করে বসে থাকে। ক্যান্টিনও খালি হয়ে আসছে। এক সময় সে বলে, 'চল উঠি।'

শুভ প্রায় চমকে মুখটা তোলে, তারপর অসহায়ের মতো বলে, 'বিশ্বাস কর চাঁদু, আমি ওকে ভালবাসি, ভীষণ ভালবাসি।'

'তাহলে বসে আছিস কেন, যা, ওর সঙ্গে যা।'

'না, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে ওর জীবনটাকে আমি নষ্ট করতে চাই না।'

'তোর জীবনটা কি তুই নষ্ট করছিস?'

'না, আমি যেভাবে বাঁচতে চাইছি, সেটা এক রকম বিশেষভাবে বাঁচা। যে এভাবে বাঁচতে জানে না, তার কাছে জীবনটা নষ্ট।'

'তুই যেভাবে বাঁচতে চাস, সেটা আমার ধারণা শালিনীও বোঝে, তোর সবটা নিয়েই ও তোকে ভালবাসে।'

'আমি এখনো সিওর না।'

'রাজনীতি করিস বলে দুনিয়ার সবার পরীক্ষা নেওয়াটা তোদের দায়িত্ব বলে তোরা মনে করিস। এটা ঠিক না।'

'তুই রেগে যাচ্ছিস চাঁদু।'

গলাতে যতটা তিক্ততা আনা যায় ততটাই এনে সে বলল, 'তোদের পার্টি থেকে কি শালিনীর মতো মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বারণ করে?'

'তোর কী ধারণা, আমাদের পার্টিটা অমানুষদের পার্টি?'

'জানি না, তবে তোকে দেখে মাঝে-মাঝে ভয় হয়।'

আলোচনাটা চালাতে চাইছে না শুভ। বলল, 'চ উঠি।'

বাসে উঠে তার মনে হল, যে কারণে সে এতক্ষণ শুভর জন্য বসেছিল, সেই কথাটা নিয়েই কোনো আলোচনা করা হল না। বাস থেকে নেমে তার মনে হয়, গোটা ব্যাপারটা গায়ত্রীকে জানান প্রয়োজন। কিন্তু পরে মনে হল গায়ত্রী বোধহয় এখন টিউশন করছে গেছে। বাড়ির কাছে যখন সে চলে এসেছে, কর্নেল চ্যাটার্জির গাড়ি তাকে অতিক্রম করে চলে গেল মাই হেভেনের দিকে। বাড়িতে ঢুকবার সময় সে দেখল তিশির বারান্দায় আলো জ্বলছে, আর তিশি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কর্নেল চ্যাটার্জিকে বোধহয় লেটার বক্সের চাবি ছুড়ে দিচ্ছে। এই ঠাণ্ডায় তিশি বারান্দায় এসেছে কিন্তু কোনো চাদর গায় দেয়নি। কিন্তু আজ তিশির দিকে তাকিয়ে তার শালিনীর কথা মনে হল।

ডাকতে আজ গায়ত্রীই বারান্দা দিয়ে উঁকি মারল। বাবুদারা চলে যাবার পর গায়ত্রীরা

একতলার দুটো ঘর ভাড়া দিয়েছে, ফলে মেসোমশাই আর একতলার বরান্দায় বসে রাস্তার লোকদের ধরতে পারেন না। এখন নিশ্চিন্তেই গায়ত্রীকে ডাকা যায়। গায়ত্রীকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কলেজে যাবি না?'

গায়ত্রী বলল, 'তুই এগো, আমার দেরি হবে।'

'না', তুই তাড়াতাড়ি আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি—দরকার আছে।'

'আমার কিন্তু দেরি হবে, এখনো চান করিনি।'

'যাক্ গে, তাড়াতাড়ি আয়।'

আজ পাড়ার মোড়ে দাঁড়াতে তার আপত্তি নেই। কাল সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় কোনো খোঁজখবর নেওয়া যায়নি, পাড়ার হালচাল কী এটা জানতে হবে। তার কপাল ভাল পাওয়া গেল শম্ভুকে, শম্ভু হল পাড়ার গেজেট। হায়ার সেকেন্ডারি ফেল করার পর শম্ভু পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছে। কী সব ইনস্যুয়রেন্সের এজেন্ট হয়েছে, ফিটফাট জামা কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়, তবে পয়সাকড়ি খুব একটা আয় হয় না। কিন্তু সবার প্রয়োজনে শম্ভুকে পাওয়া যায়, কাজেই সবার কাছেই শম্ভুর অবারিত দ্বার, আর এই সূত্রেই দুনিয়ার সব খবর সে রাখে। শম্ভুকে এর জন্য তারা বন্ধুরা কে জি বি বলে ডাকে। তাকে দেখেই চায়ের দোকান থেকে শম্ভু উঠে এল, বোঝাই যাচ্ছে বেশ উত্তেজিত। কাছে এসে গলাটা নামিয়ে বলল, 'গুরু দেখেছ, মাল পড়ে গেছে।'

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী পড়েছে?'

গলাটা আরো নামিয়ে শম্ভু বলল, 'আঙুল তুলে দেখাব না, রেশনের দোকানের পাশের দেওয়ালটা দেখ।'

সে আড়চোখে দেওয়ালটার দিকে তাকাল। খুব পাকা হাতের লেখা নয়—কিন্তু আলকাতরা দিয়ে পরিষ্কার করে লেখা—স্বৈরাচার ধ্বংস হোক। তলায় পার্টির নাম লেখা। দীর্ঘ ছ-বছর পর তাদের পাড়ার দেওয়ালে পার্টির নাম।

এবার গলাটা নামিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে লিখেছে?'

তার প্রথম ভয়, এটা ছোটর কাজ না তো?

'জানি না, তবে কেস জমে গেছে। কাল রাতে হেভি ক্যাঁচাল হয়েছে। ওই যে ওদের যুব নেতা কালো মোটা মতো অসিত, বাবুবাগানের দিকে থাকে, কাল রাতে আমাদের এদিকের মালেরা তাকে ধরে ধাক্কাধাক্কি করেছে। বলেছে এম পি ভোট চাইতে এলে নাকি জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরাবে। ছ-বছরে নাকি ওদের জন্য কিছু করেনি। আসলে অবশ্য কিছু না, টাকা-পয়সা পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু দেওয়ালে ওসব লিখল কে?' ছোটর জন্য তার রীতিমতো ভয়ই হচ্ছে।

'জানি না, তবে খবর পেয়ে যাব। বিকেলে আড্ডায় আয়, কথা বলতে হবে।'

'কেন কী করবি?'

'একটা লাইন বার করতে হবে, শালা ঝাড়ও খাব না কিন্তু কাজ হবে, এ রকম কিছু।'

বলেই শম্ভু ছুটল, 'চলি রে, মক্কেল পালাচ্ছে' বলে।

সে কতদিন ভেবেছে কবে আবার পাড়াতে পার্টি ফিরে আসবে। কিন্তু পাড়ার মোড়ে আলকাতরায় লেখা তিনটে শব্দ দেখে তার ভয় করছে। আবার শুরু হবে। আবার মাঝরাতে সি-আর-পির বুটের আওয়াজ, অস্তুদের দেওয়ালে রক্তমাখা হাতের ছাপ। পরিচিত ভয়টা

ফিরে আসছে। কিন্তু এবারের ভয়টা অনেক বেশি ছোটকে কেন্দ্র করে। সে দূর থেকে আবার দেওয়ালের লেখাটা ভাল করে দেখে, বুঝবার চেষ্টা করে, হাতের লেখাটা ছোটর মতো কি না। কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারে না।

গায়ত্রীকে গতকালের গোটা ব্যাপারটা সে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে বলে ফেলল। কিন্তু গায়ত্রীর যে রকম প্রতিক্রিয়া হবে বলে তার মনে হয়েছিল, সে রকম কোনো প্রতিক্রিয়াই হল না। গোটাটা শুনল খুব নিরুত্তাপ হয়ে এবং তার সবটা বলা হয়ে গেলেও কোনো কথাই গায়ত্রী বলল না। সে কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েই বলল, 'বল, কী করব?'

ততোধিক নিরুত্তাপ গলায় গায়ত্রী বলল, 'তুই কী করবি, আমি কী করে বলব?'

সে বলল, 'ওরা দুজনই আমাদের বন্ধু, আমাদের কিছু একটা করা দরকার।'

'কী করব? শুভকে গিয়ে বলব, দয়া করে তুই শালিনীর সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ কর?'

গায়ত্রী হঠাৎ কেন এত রেগে আছে সেটা যে আদপেও না বুঝে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হল, 'হঠাৎ তুই এত রেগে যাচ্ছিস কেন?'

'না আমি রাগিনি। তুই ব্যাপারটা কালই জেনেছিস বলে ব্যাপারটা নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছিস। এ ব্যাপারটা নিয়ে ওরা কালকেই প্রথম কথা বলছে না। বরং বলতে পারিস কাল ওরা শেষ কথা বলল।'

সে কিছুটা বিস্মিত হয়েই বলল, 'তুই সবটা জানিস?'

'জানব না কেন? শালিনী আমাকে সব বলেছে। আমিই শালিনীকে বুঝিয়েছি, যদি শুভ ওর ডাকে সাড়া না দেয়, তাহলে শুভর জন্য ও যেন দুঃখ না করে। কারণ তাহলে বুঝতে হবে, শুভ ওর যোগ্য নয়।'

'তুই আমাকে তো কিছু বলিসনি?'

'তোকে বলে কী লাভ, তুই তো শুভর ব্যাপারে অন্ধ।'

'কিন্তু শুভ কী বলেছে, সেটাও তো তোর জানা দরকার। তা না হলে তোর সিদ্ধান্তটাও একপেশে হয়ে যাবে।'

'শুভ কী বলছে তাও আমি জানি। আর জানি বলেই মনে হয়েছে, শুভ ন্যাকামো করছে। তোদের শুভ কী মনে করে, শুভকে শালিনী একদমই চেনে না? গোটা জীবনে শুভ কী দিতে পারবে তা শালিনী বোঝে না? অন্য কিছু পেতে হলে শালিনী কেন শুভর কাছে আসবে? শুভর থেকে হাজার গুণ ভাল ছেলে ও পাবে।'

'শুভ কিন্তু শালিনীকে ভালবাসে।'

'ভালবাসে?' গায়ত্রীর মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। 'শোন, আমাদের গৌতম দুদিনের জন্য প্রেম করে বেড়ায়। যখন ও প্রেম করে তখন জিজ্ঞাসা করবি, ও বলবে—ওর প্রেমিকাকে ও পাগলের মতো ভালবাসে। ওটাও ভালবাসা না, শুভ যা বলছে সেটাও ভালবাসা না। ভালবাসতো গেলে সাহস লাগে। আসলে সেই সাহসটাই তোদের নেই। তোদের সব সময় মনে হয় কোনো মেয়েকে ভালবাসা মানে সারা জীবন তার দায়িত্ব নিতে হবে। কে বলে রে তোদের দায়িত্ব নিতে? তোরা দায়িত্ব না নিলে মেয়েরা সব মরে যাবে? যাক গে ছাড়, বাস আসছে।'

'দাঁড়া, বাস আরো আসবে। আচ্ছা তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নি, তুই যা বলছিস তা

ঠিক, কিন্তু বন্ধু হিসাবে ওসব কথা না ভেবে আমাদের একটু চেষ্টা করা উচিত যাতে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা তৈরি হয়।'

আচ্ছা চাঁদু তোর কী ধারণা, আলোচনা করে কনভিন্স করে সম্পর্ক তৈরি করা যায়?'

'আমি এ সব ব্যাপারে কিছুই জানি না, কিন্তু যদি ব্যাপারটা হয় তাহলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

'আমারও খুব ভাল লাগবে, কিন্তু আমার মনে হয় না, বাইরের থেকে আমরা বিশেষ সাহায্য করতে পারব। শুভ যখন মার খেয়ে অসুস্থ ছিল তখন শুভই শালিনীর প্রতি ওর দুর্বলতার আভাস দিয়েছিল, আর শুভই আজ পিছিয়ে যাচ্ছে।'

তার এতই খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে কলেজে না গিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে।

শুভ বলল, 'কী এত ভাবছিস চাঁদু, চল।'

সে খুব কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'না রে, হবে না।'

'কেন হবে না, তুই ভেবে দেখ, কলকাতায় পার্টির কোনো ক্যান্ডিডেট নেই। আর বাইরে অনেক জায়গায় কমরেড লাগবে। ঠিক হয়েছে ছাত্রফ্রন্ট থেকে কমরেডদের বাইরে পাঠানো হবে। বেশি দূরও তো না, বাসে ঘণ্টা দুতিনেক লাগে।'

'তুই বুঝছিস না, বাড়িতে প্রবলেম হবে।'

'বাড়িতে বলার কী দরকার? বল আমাদের বাড়িতে যাচ্ছিস।'

'তাতে দিন সাতেক বড় জোর বাইরে থাকা যায়। আর এ তো প্রায় মাসখানেক।'

'প্রথমে দিন সাতেক বলেই বেরিয়ে আয়, তারপর চিঠি দিয়ে বল, ফিরতে আরো দেরি হবে।'

'ধুর, এসব হয় নাকি। তাছাড়া আমি ইলেকশনের কিছুই জানি না।'

'এটা কোনো যুক্তিই না, আমিও কি ছাই আগে ইলেকশন করেছি। চ, একসঙ্গে যাব, দেখ তোরও ভাল লাগবে।'

সে অসম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ায়। একরাশ বিরক্তি নিয়ে শুভও বসে থাকে। শেষে কোনো কথা না বলেই টেবিল ছেড়ে উঠে যায়।

সে জানে শুভ রেগে গেল, কিন্তু তার কিছুই করার নেই। বাড়িতে কথাটা বলার কোনো সুযোগই তার নেই। আর সত্যি-সত্যি সে জানে না, ইলেকশনের কী কাজ সে করবে? সে দলের পেছন-পেছন হাঁটতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায় গিয়ে পার্টির কাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব। কেন অসম্ভব সেটা অবশ্য সে নিজেও ভাল করে জানে না। প্রথম দিন শুভর সঙ্গে তার তুমুল তর্ক হয়েছে। তার মনে হয়েছিল, এই ইলেকশনে দাঁড়িয়ে পার্টি ঠিক করছে না। ওরা কাউকে ভোট দিতেই দেবে না, মাঝখান থেকে এক গাদা লোক মরবে। আবার সি-আর-পি, আবার খুনখারাপি। শুভ তাকে ধৈর্য ধরে বুঝিয়েছে, কেন ইলেকশনে দাঁড়ানোটা দরকার। মানুষকে তার ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। এই ইলেকশনটাই এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় লড়াই। যদি ওরা ভোট না দিতে দেয়, মানুষের সঙ্গে ওদের মুখোমুখি সংঘাত হবে, এটারও প্রয়োজন আছে। শুভর যুক্তির সামনে সে কোনোদিনই দাঁড়াতে পারে না। শুভর সব যুক্তি মেনেও তার ভেতরে একটা অনিচ্ছা থেকেই যায়। তার কারণটাও সে বোঝে না। পাড়ার মোড়ে পার্টির দেওয়াল

লেখা দেখেও সে খুশি হয় না। সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করে, সে কি চায় না দমবন্ধ করা অবস্থাটার পরিবর্তন, সে কি চায় না পার্টি আবার ফিরে আসুক। না, তা তো সে চায়। আসলে সে বোধহয় অসম্ভব স্বার্থপর, সে পরিবর্তন চায় কিন্তু পরিবর্তনের জন্য বিন্দুমাত্র ত্যাগ করতেও রাজি না। তার সকাল এক রকম থাকবে, তার রাত এক রকম থাকবে, শুধু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে দেখবে সব কিছু সে যে রকম চায় সেভাবে পাল্টে গেছে, তা না হলে সে এই নরকের স্থিতাবস্থায় থেকে যেতেই রাজি। এ কথা মুখে বলা যায় না বলেই সে যুক্তির আড়াল খুঁজছে।

কথাটা ভাবতে-ভাবতে তার আবার নিজের ওপরেই রাগ ধরল। সে কেন শুভর মতো হতে পারে না, ছোট যা পারে কেন তা সে পারে না। তার আবার আজ মনে হচ্ছে, অসীমদাকে কাছে পেলে বড় ভাল হত, সে সব কথা খুলে বলত আর অসীমদার কাছে জানতে চাইত, কেন সে সব কিছুকে এত ভয় পায়। অসীমদা তাকে ঠিক শিখিয়ে দিতে পারত, কী করে শুভদের মতো হতে হয়। একা-একা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে ডিসেম্বরের একটা বিষণ্ণ শহুরে সন্ধ্যায় সে আরো বিষণ্ণ হয়।

সে ক্যান্টিনে ঢুকে প্রথমে দেখবার চেষ্টা করল তাদের বন্ধুদের কেউ আছে কি না। সে একমাত্র গৌতমকে দেখতে পেল। ফার্স্ট ইয়ারের একটা মেয়েকে নিয়ে একটা টেবিলে আলাদা বসে আছে। তাদের টেবিলে দুটো ছেলে বসে আছে, সে চেনে না—হতে পারে ফার্স্ট ইয়ারের। সে একটা ফাঁকা টেবিলে গিয়ে বসে। গত কয়েক দিন হল শুভকে দেখছে না, বোধহয় ইলেকশন করতে চলে গেছে, মনে হয় কুশলও ওর সঙ্গে গেছে। গায়ত্রীটা কখন যে কলেজে আসছে আর কখন যে যাচ্ছে তার কোনো হদিসই সে করতে পারছে না। শালিনীকেও দেখা যাচ্ছে না এ-ক'দিন। আসলে সেকেন্ড ইয়ারের ক্লাস প্রায় শেষ। খুব দরকার না হলে অনার্সের কেউই বিশেষ কলেজে আসছে না। আর তাদের পাসেরও ক্লাস-ট্লাস বিশেষ হচ্ছে না। কলেজে না আসলেও চলে, কিন্তু সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে কী করবে, এটা ভেবেই সে রোজ কলেজে চলে আসছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে সময় কাটিয়ে আবার ফিরে যাচ্ছে। পাড়ার আড্ডায় যাওয়া যায়, কিন্তু আজকাল সেই আড্ডাও তার আর বিশেষ ভাল লাগে না। অমিতাভ বচ্চন বনাম রাজেশ খান্না বিতর্কে তার বিশেষ কিছু করবার নেই। দিনগুলো কাটানোটাই তার কাছে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটা ভাল না লাগার অনুভূতি সারাক্ষণ তাকে ঘিরে থাকে—সত্যিই তার কিছু ভাল লাগে না, আর কেন কোনোকিছু তার ভাল লাগে না, সেটাও সে বোঝে না।

সে অর্ডার দেয়নি কিন্তু ক্যান্টিনের ছেলেটা এসে এক কাপ চা তার সামনে রেখে গেছে। সে অন্যমনস্ক হয়ে কাপে চুমুক দেয়। গৌতম টেবিলে এসে বসে। সে প্রায় জোর করেই মুখে একটা প্রফুল্লতার ভাব ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞাসা করে, 'কী রে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলি?'

তার নতুন কৃতিত্বটা যে তার নজর এড়ায়নি এই সাফল্যেই খুশি হয়ে একটা উদার হাসি দিল গৌতম, তারপর বলল, 'একদম নতুন কেস।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী এত বকবক করিস রে এদের সাথে, বোর লাগে না?'

'তোর মতো হাফ আঁতেল এ সব ব্যাপার বুঝবে না। শোন, এ সব কেসে প্রথম-প্রথম

বিশেষ কিছু বলতে হয় না, শুনতে হয় আর তাল দিয়ে যেতে হয়। তুমি যদি প্রথমেই বাতেলা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা কর তুমি কত ঘ্যাম তাহলেই গেলে। তোরা তো প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবি—ব্রেখ্‌টের কবিতা পড়েছ? আর অধিকাংশ মালই প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর ওপরে ওঠেনি, ভাববে ব্রেখ্‌ট বোধহয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার। এ সব কিছুর দরকার নেই বরং ওদের কথায় তাল দিয়ে যাও। যদি বলে ওদের ক্লাসের মেয়েরা কত হিংসুটে, তবে বিস্মিত হয়ে বলতে হবে—ও মা দেখলে তো বোঝা যায় না, ভাগ্যিস তুমি বললে। যখন সিরিয়াস মুখ করে বলবে পিসতুতো দাদার বিয়েতে সবুজ পিওর সিল্ক না কী মেরুন সাউথ ইন্ডিয়ান পরবে ঠিক করতে পারছে না, তখন একদম লজ্জায় গলে গিয়ে বলতে হবে—আমার কিন্তু মনে হয় হালকা গোলাপি জামদানি পরলে তোমাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে।'

গৌতমের বলার ভঙ্গিতে সে হো-হো করে হাসে জিজ্ঞাসা করে, 'কী এরপরই সিনেমা?'

বেশ সিরিয়াস মুখ করে গৌতম বলে, 'না না, তারও আলাদা গ্রামার আছে। কেস টু কেস আলাদা প্ল্যান। কেউ ফিট করবে অ্যাকাডেমির নাটকে, কেউ দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে, কেউ গোলপার্কের ফুচকায়, কেউ সিনেমায়। সিনেমাতেও আলাদা ব্যাপার আছে কাউকে নিয়ে যেতে হবে নিউ এম্পায়ারে, কাউকে বসুশ্রীতে জওয়ানি দিওয়ানি, কাউকে আলেয়াতে মেজবৌদি দেখালেই চলে যাবে। মাথা খাটাতে হয়।'

সে হাসতে-হাসতে বলে, 'এই সাবজেক্ট নিয়ে তুই একটা বই লিখে ফেল গৌতম।'

'একদম না, এ সব হচ্ছে সিক্রেট নলেজ। আমার বই পড়ে সবাই জেনে গেলে আমার নিজের বাজার খারাপ হয়ে যাবে না? তোকে বললাম, কারণ আমি সিওর—এই ফিল্ডে তোর কোনোদিন কিছু হবে না।'

গৌতম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ অন্যকিছু নিয়ে আর ভাবতে হয় না। গৌতম একাই একটা আড্ডা টেনে নিয়ে যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাকিরা সব কই রে, কাউকে দেখছি না?'

গৌতম গলাটা নামিয়ে বলল, 'শুভ তো ইলেকশন করতে বাইরে চলে গেছে।'

সে কিছুটা বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'তোকে কে বলল?'

'কেন শুভই বলেছে। আমাকে ওর সঙ্গে যেতে বলেছিল, আমি কেটে পড়েছি?'

'কাটলি কেন?'

'না গুরু, ওসব আমার পোষাবে না।'

'পোষাবে না কেন রে, ম্যাগাজিনের সময় এত বিপ্লবী বাতেলা দিলি?'

'হাত তুলে দিচ্ছি বস্‌, বাতেলা মারা এক জিনিস আর শুভর মতো ফিল্ডে গিয়ে কাজ করা এক জিনিস। একবার পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেলে জিন্দেগিতে আর চাকরি পেতে হবে না।'

'বি এস-সি পাস করে কী চাকরি পাবি রে?'

'আমি ঠিক চাকরি পাব। আমার জ্যাঠতুতো দাদা ওষুধের কোম্পানিতে বড় পোস্টে আছে। ও বলেছে মেডিকাল রিপ্রেসেন্টিভের চাকরিতে ঢুকিয়ে দেবে। ওর কথামতো অলরেডি আমি স্পোকেন ইংলিসের ক্লাসে ঢুকে গেছি। শালা, ভাল চাকরি করো, পয়সা কামাও, তারপর বাকি জিনিস দেখা যাবে।'

'তাহলে তো তুই ভালই আছিস, ভবিষ্যৎ নিয়ে আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই।'

'আগ বাড়িয়ে ওসব দুশ্চিন্তা করে কী লাভ? কী যে গম্ভীর মুখ করে সারা দিন তোরা ভাবিস আমি বুঝে পাই না।'

সে জিজ্ঞাসা করে, 'শুভ ইলেকশনের জন্য বাইরে গেছে, এটা আমাকে ছাড়া আর আর কাকে-কাকে বলেছিস?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টানোয় প্রশ্নটা বুঝতে গৌতম একটু সময় নেয়, তারপর জিভ বার করে বলে, 'ছি-ছি তুই আমাকে এতটা খারাপ ভাবছিস? আমার এইটুকু সেন্স আছে। আর এটাও তোকে বলে রাখি, আমি ফুল সাপোর্ট করি শুভদের। আমি সব সাহায্য করতে রাজি, শুধু নিজের ক্যারিয়ারটা আমি নষ্ট করব না।'

তারা দুজন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে, তারপর হঠাৎ গৌতম জিজ্ঞাসা করে, 'তুই শুভর সাথে গেলি না কেন?'

টেবিল থেকে উঠে পড়তেপড়তে সে বলল, 'ভাল লাগল না তাই।'

সরস্বতী পুজোর আগের দিন রবিবার, দুপুরবেলায় সে তার ঘরে বসেছিল। পরীক্ষা খুব দূরে নেই। ভোরবেলা থেকেই ছোট কোথায় বেরিয়ে গেছে, দুপুরেও বাড়ি ফেরেনি। বাবা জানলে রাগারাগি করবেই। তাই মা দু-বার তার ঘরে এসে চুপিচুপি ছোটর খোঁজ করে গেছে। তারা কেউ বাড়ি আছে কি না বাবা সে সব খবর রাখে না, এটাই বাঁচোয়া। হঠাৎ বাইরে বুড়ির গলা। 'দেখো চাঁদুদা কাকে নিয়ে এসেছি', বলতে-বলতে বুড়ি ঘরে ঢুকল, সঙ্গে শালিনী। সে ভীষণ অবাক। শালিনী তাদের বাড়িতে আসবে, এটা সে কোনো দিন ভাবেনি।

বুড়ি বলল, 'দিদি তো পড়াতে গেছে, বলল তোমার বাড়ি চেনে না, তাই সঙ্গে করে নিয়ে আসলাম। তোমরা গল্প করো, দিদি এলে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

শালিনীকে এত সাজগোজ করতে সে এর আগে কখনো দেখেনি। তার এই বিবর্ণ ঘরে শালিনীর ঝলমলে উপস্থিতিটাই ভীষণ বেমানান। শালিনীর পেছনেই ঘরে ঢুকেছে মা। মাও যেন কিছুটা বিস্মিত।

সে বলল, 'মা তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দিই, এ হল শালিনী, আমাদের সাথে পড়ে। বিশাল আই এ এস অফিসারের মেয়ে।'

শালিনী বলল, 'ওটা বাদ দিয়ে আমার কোনো পরিচয় হয় না, না রে?' শালিনী পায়ে হাত দিয়ে মাকে প্রণাম করল।

ছোট যেই চেয়ারটায় বসে, সেটাতেই শালিনীকে বসতে দিল। তারপর নিজের চেয়ারটা তার মুখোমুখি টেনে এনে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর হঠাৎ এই গরিবের ঘরে?'

শালিনী বলল, 'কেন, আসতে পারব না?'

'না রে, তুই আমার বাড়িতে এসেছিস, আমি ভীষণ খুশি হয়েছি। তারপর তোর খবর কী? কলেজের রাস্তা একদম মাড়াচ্ছিস না। হেভি প্রিপারেশন নিচ্ছিস?'

বড় সুন্দর করে শালিনী হাসল। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না, পড়াশুনা করছি না। জিনিসপত্র গোছাচ্ছি?'

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী গোছাচ্ছিস?'

'কেন গায়ত্রী তোকে বলেনি? আমরা তো দিল্লি চলে যাচ্ছি।'

তার কাছে বিষয়টা তখনো পরিষ্কার নয়, সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'মানে?'

'মানে আবার কী, বাবা দিল্লিতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে।'

'কবে এসব ঠিক হল?'

'বাবাকে দিল্লি যেতে হবে, সেটা আগেই ঠিক হয়েছিল। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ঠাকুমার এখানে থেকে যাব, তারপর ভাবলাম, না ওখানেই চলে যাই।'

সে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'পরীক্ষা দিবি না?'

'না, ওখানে গিয়ে জে এন ইউ-তে অ্যাডমিশন নেব। একটা বছর নষ্ট হবে।'

সে কেমন যেন অসহায় বোধ করে চুপ করে থাকে। আর শালিনীও মুখটা ঘুরিয়ে চুপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সেই বলল, 'তুই কি রাগ করে চলে যাচ্ছিস শালিনী?'

শালিনী খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিল, 'ও মা, রাগ করব কেন? আর করলেও কার ওপর রাগ করব?'

'তুই চলে যাচ্ছিস, শুভ জানে?'

'জানি না।'

'বন্ধু হিসাবে তোকে আমার একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিস্ শুভ ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।'

'কারোর জন্য আমি অপেক্ষা করব না।'

সে আর কী বলবে ভেবে পায় না, একবার মনে হল গায়ত্রী এখন এলে ভাল হত, কিন্তু আগের দিনে গায়ত্রী যা বলেছে, সেটা মনে করে তার আবার মনে হল গায়ত্রীও এ ব্যাপারে তাকে বিশেষ সাহায্য করতে পারবে না। মা এসে ওদের দুজনকে চা দিয়ে গেছে, চুপ করে ওরা দুজনে চা খায়। তারপর হঠাৎ শালিনী বলল, 'ও তোদের বলা হয়নি, ইন্দ্রনীলের সাথে আমি আমার মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিটিয়ে নিচ্ছি।'

কথাটা গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে, 'তুই সত্যি কথা বলছিস না শালিনী।'

কথাটা শুনে শালিনীও যেন থমকে গেল, কিন্তু সামলে নিতে সময় বেশি নিল না। কলেজের ক্যান্টিনে যে শালিনীকে সবাই চেনে সেই চেনা শালিনীর ভঙ্গিতে উত্তর দিল, 'আচ্ছা যদি সত্যি নাও বলে থাকি কী আসে যায়? দিল্লিতে হাজারটা ইন্দ্রনীল ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারো একটার সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে নেব। না, গায়ত্রীটা আর এল না। চলি রে চাঁদু। ভাল থাকিস, জীবনে হয়ত আর তোদের সঙ্গে দেখাই হবে না।' বলতে-বলতে শালিনী উঠে দাঁড়ায়।

সে শুধু অসহায়ের মতো বলে ওঠে, 'যাস না শালিনী, শুভ তোকে সত্যিই ভালবাসে।'

যেতে-যেতে শালিনী আবার ঘুরে দাঁড়ায়। একটা অসম্ভব সুন্দর হাসিতে ভরে ওঠে, তারপর পরিচিত উচ্ছল গলায় বলে ওঠে, 'তাই? তোর বন্ধুকে নিউ ইয়ার্সের গ্রিটিং কার্ড পাঠাতে বলিস।' তারপর আবার ফিরে আসে টেবিলের পাশে। হাত দিয়ে তার মাথার চুলটা এলোমেলো করে দিয়ে বলে, 'তুই বড় বোকা রে চাঁদু। সবার পেছনে দাঁড়িয়ে অন্যের জন্য দুঃখ করেই তোর জীবনটা কাটবে। দুঃখ পাস না, আসলে এ রকমই হয়।'

সে চুপ করে বসে থাকে। উঠে গিয়ে শালিনীকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসার কথাও তার মনে থাকে না। ভেতরে বসেই সে শোনে মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শালিনী চলে যাচ্ছে।

তার মনে হয়, আজকাল পৃথিবীর কোনো প্রান্তে এ রকম কোনো ঘটনা ঘটে না, যার থেকে সে একটুও আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু তার পৃথিবীটা চিরকাল এ রকম ছিল না। শীতের বিকেল দ্রুত এগিয়ে এলে সে তার কাঠের চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে বসে। বাইরেটাও ঘরের মতোই বিবর্ণ আর নিরানন্দ। সামনের মোড়ে সরস্বতী পুজোর প্যান্ডেল হয়েছে, মাইকে তারস্বরে বাজছে হিন্দি গান। রাস্তার মানুষগুলোর মুখেও আনন্দের কোনো ছাপ নেই। মাই হেভেনের সামনে আকাশি ফিয়াট থেকে ড্রাইভার ঠাকুর নামাচ্ছে, সে বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টাও করল না সেখানে তিশি আছে কি না। বিদায়ী শীতের বিকেলের ননীমাধব দে লেন তার সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সে জানে না, কেন সে এখানে? তার থাকা আর না থাকায় পৃথিবীতে কোনো ফারাক হয় না। বরং না থাকলেই সে তার বয়ে বেড়ানো চিরস্থায়ী দুঃখবোধ থেকে মুক্তি পায়। নিজেকে নিয়ে এত বিরক্ত সে আর কোনোদিন হয়নি। সে যেন যাবজ্জীবন মেয়াদের বন্দি, কোনোদিন মুক্তি হবে না। একটা চাকা-ভাঙা গাড়ির মতো করে জীবনটাকে টেনে নিয়ে যাওয়া। শুভ বেঁচে আছে একটা লক্ষ্য নিয়ে, গৌতম বেঁচে আছে তার লক্ষ্য নিয়ে, গায়ত্রী, ছোট, এমনকী পুজোর প্যান্ডেলে জড়ো হওয়া ছেলেগুলো সকলেই তো বেঁচে আছে একটা লক্ষ্য নিয়ে। কিন্তু সে? এ রকমই একটা বিবর্ণ জীবনকে টানতে-টানতে আরো বিবর্ণ হওয়া। অথচ অন্যভাবে বাঁচার চেষ্টাও সে করতে পারে না। সব কিছুতে তার দ্বিধা, সব কিছুতে তার ভয়। সে শুভও হতে পারে না, সে স্পোকেন ইংলিসের ক্লাসে ভর্তি হবার কথাও ভাবতে পারে না। তার সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মাই হেভেনের ওপর। সে বোমা মেরে ওটা উড়িয়ে দিতে চায়, সে তিশিকে শেষ করে দিয়ে চায়, সে নিশ্চিত তিশিই তার জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এই রংহীন ননীমাধব দে লেনে বেমানান মাই হেভেনটা না থাকলে সে ঠিক বেঁচে থাকতে পারত অন্যদের মতো। সে আর পারছে না। জীবনে এই প্রথম সে নিজের মৃত্যু কামনা করছে। শুভ নেই, শালিনীটা চলে গেল চিরকালের মতো, গায়ত্রী কোথায় সে জানে না—সে দু-হাতে মুখ চাপা দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে সবুজ আর নীল মেশানো নদীর তীরে অর্জুন গাছের নীচে পৌঁছতে। সে পারে না, তার অস্তিত্বের সমস্ত রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে তিশি, তার পালানোর কোনো জায়গা নেই। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে সে জোরে নিশ্বাস নেয়। তার ভেতর থেকে সে অক্সিজেনের জন্য পাগলের মতো লড়াই করে। অবশেষে সে সফল হয়, আস্তে-আস্তে বেঁচে থাকার পরিচিত ছন্দ ফিরে আসে, সে আকাশের দিকে না তাকিয়েই বোঝে সেখানকার রং পাল্টে যাচ্ছে। সায়ানাইডের থেকেও বিষাক্ত অক্সিজেন সে বুক ভরে টেনে নেয়। ভেজা হাওয়া জানান দিয়ে যায় বৃষ্টি আসছে।

বৃষ্টিটা নামল ভোর চারটে নাগাদ। তারা এখানে এসে পজিশন নিয়েছে পৌনে তিনটে নাগাদ। ভারি একটা বর্ষাতি চাপানো আছে গায়ে। কিন্তু একটানা তিন ঘণ্টা বৃষ্টিতে বর্ষাতি কোনো ব্যাপার না। টুপি আর কলারের মাঝখান দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে এত জল ঢুকেছে যে

ভেতরটা একদম চুপচুপে ভেজা। কাদা আর ঘাসের ওপর আধশোয়া অবস্থায় সে পড়ে আছে। তাও অন্ধকার থাকার সময় একটু নড়াচড়া করা যাচ্ছিল, কিন্তু দিনের আলো ফোটার পর আর নড়াচড়া করাই যাচ্ছে না। রাইফেলটা বর্ষাতির ভেতর। যত ছোটই হোক শত হলেও তো রাইফেল, পেটের কাছটায় কুঁদোটা এমনভাবে চেপে আছে যে গোটা জায়গাতে একটা ভোঁতা ব্যথা। হাতপায়ের জোড়গুলোও টনটন করছে ব্যথায়।

তারা যে জায়গায় আছে সেটা বড় রাস্তা থেকে প্রায় একশ গজ দূরে। মাঝখানটায় একটা খেত, কোনো সময় হয় তো ধান চাষ হত, গত এক বছর কোনো চাষবাস না হওয়ায় এখন সেখানটায় ভর্তি আগাছা। ক্ষেতের পরে একটা পুকুর। পুকুরের পাড়টা প্রায় বাঁধের মতোই উঁচু, সেই উঁচু পাড়ের ওপর দুটো খেজুর গাছ আর কতগুলো ঝোপের আড়ালে তারা তিনজন। আশেপাশের ঝোপের পেছনে আরো সাতজন—দশজনের প্ল্যাটুনে তারা আছে। কাল বিকেলে একটা স্কাউট গ্রুপ এসে ঝোপগুলো এমনভাবে বসিয়ে গেছে তাতে তারা রাস্তাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু রাস্তার ওপর থেকে তাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

জেলা সদরটা আগলে পড়ে আছে শত্রুরা এবং গোটা শহরটাকে প্রায় একটা দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে, দাঁত ফোটানো যাচ্ছে না। অথচ শহরটাকে কিছু করা না গেলে রাজধানী পর্যন্ত যাওয়া হাইওয়েটাকে কব্জা করা যাবে না। আর এই হাইওয়েটা তাদের সমস্ত দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কয়েকটা নতুন ট্যাঙ্ক ডিভিশন হাইওয়েটা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে গোটা জেলাটায়—তাদের মুক্তাঞ্চলগুলো বিপদের মুখে চলে যাচ্ছে! যে করে হোক শত্রুদের শহরের বাইরে টেনে আনতে হবে, ঘাঁটি ছেড়ে বার করে আনতে হবে। গত কয়েক দিন ধরে সমানে ছোটখাট হামলা চালিয়ে যাচ্ছে এদিক-ওদিক থেকে। গতকাল রাতে শহরের ভেতরে তাদের যে সমস্ত পার্টিজান গ্রুপগুলো আছে যে করেই হোক শহরের ভেতর একটা পেট্রোল ট্যাংকে আগুন লাগিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। রাতে শহরের আকাশটা লাল হয়ে ছিল তার আগুনে, তুমুল বৃষ্টিও সেই পেট্রোলের আগুনকে কমাতে পারেনি। এখনো কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে, আর ধোঁয়ার মধ্যে মাঝেমাঝে লাফিয়ে উঠছে আগুনের শিখা। কিন্তু দূরের ঐ আগুন আর ধোঁয়া ছাড়া চারিদিকটা অসম্ভব স্বাভাবিক, সাধারণ একটা বৃষ্টির ভোর। শুধু ঝোপ আর মাটিতে মিশে থাকা দশটা গেরিলা ছাড়া আর কোনো মানুষ নেই। আশেপাশের গ্রামগুলোতে এখন আর কোনো লোকজন থাকে না। সে শুধু ভাবছিল, যারা ট্যাংকটা ওড়াতে গিয়েছিল তাদের কী হয়েছে, তারা কি বেঁচে ফিরতে পেরেছে? নাকি সুইসাইড মিশন হিসাবে কাজ করেছে?

তাদের কাছে খবর আছে, আজ ভোর রাতে একটা ট্যাঙ্ক ডিভিশন শহরে ঢুকবে এই রাস্তা দিয়ে। এই বৃষ্টির মধ্যে রাত থেকে তারা এসে বসে আছে ট্যাঙ্ক ডিভিশনটাকে 'উত্ত্যক্ত' করার জন্য। তাদের সাথে আছে দুটো অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চার, তাছাড়া তাদের সব সময়ের হাতিয়ার এ কে ৪৭। রাইফেল অবশ্য একান্ত আত্মরক্ষার কারণে। আসল অস্ত্র হলো গ্রেনেড লঞ্চার দুটো। তারা যেখানে পজিশন নিয়েছে সেখান থেকে সামনের রাস্তাটা বহুদূর দেখা যাচ্ছে। এই গ্রেইস অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গ্রেনেড লঞ্চারগুলো প্রায় তিনশ মিটার দূর থেকেও ট্যাঙ্ক ঘায়েল করতে পারে। কিন্তু তারা ঠিক করেছে কোনো রিস্ক নেওয়া হবে না, দু-শ মিটারের মধ্যে এলেই লঞ্চার চালানো হবে। সঙ্গের রাইফেলগুলো ভাঁজ করে

সবাই রেখে দিয়েছে বর্ষাতির ভেতরে। ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই রাইফেল কোনো কাজে লাগবে না, আর মুখোমুখি লড়াই করার কোনো নির্দেশ বা ইচ্ছে তাদের নেই। একমাত্র কোনোভাবে তারা যদি আটকে পড়ে তবেই রাইফেলের ব্যবহার। ভোররাতে ট্যাঙ্ক ডিভিশনটার ঢোকার কথা, কিন্তু প্রায় সাতটা বাজতে চলল, কোনো কিছুর দেখা নেই। একটা কাকভেজা কুকুর ছাড়া ভোর হবার পর এই রাস্তা দিয়ে আর কেউ যায়নি।

তারা নিশ্চিত ছিল ট্যাঙ্কগুলো আসার আগাম জানান দেবে কোনো হেলিকপ্টার বা প্লেন। যেই রাস্তা দিয়ে ট্যাঙ্ক ডিভিশনটা আসবে তার এয়ার কভারেজ ওরা করবেই, এবং এটা নিয়ে তাদের কিঞ্চিত দুশ্চিন্তাও ছিল। কিন্তু ওরা এল কোনো এয়ার কভারেজ ছাড়াই। অর্থাৎ এই রাস্তার ওপর কোনো হামলা হতে পারে এই সম্ভাবনাটাকে ওরা খুব গুরুত্ব দিচ্ছে না। প্রথমে দূর থেকে মনে হল, একটা শ্যাওলা রঙের লোহার কুণ্ডলী রাস্তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে এগিয়ে আসছে। বৃষ্টি না হলে হয়ত একটু আগে টের পেত—অন্তত গুমগুম করা আওয়াজটা মাটিতে কান পাতলে পাওয়া যেত। বর্ষাতি থেকে রাইফেলটা বার করে সে ভাঁজ হয়ে থাকা রাইফেলটা সোজা করে নিল। ট্রিগারটাকে রাখল সেমি-অটোমেটিক পজিশনে। অটোমেটিকে গুলির পাল্লাটা কমে যায়। এতদিন হয়ে যাবার পরও এরকম পরিস্থিতিতে প্রথমেই তার গলাটা শুকিয়ে আসে, সে জানে একটু পরই তার চোখটা জ্বালা-জ্বালা করতে শুরু করবে—সব মিলিয়ে মনে হবে তার জ্বর আসছে। তারপর একবার শুরু হয়ে গেলে আর কিছু খেয়াল থাকে না।

গ্রেনেড লঞ্চার একটা ঠিক তার ডানদিকের কমরেডের হাতে, আর একটা বাঁদিকে বাঁধের কিছুটা নিচের দিকে ঝোপের আড়ালে।

লাইনটা এখন স্পষ্ট। সামনে তিনটে সাঁজোয়া গাড়ি, তার পেছনে ট্যাঙ্কগুলো। সে মনে মনে হিসেব করল, তিনটে এম-১১৩ সাঁজোয়া গাড়ি মানে তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা লোক আর তিনটে মেসিনগান, তারা মাত্র দশ জন, যা মারবার প্রথমেই মারতে হবে। তারা মারার আগেই যদি শত্রু তাদের দেখে ফেলে তাহলে আর কিছু করা যাবে না। লাইনটা এগোচ্ছে আস্তে আস্তেই, যুদ্ধের সময় এম-৪৮ ট্যাঙ্কগুলো যথেষ্ট জোরে চলে, কিন্তু এখন খুব জোরে চালাচ্ছে না। আকাশের রঙটাও এখন শ্যাওলা সবুজ।

তার আন্দাজমতো, সামনের সাঁজোয়া গাড়িগুলো তিনশ মিটারের মধ্যে চলে এসেছে। নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছে গোটা লাইনটা। দু-শ মিটারের মধ্যে ঢুকে আসবার পর সে ডানদিকের কমরেডের দিকে তাকাল। ঝোপের মধ্যে তাকে সে দেখতে পাচ্ছে। মাথার থেকে বর্ষাতিটা সরিয়ে দিয়েছে, বৃষ্টির জল চুল হয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে নেমে আসছে মুখের ওপর, তলার ঠোঁটটা কামড়ে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে ভাবল, তাহলে কি ট্যাঙ্কগুলোকে মারার জন্য অপেক্ষা করছে? তার মনে হল ভীষণ ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। সাঁজোয়া গাড়িগুলো একদম ঘাড়ের ওপর এসে যাবে তখন। প্রথম গাড়িটা তখন বড়জোর দেড়শ মিটার দূরে। হাওয়াতে একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ তুলে গ্রেনেডটা ছিটকে বেরুলো তার ডানদিকের ঝোপটার ভেতর থেকে। প্রথম মুহূর্তে একটা আগুনের কুণ্ডলীতে সাঁজোয়া গাড়িটা ঢেকে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে কুণ্ডলীর ভেতর থেকে জ্বলতে-জ্বলতে বেরিয়ে এলো গাড়িটা, তারপরই উঁচু রাস্তা থেকে গড়িয়ে নেমে গেল উল্টোদিকে। সাঁজোয়াটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই তুমুল বিস্ফোরণের শব্দ আর একটা

আগুনের স্তম্ভ লাফিয়ে উঠল রাস্তার ওপার থেকে।

ততক্ষণে দ্বিতীয় সাঁজোয়া গাড়িটা অসম্ভব দ্রুতগতিতে ধেয়ে এসেছে রাস্তার ওপর দিয়ে, গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে। আর তৃতীয় সাঁজোয়া গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে নেমে আসছে খেতের ওপর। তার প্রথমেই ভয় হল, এটার দেখাদেখি ট্যাঙ্কগুলোও খেতের ওপর দিয়ে নেমে আসে তাদের দিকে, পালাবার সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ট্যাঙ্কগুলো জলকাদার মধ্যে যথেষ্ট ভাল চলে। কিন্তু ট্যাঙ্কগুলো রাস্তা থেকে না নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর প্রথম ট্যাঙ্কটা তার নলটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে তাদের দিকে।

সে পাগলের মতো গুলি চালাতে শুরু করল রাস্তার ওপর দিয়ে ধেয়ে আসা সাঁজোয়াটাকে লক্ষ্য করে। রাইফেলের গুলিতে সাঁজোয়া গাড়ির কিছু হবে না, কিন্তু সাঁজোয়া গাড়িটার মেসিনগানটা ওপরে। মেসিনগানটা চালাতে গলে ম্যানহোল খুলে বাইরে আসতে হবে। যতক্ষণ না ভারি লঞ্চারটা নিয়ে পাশের কমরেড নেমে যাচ্ছে, ততক্ষণ যেভাবেই হোক সেটাকে আটকাতে হবে। সে অবাক হচ্ছে দ্বিতীয় লঞ্চারটা এখনো চুপ করে আছে দেখে।

তার ডানদিকে মেসিনগানের গুলির আওয়াজ শুরু হয়েছে খেতের ওপর নেমে আসা সাঁজোয়া গাড়িটা থেকে। আড়চোখে সে দেখে নিল জলে ভরা ক্ষেতটার ওপর দিয়ে সাঁজোয়াটা এগোচ্ছে একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো, তবে খুবই আস্তে-আস্তে। কাদাতে সুবিধা করতে পারছে না।

পাশের কমরেডরা বুকে হেঁটে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে, সেও পেছোতে শুরু করল। আর সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় লঞ্চারটা থেকে গ্রেনেডটা উড়ে গেল প্রথম ট্যাঙ্কটার দিকে। একটা সাঁজোয়া গাড়ি থেকে শিকার হিসাবে একটা ট্যাঙ্ক সব সময়ই লোভনীয়। বিস্ফোরণটা হল ট্যাঙ্কটার এক পাশে, ফলাফল দেখার জন্য দাঁড়াবার অবস্থায় সে নেই, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মেসিনগানের গুলি। ঢালু পাড়টা দিয়ে সে পিছলে নামল পুকুরের দিকে। তার বাঁ পাশে আর এক জন। আপাতত পুকুরের উঁচু পাড়টা তাদের গুলির হাত থেকে বাঁচাবে। তার কয়েক পা আগে গ্রেনেড লঞ্চারটা নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কমরেড। বাঁ পাশে যে গড়িয়ে নামল তার দিকে তাকিয়ে সে প্রায় থমকে দাঁড়াল। মাথার ডান দিকটা প্রায় অর্ধেক উড়ে গেছে। তুমুল গুলির আওয়াজের মধ্যে সে মাথা নীচু করে ছুটল। পুকুরের অন্য পাড়ের কাঁঠালগাছটার একটা বড় ডাল মড়মড় করে ভেঙে পড়ল তার সামনেই—ট্যাঙ্কগুলো এবার গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে।

মার চ্যাঁচামেচি শুনেও সে বারান্দায় চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু সেটা বেড়ে যাওয়ায় উঠতে বাধ্য হল। বাবা বোধহয় পাড়ায় কোথাও বেরিয়েছে। রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মা চেঁচাচ্ছে। ছোট বাথরুমে পা ধুচ্ছে। কোনো ভোরবেলায় বেরিয়ে গিয়েছিল ছোট, এই এখন ঢুকেছে, মার রাগারাগি তার জন্য। ছোট অবশ্য কোনো কথারই উত্তর দিচ্ছে না। মা ক্রমাগত চেঁচিয়ে যাচ্ছে, ছোট বাথরুম থেকে বেরিয়ে গামছা দিয়ে পা মুছে ঘরে ঢুকতে গেল। এবার মার ধৈর্যর বাঁধ ভাঙল। ছোটর হাতটা ধরে টেনে বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস তুই? আজ তোর একদিন কী আমার একদিন। তোকে বলতে হবে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

মুখ-চোখে একটা বিরক্তি ফুটিয়ে ছোট বলল, 'বললাম তো কাজ ছিল।'

ছোটর উত্তর মাকে আরো রাগিয়ে দিল, 'কাজ ছিল? কী কাজ? দুদিন বাদে তোর মাধ্যমিক পরীক্ষা, তোর এখন আর কী কাজ ছিল?'

ছোট অবিচল ভাবে উত্তর দিল, 'তুমি বুঝবে না।'

'যদি আমি না বুঝি আজ তোকে বোঝাতে হবে। তোদের জন্য আমি অনেক সহ্য করেছি, আর না।'

রেগে মার মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে, তার ভয় হল মার আবার কিছু না হয়। সে বলল, 'ঠিক আছে মা এখন ছেড়ে দাও।'

মা তার কথাটার কোনো গুরুত্বই দিল না। কিন্তু ছোট বেঁচে গেল বাবার জন্য। বাইরের গেট দিয়ে ঠিক তখনই বাবা ঢুকল। সে আগেও দেখেছে, মা কখনো বাবার সামনে তাদের বকাবকি করতে চায় না। বাবার সামনে তাদের পারলে মা কিছুটা আড়ালই করে। মার যত শাসন বাবা বেরিয়ে যাবার পর। কিন্তু বাবা আজ মার চেঁচামেচি কিছুটা শুনে ফেলেছে। 'কী হল, এত চ্যাঁচামেচি কীসের?'

বাবার কথার উত্তর মা দিল, তবে আগের থেকে গলাটা অনেক নামিয়ে। 'দেখো না তোমার ছোট পুত্রের কাণ্ড। আজ বাদে কাল মাধ্যমিক আর আড্ডা মেরে বাবু এতক্ষণে ফিরল।'

বাবা ছোটর দিকে তাকাল যথেষ্ট রেগে, 'ভাল করে শুনে রাখ, ফেল করলে পড়াশুনার শেষ, আর বাপের হোটেলও বন্ধ।' বলতে-বলতে বাবা ঘরে ঢুকে গেল। আর একটা অন্ধ রাগ নীরবে তার ভেতরে বিস্ফোরিত হল। পড়াশুনা বন্ধ আর বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া, ব্যস্ বাবার দায়িত্ব শেষ। স্কুলের মাইনে আর দু-বেলা খেতে দেওয়া—যেন মনে করে এটাই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জিনিস, এগুলো বন্ধ হয়ে গেলেই সব গেল। আর যেন তাদের কিছু চাইবার নেই, আর যেন তাদের কিছু পাবার নেই। তার মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, বাবা বোধহয় জানেও না, ছোট লেখাপড়ায় ভাল, অন্তত তার থেকে। ফেল ছোট কোনোদিনই করবে না। কিন্তু বাবা হয়ে কেন একবারও খোঁজ নেয় না, তারা কেমন আছে, তারা কীভাবে বেঁচে আছে। কীভাবে তারা বেঁচে থাকবে তা তো কোনো দিন তাদের শেখানোর চেষ্টাও বাবা করেনি। তাদের ছোটবেলাটা যেদিন শেষ হয়েছে, সে দিন থেকে তারা আর বাবা আলাদা। এক ছাদের নিচে থাকে আর বাবার মাইনের টাকায় তাদের চলতে হয়, ব্যস্ এই পর্যন্ত।

সুযোগ পেয়েই ছোট ঘরে ঢুকে গেছে, মাও রান্নাঘরে। রাগ কমাবার জন্য সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

ঘরে ঢুকবার সময় দেখল ছোট চেয়ারে বসে আছে। এই ঠাণ্ডাতেও শ্রেফ একটা গেঞ্জি গায়ে। তার দিকে পিঠ করে বসে আছে ছোট, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সে চুপচাপ ছোটকে দেখে। গেঞ্জিটা পিঠের দিকে একটু ছিড়েও গেছে। ছোট সারাদিন কোথায় ছিল তা সে জানে না, শুধু এটুকু সে জানে সে যা পারে না, ছোট তা অবলীলাক্রমে করতে পারে। হঠাৎ আজ আবার অনুভব করে ছোটকে সে কতটা ভালবাসে। তার বড় ইচ্ছে করছে, কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছোটর উস্কোখুস্কো চুলগুলোতে একটু হাত বুলিয়ে দেয়। তাদের ছোটবেলার সবচেয়ে বিষণ্ণ রাতগুলোতে ছোট তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকত, আর সে ছোটর মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। ঠিক সেভাবেই সে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলবে—তোর কোনো ভয় নেই ছোট, আমি আছি তোর সঙ্গে। আমি যা হতে চেয়ে

হতে পারিনি তুই তাই হ। আমার সাহস হয়নি, তোর সাহস আছে—আমি জানি তুই পারবি। আমার নিজের জন্য বেঁচে থাকার কোনো মানে আমি খুঁজে পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তোর জন্যই বেঁচে থাকব। তোকে নিয়েই আমি স্বপ্ন দেখব এখন থেকে। সে আস্তে-আস্তে ছোটর চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'সারাদিন কিছু খেয়েছিস?'

কোনো কথা না বলে ছোট মাথা নাড়ে।

'তুই বোস, আমি মাকে বলে আসছি, আর একটা শার্ট গায়ে দে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

চেহারা যতই বড়সড় হোক, ছোটর মুখটা বড় সুন্দর, সেখানে বয়সের ছাপ এখনো পড়েনি।

ক্যান্টিনে ঢুকে সে কাউন্টারের সামনে সবসময়ই একবার দাঁড়ায়, দেখে নেয় ক্যান্টিনের কোথায় কে আছে, বিশেষত তাদের টেবিলে কে-কে আছে। আজ কাউন্টারের সামনে দাঁড়াতেই পেছন থেকে দীপকদা ডাকল। পেছনে ফিরে সে কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একজনের চায়ের দাম নেবার পর, কাউন্টারের সামনে সে একা। পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজের টুকরো প্রায় তার হাতে গুঁজে দিয়ে দীপকদা বলল, 'শুভ তোর জন্য পাঠিয়েছে।'

সে জিজ্ঞাসা করে, 'কে দিয়ে গেল?'

'চিনি না, একটা ছেলে একদম সকালবেলায় এসে দিয়ে গেছে।'

ক্যান্টিনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা টেবিল খালি। সে সেখানে গিয়ে কাগজটা খুলল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে শুভ শালিনীর চলে যাবার খবরটা কোনোভাবে পেয়েছে, এ চিঠি তার জন্যই। কিন্তু না, চিঠিতে এ সব কোনো কথাই নেই। চিঠিটা সে মনোযোগ দিয়ে দুবার পড়ল।

চাঁদু,

কেমন আছিস? বাকিরা কেমন? আমি ভাল আছি, খুব ভাল আছি। বলতে পারিস আমার জীবনের একটা বড় শিক্ষা চলছে। কত কথা বইতে পড়েছি, মনে হয়েছে সব জেনে গেছি। কিন্তু সত্যি আজ বুঝছি, পড়ে অর্ধেক জানা যায়, বাকিটা জীবনের কাছ থেকে শিখতে হয়। আমার এখন চব্বিশ ঘণ্টা সেই শিক্ষা চলছে।

তোকে চিঠিটা লিখছি একটা কথা বলতে, আয়, একবার আয়, দু-দিনের জন্য আয়। তোকে কিচ্ছু করতে হবে না, আসবি স্রেফ দর্শক হয়ে। দু-দিনের মতো মানানসই একটা গুল তুই বাড়িতে দিতেই পারবি। আর যদি একদম ইলেকশন পর্যন্ত থেকে যেতে পারিস, তাহলে কী দারুণ যে হবে তার আমি ভাবতেই পারছি না। পেছনে ডিরেকশনটা দিয়ে দিলাম। বাস থেকে নামার পর বুক ফুলিয়ে পার্টির নাম করে খোঁজ করতে পারিস। জায়গাটা আমাদের কৃষক ফ্রন্টের একদম দুর্গ। কোনো ভয় নেই তোর।

ইতি
শুভ

শেষ লাইনটা তাকে ভীষণ উত্ত্যক্ত করছে। একটা মৃদু অপমানের জ্বালা সে অনুভব করল অনেকক্ষণ। হতে পারে এটা সত্যি, কিন্তু শুভ তা লিখবে কেন? কী করবে তা ঠিক

না করলেও, যত্ন করে চিঠিটা সে বুক পকেটে রেখে দেয়।

এসপ্ল্যানেডে একদম বাসস্ট্যান্ড থেকে সে বাসটা ধরেছে কিন্তু তাতেও বসবার জায়গা পায়নি। এখন দুপুরে বেশ গরম পড়ছে, তারপর প্রচণ্ড ভিড়। বাসযাত্রাটা তার মোটেই ভাল লাগছে না। ঘণ্টা দেড়েক সে ঠায় ঐ ভিড়ে দাঁড়িয়ে। বাস পাল্টানোর জন্য শুভ যেখানে নামতে বলেছিল সে জায়গাটা বেশ জমজমাট একটা গঞ্জ। অনেক লোক নামাতে তার নামাটা ধাক্কাধাক্কি ছাড়াই সে সারতে পেরেছে। ডিরেকশন অনুযায়ী বাঁ দিকের রাস্তাটা দিয়ে যে কোনো একটা বাসে উঠলেই হবে। বাসটা থেমেছে ঠিক মোড়েই। আর নামা মাত্র তার চোখে পড়ল, বাঁ দিকের রাস্তায় একটা বাস দাঁড়িয়ে, বোধহয় এক্ষুনি ছাড়বে। কাঁধের কাপড়ের ঝোলাটা আঁকড়ে সে ছুটল বাসটাকে লক্ষ করে। কিন্তু কাছাকাছি আসতে সে যা দেখল তাতে সে রীতিমতো আতঙ্ক অনুভব করছে। লোকে পিলপিল করে উঠছে বাসের ছাদে। তার মানে বাসে আর কোনো উঠবার জায়গাও নেই। কিন্তু একদম সামনে যেতে সে বুঝল সে যা ভেবেছিল বিষয়টা অতটা খারাপ না, ভিড় থাকলেও সে উঠতে পারবে। যারা বাসের ছাদে উঠছে তারা বাসে জায়গা পায়নি বলে উঠছে না। সে তাও তাড়াহুড়ো করেই বাসে উঠল। সে ঠিকই করেছিল গেটের থেকে খুব দূরে যাবে না। শুভ লিখেছে মিনিট পঁয়তাল্লিশেক লাগবে। তার মনে হয়েছিল বাসটা বোধহয় এক্ষুনি ছাড়বে, কিন্তু বাস ছাড়ার কোনো লক্ষণই নেই। লোকজনও কিছু বলছে না, তারা বোধহয় এতেই অভ্যস্ত। এই ভিড়ে একটা লোক বাসের ভেতরে চিরুনি আর ছুঁচ বিক্রি করছে। বাস ছাড়ল আরো মিনিট সাত আটেক পরে।

কন্ডাকটারকে বলেই রেখেছিল সে কোথায় নামবে, আর এও বলে রেখেছিল জায়গাটা সে চেনে না, একটু আগে যেন বলে দেয়। কন্ডাকটারের কথা শুনে সে নেমে পড়ল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় তিনটে বাজে। জায়গাটা একটু ফাঁকা-ফাঁকা, দু-পাশেই বিস্তীর্ণ খেত। বাসটা যেদিকে দাঁড়িয়েছে তার উল্টোদিকে একটা চায়ের দোকান আর হোগলার বেড়া দেওয়া সাইকেল রাখার জায়গা। চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তাটা নেমে গেছে, তার ওই রাস্তা দিয়েই যাবার কথা। কাঁচা রাস্তার মুখে গোটা কয়েক সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে। শুভ লিখেছে জায়গাটা সাইকেল ভ্যানে গেলে মিনিট দশেক আর পায়ে হেঁটে বড়জোর আধঘণ্টা।

কলকাতায় শীত প্রায় বিদায় নেবে নেবে করছে, কিন্তু এখানে এই পড়ন্ত দুপুরেও হাওয়াটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। এই রকম একটা দুপুরে একটা গ্রাম্য রাস্তা ধরে একা-একা হেঁটে যেতে তার ভালই লাগবে। কিন্তু জায়গাটা সে একদমই চেনে না, তার মনে হল এক্ষেত্রে ভ্যানে করে যাওয়াটাই ভাল, অন্তত ভ্যানআলাকে জিজ্ঞাসা করে জায়গাটার হদিস পাওয়াটা সহজ হবে।

উল্টো দিক থেকে আর একটা বাস না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হল, কারণ যথেষ্ট প্যাসেঞ্জার না হলে ভ্যান ছাড়বে না। সে জায়গা পেয়েছে ঠিক ভ্যানআলার পেছনে, সামনের দিকে পা ঝুলিয়ে বসে তার সারাক্ষণ ভয় করতে লাগল, এই বোধহয় সে ঝাঁ-কুনিতে পড়ে যাবে। ভ্যান ছাড়ার আগেই সে ভ্যানআলাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে যেখানে যেতে সে জায়গাটা কত দূর। সে কথার উত্তর না দিয়ে উল্টে ভ্যানআলা তাকে

জিজ্ঞাসা করল, সে সেখানে কার বাড়িতে যাবে। প্রশ্নটার উত্তর দেওয়াটা কতটা ঠিক হবে সেটা সে কয়েক সেকেন্ড ভাবল, তারপর মনে হল কাউকে না কাউকে তো বলতেই হবে। সে বলল, 'সুশীল মাস্টারের বাড়িতে।'

ভ্যানআলা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি পার্টির লোক?'

এই প্রশ্নের সে কী জবাব দেবে? তার সঙ্গে পার্টির সম্পর্ক কী সেটা এই ছেলেটাকে সে কী করে বোঝাবে? সে তাই মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়ল সম্মতি জানিয়ে। ভ্যানআলা ছেলেটি এবার জিজ্ঞাসা করল সে কোথা থেকে আসছে। প্রত্যেকটা প্রশ্নই তার অস্বস্তি বাড়াচ্ছে। হতে পারে ছেলেটা পুলিসের লোক অথবা অন্য পার্টির লোক। গোটাটার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তার এবং শুভর নিরাপত্তার প্রশ্ন। কিন্তু প্রশ্নর উত্তর না দিলে বরং আরো সন্দেহ বাড়বে ছেলেটার। সে বলল, 'কলকাতা'। ছেলেটা এবার বলল, 'এদিকে পার্টির লোকেরা এলে সবাই সুশীল মাস্টারেরই খোঁজ করে।' তারপর ছেলেটা তাকে বোঝাল এই ভ্যান সুশীল মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত যাবে না, কারণ মাঝখানে খাল পার হতে হবে, কিন্তু তাকে সে দেখিয়ে দেবে ভ্যান থেকে কোথায় নামতে হবে আর বুঝিয়ে দেবে সেখান থেকে কিভাবে সুশীল মাস্টারের বাড়িতে যেতে হয়। ছেলেটার উত্তর শুনেই সে বুঝেছে এর কাছ থেকে তার ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস সে লক্ষ করল একটু পরেই। এতক্ষণ ছেলেটা তার সামনেই বিড়ি খাচ্ছিল, কিন্তু এই কথোপকথনের পরে ছেলেটা তার সামনে বিড়ি খাচ্ছে না, খাচ্ছে একটু আড়াল করে। সে ভাবল এটা কার জন্য? সে কলকাতার লোক তার জন্য, নাকি সে পার্টির লোক বলে, নাকি সুশীলমাস্টারের জন্য?

যে রাস্তা দিয়ে ভ্যানটা যাচ্ছে সেটা আসলে রাস্তা নয়, একটা খালের চওড়া বাঁধ। বর্ষাকালে সেটার অবস্থা কী হয় তা সে জানে না, কিন্তু এখন অবস্থাটা খুব খারাপ না। তবে রাস্তাটা খুব সুন্দর। রাস্তাটার একটা দিকে একটানা গাছ, গাছগুলোর মধ্যে সে বাবলা গাছ চেনে। পাশের খালটাতে জল খুব বেশি নেই, কিন্তু কাদার দাগ দেখে বোঝা যায় জল অনেকটাই থাকে। খালের কাদার ওপরে দু একটা নৌকো তোলা। সে ভ্যানআলা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করল নৌকোগুলো কাদের। ছেলেটার কাছ থেকে জানা গেল এই খালটা নাকি বড় নদীতে গিয়ে মিশেছে, জোয়ারে জল অনেকটা বাড়ে তখন এই মাছ ধরার নৌকোগুলো যাতায়াত করে। রোদে ভরা অথচ ঠাণ্ডা হাওয়ার এই প্রায় বিকেলে খালটা একসময় বড় একটা নদীতে গিয়ে পড়বে এটা ভেবে তার মনটা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল।

একটা বাঁশের সাঁকোর সামনে ভ্যানআলা তাকে নামিয়ে দিল, বলল ওপারে গিয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে সুশীলমাস্টারের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ছেলেটা ভাড়া হিসাবে নিল মাত্র কুড়ি পয়সা, তার মনে হল ইচ্ছে করে কম পয়সা নিল। সাঁকোটা পার হতে-হতেই সে দেখল ছেলেটা এতক্ষণ চুপ করে গাড়ি চালাচ্ছিল কিন্তু এবার গলা ছেড়ে 'পিয়া তু আপতো আ যা' গাইছে।

বাচ্চা একটা ছেলেকে খালপারের দোকানদার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল সেই তাকে সুশীলমাস্টারের বাড়ি পৌঁছে দিল। মাটির দেওয়ালের বাইরে একটা চালাঘর, সেই চালাঘরের সামনে গিয়ে বাচ্চাটা চেঁচিয়ে বলল, 'ও হাবুদা, দেখো কে খুঁজছে।'

লুঙিটা বাঁধতে-বাঁধতে বেরিয়ে এল যে ছেলেটি বয়সে সে তাদের থেকে একটু ছোটই হবে। তাকে পৌঁছে দিয়েই সঙ্গের বাচ্চাটা ছুট লাগিয়েছে, তার বোধহয় খেলায় দেরি হয়ে

যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সুশীলবাবু আছেন?'

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে জানাল, নেই। সে এবার জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে শুভ, মানে শুভব্রত থাকে?'

তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ছেলেটা পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

এই পাল্টা প্রশ্নে খুব একটা বিস্মিত না হয়েই সে বলল, 'কলকাতা।'

ছেলেটা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তার এবার ভয় হচ্ছে, ছেলেটি যদি বলে শুভ বলে কেউ এখানে থাকে না তবে সে কী করবে। ছেলেটি এবার কোনো কথা না বলে ঘরে ঢুকে গেল, কিন্তু বেরিয়ে এল পরমুহূর্তেই হাতে ভাঁজ করা একটা বস্তা। সেটাকে ঘরের সামনে উঁচু দাওয়ায় পেতে বলল, 'আপনি বসুন, আমি শুভদাকে ডেকে আনছি।'

সে নিশ্চিন্ত হল, যাক সে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছে। ছেলেটা একটা ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে সে রাস্তার যে দিক দিয়ে এসেছিল তার উল্টোদিকে চলে গেল। সে দাওয়ার ওপর বসল। তার সামনেই পড়ে আছে রাস্তাটা, যেটা দিয়ে সে এসেছে। তার বাঁ দিকে মাটির দেওয়ালটা, বোধহয় তার ওপারেই সুশীলমাস্টারের বাড়ি। ডানদিকে বাড়িটাতে কোনো মাটির দেওয়াল নেই, রাস্তা থেকে আলাদা করার জন্য আছে টানা কী এক ধরণের গাছের সারি। সুশীলমাস্টারের বাড়ির সামনেটায় কিছুটা ফাঁকা জমি, যার এক দিকে চালাঘরটা আর এক দিকে একটা বিশাল তেঁতুলগাছ, গাছটার ওপারে একটা পুকুর। চালাঘরটার ওপরে ঝুঁকে আছে একটা সবেদা গাছ। সবেদা গাছ সে চিনত না, কিন্তু গাছে ছোট-ছোট সবেদা হয়েছে দেখে সে চিনল। বিকেলও কিছুটা হয়েছে, চালাঘরটার ভেতরটা অন্ধকার—খাটিয়ার মতো একটা জিনিস ছাড়া আর ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে বসে আছে, ছেলেটা যে গেল আর তার কোনো হদিশ নেই। এতক্ষণ ধরে সে বসে আছে, কোনো মানুষ তার চোখে পড়েনি, এমনকী কারুর গলার আওয়াজও সে পায়নি। তার হঠাৎ মনে হল, সে কি ভুল কোনো জায়গায় চলে এসেছে? হতে পারে ছেলেটা তাদের লোকজন ডাকতে গেছে। আর তাকে যদি কেউ এখানে খুন করে মাটিতে পুঁতেও ফেলে কোনোদিন কেউ জানতেও পারবে না। শুভর চিঠিটা তার পকেটে, বাড়িতে বলে এসেছে—সম্বুদ্ধের দিদির বিয়ে, সে সিউড়ি যাচ্ছে। তার এখন সত্যি সত্যি ভয় করছে। তেঁতুলগাছের আড়ালে, ধুতরো ঝোপের পেছনে, এমনকী চালাঘরের ভেতরের অন্ধকারেও ঘাতকরা লুকিয়ে আছে বলে তার মনে হচ্ছে। সে দাওয়া থেকে নেমে সামনের ফাঁকা জমিটায় দাঁড়াল, অন্তত হঠাৎ পেছন থেকে কেউ তাকে আক্রমণ করতে পারবে না এটা ভেবে সে একটু আশ্বস্ত হল। একবার মনে হল যে রাস্তাটা দিয়ে বাচ্চাটা তাকে নিয়ে এসেছিল সেই রাস্তা ধরে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে কি না। কিন্তু তার সন্দেহ আছে আদপেও রাস্তাটা ঠিক সে চিনতে পারবে কি না। কিন্তু আর যাই হোক এই নিঃশব্দ বধ্যভূমির থেকে অন্তত পালাতে পারবে। সে তার নীল ডায়ালের বিদেশী ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল বাজে প্রায় পৌনে পাঁচটা।

'আমি জানতাম, তুই ঠিক আসবি।'

রাস্তাটা চালাঘরের পেছন দিয়ে এসেছে, তাই সে শুভকে আগে দেখতে পায়নি। হঠাৎ কথাটা শুনে সে চমকে উঠেছিল, কিন্তু পরমুহূর্তে সে ভীষণ আশ্বস্ত হল। শুভকে দেখে

এত ভাল তার আগে আর কখনো লাগেনি। শুভর পেছন পেছন ছেলেটা। তাকে দেখে একগাল হেসে বলল, 'আপনার বন্ধুকে অনেক খুঁজে ধরে নিয়ে এলাম।' সে মনে-মনে লজ্জিত হল, শুধু-শুধু ছেলেটা সম্পর্কে সে কত খারাপ কথা ভাবছিল।

শুভ ছেলেটাকে বলল, 'লক্ষ্মী বাবা হাবু, একটু তোর কাকিমাকে বলে আয় আমার এক বন্ধু এসেছে, রাতে এখনে থাকবে।'

তাকেও এরা বসিয়েছিল একদম মাঝখানে লণ্ঠনের সামনে। কাউকে বুঝতে না দিয়ে সে আস্তে আস্তে সরে এসেছে পেছনের দিকে, বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে দেখছে আর শুনছে সব কিছু। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠছে শুভ, শুভকেই সে দেখছে আর বিস্মিত হচ্ছে। এই শুভকে সে চেনে না। বিকেলেই সে শুভকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তার জামাকাপড়ের চেহারা এ রকম কেন হয়েছে। খুব সাজগোজ না করলেও শুভ সব সময় ফিট্‌ফাট। কিন্তু চালাঘরের পেছন থেকে শুভ যখন বেরিয়ে এসেছিল সে অবাকই হয়েছিল—পাজামার ওপর একটা ফুল সার্ট, দুটোই যথেষ্ট নোংরা। শুভ বলেছিল পুকুরের জলে কাচার জন্যই নাকি এই অবস্থা।

ঘরে একটাই লণ্ঠন আর প্রায় জনা পঞ্চাশেক লোক, ফলে লণ্ঠনে যতটা আলো তার থেকে বেশি অন্ধকার। আর সেই আলো-মাখা অন্ধকারকে আরো গাঢ় করছে বিড়ির আগুনের হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা। কিন্তু শুভ বসেছে একদম লণ্ঠনের সামনে, তার মুখে সব সময়ই আলো। প্রথমে বলছিল সুশীল মাস্টার। সন্ধ্যার সময়ই ফিরে এসেছিল সুশীলমাস্টার। লোকটার বয়স সে যা ভেবেছিল তার থেকে অনেক বেশি, আর অনেকগুলো দাঁত পড়ে যাওয়ায় লাগে আরো বেশি। কিন্তু প্রথম আলাপেই জানিয়ে দিয়েছিল তাকে সবাই মাস্টার বললেও আসলে সে কোনোদিন মাস্টার ছিল না, চাষবাসই তার কাজ। তার অক্ষরজ্ঞানও হয়েছে জেলে থাকার সময়, কী করে যেন লোকমুখে তার নামটা মাস্টার হয়ে গেছে। আর এও জানিয়েছিল শহরের শিক্ষিত কমরেডদের সামনে এই মাস্টার নাম নিয়ে সে যথেষ্ট বিব্রত। সুশীল মাস্টারের বক্তৃতা সবাই শুনছিল, আর সোচ্চারেই তার কথাকে সমর্থন করছিল। দু-একটা সমর্থন এতই সোচ্চার তাতে পেছন থেকে ভেসে আসা তাড়ির গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। সুশীল মাস্টার বলছিল বক্তৃতার ঢঙে নয়, একদম কথা বলার ভঙ্গিতে। তাতে বারবারই ফিরে আসছিল গ্রামের হাজারটা ঘটনা যেগুলো তার পক্ষে জানার কথা নয়, এমনকি অনেক উপমা, অনেক অলঙ্কার, এমনকি অনেক শব্দও তার অজানা। কিন্তু এটা পরিষ্কার শ্রোতাদের যা বোঝবার তা তারা বুঝেছে।

এবার শুভ। সে এতক্ষণ এর জন্যই অপেক্ষা করছিল। শুভ বলতে শুরু করল এত নীচু গলায় যে পেছন থেকে আওয়াজ উঠল যে, কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সে আওয়াজকে আপাতভাবে অগ্রাহ্য করেই শুভ বলে চলল। গোটা ঘরটা চুপ করে যখন শুনবার চেষ্টা করছে তখন আস্তে-আস্তে শুভ গলাটা বাড়াল। তার মনে হল আস্তে-আস্তে শুরু করল শুভ ইচ্ছে করেই, যাতে সবাই চুপ করে তার কথাটা শুনবার চেষ্টা করে। সুশীল মাস্টারের গোটা বক্তৃতাটা জুড়েই ছিল শ্রোতাদের সমর্থনসূচক মন্তব্য। কিন্তু শুভর বক্তৃতার মাঝখানে কোনো মন্তব্য নেই। সবাই চুপ করে শুনছে। যে ভাষায় শুভ বলছে সেটা

সুশীলমাস্টারের ভাষা নয়, কিন্তু কলেজের ক্যান্টিনে যে ভাষায় শুভ কথা বলে সে ভাষাও এটা নয়। সচেতনভাবেই কোনো ইংরেজি শব্দ শুভ ব্যবহার করছে না। এমনকী পারলে এড়িয়ে যাচ্ছে কঠিন বাংলা শব্দও। কৃষি না বলে বলছে চাষবাস, জনগণ না বলে বলছে মানুষ। শুধু মাঝে-মাঝে কানে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে স্বৈরতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের মতো কথাগুলো। সে ঠিক বুঝল না, এই কথাগুলোর কোনো সহজ প্রতিশব্দ নেই, নাকি শুভ ইচ্ছে করেই কথাগুলো ব্যবহার করছে। শুধু এই কথাগুলোই বুঝিয়ে দিচ্ছে শুভ এদের মধ্যে থেকে এদের মতো নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শুভ তার চেনা শুভ নয়। শুভ যেভাবে কাম্যুর আউটসাইডার বা বিনয় মজুমদারের কবিতা নিয়ে তর্ক করে এই শুভ সে ভাবে তর্ক করছে না। বরং অসম্ভব নরম হয়ে নিজের যুক্তির পক্ষে তার শ্রোতাকে আনতে চাইছে। গলা না তুলে গলাটাকে যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বর্ণনা দিচ্ছে ঘটনার আবেগ তৈরির জন্য। কালনা স্টেশনে কৃষক নেতার খুন, দুর্গাপুরে চেয়ারে বেঁধে হেডমাস্টারমশাইকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা—শুভ দক্ষ হাতে নরকের ছবি আঁকছে। আর তার শ্রোতারা তা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। হয়তো আক্রান্তের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে নীরবে আতঙ্কিত হচ্ছে। কিন্তু এ সবই তার এতদিনের চেনা শুভর গণ্ডিকে ছাড়িয়ে। তার মনে হল কোনটা আসল শুভ, এতদিন যে শুভকে তারা চিনত, সেই শুভ নাকি এই গ্রামীণ অন্ধকারের পটভূমিতে লণ্ঠনের আলোতে আলোকিত শুভ? কে জানে, হয়ত পার্টি করতে হলে একসঙ্গেই দুটো হতে হয়। আজ বিকেল থেকেই সে দেখছে শুভ অসম্ভব খুশি। আর যথারীতি শুভকে সে যত উৎফুল্ল দেখছে, বিনা কারণেই সে ভেতরে-ভেতরে ততই বিমর্ষ হচ্ছে। তার হঠাৎ মনে হল সে যদি এখন চিৎকার করে শুভর বক্তৃতা বন্ধ করে দেয়, তারপর গলাটা যথাসম্ভব তুলে বলে, 'তোকে বলতে ভুলে গেছি শুভ, শালিনী চলে গেছে দিল্লিতে, আর যাবার সময় বলে গেছে আর কোনোদিন আসবে না।' কী হবে? শুভর বক্তৃতা কী বন্ধ হয়ে যাবে? শুভ কী সারারাত ধরে কাঁদবে? হোক', শুভ তার মতোই বিমর্ষ হোক। দুনিয়ার সমস্ত আনন্দহীনতার ভার সে কেন একা বইবে? কিন্তু কিছুই সে করে না, অন্ধকারে বসে সে শুধু শুভর আলোকিত মুখ দেখে যায়।

মিটিং শেষ হতে প্রায় নটা। এই শীতের সময়ে গ্রামের অবস্থায় এটা বোধহয় যথেষ্ট রাত। রাস্তায় মিটিং-ফেরত তারা কয়েকজন ছাড়া আর কেউই নেই। পথের শেষটুকুতে তারা তিনজন। কয়েক পা এগিয়ে সুশীল মাস্টার, আর কয়েক পা পেছনে তারা। সুশীলমাস্টারের হাতে একটা ছোট টর্চ, কিন্তু আকাশে চাঁদ থাকায় পথ চলাটা খুব একটা কঠিন নয়। একটানা কথা বলে শুভও বোধহয় ক্লান্ত, তাই চুপ করেই তারা চলছিল। চলতে চলতে সে ভাবছিল, এই নির্জন গ্রামের পথে প্রত্যেকটা অন্ধকার কোণে, প্রত্যেকটা ঝুপশি গাছের পেছনেই ওত পেতে থাকতে পারে আততায়ী। সে চাইছিল তাদের রাস্তাটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

রাতে তারা শুয়েছিল বাইরের ওই চালাঘরে, তারা দুজন আর হাবু বলে ছেলেটি। তারা দুজন অনেকক্ষণ শুয়ে-শুয়ে গল্প করেছিল। প্রথম-প্রথম হাবুও তাতে অংশগ্রহণ করছিল, কিন্তু একটু পরেই হাবু ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর তারা দুজন। শুভই প্রধানত বক্তা, সে শ্রোতা। কিন্তু সারাক্ষণই সে ভাবছিল শালিনীর ব্যাপারটা শুভকে বলবে কি না, আর বললেও কীভাবে বলবে? শেষমেশ সে ঠিক করল শুভ যদি শালিনীর কথা জিজ্ঞাসা করে

তবেই সে বলবে, তা না হলে শুধু-শুধু কেন শুভর কাজকে নষ্ট করবে। আর শুভও একবারের জন্য কলেজের কথা জিজ্ঞাসা করছে না, বোধহয় ইচ্ছে করেই। শুভ একদম উচ্ছ্বসিত তার এই নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে। বাইরের অ্যাটাক আটকাতে পারলে নাকি পার্টি এখানে নাইন্টি পারসেন্ট ভোট পাবে।

সোঁদা গন্ধের একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে সে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু চোখটা লাগা মাত্র চালের ওপর একটা ভারি কিছু এসে পড়ার শব্দে সে চমকে জেগে ওঠে। তার ভেতরের চাপা আতঙ্কটা এক লাফে উঠে আসে তার গলার কাছে। সে হুড়মুড় করে উঠে বসে বিছানায়। ঘুমজড়ানো গলায় শুভ বলে, 'ঘুমিয়ে পড়, কিছু না, চালের ওপর পাকা বেল পড়ল। সকালে উঠে কুড়িয়ে নিয়ে তোকে খাওয়াব, খুব মিষ্টি।'

কিন্তু এরপর তার ঘুম আসতে অনেক সময় লাগে, দূরে শেয়ালের ডাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সে হঠাৎ আবিষ্কার করে শুভ তাকে সব কথা জিজ্ঞাসা করেছে, শুধু জিজ্ঞাসা করেনি, সে কদিন এখানে থাকবে। শুভ বোধহয় তার সঙ্গের ছোট ঝোলা ব্যাগটা দেখেই বুঝেছে, দু-দিনের বেশি থাকার জন্য সে আসেনি।

সকালে দুধ ছাড়া একটা অসম্ভব তেতো চা, মুড়ি আর শশা খেয়ে সে আর শুভ বেরিয়েছিল। চা'টা এতই তেতো সে প্রায় খেতে পারছিল না। শুভ বলল, 'কষ্ট করে হলেও খেয়ে নে। আমি যা বুঝেছি এ বাড়িতে চায়ের বিশেষ চলন নেই, বোধহয় আমাদের মতো কলকাতার বাবুদের জন্যই চা হচ্ছে কদিন।'

রাস্তায় বেরিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, সুশীলমাস্টার আসবে কি না। শুভ বলল, সকালের এই সময়টায় বেরোতে পারে না। বাড়ির মেয়েরা কাগজের ঠোঙা বানায়, সুশীলমাস্টার যায় এদিক-ওদিক সেই ঠোঙা বিক্রি করতে, এছাড়াও ক্ষেতে কাজকর্ম থাকে। এর জন্য সকালে শুভ একাই বেরোয়। তাকে সঙ্গে নিয়ে শুভ প্রায় গোটা গ্রামটা চক্কর দিল। কোথাও ছেলেদের দিয়ে পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করল, কোনো পাড়ায় গিয়ে কবে মিটিং হবে সে নিয়ে লোকজনদের সাথে আলোচনা করল। নানান লোকের সঙ্গে শুভর নানান কাজ। কে বলবে শুভ কয়েক দিন হল এসেছে এই গ্রামে।

শুভ বলছিল, গ্রামের লোকেরা তাকে খুব ভালভাবেই নিয়েছে, শুধু নাকি আলাদা পেলে জিজ্ঞাসা করে এই কাজের জন্য পার্টি তাকে কত টাকা দেয়। শুভ হাসতে-হাসতে বলছিল, আপ্রাণ চেষ্টা করেও নাকি সে এটা কাউকে বোঝাতে পারেনি কোনো টাকা পয়সা ছাড়াই সে এই কাজ করছে। হাঁটতে-হাঁটতে গ্রামটার এক দিকে এসে শুভ বলল, 'আয় এ পাড়ায় চায়ের দোকান আছে, চা খাব।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন সব পাড়ায় চা পাওয়া যায় না?'

'না, এই পাড়াতেও যে পাওয়া যায় তার পেছনে একটা সোসিও-ইকনমিক কারণ আছে। এটা হল গ্রামের মুসলমানপাড়া। তুলনায় গরিব, কিন্তু এই পাড়ার কিছু লোক বজবজের দিকে কলকারখানায় কাজ করতে যায়। তারা যে শুধু বাইরের জগতের খবর আনে তাই না, চা খাবার অভ্যাসটাও নিয়ে আসে। অথচ গ্রামের হিন্দুরা তুলনায় পয়সাআলা, কিন্তু প্রধানত চাষবাসের সঙ্গে আছে, চা খাবার শহুরে অভ্যাসটা হয়নি। চা খেতেই আমি দুবেলা এ পাড়ায় আসি। কয়েক দিনের পুরনো খবর কাগজও পাওয়া যায়

কখনো কখনো। তবে পাড়াটা আমাদের খুব ভাল বেস। কারখানায় কাজ করতে যায় যারা তারা সবাই আমাদের সলিড ওয়ার্কার। ভোটের দিনে এই পাড়াটা খুব ক্রুশিয়াল হয়ে যাবে। এখানকার ছেলেদের বুথের পাশে সকাল থেকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে লড়ে যাব। দেখি শালা কে কী করে, আর একটা বাহাত্তর হতে দেব না।'

চা খেয়ে বেরিয়ে এসে শুভ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা চাঁদু, এখান থেকে তুই একা সুশীল মাস্টারের বাড়িতে ফিরতে পারবি?'

'ইম্‌পসিব্‌ল।'

চুপ করে রইল শুভ, তারপর কী একটু ভেবে বলল, 'ঠিক আছে চল।'

কী ঠিক আছে, কোথাই বা সে যাবে কিছুই সে বুঝল না। কিন্তু শুভর পেছন-পেছন সে চলল। মূল রাস্তা ছেড়ে একটা পায়ে চলার রাস্তা দিয়ে। ঝোপঝাড়ে ভরা রাস্তাটায় খুব বেশি লোকজন যায় বলে মনে হয় না। বোধহয় পাড়াটার পেছন দিয়ে কোথাও যাচ্ছে শুভ। রাস্তাটা যেখানে শেষ সেখানেই ঘরটা। পুরোনো, কিন্তু পাকা। শুভ বন্ধ দরজাটায় টোকা মারতে ভেতর থেকে একটা আওয়াজ এল, 'কে?'

শুভ নাম বলাতে দরজাটা খুলে গেল। তারা দুজন ঘরটায় ঢুকল। ঘরটা আধা অন্ধকার, পেছনে একটা জানালা আছে, সেটা খোলা কিন্তু জানালাটাকে প্রায় ঢেকে রেখেছে বাইরের ঝোপঝাড়। ঘরের মাঝখানটায় একটা লণ্ঠন ঝুলছে ওপর থেকে। ঘরে একজনই ছিল, বছর তিরিশেক বয়স, পরে আছে একটা লুঙি আর ফতুয়ার মতো জামা, কয়েক দিনের জমে থাকা দাড়ি গালে। ঘরে ঢুকে শুভ প্রথমে দরজাটা বন্ধ করল, তারপর লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একা কেন, বাকিরা কই?'

খুব বিরক্ত হয়ে লোকটি বলল, 'তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করছ? আমি তো এখানে বসে মনে-মনে তোমার শ্রাদ্ধ করছি। কী সব লোকজন ধরে আনো, সকাল থেকে আমি একা। ঠিক আছে, জিনিসপত্র আমিই বানাচ্ছি। কিন্তু একটা লোকাল কেউ না থাকলে হয়। শালা জলতেষ্টা পেলেও জল খাবার উপায় নেই।' লোকটা কথা বলতে বলতেই তীক্ষ্ণ চোখে তাকে জরিপ করছে এটা সে বুঝতে পারল।

শুভ কুণ্ঠিত হয়ে বলে, 'সরি সিধুদা, আমি দেখছি। আপনি তো বোঝেন কাদের নিয়ে এখানে কাজ করতে হয়।' তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাঁদু, তুই একটু এখানে বোস, আমি আসছি।' দরজার কাছে গিয়ে আর একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একদম বাইরে যাস না, এখানেই থাকিস।'

মাটিতে চাটাই পাতা ছিল সে তার ওপর বসল। এবার সে ভাল করে তাকাল ঘরের ভেতরটায়। তখনই তার চোখে পড়ল জিনিসগুলো। পাটের দড়িতে মোড়ানো এই গোল জিনিসগুলো চেনে না, এ রকম কেই বা আছে। তাদের বড় হওয়ার গোটা সময়টাকে জড়িয়ে আছে এই পাটে জড়ানো গোলাকার জিনিসগুলো, তাদের বিস্ফোরণের আওয়াজ আর যে কোনো সাজানো গোছানো আয়োজনকে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা নিয়ে। প্রথম প্রথম যখন সি আর পি পাড়ায় ঢুকত, পার্টির ছেলেরা তার মোকাবিলা করত এই বোমগুলো নিয়ে। বুটের আওয়াজের ফাঁকে-ফাঁকে পাড়া কাঁপানো আওয়াজ, তারপর গুলির আওয়াজ। যেদিন পার্টির ছেলেরা পাড়া ছেড়ে চলে গেল সেদিন ভোর রাত থেকে গোটা পাড়াটা কাঁপছিল বাঁশপাতার মতো, বোমের আওয়াজে। এই বোমগুলো তার ভয় আর

আতঙ্কের উৎস। কিন্তু আজ এই অখ্যাত গ্রামের একটা পোড়ো ঘরে এ সবের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত। সব জেনেও একটা ভয় আর অস্বস্তি হতে লাগল তার। লোকটা, যাকে শুভ সিধুদা বলে ডাকছে, তার উপস্থিতিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে তার কাজ করে যাচ্ছে। সেও মনোযোগ দিয়ে গোটা ব্যাপারটা লক্ষ করে। একটা এনামেলের বড় বাটি থেকে লালচে মতো মণ্ড এক টুকরো কাগজের মধ্যে নিয়ে লোকটা সাবধানে কাগজটা ভাঁজ করছে। তারপর কাগজটার ওপর এক-এক করে লোহার গোল গোল টুকরো বসাল। এত সাবধানে গোটা কাজটা করছে যে মনে হচ্ছে গভীর মমত্ব নিয়ে কিছু একটা বানাচ্ছে। তারপর পাটের দড়ি দিয়ে গোটাটা বাঁধার কাজ। শেষ দিকে যখন গায়ের জোরে দড়িটা বাঁধছে দাঁতে-দাঁত চেপে, তখনই তার হরিয়ার কথা মনে পড়ে গেল।

হরিয়া তাদের স্কুলের দারোয়ানের ছেলে, তাদের থেকে কয়েক বছরের বড়। হরিয়া বোম বাঁধতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। সে দেখেনি, কিন্তু শুনেছে, হরিয়ার শরীরের মাংস এমন ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গিয়েছিল যে ঘরের দেওয়াল থেকে নাকি চামচ দিয়ে কাঁচিয়ে বার করতে হয়েছিল। লোকটা তার থেকে বড় জোর ফুট কয়েক দূরে, বোমের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ না হয়েও সে বোঝে', কিছু একটা হলে তাকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অস্বস্তিটা এখন প্রবল আতঙ্ক হয়ে ফিরে এসেছে। তার গলাটা শুকিয়ে আসছে। গোটা ঘরটায় কোথাও জল আছে বলে তার মনে হল না, আর ঐ সিধুদাকে কিছু জিজ্ঞাসাও সে করতে চায় না। সে পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকটটা বার করে একটা সিগারেট ধরায়।

বন্ধ আর এতক্ষণ শব্দহীন ঘরের ভেতর কথাটা প্রায় বিস্ফোরিত হল বোমার মতো।

'এ ভাই কী করছ? এখানে খোলা মশলা পড়ে আছে আর সিগারেট ধরাচ্ছ, এ রকম গাড়ল তো আমি জীবনে দেখিনি! যাও বাইরে গিয়ে ফেলে এসো।'

কথাটায় চমকে উঠলেও সে সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারে সে একটা মারাত্মক ভুল করেছে। ভুলটা এতটাই মারাত্মক, তাকে যে একটা অপরিচিত লোক গাড়ল বলে গালাগাল দিল সেটা সে গায়ে মাখতেই পারল না। তাড়াতাড়ি সে দরজা খুলে বাইরে এসে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল দূরে ঝোপের মধ্যে।

প্রায় তার পেছন-পেছন বেরিয়ে এসেছে লোকটা। কিন্তু একটু আগের গালাগালের কোনো চিহ্ন মুখে নেই। খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'দাও তো একটা সিগারেট, বিড়ি খেয়ে-খেয়ে মুখটায় কোনো স্বাদ পাচ্ছি না।'

সে একটা সিগারেট বার করে দিল, সঙ্গে দেশলাই। খুব মৌজ করে সিগারেটটা ধরাল, তারপর একটা লম্বা টান দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কলকাতা থেকে?' সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর এক মনে সিগারেট খেতে লাগল। কিন্তু সিগারেট এত লম্বা-লম্বা টান দিচ্ছে তাকে সিগারেটটা শেষ হতে বিশেষ সময় লাগবে না। সে প্রমাদ গুনল, সিগারেট শেষ মানেই আবার ঐ ঘরে ঢুকতে হবে। সে কিছুতেই ঐ ঘরে ঢুকতে রাজি না। সে ইচ্ছা করে কথাবার্তা শুরু করল। যতক্ষণ পারা যায় লোকটাকে বাইরে আটকে রাখা যায়, তারপর শুভ চলে এলেই তার ছুটি।

'আপনার বাড়ি কি এখানেই?'

'না-না, আমার বাড়ি ছিল বেলঘরিয়ায়, কিন্তু পাঁচ বছর হল বাড়ি ছাড়া। এখন নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই, পার্টি বলল এখনে আসতে, চলে এসেছি।'

কথোপকথনটাকে দীর্ঘায়িত করতে সে এবার জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে কে-কে আছে?'

'সে অনেকে। আমাদের অনেক বড় ফ্যামিলি, বাবা, মা, ঠাকুমা, বড় দাদা, বৌদি, দুটো ভাইপো, ছোট বোন, বউ আর আমার মেয়ে।'

'মেয়ে কত বড়?'

লোকটা মনে মনে হিসাব করে বলল, 'এই আষাঢ়ে সাত বছর হবে।'

'পাঁচ বছর মেয়ে আপনাকে দেখেনি?'

'না, মাঝখানে বছর দেড়েক কালীঘাটে ছিলাম। তখন মাঝে মাঝে বউ মেয়েটাকে নিয়ে আসত। এখানে আসাব আগে কলকাতায় মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। তবে এ রকম করে কি আর কেউ নিজের বাপকে চেনে? কোলে নিলেও কেমন কাঠ কাঠ হয়ে থাকে, যেন বাইরের লোক। ওর আর কী দোষ, আমাকে তো জ্ঞান হবার পর আর দেখেনি সেভাবে।'

তার মনে হল কথা বাড়াবার জন্য প্রসঙ্গটা না তুললেই ভাল করত। এই চোয়াড়ে লোকটার জন্য তার কেমন করুণা হচ্ছে। সে এবার গলাতে যথাসম্ভব আত্মবিশ্বাস ফুটিয়ে বলল, 'যাক' এবার তো জামানা পাল্টাবে।'

লোকটা তার কথায় কোনো উৎসাহ দেখাল না। 'হ্যাঁ, সবাই তাই বলছে', বলে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল। না, শুভর কোনো চিহ্নও নেই। বাধ্য হয়ে সে আবার ঘরে ঢুকল। এবার সে কিছুটা সরে বসল দরজার একদম পাশে, যতটা দূরত্ব বাড়ান যায়। লোকটা এখন ছোট একটা হামানদিস্তায় কী যেন গুঁড়ো করছে। লোকটার পেছনে বোমগুলো রাখা, সে গুনে দেখল, সাতটা। সাইজে ডিউস বলের থেকে একটু বড়। লোকটা কাজ করছে চুপচাপ। আর এই চুপচাপ অবস্থাটা যেন আরো অস্বস্তির কারণ হচ্ছে। কিছুক্ষণ উশখুশ করে সে এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই একটা বোমে লোক মরবে?'

মুখ না তুলেই লোকটা বলল, 'তোমাকে একটা মেরে দেখাব?'

সে জোর করে শব্দ করে হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি মেরেছেন?'

'যা বাবা! না ছুড়লে বানানো যায় না।'

'না, আমি জানতে চাইছি, আপনার ছোঁড়া বোমে কখন কেউ মরেছে?'

'সেভাবে বোঝা যায় না। দু-দল চার্জ করছি, কারটা কার গায়ে লেগে গেল সেটা আলাদা করে বোঝা যায় না। একমাত্র ওয়ান টু ওয়ান সিচুয়েশন হয়ে গেলে বোঝা যায়। তবে ওয়ান টু ওয়ানে বোম কাজে লাগে না, তখন অন্য জিনিস লাগে।'

'আপনার এ রকম হয়েছে?'

লোকটা কোনো কথা না বলে এক মনে কাজ করে যাচ্ছে, যেন তার প্রশ্নটা শোনেইনি। তারপর হঠাৎ বলতে শুরু করল 'শীতকাল ছিল। আমি লেভেল ক্রশিং পার হচ্ছিলাম, আমরা তখনো লাইনের ওপারে যেতে পারতাম। রাত আটটা নাগাদ। আশেপাশে লোকজনও ছিল। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গেছি। একাই ছিল। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম আগে খেয়াল করতে পারিনি। হঠাৎ দেখি একদম সামনে, হাতে চেম্বার। চেম্বার হাতে কিন্তু মুখে বলছে—স্ট্যাব করে দেব, স্ট্যাব করে দেব। আর দেখি হাতটা কাঁপছে। আমার ডান পকেটে একটা ওয়ান শটার ছিল। যা হবার হোক বলে বাঁ হাত দিয়ে ওর হাতটা চেপে আমারটা

বার করে চালিয়ে দিলাম।'

হামানদিস্তা থেকে লোকটা লালচে একটা পাউডার মতো সাবধানে একটা ন্যাকড়াতে ঢালতে লাগল। সে প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিল। সে বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কী, স্পটেই শেষ।'

'আর আপনি?'

'আমি?' লোকটা তার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল। 'সেদিন রাতে কমরেডরা জোর করে ক্যাম্পোস ইন্‌জেকশন দিয়ে দিয়েছিল। তাতেও ঘুমোতে পারিনি। ভয়ঙ্কর, ভাবা যায় না। আমি সিওর ও আমাকে দেখে ভয় পেয়ে চেম্বার বার করেছিল। যদি ও ওর মতো চলে যেত তবে কিচ্ছু হত না। কমরেডরা বোঝাচ্ছিল, তুই এ রকম করছিস কেন, তুই না মারলে তো তোকে ও মেরে দিত। কিন্তু তখন ওসব মনে থাকে না, শত হলেও একটা মানুষ তো!'

তারপর হঠাৎ যেন রেগে গিয়ে বল উঠল, 'চুপ করো তো ভাই, এসব কাজের সময় কথা বলিও না, অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।'

সে অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে যায়।

শুভ তাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল খাল পর্যন্ত। রাস্তায় তারা কেউই বিশেষ কোনো কথা বলেনি। সে ভাবছিল শালিনীর ব্যাপারটা শুভকে সে বলবে কি না। প্রথমে সে ঠিক করেছিল শালিনীর কথা জিজ্ঞাসা করলেই সে বিষয়টা শুভকে জানাবে। কিন্তু শুভ দুনিয়ার সব কিছু নিয়ে কথা বলেছে কিন্তু ভুলক্রমেও শালিনীর কথা তোলেনি। বোধহয় ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু সব জেনেও শুভকে কিছু না বলাটা অন্যায় হবে বলে তার মনে হচ্ছে। সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে সে শুভকে খুব কুণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'শালিনীর কথা শুনেছিস?'

শুভ সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল, 'শুনেছি।' এই উত্তরটা সে আদপেও প্রত্যাশা করেনি। এবং শুভ এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, তার মনে হল, শুভ যেন জানত সে এই প্রশ্নটা করবে।

বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবি?'

'ইলেকশনটা মিটুক তারপর যাব দিল্লিতে।'

সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'সত্যি যাবি?'

'হ্যাঁ যাব।'

'সেই যাবি। আগে বললি না কেন, তাহলে তো ও যেতই না।'

একটু সময় চুপ করে থেকে শুভ অদ্ভুতভাবে হাসল। 'সত্যি কথাটা তোকে বলি। ভুল করেছি, আমিই ভুল করেছি। আসলে ভয় পেয়েছিলাম।'

'এবার ও যদি তোকে ফিরিয়ে দেয়?'

'ফিরিয়ে দেবে না। ওর ওপর আমার কোনো জোর নেই?'

'তুই কী মনে করিস? জোর করে শালিনীকে কিছু করা যায় না।'

'না রে, আমি সেই জোরের কথা বলছি না। ও আমাকে ভালবাসে, আমিও ওকে ভালবাসি। একবার মাথা নীচু করে ওর সামনে দাঁড়ালে ও আমাকে ফেরাতে পারবে না।'

'এই এক মাসে এত সাহস পেয়ে গেলি, ইলেকশনে জিতবি বলে?'

'শুধু সাহস কী রে, এই এক মাসে কত কী যে পেয়েছি তুই জানিস না। বলতে পারিস

আমি নিজেকে আবিষ্কার করেছি। এত দিনে নিজেকে দেখতাম একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে। হঠাৎই ফ্রেমটা অনেক বড় হয়ে গেছে। নিজে বুঝেছি, সত্যি আমি কত ছোট, আবার অন্যদিকে ধরতে পারছি চাইলে কত কিছু করতে পারি। এতদিন ভাবতাম পার্টি করে পার্টির উপকার করছি, কিন্তু এখন বুঝেছি পার্টির জন্য পার্টি করা না, নিজের জন্যই পার্টি করা উচিত। তোকে বারবার ডাকছিলাম এর জন্যই, তুই তো এলি না। তোকে বলছি চাঁদু, এ ছাড়া বাঁচা যাবে না।'

'কী ফালতু কথা বলছিস, এ ছাড়া কেউ বাঁচে না?'

'বাঁচবে না কেন? বাঁচে। মনের দরজা জানালা কংক্রিট দিয়ে বন্ধ করে বাঁচে। বেঁচে থাকাটা শারীরিক প্রবৃত্তি তাই বাঁচে। প্রতিদিন শ্মশানে হাজারটা বডি পোড়ে, পুড়ে গেল ব্যস শেষ। রকফেলার আর টাটা বিড়লাদের যুগে শোকের মেয়াদও ঘণ্টা দিয়ে মাপা যায়। তাও অনেকে আছে যারা কিছু পারে। কেউ ভাল ছবি আঁকে, কেউ ভাল গান গায়, কেউ বা শুধু ভাল ফুটবল খেলে। এদের তাও বেঁচে থাকার একটা অর্থ আছে, দে আর ক্রিয়েটিং সামথিং। আর তুই আর আমি, যারা কোনো অর্থেই অসাধারণ নই—আমরা কীভাবে আছি। পাস করে কপাল ভাল থাকে একটা চাকরি, মাইনে ভাল পেলে শেয়ার ট্যাক্সি না হলে বাসে বাদুড়ঝোলা। তারপর বিয়ে কর, বাচ্চা বিয়োও। কেন বড়লোক হতে পারলাম না ভেবে হা-হুতাশ কর। অ্যাসিডিটি, ডায়বেটিস নিয়ে ঘর করতে-করতে একদিন খই ছিটিয়ে বলো হরি-হরি বোল বলে যাত্রা শেষ। ধুৎ, এমন বাঁচার মুখে আমি পেচ্ছাপ করি।'

সে হাসতে-হাসতে বলল, 'আচ্ছা অন্যের বাঁচা নিয়ে তুই কেন এত খেপে যাচ্ছিস। যারা এভাবে বাঁচছে তারা তো দিব্যি আছে।'

'তারা দিব্যি থাকবে না কেন। ঠিকভাবে বাঁচতে না পেরে বাঁচার মনটাকেই তো আস্তে-আস্তে মেরে ফেলে। তুই আলাদা করে জিজ্ঞাসা কর—আপনি কী এভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন। বলবে, না। কিন্তু তোর আমার তো এখনও বাঁচার মনটা আছে। ভাল একটা জিনিস পেয়েছি তাকে নষ্ট করব কেন? বেঁচে থাকবার মনটাকে মেরে ফেলে বেঁচে থেকে লাভ কী। ধর এখানে, আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় যে লোকটাকে অনেক কথা বুঝিয়েছি, পরের দিন যখন দেখি সেই লোকটা মিছিলে এসেছে, কী যে ভাল লাগে তোকে আমি বোঝাতে পারব না। আমার মনে হয়, ভাল একটা কবিতা লিখলে একজন কবিরও ঠিক এ রকম আনন্দ হয়। আমি তো শালা কবিতাও লিখতে পারব না, ছবিও আঁকতে পারব না—কিন্তু আমি মিছিলে লোক আনতে পারব। আমার রাজনীতির কথায় যারা মিছিলে এসেছে তাদের মধ্যে দিয়েই আমার ক্রিয়েশন। হতেই পারে আমি বেঁচে থাকতে বিপ্লবটা হলই না, তাতে কী হয়েছে তার জন্য আমি যা করেছি তা তো নষ্ট হয়ে যায়নি। ঠিক করেছি, এভাবেই বাঁচব।'

বিকেল হয়ে আসছিল। সে বলল, 'যাক এসব নিয়ে পরে কথা বলব, চলি। তবে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, শালিনীর ব্যাপারটা জেনে ভীষণ ভাল লাগছে।'

একটা দুষ্টুমি মেশানো হাসি দিয়ে শুভ বলল, 'আমার কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করলি না?'

সেও হেসে ফেলে, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'কেমন?'

'আমি এখন উড়ে বেড়াচ্ছি, মাটিতে পা পড়ছে না। ওরে চাঁদু, এত ভাল যে লাগতে পারে আমি জানতামই না। কেন কবিরা এত কবিতা লিখেছে প্রেম নিয়ে তা অ্যাদ্দিনে

বুঝলাম।'

'তুইও তাহলে কবিতা লিখতে শুরু কর।'

'সময় কই? মনে মনে শালিনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই তো গোটা দিন কেটে যাচ্ছে।'

ফেরার সময় আগের ভ্যানআলাকে পাওয়া গেল না। এবারের ভ্যানআলা বুড়ো মতো। আসার সময় সে খেয়াল করেনি। খালের উল্টোদিকে বাঁধের অন্যপারে খেতে মরশুমি ফুলেরও চাষ হয়েছে। ছোট-ছোট হালকা গোলাপি ফুলে ছেয়ে আছে গোটা খেত। হাওয়াটাও ঠাণ্ডা, সব মিলিয়ে বহুদিন পরে তার ভাল লাগছে।

সে প্রায় চমকে লাফিয়ে উঠেছিল। কী হচ্ছে বুঝতেই তার কিছুটা সময় লেগে গেল। চোখ খুলতেই সে দেখল ছোটর মুখ। ছোটকে এত উত্তেজিত সে কখনো দেখেনি। ছোট তাকে প্রাণপণে ধাক্কাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—'দাদা ওঠ্, প্রধানমন্ত্রী হেরেছে।' সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তখনো ছোট তাদের ভাঙা ট্র্যাঞ্জিস্টারে খবর শোনার চেষ্টা করছিল। এমনিতেই ট্র্যাঞ্জিস্টারটায় ভাল আওয়াজ হয় না, সব সময় ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে। তারপর ছোট সেটাকে আস্তে-আস্তে চালাচ্ছিল যাতে আওয়াজ বাইরে না যায়। সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার আড্ডায় খবর ছিল ওরা নাকি হারছে, কিন্তু সেটা কতটা বিশ্বাসযোগ্য সে ব্যাপারে তার সন্দেহ ছিল। সে সিগারেটের দোকানে বিকেলে নিজের কানে দিল্লির খবর শুনেছে, কর্ণাটকের চারটে সিটে ওরা জিতেছে। আজ কেন যেন পাড়ার রাস্তাঘাট খালি-খালি। আড্ডাটাও বেশিক্ষণ চলেনি, সে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছিল। ছোট ফিরল তার অনেক পরে, ভীষণ উত্তেজিত হয়ে। তারপরই বসে গেল ভাঙা ট্র্যাঞ্জিস্টার নিয়ে। সে খবর জিজ্ঞাসা করাতে বলল, ওরা নাকি সব সিটে হারছে।

ভোটের দিনে তারা পাড়ার বন্ধুরা সারাক্ষণই একসাথে আড্ডা মেরেছে, কর্পোরেশন প্রাইমারি স্কুলের আশেপাশে। ওখানেই তাদের পাড়ার ভোট হয়। সে নিশ্চিত ছিল ভোট নিয়ে গণ্ডগোল হবেই। কিন্তু কোনো গণ্ডগোলই হয়নি। রাস্তার ওপর দুটো ক্যাম্প ছিল। ওদের ক্যাম্প সকালে থেকেই জমজমাট, যে সমস্ত ছেলেরা জড়ো হয়েছে তাদের সবাইকে তারা চেনেও না। আর একটা ক্যাম্প সারাদিনই প্রায় ফাঁকাফাঁকাই থেকেছে। ছোট আর ওদের গ্রুপের দু-তিনটে ছেলে, সুনীতিপিসি আর বয়স্ক কয়েকজন। সুনীতিপিসি পাড়ার সব ছেলেদের পিসি। বিয়ে করেননি, পোস্ট অফিসে কাজ করেন। বয়স্কদের মধ্যে আছে বাপ্পার জ্যাঠামশাই, সরকারি চাকরি করতেন, বছর দুয়েক হল রিটায়ার করেছেন। ছোটকে নিয়ে তার আশঙ্কাটা এখন প্রায় ভোঁতা হয়ে গেছে। সে জানে বাধা দিতে সে পারবে না। মা'র

বকাবকি, এমনকী বাবা একদিন মারধরও করেছে, কিন্তু ছোটকে আটকানো যায়নি। সে ভেবে রেখেছে সামনা-সামনি না থাকুক দূর থেকে সে ছোটকে নজরে রাখবে, যদি কিছু হয় অন্তত একবার সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

পাড়ার লোকেরা অদ্ভুত, কোনো ক্যাম্পেই যাচ্ছে না। চুপচাপ চলে যাচ্ছে ভোট দিতে। কারুর মুখে হাসি নেই, এমনকী কেউ বিশেষ কথাও বলছে না। তাদের কারোরই ভোট নেই। শম্ভু একবার প্রস্তাব দিয়েছিল ওদের দলের মধ্যে ভিড়ে গিয়ে বিপক্ষে ভোট দিয়ে আসবে। তারা বাকিরাই আটকেছে, ধরা পড়লে খারাপ হবে বলে।

ওদের ক্যাম্পে অন্তু একজন নেতা। সাদা হাইকলার পাঞ্জাবি আর চোস্ত পাজামা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝখানে একবার এসে তাদের সঙ্গেও কথা বলে গেছে। অন্তুকে দেখেই তিলক বলল, 'গুরু অনেক তো আমদানি হল, একটু চা খাওয়াও।'

কেমন একটা লাজুক-লাজুক হাসি দিয়ে অন্তু বলল, 'চা খাবি, দাঁড়া পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোরা কজন আছিস বল, খাবার প্যাকেটও পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

তারপর যেন হঠাৎই তার দিকে নজর পড়ল অন্তুর, 'কী বে চাঁদু, আজকাল কলেজে দেখছি না তোকে। যাচ্ছিস না?'

তার প্রথমেই যেটা মনে হল, শুভ মার খাবার পর থেকে সে আর অন্তুর সাথে কথা বলেনি। সে কোনো কথা না বলে শুধু হাসল। একটু থেমে এবার অন্তু বলল, 'ভাইটাকে একটু বোঝা, কী সব করছে।'

সে নিশ্চিত এই কথাটা বলবার জন্যই অন্তু এখানে এসেছে। তার প্রথম যে উত্তরটা মুখে চলে এসেছিল, তা হল—যা করছে, বেশ করছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল তার দিক থেকে এ রকম একটা উত্তর ছোটর বিপদ ডেকে আনতে পারে। সে অস্পষ্টভাবে বলল, 'ছাড়, কী আর বলব?'

অন্তু এবার গলাটা একটু তুলেই বলল, 'দেখ আমার কিছু না, আমি জানি বাচ্চা ছেলে। তোর ভাই তো আমার ভাইয়ের মতো। কিন্তু বাকি যারা আছে তারা তো এ সব জানে না। কিছু একটা কিচাইন হয়ে গেলে, আমি ঝামেলায় পড়ে যাব।'

বাপ্পা বলে উঠল, 'অন্তু ছাড় না এসব। তোদের তো এত লোক, দু-তিনটে বাচ্চা ছেলে কী করবে তোদের?'

'না-না তুই বুঝবি না। দু-চারটে বুড়ো-হাবড়া নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। দু-দিন পরে মরে যাবে, ব্যস্ ওদের পার্টি শেষ। আমরা চাই না ওদের পার্টির নাম এখানে কেউ করুক।'

বোধহয় প্রসঙ্গ পাল্টাতেই হঠাৎ শম্ভু বলে উঠল, 'গুরু একটু ভোট দেবার ব্যবস্থা করে দাও না, কোনোদিন ভোট দিইনি।'

একটা উদার হাসি দিয়ে অন্তু বলল, 'ভোট দিবি? চ।'

'একটা-দুটো না কিন্তু, মিনিমাম পাঁচটা।'

'সে তুই দে না, যতগুলো পারিস।'

অন্তুর পিঠে হাত দিয়ে শম্ভু রওনা হল স্কুলের দিকে। একবার শুধু তাদের দিকে মাথা ঘুরিয়ে অর্থপূর্ণভাবে হাসল।

'শালা, ধরা পড়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে শম্ভু', তিলক বলল।

'কিচ্ছু ধরা পড়বে না। শম্ভু পাঁচটা অস্তুকে কিনে বেচে আসতে পারে। যা, যটা পারিস উল্টোদিকে মেরে আয়। এটাই ওদের দরকার' বাপ্পা বলল।

নেতা-সহ জিপের আনাগোনা, পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পুলিসের অলস সময় কাটানো, এমনকী দূরে কোথাও একটা বোমার আওয়াজ—এভাবেই কেটে গিয়েছিল সারা দিনটা। ছোট ফিরেছিল প্রায় মাঝরাতে। কিন্তু মা বা বাবা কেউই কিছু বলেনি।

ওই দিনটার সাথে আজ মাঝরাতের এই খবরটা খাপ খায় না। সে বিছানায় উঠে বসল। কিন্তু ছোট তখন জামা পরছে। সে প্রায় আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এই মাঝরাতে কোথায় যাচ্ছিস?'

এক গাল হাসি দিয়ে ছোট বলল, 'যে দিকে দু চোখ যায়।' বারান্দার দিকে দরজাটা ছোট যখন খুলছে, সে শেষবারের মতো চেষ্টা করল, 'যাস না, ঝামেলা হবে।'

তারদিকে ফিরে হাসিমুখেই ছোট বলল, 'আজ রাতে কে ঝামেলা করবে রে?'

বারান্দার রেলিং টপকে ছোট অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সে এসে দাঁড়াল অন্ধকার বারান্দায়। কিন্তু সে বিস্মিত হল টিঙ্কুর বড়কাকার ঘরে আলো জ্বলছে এত রাতে। সে বারান্দায় দাঁড়াতেই আলো জ্বলে উঠল সুমিতাদিদের বাড়িতে, তার পরেই ঘোষাল জেঠুর ঘরে। এক-এক করে আলো জ্বলছে। মানে সবাই অন্ধকার ঘরে বসে খবর শুনছিল, পাঁচ বছর পর সাহস করে আলো জ্বালিয়েছে। কে যেন নাম ধরে কাকে ডাকছে। এদিক-ওদিক থেকে কথাবার্তা ভেসে আসছে। একটা আনন্দ মেশানো বিস্ময় নিয়ে সে তাকিয়ে থাকে তার ননীমাধব দে লেনের দিকে। মাই হেভেনে কোনো আলো জ্বলেনি।

মা কখন যেন এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সে অন্ধকারেই মার দিকে তাকিয়ে হাসল। মা বলল, 'একটা শার্ট গায়ে দিয়ে এলে কী হয়, হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা।'

সে মায়ের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'ছোট কি আজ রাতে ফিরবে, না রাত কাবার করে আসবে?'

'আজ ছেড়ে দাও মা।'

'আটকালাম কোথায়, তোদের তো ছেড়েই দিয়েছি।'

সব মিলিয়ে অনেকদিন পরে তার ভীষণ ভাল লাগছে। সে মায়ের কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, বহুদিন পরে সে প্রাণভরে নিশ্বাস নেয় মা-মা গন্ধটা পেতে।

সময় যেন উড়ে যাচ্ছে। সব কিছুর সঙ্গে তাল রাখতেই সে হিমশিম খাচ্ছে। প্রায় শ দুয়েক ছেলে-মেয়ে গিয়ে তারা জড়ো হয়েছিল প্রিন্সিপালের ঘরে—একটাই দাবি, ইউনিয়ন রুমে তালা লাগাতে হবে। প্রিন্সিপাল বোধহয় এ রকম পরিস্থিতিতে কখনো পড়েননি। গোটা দলটার নেতা শুভ, কুশল, আর থার্ড ইয়ার ইকনমিক্সের অশোক। প্রিন্সিপালের বক্তব্য, গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ছাড়া এ কাজ তিনি করতে পারবেন না। তুমুল গণ্ডগোল তাই নিয়ে। অশোক একটা চেয়ারের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতে শুরু করল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল কুশল। কুশলের গলাটা খুব ভারি। প্রিন্সিপালের চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কুশল চ্যাঁচাল—'সাইলেন্স প্লিজ'। এই আওয়াজে সবাই চুপ, এমন কী অশোকও তার বক্তৃতা বন্ধ করে দিল। কুশল এবার প্রিন্সিপালকে লক্ষ করে বলল, 'দেখুন স্যার, আজকে কলেজে

সবচেয়ে সহজ কাজ হল ইউনিয়ন রুমটা বন্ধ করা। কাজটা আমরা পারি না তা নয়, আপনি যদি কিছু না করেন তবে আমরাই তা করব এবং কাজটা করতে ঠিক দু-মিনিট লাগবে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে দু-একটা জানোয়ার যদি আমাদের হাতে মার খেয়ে মরে যায় তবে দায়িত্ব আপনার। ঠিক আছে আমরা চললাম, ইউনিয়ন রুম বন্ধ করতে।'

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন প্রিন্সিপাল, 'একদম না, কলেজের ভেতরে এসব গণ্ডগোল আমি বরদাস্ত করব না। দরকার হলে আমি পুলিস ডাকব।'

গোটা ঘরটা একদম একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। শুভকে টানতে-টানতে প্রিন্সিপালের একদম সামনে দাঁড় করিয়ে কুশল বলল, 'পুলিস ডাকবেন? এই ছেলেটাকে যেদিন বাইরের অ্যান্টিসোস্যালরা কলেজের ভেতর মারল, সেদিন পুলিস ডাকেননি কেন?'

চেঁচাতে-চেঁচাতে যে মেয়েটা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল তার নামটা সে জানে না, শুধু জানে থার্ড ইয়ার পলসায়ন্সের মেয়ে। 'আমাদের ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরি থেকে যেদিন মাও সে তুং-এর বইগুলো বার করে সবার সামনে ছিঁড়ে ফেলল, সেদিন পুলিস ডাকেননি কেন?'

তুমুল হট্টগোলে কারোর কথাই আর শোনা যাচ্ছে না। ভিড় ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ভাইস প্রিন্সিপাল জ্যোতিষবাবু। কলেজের ছেলেরা জ্যোতিষবাবুকে তুলনায় একটু বেশি ভয় পায়। জ্যোতিষবাবু ঢুকতেই সবাই কিছুটা চুপ করল। গলাটা তুলে জ্যোতিষবাবুকে বললেন, 'তোমরা এখন বাইরে যাও, তোমাদের কথা আমরা শুনেছি। আমরা টিচাররা এখন বসব, তারপর ঠিক করব কী হবে।'

ভিড়টা তখনো চুপ। কথা বলল শুভ, 'ঠিক আছে স্যার, আমরা বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু আপনাদের সিদ্ধান্তর জন্য আমরা ঠিক পনের মিনিট অপেক্ষা করব।'

'ঠিক আছে, পনের মিনিট না আরো বেশি তা দেখা যাবে, এখন সব বাইরে যাও।'

সবাই বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু কেউ চলে যায়নি, প্রিন্সিপালের ঘরের বাইরে মাটিতে বসেই সবাই অপেক্ষা করছিল। তাদের ক্লাসের তীর্থ গান গাইছিল—

ওরা আমাদের গান গাইতে দেয় না
নিগ্রো ভাই আমার পল রোবসন

গানের সাথে গলা মেলাচ্ছিল অনেকে।

মিনিট দশেক পরে প্রিন্সিপালের ঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলেন হিস্ট্রির সুকান্তবাবু আর ইংলিশের হীরকবাবু, সুকান্তবাবুর হাতে একটা তালা। আনন্দে ফেটে পড়ল গোটা কলেজ, চেঁচামেচিতে কান পাতা দায়। লাফাতে-লাফাতে গোটা ভিড়টা ছুটল ইউনিয়ন রুমের দিকে। ইউনিয়ন রুমের ভেতরে ওরা জনা ছয়-সাত বসেছিল। সুকান্তবাবু ইউনিয়ন রুমে ঢুকলেন, গোটা ভিড়টা চুপ। গৌতম তার কানে-কানে বলল, 'ভাল কথায় না বেরোলেই মারতে শুরু করব, তৈরি থাকিস।'

'তোমরা ইউনিয়ন রুমের বাইরে যাও। ইউনিয়ন রুমে তালা দেওয়া হবে।' সুকান্তবাবুর কথায় ওরা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাল, তারপর আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এল। ভিড়টা সরে গিয়ে ওদের বেরিয়ে যাবার জায়গা করে দিল। সে ছিল একটু পেছনের দিকে, ওরা বেরিয়ে যাবার সময় সে দেখল যারা ইউনিয়ন রুমের ভেতর ছিল, তাদের মধ্যে অন্তু নেই। এভাবে অন্তুকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেতে দেখলে সে বড় খুশি হত। কে একজন পেছন

থেকে মন্তব্য করল, 'যাবার সময় একবার 'যুগ যুগ জিও' বলে যাও।'

এতক্ষণ চুপ করে থাকা ভিড়টা এবার হেসে উঠল। স্যাররা যতক্ষণ তালা লাগাচ্ছে তার মধ্যেই একটা বেঞ্চ জোগাড় করে শুভ বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে। কিন্তু কেমন একটা বাঁধভাঙা আনন্দ সবার মধ্যে, কেউই বিশেষ বক্তৃতা শুনছে না। সে শুনতে পেল শুভ বলছে, '...গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিধানসভা ভেঙে দেওয়া আর শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানের দাবিতে আজ ইউনিভার্সিটি লনে ছাত্র সমাবেশ ডাকা হয়েছে, চলুন আমাদের এই জয়ের সংবাদ নিয়ে আমরাও সেই সমাবেশে যোগ দিই।'

হঠাৎ অশোক চেঁচিয়ে উঠল, 'বন্দিমুক্তির দাবি নেই কেন?'

'তোমার কী মনে হয়, গণতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার দাবির ভেতরে বন্দিমুক্তির ব্যাপার নেই?' বেঞ্চ থেকে না নেমেই শুভ উত্তর দিল।

'না দাবিটা নির্দিষ্টভাবেই করা উচিত।'

'নির্দিষ্টভাবে দাবি জানালে আরো হাজারটা দাবিও নির্দিষ্টভাবে জানানো উচিত।'

অদ্ভুতভাবে কাঁধটা ঝাঁকিয়ে অশোক ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল, সঙ্গে আরো জনা ছয়েক। আর কিছুক্ষণ পর শুভ আর কুশল কলেজ গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল বাসস্টপের দিকে, ওদের সঙ্গে জনা পনের ছেলেমেয়ে। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাকি ছেলেমেয়েরাও যেন কিছুটা হতভম্ব, ব্যাপারটা ঠিক এভাবে শেষ হবে এটা যেন কেউ ভাবেনি। ভিড়টা আস্তে আস্তে হালকা হয়ে এল। সে তখনো একা দাঁড়িয়ে।

একদম ছোটবেলায় খুব অভিমান হলে বুকের কাছটায় কেমন যেন ব্যথা করে উঠত। এতদিন পরে তার আবার বুকের কাছটা ব্যথা করে উঠল, একটা তীব্র অভিমানে। ভিড়ের মধ্যে যাবার আগে শুভ একবার তাকে ডাকলও না, এমনকী একবার তাকে খুঁজবার চেষ্টাও করল না। আজ সঙ্গে অনেককে পেয়ে তার কথা শুভ ভুলে গেল?

কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মনে হল সে একদম বাচ্চা ছেলেদের মতো ভাবছে। এটা কী অভিমান করার সময়? আর শুভ যদি তাকে না ডাকে দোষ তো তারই, কবেই বা সে শুভর ডাকে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু একটা চাপা অভিমানের অনুভূতি কিছুতেই তাকে ছাড়ছে না। সে এই মুহূর্তে আর কলেজে থাকতে চায় না, সে চায় কিছুক্ষণ একা থাকতে।

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নামছিল গায়ত্রী, হাত তুলে তাকে দাঁড়াতে বলল।

'ক্লাস আজ আর হবে না, বাড়ির দিকে যাবি নাকি?'

সে এমনিতেই ভাবছিল কলেজ ছেড়ে বেরোবে, সে কোনো কথা না বলে গায়ত্রীর সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে।

গেট পেরিয়ে রাস্তার ওপাশে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াল দুজন। গায়ত্রীই বলল, 'কী রে, এ রকম একটা বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে আছিস কেন?'

'কই কিছু না তো?'

'একটু আগে প্রিন্সিপালের ঘরে এত লাফাচ্ছিলি, এখন একদম চুপচাপ। শুভদের সঙ্গে মিটিংয়ে গেলি না?'

'দেখছিসই তো যাইনি।'

'তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, গেলি না কেন?'

'এমনিই।'

'তোর তো সব প্রশ্নেরই এক উত্তর—এমনিই।'

সে কোনো কথার উত্তর না দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ হাসতে-হাসতে গায়ত্রী বলল, 'তুই কেন মুখ গোমড়া করে আছিস তা আমি জানি।'

কোনো কথা না বলে সে অবাক হয়ে তাকাল গায়ত্রীর দিকে।

'শুভ তোকে ডাকেনি বলে।'

সে ভীষণ বিস্মিত হয়ে ভাবল, গায়ত্রী তার মনের কথা বুঝল কী করে। ভিড়ের মধ্যে গায়ত্রী ছিল কি না তাও সে দেখেনি। কিন্তু গায়ত্রী ছিল এবং গায়ত্রীর নজর ছিল তার দিকে। কিন্তু তার যে বাচ্চাদের মতো অভিমান হয়েছে সে ব্যাপারটা গায়ত্রী ধরে ফেলায় সে বেশ লজ্জা পেয়ে গেল। মুখে বিরক্তির ভাব ফুটিয়ে সে বলল, 'ধ্যাৎ'।

গায়ত্রী হাসল হো-হো করে, 'দেখ চাঁদু তুই নিজেকে যা চিনিস, আমি তোকে তার থেকে বেশি চিনি। মুখে তুই যতই পাকা-পাকা হাবভাব করে ঘুরে বেড়া, আসলে তুই এখনো বাচ্চা আছিস।'

'ঠিক আছে, আমি বাচ্চা আর তুই বুড়ি পিসিমা।'

গায়ত্রী হাসল আরো জোরে জোরে।

'গায়ত্রী, তুই গেলি না কেন মিছিলে?'

'আমি আবার কবে এসবের মধ্যে থাকি?'

'কেন তুই এসব সমর্থন করিস না?'

'ও মা করব না কেন, যারা ওই মিছিলে গেল তাদের অনেকের থেকে বেশি করি। তবে আমাকে তো দুটো ফ্রন্টে লড়াই করতে হয়। একটা লড়াই তো আমাকে নিজের জন্য নিজেকে করতে হয়। আর আমি বুঝেছি, দুটো লড়াই আসলে এক। তাই আমাকে কাউকে ডাকতে হবে না। যে দিন দরকার বুঝব, নিজেই মিছিলে চলে যাব। তাছাড়া একটা জিনিস টাইপ করতে দিয়েছি নিতে হবে।'

'কী আবার টাইপ করাচ্ছিস?'

'ইউ বি আই ক্লার্ক নেবে তাতে অ্যাপ্লাই করছি।'

'তোর তো এখনো বি এস-সি হতে অনেক দেরি?'

'ওরা তো হায়ার সেকেন্ডারি চেয়েছে।'

'তো পেয়ে গেলে আর পড়বি না?'

'তোর কী ধারণা বি এস-সি পাস করে এর থেকে ভাল কিছু পাওয়া যাবে। তুইও অ্যাপ্লাই কর না।'

'আমি? পাগল?'

'এতে পাগলের কী আছে, সবাই দিচ্ছে।'

'ওরে বাবা আমার দ্বারা ওসব হবে না।'

'না রে, তুই যা ভাবছিস সে রকম কঠিন কিছু না, আমি ওদের মডেল কোশ্চেন পেপার দেখেছি। সিম্পল ইংরেজি, অঙ্ক আর জেনারেল নলেজ।'

'কী বললি? ইংরেজি? তুই জানিস না আমি হায়ার সেকেন্ডারিতে দু-পেপার মিলিয়ে আটষট্টি পেয়েছিলাম? তার ওপর আবার দু-বছর ইংরেজির সাথে কোনো টাচ্ নেই।'

'বোকার মতো কথা বলিস না। তোর কী ধারণা যারা ব্যাঙ্কের ক্লার্ক হয় তারা তোর

থেকে ভাল ইংরেজি জানে? আরে কী আর হবে, ম্যাক্সিমাম চান্স পাবি না, পোস্টাল অর্ডারের দশটা টাকা নষ্ট হবে। আমিও ধরে রেখেছি এবারটায় হবে না। দু-একটা এ-রকম কম্‌পিটিটিভ পরীক্ষা দিলে বোঝা যাবে ব্যাপারটা কী রকম, তারপর ভাল করে ট্রাই করব।'

সে এবার হাসতে-হাসতে বলল, 'পাব না এটা আমার ভয় না, আমার ভয় যদি পেয়ে যাই।'

'ও মা তাতে ভয় কী?'

'বুঝবি না গায়ত্রী, বুঝবি না। এই ধর কত কী হব ভাবছি। কিন্তু একবার চাকরি পেয়ে গেলাম তো হয়ে গেল। চিরকালের জন্য ব্যাঙ্কের ক্লার্ক। আর মনে-মনে অন্য কিছু হওয়া যাবে না।'

'কে তোকে অফিসারের চাকরি দেবে রে?'

'কাউকে দেবার দরকার হয় না তো, আমি নিজে নিজেই হয়ে যাই।'

'ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে?'

'ঘুমোবার কী দরকার, চেষ্টা করলে জেগে জেগেই হওয়া যায়। আচ্ছা গায়ত্রী তুই কোনো দিন এ সব ভাবিস না।'

ভোরের আলোর মতো সুন্দর একটা হাসি ছড়িয়ে পড়ল গায়ত্রীর গোটা মুখে। সে আবার অনুভব করল গজ দাঁত থাকায় গায়ত্রীর হাসিটা বড় মিষ্টি। সেই হাসিটা ধরে রেখেই গায়ত্রী বলল. 'ভাবব না কেন? আমাদের হিস্ট্রির শকুন্তলাদি, কী ভালো লাগে আমার! যখন নাইন টেনে পড়তাম তখন ভাবতাম ও রকম প্রফেসার হব। সাদা খোলের টাঙ্গাইল পরব, একটা ভারি ফ্রেমের চশমা থাকবে। কী দারুণ! ধ্যুৎ অনার্সটাই পেলাম না।'

'হয়ে যা, মনে-মনে ও রকম হয়ে যা। দেখবি ওই সময়টুকুই ভাল আছিস।'

'তুই মনে-মনে কী হচ্ছিস।'

'একেক সময় একেক রকম। ধর, এখন আমি কী চাইছি—আমি থাকব পাহাড়ের ওপর একটা ধপধপে সাদা বাংলোয়। নীচ দিয়ে বয়ে যাবে একটা পাহাড়ি নদী। নদীর জল হবে সবুজ মেশানো আকাশি নীল। আমি হাঁটু পর্যন্ত টানা একটা চামড়ার বুট আর ক্যামুফ্লেজ রঙের জ্যাকেট পরে ভোরবেলায় শিশিরভেজা ঘাস মাড়িয়ে তিতির পাখি শিকার করতে যাব।'

খিলখিল করে হাসতে হাসতে গায়ত্রী বলল, 'ওই ড্রেসে তোকে যা লাগবে না!'

'আরে ধুর্, আমি কী তখন এ রকম কালো রোগা টিংটিঙে পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চি থাকব নাকি? আমি তখন ছ ফিট, দাড়ি কাটার পর গালটায় ফুটে উঠবে হালকা একটা নীল আভা। আমার চিবুকটা থাকবে মাঝখান থেকে কাটা, হাতে স্টেট এক্সপ্রেস নিয়ে আমি যখন সামনের দিকে তাকাব তখন সবাই ভাববে ছেলেটা বোধহয় একটু অহঙ্কারী। যাবি গায়ত্রী আমার সঙ্গে?'

'কী করে যাব? আমার এই চেহারা দেখে তো তোর বাংলোয় ঢুকতেই দেবে না।'

'আমার মতো পাল্টে নিবি তুই নিজেকে?'

হাসিহাসি মুখে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে কী রকম হতে হবে?'

'তুই হবি একটা পুতুলের মতো, যেন মোম দিয়ে তৈরি। একটু রোদে থাকলে তোর গালটা লাল হয়ে উঠবে। তোর আঙুলগুলো হবে নরম আর ঠাণ্ডা। পা পর্যন্ত লোটানো একটা

হালকা গোলাপি রঙের গাউন তুই পরে থাকবি।'

গায়ত্রী বলল, 'চ'।

'যাবি? সত্যি যাবি?'

'আরে, কী পাগল রে, কে তোর হাবিজাবির কথা বলছে। বলছি বাস আসছে, চ।'

'না তোকে দিয়ে কিছু হবে না গায়ত্রী, দিলি মুডটা অফ করে।'

'আমি ভাবছি তোর কী হবে চাঁদু? আসলে তোর একটা কড়া গার্জিয়ান দরকার। বাচ্চারা বাজে কথা বললে, মা'রা যেমন চড় মেরে বলে—একদম বাজে কথা বলবে না। সে রকম সেও তোকে মাঝে-মাঝে চড় মেরে বলবে—একদম বাজে কথা ভাববে না।'

সে হাসতে-হাসতে বলল, 'সে রকম গার্জিয়ানই বা পেলাম কোথায়?'

তার মাথায় আলতো করে একটা চাঁটি মেরে গায়ত্রী বলল, 'নে ফার্স্ট ইনস্টলমেন্টটা মেরে দিলাম।'

বাস থেকে নেমে তার প্রথমেই চোখে পড়ল, রেশনের দোকানের পাশের ভাঙা ঝুপড়িটা যেটা আগে তেলেভাজার দোকান ছিল, সেটাকে নতুন চাটাই দিয়ে সারানো হয়েছে। সেটার সামনে একটা বাঁশে পার্টির পতাকা টাঙানো, আর হাতে লেখা পোস্টারে লেখা হয়েছে—পার্টি অফিস। তার মানে পার্টি আবার ফিরে এল। কিন্তু এই মুহূর্তে এ ব্যাপারটা তাকে কোনো উৎসাহ জোগাল না। বাসে আসতে-আসতে সে সারাক্ষণ ভেবেছে গায়ত্রী যা বলল তা কি ঠিক—সত্যিই কি গায়ত্রী তার মনের সব কথা বুঝতে পারে। তার রঙিন আকাশের নীচের জগৎটার খোঁজও কি গায়ত্রী পেয়ে গেছে? গায়ত্রী কি সব জানে? তাকে জানে, তিশিকে জানে, জানে তিশিকে নিয়ে তার সমস্ত স্বপ্নের কথা। সে বোধহয় ধরা পড়ে গেছে। কেমন যেন একটা চাপা ভয়ে সে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

বাড়ি ফিরে কেবল জামাটা খুলেই সে শুয়ে পড়ল বিছানায়। আর কিছুক্ষণ পরেই সে নিজেকে আবিষ্কার করল, একটা অদ্ভুত নীল কাচে ঢাকা রাস্তায় তিশির সাথে। রাস্তার দু পাশে আলোয় মোড়া উজ্জ্বল শো রুম। যথারীতি সে জানে না এটা কোনো জায়গা, শুধু জানে এটা ননীমাধব দে লেন নয়, কলকাতাও নয়, এখনকী এটা দেশের কোথাও নয়, হয়ত পৃথিবীর কোথাও না। সে খুশি তিশি আবার ফিরে এসেছে। আজ দুপুর থেকেই সে জানে তিশি ফিরে আসবে, কারণ দুপুর থেকেই তার চিরস্থায়ী ভাল না লাগাটা ফিরে এসেছে—যেটা সে হারিয়েছিল ইলেকশনের রেজাল্ট বেরোনোর রাতে।

খাতার কাগজ কিনতে সে লালার দোকানে এসেছিল। ফেরবার সময় সে হঠাৎই খেয়াল করল, তার সামনে হেঁটে যাচ্ছে যে লোকটা, সে আসলে সুবীরদা। তাদের ছোটবেলার পাড়ার হিরো সুবীরদা। সুবীরদার গোলে পাড়ার টিম খেলায় জিতত, সুবীরদার ঘুষিতে মুখ ফেটেছিল কলাবাগনের কাল্টুর। তারপর একদিন অনেকের সাথে সুবীরদাও পাড়া ছাড়া। সে বেশ চেঁচিয়েই সুবীরদাকে ডেকেছিল। তার ডাক শুনে পেছন ফিরতে প্রথমেই সে যেটা আবিষ্কার করল কেমন যেন বুড়িয়ে গেছে সুবীরদা, একটু যেন কুঁজোও হয়ে গেছে। তাকানো দেখেই সে বুঝেছে সুবীরদা তাকে চিনতে পারেনি। অবশ্য ছ বছর পার হয়ে গেছে, চিনতে তাকে নাই পারে। সে একদম কাছে গিয়ে বলল, 'কী গো, আমায় চিনতে পারছ না,

আমি চাঁদু, নিশীথ চৌধুরীর বড় ছেলে।

'তুই চাঁদু? তোদের চিনব কী করে? তোরা সব কত বড় হয়ে গেছিস।' সুবীরদার দিলখোলা হাসিটা একদম পাল্টায়নি। 'তারপর তোদের সব খবর কী রে? মা-বাবা কেমন আছে?

'সে সব ঠিক আছে। তুমি কেমন আছ বলো?'

'আমি ভাল আছি। আর এখন তো সব চেয়ে ভাল আছি, এতদিন পর আবার নিজের বাড়িতে ফিরছি। তারপর বল তোদের খবর কী? তোর ভাইটার খবর পেলাম। তুই কী করছিস?'

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সে সুবীরদার সাথে গল্প করল। সুবীরদাই পাড়ার সবার খোঁজ নিচ্ছিল। সুবীরদা গোটা পাড়ার খোঁজ নিলেও তার দরকার একজনের খোঁজ, অনেক কথার পর সে সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আচ্ছা সুবীরদা অসীমদার খবর কী?'

তাকে কিছুটা বিস্মিত করে সুবীরদা জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো অসীম?'

'অসীম মজুমদার, যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। তোমার মনে নেই? তুমিই তো নিয়ে এসেছিলে, আমাদের বাড়িতে অনেক দিন ছিল।'

এবার সুবীরদার মনে পড়ল, 'ও, যাদবপুরের অসীম, না রে ওর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ নেই। লাস্ট শুনেছিলাম বম্বেতে আছে, ও. এন. জি. সি-তে নাকি বড় চাকরি করছে।'

সে কেবল একটা কথাই বলেছিল, 'তুমি ঠিক জানো সুবীরদা?'

'হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে পড়ত এ রকম একজনই বলছিল।'

বাকি রাস্তাটা সে একাই ফিরেছিল, মনে-মনে কথাটা বার কয়েক উচ্চারণ করতে-করতে—অসীমদা ও. এন. জি. সি-তে বড় চাকরি করে। যেন এই সহজ বাংলা বাক্যটার মধ্যে কোথাও একটা মারাত্মক ভুল লুকিয়ে আছে। তাকে ভুলটা খুঁজে বার করতে হবে, করতে হবে এক্ষুনিই, কারণ তা না হলে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। সে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আছে। সে আস্তে-আস্তে কথাটা আবার নিজের ভেতরে উচ্চারণ করে। তাকে এক্ষুনি ছুটে যেতে হবে সুবীরদার কাছে, তাকে দেখিয়ে দিতে হবে—কী মারাত্মক ভুল সুবীরদা করেছে! অসীমদা কেন ও. এন. জি. সি-তে চাকরি করতে যাবে? হাতে রাইফেল নিয়ে অসীমদা এখনও শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করছে। জিনারেল গিয়াপ কি কখনও যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে পারে? তার কৈশোর থেকে যৌবনের এই গোটা সময়টা সে অসীমদার জন্য অপেক্ষা করে আছে। আর আজ সুবীরদা তাকে বলে গেল অসীমদা আর আসবে না, এটা সে কী করে মেনে নেবে?

ছোটবেলায় ছোটমামা পুজোর সময় তাকে আর ছোটকে দুটো করে টাকা দিত। পুজোর অনেক আগে থেকেই সে ভাবতে বসত এবার টাকাটা নিয়ে কী-কী করবে। পুজো যত এগিয়ে আসত, বাড়ত তার উত্তেজনা। যেবার ছোটমামার টাইফয়েড হল, সেবার ষষ্টির দিন খবর এল ছোটমামা আসবে না। ছোট রাগ করে চায়ের প্লেট ভেঙে মা'র হাতে মার খেল, আর সে ষষ্টির সন্ধেটা একা একা বারান্দায় বসে কেঁদে কাটিয়ে দিল। তারপর মা তাদের দুজনকে একটা করে টাকা দিয়েছিল। আজও এক উৎসবহীন সন্ধ্যায় সে বসে আছে বারান্দায় একভাবে। অথচ সে ঠিক জানে না অসীমদার কাছ থেকে তার কী চাইবার ছিল।

আজ নিজেকেই সে প্রশ্ন করছে—সে কী ভেবেছিল, তার সব মুক্তি অসীমদা তাকে এনে দেবে? তার যন্ত্রণা, তার ভয়, তার অসহায়তা সব কিছু থেকে মুক্তি এনে দেবে অসীমদা? সে নিজে জানে না তা কখনো হয় না—মুক্তি নিজেকে আনতে হয়। রঙিন আকাশের জেলখানা থেকে কী করে সে মুক্তি পাবে? জানে নিজের ক্ষমতায় সে তা পারবে না, গায়ত্রীও তাকে সে মুক্তি দিতে পারছে না, তার কেন যেন মনে হয়েছিল অসীমদাই পারবে তাকে রঙিন আকাশের আঙিনা থেকে জোর করে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনতে।

অসীমদা তাকে লড়াইয়ের গল্প শুনিয়েছিল, লড়াই করতে শেখায়নি। সে ঠিক জানে না দোষটা কার, তার নিজের না অসীমদার। কিন্তু একটা কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না—তাহলে তার সঙ্গে অসীমদার পার্থক্য কোথায় রইল? সে তো লড়াইয়ে নামতেই পারেনি এখনো। কিন্তু অসীমদা তো লড়াইয়েই ছিল, সে কেন লড়াই থেকে পালাল? সে আর অসীমদা কি আসলে একই সত্তার দুটো রূপ? কিন্তু এটা মেনে নিতে তার ভেতর থেকে বাধছে। সে নিজের পরাজয় তো মেনেই নিয়েছে, কিন্তু অসীমদা হার সে কী করে মেনে নেবে? অসীমদা তো তার সব কল্পনার নায়ক, অসীমদা তার জেনারেল গিয়াপ। অসীমদা হেরে গেলে আর কেউ কোনোদিন এই যুদ্ধে জিতবে না।

তার এখন কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে এ লড়াইটা বোধহয় তাদের জন্য না। এ লড়াইটা আসলে চা বাগানের ছাঁটাই মজুর শুখরামদের, এ লড়াইটা শুভর বিনয়কাকু আর সুশীল মাস্টারদের, এ লড়াইটা শুভর সিধুদার যে, নিজের মেয়ে তাকে চিনতে পারে না, এই দুঃখ ভুলে বোমা বাঁধতে পারে। আর তাদের মতো যারা, তারা কেবল বাইরের থেকে কোলাহল বাড়াতে পারে, কেউ তার মতো সন্ধ্যার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেবল কল্পনায় স্রোতে ভাসতে পারে, আর কেউ উল্কার মতো একটা কিশোরের কাছে জেনারেল গিয়াপ হয়ে আবার ও. এন. জি. সি-র চাকরির মধ্যে হারিয়ে যায়। কিন্তু এই বারান্দায় আসবার আগে সে দেখে এসেছে আলনায় ছোটর ঘামে ভেজা শার্টটা ঝুলছে, আজ সকালে সে শুভকে দেখেছে এক দল ছেলেকে নিয়ে মিটিংয়ে যেতে—এ সব কি একটা ভুল? এরা কি সবাই শুধু কোলাহল বাড়ানোর জন্য এসেছে? অসীমদার বিশ্বাসের গভীরতা পরিমাপ করার কোনো সুযোগ তার ছিল না, কিন্তু শুভর বিশ্বাসের গভীরতা কতটা আর কেউ না জানুক সে তো জানে। শুধু কয়েকদিনের ভিড় বাড়ানোর জন্য এতটা দরকার হয়? কোনো প্রশ্নের উত্তরই তার জানা নেই, কে উত্তর দেবে তাও সে জানে না। কিন্তু সে এটুকু জানে আজকের পর থেকে সে আরো অসহায়, আরো দুর্বল হয়ে যাবে। হয়ত এটাই নিয়ম—একটা অসীমদা হারিয়ে যাবে কিন্তু শূন্যতা ভরিয়ে দিতে উঠে আসবে শুভ আর ছোটরা। কিন্তু কোনো কিছুই তার অসহায়তা কমাবে না। একটা অসীমদার হারিয়ে যাওয়া, একটা তার মতো অকিঞ্চিৎকর মানুষের লড়াইয়ে শামিল না হওয়াতে বিপ্লবের কিছু যায় আসে না, পার্টির কিছু যায় আসে না, কিন্তু তাদের তো একটাই জীবন, সেটা নষ্ট হলে আর কী থাকে? পার্টি কেন তার জন্য অপেক্ষা করে না, যে হারিয়ে গেল তাকে কেন পার্টি খোঁজে না? কেউ কি কাল সকালে তাকে ডেকে বলবে—আয় চাঁদু তোর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, তোকে আমাদের দরকার। কেউ কি তাকে বলবে, আমরা এমন এক বিপ্লবের কথা ভেবেছি, যে বিপ্লব এমন একটা সমাজের জন্য যেখানে প্রত্যেকের নিজস্ব যন্ত্রণা, হতাশা আর অসহায়তাকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হবে। পার্টি কেন শুধু সমষ্টির কথা ভাববে, কেন তার মতো ব্যক্তির কথা

ভাববে না।

বিকেল থেকে মাথাটা ধরেছিল। কেন জানি এটা তার প্রায়ই হয়। কিন্তু এখন মাথা ধরাটা ভীষণই বেড়ে গেছে। সে বসে আছে তার বারান্দার কাঠের চেয়ারে, সামনে পুরনো সন্ধ্যার ননীমাধব দে লেন। সে একবার ভাবল বারান্দা ছেড়ে ঘরে চলে যাবে। কিন্তু ঘরে গিয়েই বা সে কী করবে। অঙ্ক করবে? বলে কাগজ কিনতে গিয়েছিল, এক দিস্তা নতুন কাগজ পড়ে আছে পড়ার টেবিলে, অঙ্ক করার কথা এই মুহূর্তে সে ভাবতেই পারছে না। মা রান্নাঘরে আর রান্নাঘরের চৌকাঠে বসে ছোট বোধহয় খাচ্ছে—না ছোটর সাথে কোনো কথা তার এই মুহূর্তে বাকি নেই। মার সাথে কথা বলা যায়, কিন্তু কী কথা বলবে? মার সাথে কথা বলতে গিয়ে তার আজকাল কেমন একটা অপরাধবোধ হয়, মনে হয় মার কাছ থেকে সে সত্য লুকিয়ে রাখছে। যখন সে ছোট ছিল, রঙিন আকাশের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলাটা ছিল তার কাছে একটা খেলার মতো, কিন্তু আজ সে বোঝে চাক বা না চাক তাকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে এবং সে দিনটা খুব দূরে নয়। আর সে বোঝে বাস্তবটা কল্পনার থেকে হাজার যোজন দূরের। সময়ের ডাক না শুনে সে যে নিজেকে আলাদা জগতে আটকে রেখেছে এর জন্য সে লজ্জিত। সে সবাইকে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু মা? মাকেও সে প্রতারণা করছে।

পাড়ার আড্ডায় যাওয়া যায়, কিছুক্ষণ কেটে যাবে, কিন্তু তার যন্ত্রণা বা মাথা ধরা কোনোটাও তাতে কমবে না। গায়ত্রী কোথায় কে জানে—হয় টিউশন অথবা রান্নাঘরে। একমাত্র ছিল শুভ যার কাছে সে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে পারত, কিন্তু শুভ এখন কোথায় তা সে জানে না, আর আজ দুপুরের পর থেকে শুভ কোথায় সে আর কোনোদিনও জানতে পারবে না। গভীর হতাশার মধ্যে জন্ম নেয় যে তীক্ষ্ণ অনুভূতি সেই অনুভূতি দিয়ে সে বুঝেছে শুভর সাথে আজকের পর থেকে তার চিরকালের ছাড়াছাড়ি, আজ থেকে তার আর শুভর রাস্তা আলাদা। শুভ তার জন্য আর অপেক্ষা করবে না। কেনই বা করবে, শুভকে ডাকছে পার্টি, শুভকে ডাকছে বিপ্লব।

কিন্তু সে তাহলে কোথায় যাবে? কার কাছে যাবে? তিশি ছাড়া আর কেউ নেই যে তাকে এই যন্ত্রণা থেকে ছুটি দিতে পারে। এক অদ্ভুত বিষাক্ত নীল কুয়াশার মতো তিশি তাকে ডাকছে, হোক না বিষাক্ত সেখানেই তার আনন্দ, সেখানেই তার সব পাওয়া। কিন্তু এভাবে সে বাঁচতে চায় না, সে আর একবার চেষ্টা করতে চায়। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেট বার করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল প্যাকেটটা ফাঁকা, অর্থাৎ এক ঘণ্টায় সে ছটা সিগারেট খেয়েছে। কিছু না ভেবেই শার্টটা গলিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে এল। মা জিজ্ঞাসা করল—কোথায় বেরোচ্ছিস। 'এই আসছি', বলে সে রাস্তায় নামল।

যথেষ্ট গরম আজ, বাইরে তাও কিছুটা হাওয়া আছে। রাস্তায় হাঁটতে তাই খারাপ লাগছে না। পাড়ার মোড়ে যথেষ্ট ভিড়, দোকানপাট জমজমাট। বাসগুলোয় বেশ ভিড়। সে পকেট থেকে পয়সা বার করে ভাল করে গোনে, তারপর সেই পয়সায় পাঁচটা চারমিনার কেনে। সিগারেটের দোকানের পাশেই নতুন পার্টি অফিস। একবার তার মনে হল একটা সিগারেট ধরাবে। কিন্তু অনেকগুলো সিগারেট খাওয়ায় মুখটা কেমন বিস্বাদ হয়ে গেছে, তাছাড়া মনে মনে সে হিসাব করে, যা পয়সা আছে তাকে তাতে গোটা সপ্তাহ চালাতে হবে, এত সিগারেট খেলে শেষে বিড়ি খেতে হবে। তার বিড়ি খেতে একদম ভাল লাগে না।

উল্টোদিকে কাদের বাড়িতে প্রচণ্ড জোরে রেডিয়ো চালিয়েছে—কাজেই যথেষ্ট চেঁচিয়েই তাকে ডাকতে হচ্ছিল। কয়েকবার ডাকার পর দোতলার বারান্দায় এসে গায়ত্রী উঁকি মারল। তাকে দেখে নেমে আসল নীচে।

'কী রে চাঁদু?'

'ব্যাঙ্কের অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা দে।'

গায়ত্রী কিছুটা অবাক হয়েই তার দিকে তাকাল। তারপর গেটের ষাট-পাওয়ারের আলোর নীচে দাঁড়িয়ে গায়ত্রী হাসল গোটা সন্ধ্যাটাকে আলোকিত করে, গজদাঁত থাকায় সে হাসিটা বড় সুন্দর।

'আজ তো দিতে পারব না রে, টাইপ মেসিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কাল সকালে দেবে বলেছে। পেলেই আমি তোকে গিয়ে দিয়ে আসব। তুই দুটো পাসপোর্ট সাইজের ছবি তুলে রাখিস। আর দশ টাকার পোস্টাল অর্ডার লাগবে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তোর কাছে আছে টাকা?'

সে অনির্দিষ্টভাবে উত্তর দিল, 'সে জোগাড় করে নেব।'

গায়ত্রী তাড়াহুড়ো করে বলল, 'না না শোন, তুই আমার থেকে টাকাটা নে, পরে দিয়ে দিস।'

সে বোঝে গায়ত্রী ভয় পাচ্ছে, যদি টাকার কথা ভেবে সে অ্যাপ্লিকেশনটা না করে।

গায়ত্রী বলে যায়, 'শোন কলেজে তো ক্লাস বিশেষ হচ্ছে না। দুপুরে তোর বাড়িতে আমি চলে যাব, বইপত্র আমি জোগাড় করে রাখব। দুজনে মিলে একসাথে পড়ব। দুজনে মিলে চেষ্টা করলে অন্তত একজনের ঠিক হয়ে যাবে।'

মাথাটায় দপ করে উঠল রাগটা। নিজের প্রতি রাগ। মনে মনে সে নিজেকেই বলল 'শুয়োরের বাচ্চা'।

গায়ত্রীর কথাটার কোনো উত্তর না দিয়েই সে চলে এল।

সে ভেবেছিল ফিরে এসে একা-একা বসে থাকবে বারান্দায়। নিজের সে পরীক্ষা নেবে, সারাক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবে কিন্তু একবারও মাই হেভেনের দিকে তাকাবে না। কিন্তু দেখল ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদল ছেলের সাথে কথা বলছে। ছোট বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর ছেলেগুলো রাস্তায়। বাধ্য হয়েই সে বসল পড়ার টেবিলে। নতুন কাগজ আর ক্যালকুলাস বইটা টেনে নিল সামনে। এবং অপ্রত্যাশিতভাবেই প্রথম কয়েকটা অঙ্ক সহজে হয়ে গেল। কিন্তু শেষ অঙ্কটা করার সময়ই তার আবার মনে হল তার মাথাটা ধরেছে এবং পরের অঙ্কটায় সে গেল আটকে। বৃথাই সে মিনিট পাঁচেক অঙ্কটা করার চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সে শেষমেশ ঘরের আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। আর অন্ধকারের সঙ্গে-সঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল গোটা সন্ধ্যার চিন্তার ঝড়টা যেটাকে সে আপ্রাণ এড়াতে চেয়েছিল।

খেতে বসে সে দুটো রুটি খেয়েই উঠে পরেছিল। মাথা ধরাটা এখন কেমন একটা অস্বস্তিতে পরিণত হয়েছে, অল্প-অল্প গা গুলোচ্ছে। মা জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে কী হল, কিছু খেলি না? শরীর খারাপ নাকি?'

'না, কিছু হয়নি', বলে সে উঠে পড়ল। সে নিজেকে এখন যথেষ্ট ভয় পাচ্ছে। সচরাচর সে রাতে খাবার পর সিগারেটটা খায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে', আজ সে সিগারেটটা খেল খাটে বসে। পড়ার বই নিয়ে বসার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। মশারি টাঙিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

ছোটর সামনে পরীক্ষা। সারা দিন ধরে ছোট যাই করুক রাতে অনেকক্ষণ পড়ে। ঘরে লাইটটা জ্বলবে, কিন্তু তার অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে, মনে হয় ঘুমিয়ে পড়তে পারবে।

তার ঘুম এল না। তার মাথার অস্বস্তিটা বাড়ছেই। তার যে কেমন লাগছে সেটা সে বলে বোঝাতে পারবে না, কারণ তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কষ্টটা কোনো শারীরিক কষ্ট না। বিছানায় চুপচাপ শুয়ে যন্ত্রণাটা সহ্য করার চেষ্টা করে গেল। কিন্তু তার প্রতিরোধও দুর্বল হয়ে আসছে। মায়ের ঘরের বড় ঘড়িতে বারোটা বাজল। সে প্রায় লাফিয়ে উঠল বিছানায়, তারপর হুড়মুড় করে মশারি তুলে বেরিয়ে এল। তাকে এভাবে বেরোতে দেখে ছোট তার পড়া থামিয়ে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। ছোটকে ওভাবে তাকাতে দেখে তার সম্বিত ফিরল, এবং সে অনুভব করল হঠাৎ এভাবে কেন সে বার হল সেটা সে নিজেও জানে না। কিছুটা লজ্জিত হয়েই সে বাথরুমের দিকে চলে গিয়েছিল। তাদের বাথরুমে চৌবাচ্চার জলটা রাতে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। সে মগে করে ঠাণ্ডা জল নেয় তারপর মাথায় সেই জল ঢালতে শুরু করে। জল চুল স্পর্শ করা মাত্র তার ভেতর থেকে কেমন একটা কাঁপুনি দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি মগটা ফেলে দিয়ে সে পিছিয়ে এল কয়েক পা, জলটা দেখেই তার ভয় লাগছে। বারান্দায় এসে বারবার সে গামছা দিয়ে মাথাটা মুছল, তার কেন যেন মনে হচ্ছে জলটা কিছুতেই যাচ্ছে না। সে এবার সচেতনভাবে আস্তে-আস্তে এসে শুয়ে পড়ে। সে ছোটর দিকে তাকায়নি কিন্তু সে জানে ছোট তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঘুম আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, কিন্তু সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। আরো অনেক পরে ঘরের আলো নিভলে সে বোঝে ছোট ঘুমোতে আসছে।

শোয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বোধহয় ছোট ঘুমিয়ে পড়ল, পাশে শোয়া কেউ ঘুমিয়ে পড়লে ঠিক টের পাওয়া যায়। সে তাও কয়েক মিনিট চুপ করে শুয়ে থাকে, তারপর সাবধানে মশারি তুলে বেরিয়ে আসে। তাদের জানালার পাশেই ল্যাম্পপোস্ট তার আলো তাদের পড়ার টেবিলে এসে পড়ছে। সে ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা ধরায়। গোটা পাড়াটা নিস্তব্ধ, রাস্তাটাও ফাঁকা। তাকে বেরোতে দেখে রাস্তার দুটো কুকুর তাদের বারান্দার সামনে এসে লেজ নাড়তে শুরু করেছে। সিগারেটটা শেষ করে জ্বলন্ত টুকরোটা সে ছুঁড়ে মারল কুকুর দুটোর দিকে। না, একটার গায়েও লাগেনি। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল আজ বোধহয় পূর্ণিমা, আকাশটা ভেসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নায়, তাদের এই জনশূন্য ননীমাধব দে লেনও কেমন একটা আলো আর অন্ধকারের নকশায় সেজে উঠেছে। আর সেই জ্যোৎস্নার আলোয় ধব্‌ধবে সাদা মাই হেভেনকে মনে হচ্ছে বরফে ঢাকা এক আশ্চর্য রাজপুরী। তিশির ঘরে পর্দার ওপারে নীল ডিমল্যাম্পের আলো, নীল কুয়াশায় আলোকিত অন্ধকারে তিশি ঘুমোচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ তার সন্দেহ হচ্ছে, সে যা দেখছে তা আসলে নেই, মাই হেভেন নেই, তিশি নেই, কর্নেল চ্যাটার্জি নেই। বরং এই জ্যোৎস্না-ধোয়া রাতে ফিরে এসেছে শৈশবের সব আনন্দের আধার সেই মাঠটা। আবার পুজোর প্যান্ডেল হবে, মা স্বপ্ন-স্বপ্ন নীল শাড়িটা পরে অঞ্জলি দিতে যাবে। এখন তো সাদা বেগুনি আকন্দ ফুল ফুটেছে, উজ্জ্বল হলুদ রঙের শিয়ালকাঁটা ফুলের ওপর উড়ছে একই রঙের প্রজাপতি। সে দেখতেই পাচ্ছে কাপাস গাছটা থেকে কাপাস ফুল ফেটে সাদা-সাদা তুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। সে আপন মনেই হাসে, নীরব হাসিতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু চোখের সামনে থেকে মাই হেভেনকে সে তাড়াতে পারে না। কিন্তু মাই

হেভেনকে চিরকালের মতো সরিয়ে দিতে পারলে সে আবার তার হারিয়ে যাওয়া আনন্দ ফিরে পাবে। হঠাৎ তার মনে হল, এটা এমন কী কঠিন কাজ, চাইলেই তো চিরকালের জন্য মাই হেভেনকে সে সরিয়ে দিতে পারে।

সে লাফিয়ে বারান্দার রেলিংটা টপকে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। কয়েক পা হেঁটেই সে পৌঁছে যায় মাই হেভেনের গেটের কাছে। সে বুকের আড়াআড়ি ঝোলানো ক্যানভাসের ব্যাগটার ওপর হাত বুলিয়ে বাইরের থেকে গ্রেনেডগুলো অনুভব করে। তার বাঁ কাঁধে ঝুলছে ৯ মিমি উজি সাবমেসিনগানটা, এটা শত্রুপক্ষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া। সে প্রথমে একটু দাঁড়িয়ে ভাবে, কী ভাবে ঢুকবে ভেতরে? গুলি করে ভেতরের তালাটা ভাঙা তার কাছে কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এই রাত্রে পাড়ার ভেতরে প্রথমেই এতটা হই চই ফেলতে তার কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। সে গেটটার সামনে এসে আস্তে করে গেটটা ঠেলে এবং বিস্মিত হয়ে দেখে গেটটা তার সামান্য চাপেই খুলে গেল। আজ বাড়ির লোকেরা বাইরের গেটে তালা দিতে ভুলে গেছে, কারণ অনেক দিনই বারান্দায় বসে সে মাই হেভেনের গেটে তালা লাগানোর আওয়াজ পায়। সামনের লনটাও জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। লন পার করে বড় কাঁচের দরজা, সে দরজাটাও খোলা। দরজার ওপারের হলঘরে একটা অদ্ভুত লাল আলো জ্বলছে। তার পায়ে রবারের সোলের জুতো, সামান্যতম আওয়াজও হবে না, কারণ সে নিশ্চিত কেউ একটা জেগে আছে। তা না হলে দরজা খোলা থাকত না, আলো জ্বলত না। তার শুধু একটাই ভয়, তিশি যেন জেগে না থাকে। তিশি ঘুমিয়ে থাক, সে চায় না তিশি এই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডটা দেখুক। তার কাজ শেষ হলে সে তিশির ঘরে যাবে, প্রাণভরে দেখবে ঘুমন্ত তিশিকে। গোলাপি ফ্রিল দেওয়া বালিসের চারিদিকে ছড়িয়ে থাকবে তিশির চুল। সে হাঁটু গেড়ে বসবে তিশির খাটের পাশে, কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখবে সাবমেসিনগানটা, আস্তে আস্তে মুখটা নামিয়ে এনে স্পর্শ করবে তিশির অন্ধকারের মতো চুল। তারপর মুখটা সেই অন্ধকারে ডুবিয়ে দিয়ে প্রাণভরে নিশ্বাস নেবে তার জীবনের প্রথম অক্সিজেনে। তিশি জানবেও না সে এসেছে। তিশি তখনই জাগবে যখন সে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রথম বার ঘুমন্ত তিশিকে চুমু খাবে। তারপর তিশির হাত ধরে বেরিয়ে আসবে মাই হেভেনের দরজা দিয়ে আর পর মুহূর্তেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উড়ে যাবে বাড়িটা, তারা ফিরেও তাকাবে না।

সে খুব সাবধানে দরজার চৌকাঠটা পার হল। সামনের জানালার দিকে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে পেছন করে, তাই সে যে ঢুকেছে সেটা লোকটা টের পায়নি। সাদা একটা স্লিপিং গাউনে ঢাকা লোকটার প্রশস্ত পিঠটা সে দেখতে পাচ্ছে। সে ভাবল, কিচ্ছু না, কেবল সাবমেসিনগানের ট্রিগারটা টিপলেই কর্নেল চ্যাটার্জি শেষ, শেষ তার প্রথম কাজ।

'আরে এসো, তোমার জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি।' আওয়াজটায় গমগম করে উঠল গোটা হলঘরটা। আর সে বিস্মিত হল, কথাটা বলা হয়েছে একটা অসম্ভব বন্ধুত্বপূর্ণ স্বরে। কথাটা বলতে-বলতে তার দিকে লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। সেই কবে এক অষ্টমীর সকালে লোকটাকে সে প্রথম দেখেছিল। এখন বয়স বেড়েছে, রগের কাছে চুলগুলো কিছুটা সাদা হয়েছে, চেহারাটাও ভারিক্কি হয়েছে। শুধু কমেনি তার পুরুষালি সৌন্দর্য আর অহঙ্কারী ভঙ্গি।

কিন্তু লোকটার কথা শুনে সে কিছুটা হতভম্ব হয়ে যায়, সে এ রকমটা কখনো ভাবেনি। লোকটা তার দিকে এগিয়ে আসে দু-পা।

'শোনো আমি ইচ্ছে করেই কোনো লোকজন ডাকিনি, এই সই-সাবুদের সময় সাক্ষী

থাকার খুব একটা দরকার নেই।'

সে গোটা কথাটার কোনো মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে অস্ফুটভাবে জিজ্ঞাসা করে—'কীসের সই?'

লোকটা তার প্রশ্ন শুনে কিছুটা অবাক হয়ে তাকে বলে, 'কীসের সই, তুমি জানো না? সন্ধির চুক্তি সই, যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে।'

যা ঘটছে গোটাটাই তার কাছে অপ্রত্যাশিত, তারপর কর্নেল চ্যাটার্জির সব কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কোনো যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে?'

'কোনো যুদ্ধ মানে? যুদ্ধ তো একটাই হচ্ছিল।'

তার মনে হচ্ছে লোকটা আজেবাজে কথা বলে তার আক্রমণ এড়িয়ে যেতে চাইছে, তাকে সজাগ থাকতে হবে, পালাবার কোনো সুযোগ সে দেবে না। সে খুব স্পষ্ট করে বলে, 'হ্যাঁ যুদ্ধ একটাই চলছিল এবং সে যুদ্ধ শেষ হয়নি এখনো।'

লোকটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে তাকে বলে, 'আচ্ছা, তুমি এসো আমার সাথে।' লোকটা হলঘরের অন্য দরজার দিকে এগোয়।

সে এবার নিশ্চিত হয় লোকটা পালাবার চেষ্টা করছে। সে দ্রুতগতিতে লোকটার পেছনে এসে দাঁড়ায়। সাবমেসিনগানটার নলটা প্রায় লোকটার গায়ে ঠেকিয়ে। লোকটা ততক্ষণে দরজাটা খুলে ফেলেছে। দরজাটা খুলতেই যে পৃথিবীটা তার চোখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই পৃথিবীটা তার অচেনা। মাই হেভেনের যে দিকটা ননীমাধব দে লেনের দিকে সেদিকে পূর্ণিমা থাকলেও এদিকের আকাশে চাঁদ নেই, এমনকী দিন না রাত তাও বোঝার কোনো উপায় নেই। কেমন একটা অন্ধকার মেশানো আলোতে ঢাকা আছে চারিদিক। মাঝ-আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে একটা অদ্ভুত জিনিস, তার মনে হল বোধহয় একটা জ্যাপোলিন, কিন্তু জ্যাপোলিনটা কুচকুচে কালো, সেখানে কোনো আলোর চিহ্ন পর্যন্ত নেই, জ্যাপোলিনটা স্থির, একফোঁটাও নড়ছে না। সামনে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরটা মরুভূমি কি না সে বুঝতে পারছে না, কিন্তু সেখানে সবুজ বা প্রাণ কিছুই নেই। নেই কোনো চড়াই বা উতরাই, জ্যামিতির বইয়ের মতো সমভূমি, শুধু মাঝেমাঝে সিল্যুয়েটের মতো কিছু ধ্বংসস্তূপ। সবচেয়ে কাছের ধ্বংসস্তূপটাকে সে চেনে, আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে ক্যাটারপিলারটা, ওটা বিধ্বস্ত একটা ট্যাঙ্ক। সে দু-পা এগিয়ে আসে, না কোনো হাওয়া নেই। এখানে বোধহয় সময়ও স্থির হয়ে আছে।

লোকটা বিজয়ীর মতো নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'কই, তোমার যুদ্ধ কই?'

সে জানে না এই প্রশ্নের কী জবাব সে দেবে। যা চোখের সামনে সে দেখছে তাতে পরিষ্কার যুদ্ধ নেই। এ এক পরিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে—কেউ নেই, কমরেডরা কেউ নেই, নেই শত্রুপক্ষের কেউ। কিন্তু সে এখন কী করবে। কোনো কথার উত্তর না দিয়ে সে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

পেছন থেকে লোকটা বলে উঠল, 'কোথায় যাচ্ছ হে, যুদ্ধ শেষ হলে কী হবে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ল্যান্ডমাইন, পা পড়লেই গেলে। আর যুদ্ধ শেষ হবার পর মরলে কেউ শহিদও বলবে না।' লোকটা কথাটা শেষ করল একটা ব্যঙ্গের হাসি দিয়ে।

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না, যুদ্ধ শেষ হয়েছে।'

লোকটা হো-হো করে হাসল, তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'তুমি কেমন সৈনিক ভাবো,

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে তাই তুমি জান না!'

তার প্রথম মনে হল, যাই হোক, সে এবার গুলি চালিয়ে দেবে, সে আর লোকটাকে সহ্য করতে পারছে না। কিন্তু তার ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, সাবমেসিনগানটা তুলে গুলি চালানোর ক্ষমতাও বোধহয় তার আর নেই। সে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি জানেন, কারা জিতেছে যুদ্ধে?'

'এখনো কেউ জেতেনি।'

'তাহলে? যুদ্ধ তো চলবে।'

'হ্যাঁ, তা চলবে, কিন্তু সে যুদ্ধ এখানে হবে না, এই যুদ্ধক্ষেত্রে হবে না। অন্য কোথাও হবে, অন্যভাবে।'

সে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে?'

'তা কী করে হবে, তুমি যাদের হয়ে যুদ্ধ করছিলে তারাই তোমাকে নিয়ে যায়নি, আমি কী করে তোমায় নিয়ে যাব?'

'তাহলে আমার কী হবে?'

'সে আমি জানি না। তুমি নিজেই জান না কখন যুদ্ধক্ষেত্র পাল্টে গেছে। তোমার কমরেডরাও তোমাকে ডেকে নেয়নি, আসলে নতুনভাবে যুদ্ধ করার যোগ্যতা বোধহয় তোমার নেই, তুমি নষ্ট হয়ে গেছ। তোমাকে দেখে আমার সেই জাপানি সৈনিকের কথা মনে হচ্ছে, যে মালয়ের জঙ্গলে তিরিশ বছর ধরে লুকিয়ে ছিল। বাইরের জগতে যে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে সে জানতই না। খুঁজে দেখো, যদি নতুন যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে তা বার করতে পারো।'

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে কারণ সে সত্যিই জানে না, এখন সে কোথায় যাবে। অনেকক্ষণ পর ছোটর গলার আওয়াজে সে পেছনের দিকে তাকায়, 'কী হয়েছে তোর, তুই কী সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবি?'

ছোটর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'কিছুতেই ঘুম আসছে না রে।'

সকালে সে ভেবেছিল কলেজে যাবে না সারাদিন বাড়িতেই পড়বে, পরীক্ষাটা সত্যিই একদম ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে। কিন্তু দুপুরে ভাত খাবার পর তার মনে হল সারাদিন বাড়িতে বসে থাকাটা ভীষণই বোর, যাই একবার কলেজে ঘুরে আসি।

ক্লাস হচ্ছে না, কাজেই কলেজ মানে ক্যান্টিন। অনার্সের ছেলেরা অবশ্য অনেকেই লাইব্রেরিতে থাকে। কিন্তু তার লাইব্রেরিতে কোনো কাজ নেই। কিন্তু ক্যান্টিনে আড্ডা মারার কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে, গৌতমের বাড়ি কাছেই, ও প্রায় রুটিন করেই দুপুরে একবার কলেজে আসে। সেকেন্ড আর থার্ড দুটো ইয়ারেরই সামনে পরীক্ষা, কাজেই কলেজ

ফাঁকাফাঁকা। ক্যান্টিনে ঢুকেই তার চোখ পড়ল তাদের পুরনো টেবিলে একদল ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেমেয়ে বসে আছে। গোটা ক্যান্টিনটার দিকে চোখ বুলিয়ে সে দেখবার চেষ্টা করল চেনাশোনা কে আছে। তখনই তার চোখ পড়ল, যাকে সে এই মুহূর্তে এখানে প্রত্যাশা করেনি—শুভ। কোণের দিকে একটা টেবিলে বসে শুভ খাচ্ছে। বেচারার বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে, গোগ্রাসে পাউরুটি আর ঘুঘনি খাচ্ছে। সে শুভর সামনে গিয়ে বসল।

'তোরা সব কোথায় রে?' শুভর চোখ-মুখের হাসিই বলছে তাকে দেখে শুভ খুশি হয়েছে, খুবই খুশি হয়েছে।

'কে আর এখন ক্যান্টিনে আড্ডা মারতে আসবে, সবাই পরীক্ষার জন্য পড়ছে।'

'সবাই খুব পড়াশুনো করছে?'

'শুভ, তুই পরীক্ষা দিবি না?', সে জিজ্ঞাসা করল।

'মনে হচ্ছে এ বছরটা দিতে পারব না।' একটু ইতস্তত করে শুভ বলল।

'এ বছর পারবি না, নাকি কোনো বছরই আর পারবি না?'

শুভ অদ্ভুতভাবে হাসল, 'যাক গে, ছাড় ওসব।'

সে না ছেড়েই জিজ্ঞাসা করল, 'তোর এই সিদ্ধান্ত বাবা-মাকে জানিয়েছিস?'

শুভ মাথা নাড়ল। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোর মাসি জানে?'

'ও, তোকে বলা হয়নি, আমি আর মাসির বাড়িতে থাকছি না, পার্টি কমিউনে চলে এসেছি।'

'সেটা আবার কোনো জায়গা?'

'ঐ পার্টির হোলটাইমারদের একটা মেস মতো, পার্টিই চালায়। আমার অবস্থা শুনে পার্টি ওখানে থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

'তাহলে সাধারণের মতো আর জীবন-যাপন করছিস না?'

'এর মধ্যে আবার অসাধারণত্ব কী দেখলি?'

'অসাধারণ না? পরীক্ষা দিচ্ছিস না, পার্টির মেসে থাকছিস, এটা সাধারণ কেউ তো করে না।'

'সে আর কী করব বল, আমাকে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে।'

'আচ্ছা শুভ তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, বল রাগ করবি না।'

কোনো কথা না বলে শুভ তার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে রইল।

'আচ্ছা শুভ, তুই তো পার্টি করার জন্য তোর ক্যারিয়ার বাড়িঘর সবই ছাড়ছিস, কিন্তু কোনোদিন যদি তোর মনে হয় যা করেছিস তা সব ভুল, তবে কী করবি?'

শুভ পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ এই প্রশ্নটা করছিস কেন?'

'তোকে আমি অনেকবার অসীমদার গল্প করেছি। খবর পেলাম অসীমদা নাকি পার্টি করা ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরি করছে।'

অসীমদা আর পার্টি করে না এই খবরে শুভর কোনো ভাবান্তর হল না, 'হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে, অনেকেই ভয় পেয়ে যায়।'

সে শুভর একদম চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকে পার্টি করা ছাড়ে কি কেবল ভয় পেয়েই?'

তার চোখের ওপর চোখ রেখে শুভ বলল, 'না', তারপর হাসতে-হাসতে বলল, 'তোর

কী হয়েছে রে চাঁদু, সমানে আউট অব্‌ সিলেবাস্‌ প্রশ্ন করে যাচ্ছিস?'

'তুই কিন্তু প্রশ্নের উত্তরটা দিলি না।'

'হতে পারে একটা সময় গিয়ে একজন ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাসের সাথে তাল রাখতে পারল না।'

'তখন কী হবে?'

'কী হবে আমি জানি না, তবে ভাল কিছু হবে না।'

'তাহলে তুই যা করছিস তা তো এক ধরণের জুয়া খেলা।'

'না, কারণ যা অনিশ্চিত তা নিয়ে জুয়া খেলা যায়, কিন্তু আমার বিশ্বাসের মধ্যে কোনো অনিশ্চয়তা নেই।'

'যদি বিশ্বাসটাই ভুল হয়?'

'এখনো পর্যন্ত আমার বিশ্বাসটা আমার কাছে ধ্রুব সত্য। আর তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই তোর কথাই ঠিক, একদিন গিয়ে মনে হবে বিশ্বাসটাই ভুল, তাহলেও কোনোদিন মনে হতে পারে এই ভয়ে সারা জীবন বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের প্রান্তে হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব, কিছু করব না?'

সে চুপ করে থাকে, শুভ বলে যায়, 'চাঁদু, তোর কাছে তো আমি কোনোদিন কিছু কথাই লুকোইনি, তোকে আমি বহুদিন বলেছি—বেঁচে থাকার অন্য রাস্তাটা আমার পছন্দ না। তুই যে কথাটা আসলে জিজ্ঞাসা করছিস তার সব উত্তর আমারও জানা নেই। আজকের বিশ্বাসের সঙ্গে কালকে তাল মেলাতে পারব কি না তা আমিও জানি না। কিন্তু আজকের জন্য আমার কাছে আমার বিশ্বাসটা নির্ভুল।'

'তাহলে এখানেও অনিশ্চয়তা?'

'তা বলতে পারিস, কিন্তু এই অনিশ্চয়তা ডালহৌসি স্কোয়ারের দশটা পাঁচটার নিশ্চয়তার থেকে ফার বেটার।'

'তোর বিশ্বাস যদি ঠিক হয়, তবে তার সঙ্গে অনিশ্চয়তা কেন?'

'তা তো থাকবেই, কারণ কী বিশ্বাস করছিস সেটা একমাত্র ব্যাপার না, কে বিশ্বাস করছে সেটাও বড় ব্যাপার। বিশ্বাসটা ঠিক, কিন্তু যে বিশ্বাস করছে সে যদি ঠিক না হয়, তাহলেই তো গণ্ডগোল।'

'ঠিক বিশ্বাস ঠিক মানুষ তৈরি করে না?'

'একশ বার করে। কিন্তু সেটা একটা কন্‌টিনিউয়াস প্রসেস। কখনোই বলা যায় না—ব্যস ঠিক হয়ে গেছে। আসলে আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষ ব্যাপারটাই বেশ গোলমেলে। মানুষ আসলে কী চায় সেটা সবসময় বোঝা যায় না। কখনও কখনও মানুষ খুবই চেনা। সে কী করবে সব বোঝা যায়। কিন্তু কখনও কখনও সেই মানুষই কেমন সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে যায়। আসল অনিশ্চয়তাটা বোধহয় এখানেই।'

'কেন তুই নিজেকে চিনিস না?'

এবার শুভ হাসতে শুরু করল, হাসতে-হাসতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কী সব উপনিষদ-মার্কা ফিলোসফিকাল প্রশ্ন করছিস? তোর অসীমদার খবর শুনে বোধহয় খুব আপসেট হয়ে গেছিস? তুই যাই বল চাঁদু, এটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু না। একজন পারল না তো কী হয়েছে, সে জায়গায় আরো হাজার জন আসছে। তুই বিষয়টা টোটালিটিতে দেখ, একজন ব্যক্তিকে

দিয়ে দেখিস না।'

'তোরা বড় নিষ্ঠুর শুভ। একটা মানুষের তো একটাই জীবন।'

'ইতিহাস তো বিচার করবে টোটালিটি দেখেই।'

'সাধারণ একজন মানুষের কাছে নিজের অস্তিত্ব থেকে ইতিহাস কখনো বড় না।'

'ইতিহাসকে বড় করে দেখতে পারলেই এ সব অপ্রয়োজনীয় ইমোশনের থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, আমাদের সবার সেটাই চেষ্টা করা উচিত। যাক্ এসব বাদ দে, বল তোর প্রিপারেশন কেমন হল?'

সেও হাসতে-হাসতে জবাব দিল, 'আমি ফেল করার জন্য অলওয়েস প্রিপেয়ার্ড। কিন্তু আসল কথা বল, কবে যাচ্ছিস দিল্লিতে, শালিনীর কাছে?'

একটা রহস্যজনক হাসি দিয়ে শুভ বলল, 'এক্ষুনি যাচ্ছি না, তবে চিঠি দিয়েছিলাম, চিঠির উত্তর পেয়েছি।'

'শুভ তুই কী ছেলে রে, আসল কথা চেপে গেছিস। বল, কী লিখেছিস, ও কী উত্তর দিয়েছে?'

'আমি কী লিখেছি? একদম দু-হাত তুলে স্যারেন্ডার করেছি। যাকে বলে আত্মসমালোচনা, আত্মসমর্পণ, ক্ষমাপ্রার্থনার এক অমর দলিল। তুই বিশ্বাস করবি না চাঁদু, নিজের লেখা পড়ে আমি নিজে হতবাক, আমি নিজে কী করে এত ন্যাকা-ন্যাকা চিঠি লিখলাম আমি নিজেই জানি না।'

সে খেঁকিয়ে উঠল, 'দেখ শুভ বেশি পাকামো করিস না, তুই যা করেছিস তোকে জুতো মারা উচিত।'

'বলে যা, বলে যা, কাদায় পড়লে কারা যেন কাদের লাথি মারে?'

'আসল কথা বল, ও কী লিখল?'

'প্রচণ্ড গালাগাল দিয়েছে আমায়, বলেছে অন্য কেউ যে কথা অনেক সহজে বোঝে, আমি বোকা বলে সে কথা বুঝতে আমার অনেক বেশি সময় লেগেছে।'

'কী আনন্দ, অবশেষে একজন সত্যি কথাটা বলেছে।'

রাগের ভঙ্গি করে শুভ বলল, 'তুই একটা শুয়োর। তারপর পরীক্ষা দিচ্ছি না শুনে সেকেন্ড ইন্‌স্টলমেন্টে গালাগাল। তারপর অবশ্য লিখেছে—রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো কথা ভাবার আমার দরকার নেই, বাকি ব্যাপারগুলো ওই আমার হয়ে ভাবতে পারবে।'

'ও ভাবা যাচ্ছে না। কী রোমহর্ষক অমর প্রেমের গল্প। পরের পার্টে নায়ক বিপ্লবী জামাই বনাম ভিলেন আই এ এস শ্বশুরের লড়াই। যাক্ গে, আর কী লিখেছে বল?'

আমতা-আমতা করে শুভ বলল, 'আর কী লিখবে?'

'গ্যাস দিস না শুভ, আরো লিখেছে। বল তুই আমাকে বলবি না।'

একটা লাজুক হাসি দিয়ে শুভ বলল, 'এক লাথি মারব তোকে।'

কাউন্টার থেকে দীপকদার গলার আওয়াজ, 'এই চাঁদু অফিসে তোর টেলিফোন।'

টেলিফোন এবং তার? সে প্রচণ্ড অবাক। কে তাকে টেলিফোন করবে? এবং কলেজে? সে যে কলেজে আছে এটাই বা কে জানল? এসব ভাবতে ভাবতেই সে অফিসের দিকে চলল। কলেজে একটাই টেলিফোন, সেটা থাকে ক্যাশ কাউন্টারের পাশে, প্রিন্সিপালের

ঘরের ঠিক বাইরে। পুরোনো আমলের কালো টেলিফোনটা হাতে নিয়ে হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা, 'হ্যালো, চন্দ্রশেখর বলছ?'

গলাটা শুনে তার মনে হল অপরিচিত কেউ, আর পরিচিত কেউ তাকে চন্দ্রশেখর বলে না, চাঁদুই বলে। সে উত্তর দিল, 'বলছি।'

ওপারের গলাটা আবার ভেসে আসল, 'তুমি আমায় চিনবে না, আমি নিশীথদা মানে তোমার বাবার সাথে কাজ করি। নিশীথদা হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ওনাকে আমরা বি আর সিং-এ নিয়ে এসেছি, তুমি এক্ষুনি চলে এসো।'

বিষয়টা তার কাছে এতটাই আকস্মিক সে ঠিক বুঝে উঠতে পারল না যে, সে কী বলবে, সে যন্ত্রর মতো উত্তর দিল, 'ঠিক আছে।'

ওপাশ থেকে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি চিনতে পারবে বি আর সিং হসপিটাল? শিয়ালদা থেকে রাজাবাজারে যেতে ডান দিকে পড়বে।'

সে হ্যাঁ বলামাত্র ওপাশ থেকে টেলিফোনটা রেখে দিল।

টেলিফোনটা রেখে সে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে ঠিক বুঝতে পারছে না, তার এখন কী করা উচিত। প্রথমেই তার মনে হল যে টেলিফোন করছে তাকে আরো কয়েকটা কথা তার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল—বাবা অসুস্থ মানে কতটা অসুস্থ। লোকটা বলল, 'এক্ষুনি চলে এসো', এর মানে কী? তাহলে কি বাবার খারাপ কিছু হয়েছে? আরো যেটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি, মাকে কি খবর দেওয়া হয়েছে? সে কী করবে, বাড়ি গিয়ে মাকে খবর দিয়ে তারপর হাসপাতালে যাবে, নাকি সরাসরি চলে যাবে? আবার তার মনে হল বাবার বন্ধুরা হয়ত মাকেও খবরটা দিয়েছে। কিন্তু যে ফোন করেছিল, তার নামটা একবার জিজ্ঞাসা করলে হত। হতেও তো পারে এসব কিছু না, আসলে কেউ তার সাথে চ্যাংড়ামো করছে।

করিডোর দিয়ে ফিরতে-ফিরতে সে ভাবছিল, সে কী করে শিয়ালদা যাবে। বাসে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে, সে কি একটা ট্যাক্সি নেবে? কিন্তু এত টাকা তার কাছে নেই, কারোর কাছ থেকে ধার নেবে? এতটা টাকা কী তার খরচ করা উচিত? ক্যান্টিনে ঢুকে তার চোখে পড়ল, টেবিলে শুভর সাথে গৌতমও বসে আছে।

তাকে দূর থেকে দেখে শুভ উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে?'

সামনে পুজো আসছে, রাস্তাঘাটে অসম্ভব জ্যাম। ট্যাক্সি নিয়েও অনেক সময় লাগছে। শিয়ালদাতে ফ্লাইওভার তৈরি হচ্ছে, তাতে জ্যামটা আরো বেশি। তারা বাধ্য হয়েই মৌলালির পরে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল। আসবার সময় শুভ দীপকদার কাছে থেকে টাকা নিয়ে এসেছিল, ও-ই ট্যাক্সির ভাড়াটা দেয়। অসম্ভব একটা ভিড় ঠেলে ওরা তিনজন এগোল।

রাত প্রায় পৌনে নটা, সে বসেছিল হাসপাতালের বাইরে চায়ের দোকানে বেঞ্চিতে একা। গৌতম গেছে মা আর ছোটকে বাড়ি পৌঁছে দিতে, রাতে ফিরবে না বলে শুভ গেছে কমিউনে খবর দিতে। বাবার দুজন বন্ধুও আছে রাতে থাকবে। সে এতক্ষণ বসে ছিল তাদের সঙ্গেই, হাসপাতালের করিডোরের একটা লম্বা বেঞ্চিতে। একটা আলো না জ্বলায় করিডোরটা আধা অন্ধকার। কোনো হাওয়া করিডোরটায় ঢোকে না, আর হাসপাতালেরই

বোধহয় কিছু স্টাফ্ এক কোণে বসে আড্ডা মারছে। তাদের বিড়ির গন্ধর সাথে মিশে যাচ্ছে ওষুধ আর একটা পচা গন্ধ, যার উৎস সে জানে না। মাথাটা ভারী-ভারী লাগছে, আর তার সাথে গা-গোলানি। কিছুটা বাধ্য হয়েই সে এসে বাইরে বসে আছে।

গত কয়েকটা ঘণ্টা তার কেটে গেছে ঝড়ের মতো। এখনই সে চুপচাপ বসতে পেরেছে। ডাক্তারির সে কিছুই জানে না, কিন্তু ডাক্তারদের হাবভাবেই সে বুঝেছে অবস্থা ভাল না। বাবা যদি সুস্থ হয়েও যায় কোনোভাবেই আগের অবস্থায় ফিরবে না। সে ভাবছিল সবচেয়ে খারাপ সম্ভাবনাটা। সে কী করবে? এ রকম একটা ভাবনার কোনো নির্দিষ্ট অভিমুখ থাকে না। এলোমেলো চিন্তাগুলো তাকে আরো অসহায় করে দিচ্ছে। এ অবস্থাতেই কথাটা তার হঠাৎ মনে হল, সে শুধু নিজের কথাই ভাবছে। হাসপাতালের বেডে বাবা শুয়ে আছে, অজ্ঞান, অক্সিজেন চলছে। যদি বাবার জ্ঞান আর কখনো না ফিরে আসে এটা ভেবে সে শুধু নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবছে। বাবার জন্য তার কোনো দুঃখ হচ্ছে না। একমাত্র বিকেলে মা যখন হাসপাতালে ঢুকেছিল কাঁদতে-কাঁদতে তখনই তার কান্না পাচ্ছিল। সেটা বোধহয় মার জন্য, বাবার জন্য না। সে কি তাহলে বাবাকে ভালবাসে না? নিজের বাবার প্রতি একজন সন্তানের যে অনুভূতি থাকা উচিত, তা কি তার নেই? কথাটা ভেবেই সে একবার চারিদিকে তাকিয়ে নিল। যেন তার ভয় হল, সবাই বুঝে ফেলবে তাকে। চায়ের দোকানে সে ছাড়া আর তিনজন। বৃদ্ধ চাআলা, আর খরিদ্দার বলতে একজন মোটামতো মাঝবয়সী মহিলা আর তার সাথে কথা বলছে লুঙি পরা একটা লোক। না, এরা কেউই তাকে লক্ষ করছে না।

এক ছাদের নিচে দুজন থাকতে হলে সামান্য যে টুকু কথা বলতে হয় তার বাইরে কোনো কথা বাবার সাথে তার দীর্ঘদিন হয়নি। বাবা থাকলে ও ঘরে সে বিশেষ ঢোকে না, আর মাস দুয়েক আগে ছোটর যখন জ্বর হয়েছিল, তখন বোধহয় শেষবার বাবা তাদের ঘরে ঢুকেছিল। সে ভেবেছিল, এই মানুষটাকে বাদ দিয়েই তার চলে যাবে। কিন্তু হাসপাতালের বেডে সংজ্ঞাহীন মানুষটা হঠাৎ তার সমস্ত অধিকার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার মুখোমুখি। সে কী জবাব দেবে? নিজের কাছ থেকে সে কোথায় লুকোবে—সে তো মানুষটাকে অপছন্দ করত। হাজারটা বিষয়ে তার বাবার প্রতি অভিমান, বাবার প্রতি তার রাগ। কিন্তু আজ শিয়ালদার জনবহুল রাস্তাকে সাক্ষী রেখে সে অনুভব করছে, কখন যেন নিজের বাবার প্রতি ন্যূনতম অনুভূতিটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে হচ্ছে কাজটা সে ঠিক করেনি।

তার আর ছোটর বড় হওয়ার গোটা প্রক্রিয়াতে বাবা অনুপস্থিত। তারা কীভাবে বড় হবে, কোনো লক্ষ্য সামনে রেখে বড় হবে, না, বাবা তাদের কিছুই বলেনি। চারশ বাহাত্তর পেয়ে সে যখন কলেজের দরজায়-দরজায় ঘুরে বেরাচ্ছে, লজ্জায় অপমানে দুঃখে হতাশায় সে শেষ হয়ে যাচ্ছে, বাবা এসে তার খোঁজও নেয়নি। তার এক সময় মনে হত সে যদি বাড়িতে আর কোনোদিন না ফেরে, লোকটা তার খোঁজও করবে না। কিন্তু সেই মানুষটাকে অসহায়ের মতো হাসপাতালের বেডে পড়ে থাকতে দেখে আজ তার মনে হচ্ছে আসল অপরাধ তো তারই। তার যা স্বাভাবিক ভবিষ্যৎ পরিণতি, যার প্রতি চূড়ান্ত ঘেন্না, নিজের অজ্ঞাতেই সে বোধহয় তা দেখতে পেত বাবার মধ্যে। আর তাই তার কোনো স্বপ্নে সে কখনো বাবাকে দেখেনি। কিন্তু সে তো একবারও ভাবল না, এই মানুষটাও একদিন স্বপ্ন দেখত আর হাজার লোকের মতো বুকের ভেতরে পাথরের মতো দুঃখকে চেপে রেখে, লোকটা বাধ্য হয়েছিল প্রতিদিন সকল নটা তিনের নৈহাটি লোকাল ধরতে। আর তার পরও

যদি কোনো স্বপ্ন মানুষটার থাকত তবে, তা ছিল তাকে আর ছোটকে কেন্দ্র করে। আর প্রতিদিনকার পালিয়ে যাওয়ার স্বপ্নে সে মানুষটার পরিচয়ই অস্বীকার করে গেল। বাবা কি তা বুঝতে পেরেছিল? শত হলেও সে তো সন্তান, শত হলেও সম্পর্কটা রক্তের, সে কি ধরা পড়ে গিয়েছিল বাবার চোখে? আর সব বুঝে বাবা নিজে সরে গিয়েছিল তার জীবনের থেকে। স্টেশনের দিকে ছুটে যাওয়া এই জনস্রোত তাকে লক্ষ করছে না, কিন্তু তার মনে হচ্ছে এ সব কিছুর থেকে লুকিয়ে পড়তে পারলেই সে সবচেয়ে খুশি হবে। তার প্রতিটি স্বপ্নে সে কর্নেল চ্যাটার্জিকে ডেকে এনেছে, বাবা সেখানে অনুপস্থিত। সে নিজের পিতৃপরিচয় অস্বীকার করেছে, সে অপরাধী।

কিন্তু এখন সে আর কী করতে পারে। চাইলেও সে এক ফোঁটা চোখের জল বাবার জন্য ফেলতে পারবে না। সে আর ফিরে যেতে চায় না, হাসপাতালের আধা-অন্ধকার করিডোরে। এই মুহূর্তে সে তিশির কথা ভাবার মতো পাপ করতে পারবে না। সে চোখ বুজে খুঁজবার চেষ্টা করে অর্জুন গাছটাকে, সে গিয়ে বসতে চায় পাথরের চাতালটায়। নদীর জল এই অন্ধকারেও লাফিয়ে নামছে পাথরের ওপর, সে সেই আওয়াজ শুনতে চায়। ওটাই তার জন্মস্থান। সে সবার কাছে ক্ষমা চাইতে চায়। কিছুক্ষণ আগে যেটা ছিল একটা ভোঁতা যন্ত্রণা, সেটাই এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মাথার ভেতরে একটা তীব্র অস্বস্তি।

সে যেখানে বসে আছে সেখান থেকে নদীটা দেখা যায় না। অবশ্য ওটাকে নদী না বলে একটা কদাকার খাল বলাই ভাল। মাঝখান দিয়ে জলের যে ধারাটা বয়ে যাচ্ছে সেটার রঙং প্রায় কালো, কিন্তু সেই জলে পৌঁছতে গেলে কাদা ভাঙতে হয় অনেকটা', কাদাটাও জলের মতোই। এক কোণে কোনো একটা জন্তুর পচা ফুলে ওঠা মরা, তার ওপর চলছে কাকেদের ভোজ। বাঁধানো ঘাটের অধিকাংশটা জুড়েই মাটির হাঁড়ির ভাঙা টুকরো আর আধপোড়া খড়। সবাই বলেছিল ইলেকট্রিক চুল্লির কথা কিন্তু সেখানে লোডশেডিং। বাধ্য হয়ে এখানে।

সে বসে আছে সিঁড়িটার ওপর। তার সামনের বড় বাঁধানো উঠোনের মতো জায়গাটায় জ্বলছে তিনটে চিতা। একটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। যেখানে সে বসে আছে সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে লাইনে সার দিয়ে শোয়ানো আছে শবগুলো। প্রায় তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর বাবার চিতাটা জ্বালানো হয়েছে মিনিট পনের আগে। সামনেই জ্বলছে বাবার চিতা। দেওয়াল ঘেঁষে দুজন মহিলা বসে বিড়ি খাচ্ছে, আর একজন আর একজনের চুল থেকে উকুন বাছছে। তাদের সামনে বসে একটা বাচ্চা এনামেলের বাটি থেকে কী যেন খুঁটে-খুঁটে খাচ্ছে। এরা বোধহয় ডোমেদের পরিবার। বাপ্পা তাকে একটু আগে ডেকেছিল চা খেতে, সে যায়নি। গোটা রাস্তাটা জুড়ে নাকে এসেছিল অগুরু সেন্টের গন্ধ, তার মনে হচ্ছিল আসলে এটাই মৃত্যুর গন্ধ। কিন্তু এখানে আসার পর নাকে আসছে যে গন্ধটা সেটাই আসলে মড়া পোড়ার গন্ধ। চারিপাশে অনেক লোক, তাদের কাউকে সে চেনে, অধিকাংশকেই সে চেনে না। হতে পারে এরা অন্য মৃতদেহর সঙ্গে এসেছে, অথবা বাবার অফিসের লোকজন। সে শুধু ভিড়ের মধ্যে একবার ছোটকে খুঁজবার চেষ্টা করেছিল। না এই ভিড়টার মধ্যে ছোট নেই।

অনেকগুলো জ্বলন্ত চিতার ওপর দিয়ে যে আকাশটা চোখে পড়ছে সেটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে। আকাশের দিকে তাকাতে গিয়েই সে প্রথম বিষয়টা নজর করল। চিতার

আগুনের শিখাটা যেখানে রংহীন হয়ে গিয়ে মিশে যাচ্ছে হাওয়াতে, সেখান থেকেই ছাইগুলো দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে। সে দেখবার চেষ্টা করছিল ছাইগুলো কোথায় যাচ্ছে। কিছুটা উঠে ছাইগুলো ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। কোনো হাওয়া নেই, হাওয়া থাকলে হয়তো ছাইগুলো ভেসে যেত কোনো একটা দিকে। তারপর ছাইগুলো নেমে আসছে নীচের দিকে। সে পরিষ্কার দেখতে পেল সেগুলো এসে পড়ছে চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মানুষগুলোর গায়ে। কিন্তু কেউই সেগুলো ভ্রূক্ষেপ করছে না। তার হাতের তালুর উল্টোপিঠে এ রকম ছাই এসে পড়াতে তার কেমন যেন ঘেন্না করতে শুরু করল। সে তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে ছাইটা ফেলতে চেষ্টা করল, কিন্তু ঘামে চটচটে হাত থেকে সেটা পড়ল না। সে জোরে ফুঁ দিলেও নাছোড়বান্দার মতো ছাইটা আটকে রইল। বরং উড়তে উড়তে আরো কিছুটা ছাই তার গায়ে নেমে এল। সে এবার হাত দিয়ে ছাইগুলো সরাবার চেষ্টা করাতে ছাইগুলো ঘামের সঙ্গে মিশে চামড়ার ওপর লেপটে গেল। কিন্তু ছাই আরো বেশি করে নেমে আসছে। ব্যাপারটা কী তা বুঝবার জন্য সে তাকাল ওপরের দিকে এবং ছাইগুলো এসে পড়ল তার মুখে চোখে। ঘেন্নায় তার গা গোলাতে শুরু করল। চারিদিকের ওপর ছাইয়ের একটা আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে। সারা আকাশ জুড়ে ছাইগুলো নেমে আসছে সিনেমায় দেখা তুষারের মতো। এবং গায়ের থেকে ছাইগুলোকে সরানো যাচ্ছে না। তার মনে হচ্ছে ছাইগুলো রোমকূপের মধ্য দিয়ে শরীরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, আত্মরক্ষা করার কোনো রাস্তা নেই। সে ভাবল ভাল করে জল দিয়ে গাটা ধোয়া দরকার। চাতালের এক কোণে একটা টিউবওয়েল আছে। সে দমবন্ধ করে উঠে গেল টিউবওয়েলটার দিকে। সে নিশ্চিত নিশ্বাস নিলে ছাইগুলো তার ভেতরে ঢুকে যাবে। যে বাচ্চাটা এনামেলের বাটি থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল, সেই বাচ্চাটা প্রায় হ্যান্ডেলটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে জল পাম্প করছিল। জলটা বেরিয়ে আসতেই বাচ্চাটা হ্যান্ডেলটা ছেড়ে নলের মুখে মুখ লাগিয়ে জল খেতে লাগল, আর আতঙ্কিত হয়ে সে দেখল, টিউবওয়েলের নল থেকে যে জলটা বেরোচ্ছে সেটাও ছাই রঙের। বাচ্চাটা অবলীলাক্রমে সেই জল খেয়ে যাচ্ছে। প্রায় বিস্ফোরণের মতো বমিটা বেরিয়ে এল তার পেটের একদম ভেতর থেকে। কেউ একটা তার পিঠে হাত রাখল, কেউ একজন খুব সহানুভূতি নিয়ে বলল, 'আহা রে, বেচারার সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি।'

সে জানে, সব কিছুই পাপের ফল।

বাড়িতে অনেক লোক, তারা কারা সে নজর করে দেখবার চেষ্টাও করছে না। সে সারা শরীর দিয়ে অনুভব করছে, সে খুব ক্লান্ত—চারিপাশের এই সব মানুষগুলোকে আলাদা করে চিনতে যে পরিশ্রম করতে হয় তাও সে করতে রাজি না। তার পড়ার টেবিলের সামনে মাথা নীচু করে সে চুপ করে সারাটা সন্ধ্যা বসে রইল। এক এক করে বন্ধুরা বিদায় নিয়ে গেছে সে কোনো কিছুই নজর করেনি। শুভ যখন বলল ও যাচ্ছে তখনই একবার তার মনে হয়েছিল কী যেন একটা জরুরী কথা শুভকে তার বলা দরকার কিন্তু কিছুতেই সে কথাটা মনে করতে পারল না। সে শুধু শুভকে বলেছিল শুভ যেন সিগারেট কয়েকটা তার জন্য রেখে যায়।

সকালে উঠে সে মনে করার চেষ্টা করল সে কাল রাতে কী করেছিল—কিন্তু কিছুতেই সে মনে করতে পারে না। কখন সে ঘুমিয়েছে, না কী আদপেও ঘুমোয়নি তাও তার মনে

নেই। শুধু মনে আছে তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছিল। মাথাটা তার এখনো ভারভার লাগলেও কালকের মতো যন্ত্রণাটা আর নেই। কিন্তু তার যেটা অবাক লাগছে তা হল গোটা বাড়িটা অদ্ভুত চুপচাপ—টিঙ্কুদের বাড়িতে কে যেন গলা সাধছে, এ ছাড়া কোনো আওয়াজ তার কানে আসছে না, অথচ কাল সন্ধ্যাতে গোটা বাড়িটা জুড়ে ছিল বিরক্তি ধরানো একটা ভিড়। বাথরুমে যেতে গিয়ে সে একবার উঁকি মারল মা'র ঘরে। বিছানায় মা শুয়ে, দরজার দিকে মা'র পা'টা থাকায় সে ঠিক বুঝতে পারল না মা ঘুমোচ্ছে কি না। সে শুধু আশ্বস্ত হল এই ভেবে, আর যাই হোক মা অন্তত কাঁদছে না। রান্নাঘরে ছোট মামিমা বোধহয় চা করছে। অন্যদিন এই সময় বাবা চান করতে যেত, আজ বাথরুম ফাঁকা। মুখে জল দিতে দিতে তার খেয়াল হল ছোট কোথাও নেই। বাথরুম থেকে সে যখন বেরিয়ে আসছে ছোট তখন ঢুকল, হাতে বাজারের থলি।

ঘরে ঢুকে সে মনে করার চেষ্টা করল, এর আগে ছোট কোনোদিন বাজারে গিয়েছিল কি না। সে মনে করতে পারল না। এতদিন ধরে বাবা বাজারে না গেলে সে'ই বাজারে যেত, কিন্তু আজ কেউই তাকে বাজারে যেতে বলেনি। অবশ্য কেই বা বলবে, বললে বলতে পারত মা, কিন্তু মা আজ এসব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। অর্থাৎ বাজারে যাবার সিদ্ধান্ত ছোট নিজেই নিয়েছে, তাকে ছোট ডাকেনি। চা খাবার পর সে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এখন তার কী করা উচিত। বাবা নেই, সেই তো বাড়ির বড় ছেলে—তারই তো সব কিছু করা উচিত। কিন্তু সব কিছুটা কী সেটাই সে বুঝতে পারছে না। শ্মশান থেকে ফিরে আসার পর কেউই তাকে কিছু করতে বলেনি—বোধহয় তার শরীর খারাপ এটা ধরে নিয়ে। এই সকালে সে এখন কী করবে? গতকাল যার বাবা মারা গেছে তার এখন কী করা উচিত? সে কী একবার ওঘরে গিয়ে মা'র কাছে বসবে? তাকে দেখে মা কাঁদবে—সে কী সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করবে? না, এ কাজ তার পক্ষে অসম্ভব—কী করে মা কে সান্ত্বনা দিতে হবে তা সে জানে না। আর সবচেয়ে বড় কথা এ মুহূর্তে সে মা'র সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চায় না। বাবার মৃত্যুতে তার যা অনুভূতি হওয়া উচিত ছিল তা তার হয়নি—একবার সে মা'র সামনে দাঁড়ালে মা বুঝে যাবে। সে মা'র চোখে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ছোটকে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করবে—বল কী করতে হবে? তার মনে হল এটাই বরং ভাল, হোক না ছোট তার ছোট ভাই কিন্তু কাল থেকে যা করবার তা তো ছোটই করছে। মা'র ঘরে কেউ নেই, মা একই ভাবে শুয়ে আছে। বাইরে কোথাও ছোট নেই, রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখল, ছোট মামিমা কী যেন করছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'মামিমা ছোট কোথায়?'

তাকে দেখে মামিমা যেন কিছুটা বিস্মিতই হল, তারপর বলল, 'ও চাঁদু, ছোট তো একটু বেরুলো, পুরুত মশাইকে ডাকতে গেছে। তুই ঘরে বোস, আমি এক্ষুনিই তোর খাবার নিয়ে যাচ্ছি।'

সে আবার ঘরে ফিরে এল। সামনেই তার পড়ার বই-খাতা, একবার মনে হল পড়াশুনো করবে। কিন্তু কাল যার বাবা মারা গেছে আজ তার পক্ষে লেখাপড়া করতে বসাটা বোধহয় বাড়াবাড়ি হবে। কাজেই আগের মতোই সে চুপচাপ বসে রইল। সে এ ঘরেই বসে টের পেল, মা উঠেছে। মামিমা মাকে ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। তার এখন ভয় হচ্ছে মা যদি এবার তাকে ডেকে পাঠায়। মা ফিরে এল ঘরে। কিছুক্ষণ পর মার ঘর থেকে নীচু গলায়

কান্নার আওয়াজও সে পেল, কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। তারপর গোটা বাড়িটা একদম চুপ। কাল রাতে বাড়িতে বেশি লোকজন ছিল তার জন্য সে বিরক্ত হচ্ছিল, কিন্তু এখন এই নীরবতাটা তার অসহ্য মনে হচ্ছে। তার থেকে বেশি অসহ্য মনে হচ্ছে তার এই কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকাটা। একবার সে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, কিন্তু ঘোষাল জেঠুদের বাড়ির বারান্দায় দুজন মহিলাকে দেখে সে আবার ভেতরে চলে এল—কেন যেন তার মনে হচ্ছিল ওরা তাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ তাকে দেখছে এটা ভাবলে তার ভীষণ অস্বস্তি হয়, ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

গায়ত্রী কখন এসেছে সে খেয়াল করেনি। যখন গায়ত্রী তার ঘরে ঢুকছে তখনই সে খেয়াল করল। এই ভীষণ বিরক্তিকর কিছু না করতে পারা সকাল থেকে গায়ত্রী তাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও মুক্তি দিতে পারে—এটা ভেবেই সে খুশি হল। সে বসে ছিল খাটের উল্টোদিকের চেয়ারে। গায়ত্রী এসে দাঁড়াল চেয়ারের পেছনে। সে কোনো কথা বলেনি, সে চাইছিল গায়ত্রীই কথা বলুক আগে। কাল সন্ধ্যায়ও গায়ত্রী ছিল কিন্তু গায়ত্রী কখন চলে গেছে সেটা সে খেয়াল করেনি। গায়ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, বোধহয় গায়ত্রীও চাইছিল আগে সেই কথা বলুক। গায়ত্রী দাঁড়িয়ে আছে তার ঠিক পেছনে। সে প্রায় গায়ত্রীর গন্ধ পাচ্ছে। ছোটবেলায় মার এক পিসতুতো বোন তাদের বাড়িতে এসেছিল। বয়সে তার থেকে বড় জোর বছর পাঁচেক বড় হলেও সে তাকে ডাকত বুলিমাসি বলে। তাদের শিউলিগাছের থেকে সেই বুলিমাসি ফুলগুলো তুলে শুকিয়ে রাখত, সেই শিউলিফুলের বোঁটা দিয়ে নাকি সরস্বতী পুজোর সময় শাড়ি রং করবে। হঠাৎ তার মনে হল সেই শুকনো শিউলির গন্ধ গায়ত্রীর গা থেকে সে পাচ্ছে। বোধহয় তার সঙ্গে মিশে আছে কাঁচা হলুদের গন্ধও।

গায়ত্রী আস্তে-আস্তে তার হাতটা রাখল তার মাথায়, তারপর আর একটা হাত তার কাঁধে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল বহুদিন আগের কথা যেদিন এক সন্ধ্যায় ল্যাম্পপোস্টের আলোর অন্ধকারে গায়ত্রী তার হাত ধরে বলেছিল—চাঁদু, তুই খুব ভাল ছেলে। বহুদিন তার ঘুম আর জাগায় সে অনুভব করেছিল সেই স্পর্শ। আজ বহুদিন পর আবার গায়ত্রীর স্পর্শ—তার আবার ভাল লাগছে। সে মাথাটা ফেরাল গায়ত্রীর দিকে। গায়ত্রী এখন তার আরো কাছে, গায়ত্রীর গন্ধ তখন আরো তীব্র। সে মাথাটা আরো সামনে নামিয়ে আনতেই তার কপাল স্পর্শ করল গায়ত্রীকে। গায়ত্রী তাকে বাধা দেয়নি। সে এখন অনুভব করছে গায়ত্রীর প্রতিটি নিশ্বাসের স্পন্দন। তার কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে গায়ত্রী দু-হাত দিয়ে মাথাটা জড়িয়ে নেয় আরো নিবিড় করে। সে এখন গায়ত্রীর বুকের ভেতরে নিজের মুখটাকে ডুবিয়ে দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নেয়। তখনই সে অনুভব করে শুকনো শিউলি আর কাঁচা হলুদের মধ্যে মিশে আছে ল্যাভেন্ডারের গন্ধ। সে আরো জোরে শ্বাস নেয়, তার মরুভূমির মতো তপ্ত কপাল, নাক আর ঠোঁট আরো গভীরভাবে গায়ত্রীর শরীরে মিশে গিয়ে খুঁজে নেবার চেষ্টা করে ল্যাভেন্ডারের গন্ধের উৎস। এই গন্ধ তার প্রতিটি স্বপ্নে চেনা। ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আরো তীব্র হয়ে আসে, সে পাগলের মতো গায়ত্রীর শরীরে তার উৎস খুঁজে বেড়ায়। এবং এক সময় সে নিশ্চিত হয় তার সামনে গায়ত্রী নয়, দাঁড়িয়ে আছে তিশি। সে শুধু অস্ফুটভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি এত দিন আসনি কেন?' সমুদ্রের ভেঙে পড়া ঢেউয়ের আওয়াজে ঢেকে যায় তিশির উত্তর। সে শুনতে পায় আকাশে উড়ে বেড়ান

শঙ্খচিলের ডাক। ঝুঁকে পড়া নারকেলগাছের সারির ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণের ঝোড়ো হাওয়া। সে তিশিকে অনুভব করতে চায় নিজের ভেতরে, সে তিশির ভেতরে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়। রোদে উষ্ণ নীল সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে তাদের ওপর। সময় থমকে গেছে, গোটা পৃথিবী বিলীন হয়ে গেছে, শুধু এক রোদে উজ্জ্বল সমুদ্রতটে রয়ে গেছে সে আর তিশি, একটা গোটা ইতিহাসের সমস্ত সুখের সম্ভাবনা নিয়ে। হাওয়া আরো দুরন্ত, সমুদ্র আরো উত্তাল হয়।

'চাঁদু ছাড়, কী করছিস?', তাকে কিছুটা জোর করে সরিয়ে দেয় গায়ত্রী। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, গায়ত্রী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। সে মুখ ঢেকে বসে পড়ে চেয়ারে, সে জানে না আর কোনোদিন সে কী ভাবে গায়ত্রীর কাছে মুখ দেখাবে। সে প্রতারণা করেছে গায়ত্রীকে, সে অপরাধী, জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী। সে তার অপরাধ সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হয়, কারণ চলে যাবার সময় গায়ত্রীর চোখে সে কোনো ভর্ৎসনার চিহ্ন দেখেনি।

'এই ধরণের পাগলামো করার মতো ক্ষমতা আমাদের এখন নেই, এটা তোর স্পষ্ট করে বোঝা উচিত।'

গোটা আলোচনাটাতে মা নীরব শ্রোতা। সে আবার বোঝাবার চেষ্টা করল, 'তুই বুঝছিস না ছোট, তুই যা ভাবছিস তা কিন্তু আমি বলছি না। আমি এখন পরীক্ষা দিলে নির্ঘাৎ ফেল করব।'

'তুই বরং পরীক্ষা দিয়ে ফেলই কর, কিন্তু তুই যা বলছিস তা ইম্‌পসিবল।'

'কেন ইম্‌পসিবল, ভাল করে প্রিপারেশন করে এক্সটারনাল হিসাবে সামনের বার পরীক্ষাটা দিয়ে দেব।'

'সামনের বছর? সামনের বছর সম্পর্কে তোর কোনো আইডিয়া আছে? মার হাতে যা আছে তাতে বড় জোর দু-তিন মাস। আমি বাবাদের ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি, পেনশন পেতে সময় লাগবে। আর এটাও বোঝা পেনশনের ওই সামান্য টাকায় সংসার চলবে না। ডাইং ইন হারনেস কেস সবে বাহাত্তরের ব্যাজ হয়েছে, এখন স্ট্রাইকের সময় যারা ছাঁটাই হয়েছিল তাদেরকে ফেরত নিচ্ছে তাদের হয়ে গেলে তারপর সিরিয়ালি আবার আসবে, আমার ধারণা অনুপকাকু যাই বলুক তিন-চার বছরের মধ্যে বাবার অফিসে তোর চাকরি পাবার কোনো চান্স নেই। মাঝখানটায় আমাদের চলবে কী করে? আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আমার লেখাপড়ার খরচের কথা কাউকে ভাবতে হবে না, সে ব্যবস্থা আমি করে নেব। কিন্তু এর বেশি আমি এই মুহূর্তে কিছু করতে পারব না। তোকেই তো কিছু একটা করতে হবে? আমি বলছি তুই কষ্ট করে পার্ট ওয়ানটা এবার দিয়ে দে, পার্ট টু তোকে এক্সটারনাল হিসাবেই দিতে হবে।'

'না রে এবার আমি পারব না।'

'সে তুই যা ভাল বুঝিস কর, তবে মা তুমি মিলিয়ে নিও—এই যে ও পরীক্ষা দিচ্ছে না, আর জীবনে ওর পরীক্ষা দেওয়া হবে না।'

ছোট রাগ করেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে তাকাল মার দিকে, মা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বালিশে ওয়াড় ভরছে। তার মনে পড়ল, গায়ত্রীও তাকে একই কথা বলেছে—এবার পরীক্ষা না দিলে তার আর পরীক্ষা কোনোদিনই দেওয়া হবে না। মুখে সে যাই বলুক সেও ঠিক নিশ্চিত না, ভবিষ্যতে সে আর পরীক্ষা দিতে পারবে কি না।

আসলে গত একটা মাস সে প্রায় কিছুই করেনি। সারাক্ষণই সে বাড়িতে ছিল। চুপচাপ বসেই ছিল, পরীক্ষা সামনে জেনেও সে কোনো পড়াশুনা করেনি। কেন করেনি সেটাও তার কাছে পরিষ্কার না। গৌতম দু-একবার এসেছিল, শুভ একবার, তার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর একমাত্র যোগাযোগ বলতে ছিল গায়ত্রী। গায়ত্রীই বলেছিল পরীক্ষার ফর্ম জমা দেবার লাস্ট ডেটের কথা। গায়ত্রীর উৎকণ্ঠা ছিল পরীক্ষার ফি-র টাকা নিয়ে। তার ব্যবস্থা নাকি গায়ত্রী বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে করে রেখেছে। কিন্তু কথাটা শোনামাত্রই সে বুঝেছে এবার পরীক্ষা দেওয়া মানে টাকা নষ্ট করা। তার এখন মনে হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা নিয়ে মা আর ছোটর সঙ্গে আলোচনা করাটাই ভুল হয়েছে। কাউকে কিছু না বলে ড্রপ দিয়ে দিলে কেউই ব্যাপারটা খেয়াল করত না। আসলে বাড়ির সব ব্যাপারে ছোটই এখন সিদ্ধান্ত নেয়। মা'ও সব ব্যাপারে ছোটর সঙ্গেই আলোচনা করে। প্রথম প্রথম তার একটু খারাপই লাগত। কিন্তু কয়েকটা ঘটনার পর সে বুঝেছে সে ঠিক ছোটর মতো না, ছোট কোনো একটা ব্যাপারে যে ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে তা পারেই না। তারই মনে হয়েছিল পরীক্ষার ব্যাপারটা ছোটকে জানানো উচিত।

গায়ত্রীর সঙ্গেই সে গিয়েছিল। পায়ে হেঁটে তাদের বাড়ি থেকে মিনিট পনের লাগে। ছোট একতলা বাড়ির বাইরের ঘরে কথাবার্তা হচ্ছিল। ভদ্রলোক অসম্ভব রোগা, পরে ছিলেন নীল রঙের লুঙি। গায়ত্রী ভদ্রলোককে ডাকছিল মেসোমশাই বলে। ভদ্রলোকের ছেলে ক্লাস নাইনে পড়ে তাকে অঙ্ক আর ইংরেজি পড়াতে হবে। ভদ্রলোক তার সামনেই বারবার গায়ত্রীকেই পড়ানোর জন্য বলছিল। আর প্রত্যেকবারই গায়ত্রী বোঝাচ্ছিল সে কত ভাল ছাত্র আর কত ভাল সে পড়ায়। আসবার আগের থেকেই তার অস্বস্তি হচ্ছিল, কিন্তু গায়ত্রী তাকে যত সার্টিফিকেট দিচ্ছিল ততই তার অস্বস্তিটা পরিণত হচ্ছিল বিশুদ্ধ ভয়ে। সে এখনও একটি কথাও বলেনি, তার হয়ে গায়ত্রীই কথা বলছে। ঠিক হল সপ্তাহে তিন দিন সে পড়াবে। সব শেষে এল, টাকাপয়সার কথা। ভদ্রলোক বলল ষাট টাকা, গায়ত্রী তাকে মুখ খুলবার কোনো সুযোগ না দিয়ে বলল, 'কী বলছেন মেসোমশাই, প্রাইমারির ছাত্রের টিউশন করালে এখন মিনিমাম আশি টাকা।'

তার প্রচণ্ড লজ্জা লাগছে, কিন্তু গায়ত্রী সে সবের পরোয়া করছে না। সে ঠিক বুঝছে না, এসব ক্ষেত্রে গায়ত্রী এ রকমই করে, নাকি তার জন্যই এ রকম করছে?

ভদ্রলোক বললেন, 'আমি একশ দিতেও রাজি, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনের গ্যারান্টি দিতে হবে।'

গায়ত্রী একদম ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'চন্দ্রশেখর কেন আইনস্টাইন এলেও এই গ্যারান্টি দিতে

পারবে না, একটা বিষয় বুঝুন মেসোমশাই, পরীক্ষাটা তো টিউটর দেবে না, পরীক্ষা দেবে আপনার ছেলে।'

তর্কটা চলতেই থাকল আর এক্ষুনি উঠে চলে যাবার ইচ্ছাটা তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু এক সময় তর্কটা শেষ হল, রফা হল মাসে আশি টাকা সে পাবে। গায়ত্রীর মুখে প্রায় বিজয়িনীর হাসি। বেশ ময়লা কাপড় পরা একজন মহিলা ঢুকলেন চা নিয়ে। ভদ্রলোক তাকে দেখিয়ে বললেন, 'বুঝলে গো এই হল বুবুনের মাস্টারমশাই।'

ভদ্রমহিলা নিরাসক্তভাবে একবার তার দিকে তাকাল। সে বুঝল, ইনিই ছাত্রের মা। চা'টা মুখে দিয়ে প্রায় গা গুলিয়ে উঠল, এত খারাপ চা সে জীবনে কখনো খায়নি।

এইবারই সে প্রথম কথা বলল। ভদ্রলোককে বলল, 'আপনার ছেলেকে একবার ডাকুন।'

ভদ্রলোক ডাকাডাকি করতে যে ছেলেটি এসে ঘরে ঢুকল; সে তার বাবার মতোই রোগা, আর চোখে একটা চশমা থাকায় ছেলেটিকে কেমন যেন একটু নির্জীব-নির্জীব লাগছে। ছেলেটিকে দেখে তার কেমন যেন একটু ভরসা হল। সামনের সোমবার থেকে আসবে জানিয়ে, সে আর গায়ত্রী বেরিয়ে এল।

বাসটায় প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় নিয়ে সে খুব একটা চিন্তিত না, কিন্তু ভীড়ের মধ্যে অনুপকাকু যাতে চোখের আড়ালে চলে না যায় সেটাই সে বারবার নজর রাখছিল। কোথায় নামতে হবে সে বিষয়ে তার একটা ভাসাভাসা ধারণা আছে, কিন্তু সে ঠিক নিশ্চিত না। তাছাড়া অনুপকাকুকে বাদ দিয়ে সে কিচ্ছু করতে পারবে না। হঠাৎ তার মনে হল আজ অনেকদিন পরে সে যখন বেরোচ্ছে, মা তার মাথায় হাত রেখেছিল। মা কী ভেবেছিল কে জানে?

ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিড় ঠেলে যে অফিসটায় অনুপকাকু তাকে নিয়ে গেল সে অফিসটাতে ভিড় রাস্তার থেকেও বেশি। একটা ভিড় ঠাসা করিডোর দিয়ে প্রায় টানতে টানতে তাকে নিয়ে যে ঘরটায় অনুপকাকু ঢুকল, দেখলেই বোঝা যায় সেটা ইউনিয়ন রুম। এ ঘরটায় অবশ্য ভিড় বেশি নেই। ঘরটার মাঝখানে একটা কাঠের পার্টিশন, আওয়াজে বোঝা যাচ্ছে ওপাশে ক্যারাম খেলা হচ্ছে। তার একবার দেখতে ইচ্ছে করল এই সকালবেলা অফিসে কারা ক্যারাম খেলছে। ঘরটার একদিকে একটা পুরোনো বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলটার চারদিকে অনেকগুলো 'চেয়ার, কিন্তু অনুপকাকু তাকে বসতে বলল পেছনের দিকে রাখা বড় বেঞ্চে। যারা টেবিলের চারিদিকে বসে আছে তাদের সঙ্গে অনুপকাকুর কী কথা হচ্ছে, তা সে এখান থেকে শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু কথা যে তাকে নিয়েই হচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারছে। কারণ যারা তার দিকে পেছন করে বসে ছিল তারাও ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। বিষয়টা যথেষ্ট অস্বস্তিকর। তার একবার মনে হল এখানে সে গুরুদশার কাপড়টা পরে এলেই ভাল করত, তাতে আরো সহানুভূতি পাওয়া যেত। টেবিলের উল্টোদিকের বড় চেয়ারটায় যে ভদ্রলোক বসে ছিলেন তিনি বোধহয় ইউনিয়নের বড় কোনো নেতা। তিনিই উঠে এলেন তার দিকে, সে জানে এবার শুরু হবে সহানুভূতি জানানোর বিরক্তিকর পর্যায়টি। গোটা বিষয়টায় তার করুণ করুণ মুখ করে মাথা নীচু করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কেউ সহানুভূতি জানালে এ রকমই করতে হয় এটা তাকে কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু তার ধারণা এ রকমই করা উচিত। ভদ্রলোক তার সামনে এসে কিছু না বলে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকে দেখলেন।

সঙ্গের একজন বলে উঠল, 'বড় ভাল লোক ছিল গো তোমার বাবা, এই হয়, ভাল লোকেরাই আগে চলে যায়।' সে বুঝল এবার শুরু হল রুটিন মাফিক সহানুভূতির বর্ষণ। কিন্তু নেতা যিনি তিনি চুপ, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার বয়স কত?'

সে অবাক হল দুটো জিনিসে। এক, ভদ্রলোকের গলার আওয়াজে, এ রকম একজন ছোটখাটো চেহারার লোকের এ রকম একটা ভারি গলা সে আগে কখনো শোনেনি। আর, তার বাবার সহকর্মী হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের মতো তাকে তুমি না বলে ভদ্রলোক তাকে আপনি বললেন।

সে উত্তর দেবার পর বললেন, 'আপনাকেই তো আপনাদের সংসারটা চালাতে হবে। তবে এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই, আপনার বয়সী অনেককেই এ কাজ করতে হয়। তারা যখন পারে তখন আপনিও পারবেন। প্রথম দিকটায় একটু অসুবিধা হবে। আপনাকে অনুপবাবু নিশ্চয়ই বলেছে আপনার মার পেনশনের ব্যাপারটা প্রায় হয়ে এসেছে। কিন্তু আপনার কাজের ব্যাপারটায় একটু সময় লাগবে। আর একটা ব্যাপার আপনাকে আগেই পরিষ্কার করে বলে রাখি, আপনার কাজের ব্যাপারটা আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের নানা ধরণের ঝামেলা থাকে, আপনাকেও একটু লেগে থাকতে হবে।'

এই লেগে থাকার ব্যাপারটা কী রকম হবে সেটা না বুঝেই সে সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়ল।

গমগম করা গলায় ভদ্রলোক বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই, আমরা আছি আপনার সঙ্গে। কিন্তু আপনাকেও লড়তে হবে।' তার পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে ভদ্রলোক এগোলেন দরজার দিকে। অনুপকাকু তার পাশে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'অচিন্ত্যদা, আমাদের খুব বড় লিডার।'

অনুপকাকুদের অচিন্ত্যদা বেরিয়ে যেতে আস্তে-আস্তে ঘরটা খালি হয়ে যেতে শুরু করল। কোণের দিকে একটা ছোট টেবিলে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এক মনে কী যেন একটা জিনিস টাইপ করে যাচ্ছেন। এতক্ষণ ঘরে যা ঘটেছে তার কোনোটাতেই ভদ্রলোক অংশগ্রহণ করেননি। এখনো তিনি টাইপ করছেন। অনুপকাকু কাকে একটা টেলিফোন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বড় টেবিলটার ওপর কতগুলো খবর কাগজ পড়ে আছে। দুজন সেই কাগজ পড়ছে। সে চুপচাপ বসে। পার্টিশনের ওপারে ক্যারাম খেলোয়াড়দের মধ্যে বোধহয় ঝগড়া লেগেছে, ব্যাপক চ্যাঁচামেচি।

অনেকক্ষণ পর অনুপকাকু এসে বলল, 'চ'। কোথায় এবং কার কাছে যেতে হবে সে সব কিছু জিজ্ঞাসা না করে সে উঠে পড়ল। আবার সেই ভিড়ে ঠাসা করিডোর। তার মনে হল যদি অনুপকাকুকে সে হারিয়ে ফেলে তাহলে সে বোধহয় কোনোদিন এই করিডোরের গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারবে না। অনুপকাকু একটা দরজা ঠেলে তাকে নিয়ে ঢুকল একটা ছোট ঘরে। ঘরে ঢুকে সামনের একটা বড় দরজা খুলতে যেতেই পাশে টুলে বসা খাকি জামাকাপড় পরা একজন উঠে দাঁড়িয়ে তাদের রাস্তা আটকাল।

কিছুটা বিরক্ত হয়েই অনুপকাকু বলল, 'আরে, এইমাত্র সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। উনিই আমাকে আসতে বলেছেন।'

কথাটা লোকটাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না। একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাম লিখুন।'

অনুপকাকু কাগজটায় লিখে হাতে দিতে, পেছনের একটা বেঞ্চি দেখিয়ে 'ওইখানে বসুন' বলে লোকটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

আবার চুপচাপ বসে থাকা। অনুপকাকু বললেন, 'বুঝলি, ওই যে বলে না, বাবু যত বলে ইয়ে তার বলে শতগুণ, এ হল তাই। অফিসারের বেয়ারা তার রংবাজি অফিসারের থেকে বেশি।'

ঘরের এককোণে একটা টেবিলে হিটারে জল গরম হচ্ছে, বোধহয় চা হবে—এটা দেখে তার হঠাৎ মনে হল, এক কাপ চা পেলে খারাপ হয় না। সেই সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার চা খেয়েছে তারপর আর চা খাওয়া হয়নি।

ঘরটায় এয়ার কন্ডিশনারটা এমনভাবে চালানো আছে যে, ঢুকে তার রীতিমতো শীত করছে। এ রকম একটা ধুলোভরা আধা অন্ধকার অফিসের ভেতরে এ রকম একটা ঝকঝকে ঘর থাকতে পারে সে ভাবতেই পারেনি। অনুপকাকুর পেছন-পেছন সেও গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের সামনে রাখা চেয়ারগুলোর পেছনে। অফিসার মাথা নীচু করে কী একটা ফাইল দেখছে। তার কেন যেন মনে হল কোনো কৃপাপ্রার্থী ঢুকলে এই অফিসারের মতো কর্তাব্যক্তিরা যে ঢুকল তার দিকে প্রথমে না তাকিয়ে সব সময়ই কোনো কাগজপত্র গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে যায়—এটা বোঝানোর জন্য, এই কৃপাপ্রার্থীদের কথা শোনার থেকে অনেক বেশি 'গুরুত্বপূর্ণ কাজ তার আছে। তার আরো মনে হল, ভদ্রলোক মাথা তুললেই সে দেখতে পাবে ভারী চিবুকটা মাঝখান থেকে কাটা।

গলাটা তুলে অনুপকাকু বলল, 'নমস্কার স্যার।'

ফাইলের থেকে মাথা না তুলেই বলা হল, 'বসুন'।

তারা বসবার পর আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। অফিসারের মাথার ওপর সদ্য ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর হাসিমুখের ছবি।

কথাটা শুরু করল হঠাৎই। 'বুঝলেন, এ ব্যাপারে কোনো ডিসিশন তো আমরা নেব না, যা হবার হবে দিল্লিতে। আমরা শুধু কেসটা ফরোয়ার্ড করে দেব।'

'কিন্তু স্যার দু মাস প্রায় হয়ে গেল কেস্‌টা এখনো এখানেই আটকে আছে।' একটু কুণ্ঠিত স্বরে অনুপকাকু বলল।

'না, না, আমার এখানে আটকে নেই, আটকে আছে সেকশনে।'

'একই তো হল স্যার।'

'না এক না, কাগজে-কলমে সেকশন আমার আন্ডারে হলেও আমার কথা শুনে তো তারা কাজ করে না। আপনারা বরং ইউনিয়নের থ্রুতে বলুন, যাতে তাড়াতাড়ি ফাইলটা আমার কাছে পুট করে।'

'সে আমরা বলব, কিন্তু আপনি যদি একটু জোর দেন তাহলে ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। বুঝতেই তো পারছেন ফ্যামিলির একমাত্র আর্নিং মেম্বার ছিল।'

'সে আমাকে বোঝাতে হবে না, আপনারা কেরানিবাবুদের বোঝান। আপনি এটা নিশ্চিত থাকুন, আমার কাছে এলে আমি আন্‌নেসেসারি ডিলে করাব ন। পারলে সেকশন ইনচার্জের সঙ্গে একবার কথা বলে যান।'

সে আর অনুপকাকু বেরিয়ে এল ঘর থেকে, অনুপকাকু বলল, 'চ, একবার সেকশন

ইন্‌চার্জের ওখান থেকে ঘুরে যাই।'

অফিসার ভদ্রলোকটি তার দিকে একবারও তাকায়নি, এটা সে বাইরে এসে খেয়াল করল।

বিশাল একটা হল ঘরে বোধহয় কয়েকশ টেবিল। এটা নিশ্চয়ই ক্লার্কদের বসবার জায়গা। প্রায় একটা হাটের মতো অবস্থা। একে ওকে জিজ্ঞাসা করে নির্দিষ্ট টেবিলটায় পৌঁছে দেখা গেল সেকশন ইনচার্জ টেবিলে নেই। পাশের টেবিলে বসে ছিলেন একজন মাঝবয়সী ভদ্রমহিলা, তাকে জিজ্ঞাসা করতে বলল, 'ওমা, গেল কোথায়? ছিল তো এইমাত্র। আছে আশেপাশেই আছে, চলে আসবে।'

টেবিলের সামনে একটাই চেয়ার। অনুপকাকু বলল, 'চাঁদু তুই বোস।'

সে বলল, 'না না, আমি দাঁড়াচ্ছি, তুমি বোসো।'

কথাটা বলতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, দীর্ঘক্ষণ পরে সে কথা বলছে। গলা শুকিয়ে গেছে।

অনুপকাকু বলল, 'ঠিক আছে একটা কাজ কর, তুই বরং ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে বোস। এরা কখন ফিরে আসবে কিছু ঠিক নেই। আমাকে খুঁজে বার করতে হবে। তুই ইউনিয়ন অফিসটা চিনতে পারবি?'

সে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাতে অনুপকাকু তাকে নিয়ে ফিরে এল ইউনিয়নের অফিসে।

আবার চুপ করে বসে থাকা। অন্য সময় হলে সে বোধহয় না পেরে উঠে চলে যেত। কিন্তু গত দুটো মাস সে এভাবেই বসে থেকেছে। ঘর অথবা বারান্দায় না বসে একটা অপরিচিত জায়গা, এই কেবল পার্থক্য। নানা রকম লোকজন আসছে, চলে যাচ্ছে, শুধু সে আর টাইপ করছিল যে ভদ্রলোক এই দুজনই একটানা রয়ে যাচ্ছে। ডাইং ইন হারনেসের চাকরির জন্য তার বসে থাকা আর ভদ্রলোকের টাইপ—কখনো শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তার এখন খিদে পাচ্ছে, সেই সকালে দুটো রুটি খেয়ে সে বেরিয়েছে। অল্পঅল্প মাথাটা ধরেছে। এই মাথাধরাটাকেই তার আজকাল বড় ভয় করে, কোনো নোটিস না দিয়েই সেটা হাজির হয়—আর অনেক সময়ই সেটা পরিণত হয় একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়, আর তখন তার সব কিছু গুলিয়ে যায়। ঘরটার ওপারেই বড় রাস্তা, রাস্তার হাজারটা গোলমালের সঙ্গে ভেসে আসছে কোথাও জিলিপি ভাজা হচ্ছে তার গন্ধ।

সে জানে না কখন অনুপকাকু সেকশন ইনচার্জের সঙ্গে হেস্তনেস্ত সেরে ফিরবে, তবে তার ছুটি। এই সারাদিনের ঘটনাগুলো থেকে সে বুঝেছে বাবার জায়গায় তার চাকরি পাওয়াটা খুব একটা সহজ ব্যাপার হবে না। আর কেউ যদি তাকে বলে দেয়—না ভাই তুমি এসো, তোমার এখানে চাকরি হবে না। সে মাথা নীচু করে এখান থেকে চলে যাবে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দাবি করতে পারবে না। কিন্তু তার জায়গায় যদি ছোট হত তবে ছোট ঠিক তার পাওনা আদায় করে ছাড়ত। অফিসারকে ছোটর দিকে তাকাতেই হত। কিন্তু ছোটর এখনও আঠার বছর হয়নি, বাবার জায়গায় চাকরির জন্য তার নামই দেওয়া হয়েছে। আর সব চেয়ে বড় কথা সে চায় না ছোট এ রকম ধুলোভরা আধা অন্ধকার করিডোরের মধ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিক। দরকার নেই নীল ফিয়াটের, ছোট বরং জলপাই রঙের পোশাক পরে উজি সাবমেসিনগান হাতে উঠে আসুক। সে বুকের ভেতর অনেক দিন ধরে জমিয়ে

রেখেছে একটা নামের তালিকা, সেটা ছোটর হাতে তুলে দিয়ে বলবে, 'মার, ছোট মার। একদম মেরে ফেল, মেসিনগানে ঝাঁঝরা করে দে, বেয়নেটে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেল এই শুয়োরের বাচ্চাদের। এরা আমাকে নষ্ট করেছে, আমার জীবনটা নষ্ট করেছে। আমি এদের মরা মুখ দেখতে চাই।'

হঠাৎ তার মনে হল মা বোধহয় তার ভাত নিয়ে না খেয়ে বসে থাকবে। এই হল মুশকিল, ছোটর জন্য মা ভাত না খেয়ে বসে থাকে না, কারণ ছোট কখন ফিরবে তার কোনো ঠিক থাকে না। কিন্তু কিছু না বলে এলে, তার জন্য মা না খেয়ে বসে থাকে। সে এখন মার বিছানায় শোয়, ছোট শোয় তাদের পুরনো খাটে একা। মা কেন জানি সারাক্ষণ তাকে চোখেচোখে রাখে। সে কোথাও বার হলে বারবার খোঁজ নেয় কোথায় যাচ্ছে, কখন ফিরবে। অথচ সে মাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল। সে পারলে অবশ্য গোটা পৃথিবীকেই এড়িয়ে চলতে চায়। সে জানে, সে অন্যায় দাবি নিয়ে সে এখানে এসেছে। তার কোনো অধিকারই নেই, বাবার জায়গায় চাকরি চাইবার।

ছেলেটা প্লেটটা ঠক্ করে তার সামনে রাখতে তার সম্বিত ফিরল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না, কেন ছেলেটা তার সামনে মাখন লাগান দুটো টোস্ট রেখে গেল।

'খাও, সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি তো।', টাইপ করছিলেন যে ভদ্রলোক কথাটা বললেন তিনি। টাইপ ছাড়া আর কোনোদিকে ওনার নজর আছে বলে তার মনে হয়নি। তার সত্যিই খিদে পেয়েছিল, সে টোস্টটা খেতে শুরু করল। এই ভীষণ বিবর্ণ হৃদয়হীন অফিসে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় তার খিদে পেয়েছে এটা অনুভব করেছে, এটা তার কেমন যেন অপ্রত্যাশিত বলে মনে হচ্ছে। সে ভদ্রলোকের দিকে এতক্ষণ আলাদা করে তাকায়নি। ছেলেটা এক কাপ চা দিয়ে গেছে। চা খেতে-খেতে সে ভদ্রলোককে দেখল। বাইরে বেরিয়ে আধ ঘণ্টা পরে সে ভীড়ের মধ্যে ভদ্রলোককে আলাদা করে চিনতে পারবে বলে মনে হয় না। ধুতির ওপর পরে আছে যে হালকা বাদামি জামাটা তার ওপর দিকটা হাফ শার্টের মতো আর নীচের দিকটা পাঞ্জাবির মতো। এগুলোকে কী বলে সে জানে না, কিন্তু বয়স্ক অনেককেই সে এই রকম জামা পরতে দেখেছে। মাথায় অল্প টাক, আর বুক পকেটটা ভেতরের কাগজের চাপে ফুলে উঠেছে।

চা খেয়ে তার সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখানে তার সিগারেট খাওয়া ঠিক হবে কি না সে বুঝতে পারছে না, শত হলেও এরা তার বাবার বন্ধুস্থানীয়। হতে পারে এই ভদ্রলোকের তার মতো ছেলে আছে, হয়ত তার জন্যই তার প্রতি এই সহানুভূতি। এই সব ভাবতে ভাবতে সে দেখল, ভদ্রলোক তার হাতের কাজ শেষ করে টাইপ মেসিন ছেড়ে উঠছেন। এতক্ষণ টাইপ করে বোধহয় পিঠে ব্যথা হয়ে গেছে, ভাল করে তাই আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর এসে বসলেন তার সামনে।

'বুঝলে, টাইপ শর্টহ্যান্ডটা শিখে নাও, কাজে লাগবে।', বলে ঝোলা পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে নস্যি নিলেন। তখনই সে প্রথম গন্ধটা পেল। গন্ধটা নস্যির গন্ধ নয়। গন্ধটা খুব মৃদু হলেও চেনাচেনা। সে একটু জোরে নিশ্বাস নিল। সে নিশ্চিত গন্ধটা সম্পর্কে। পরমুহূর্তেই সে গন্ধটা চিনতে পারল—এটা অগুরু সেন্টের গন্ধ, বাবার দেহ নিয়ে শ্মশানে আসবার পর থেকে এই গন্ধটাকেই তার মৃত্যুর গন্ধ বলে মনে হয়। ভদ্রলোক কি অগুরু সেন্ট মেখেছে? অসম্ভব। তবে গন্ধটা কোথা থেকে আসছে? গন্ধটা ভদ্রলোকের গা থেকেই

আসছে, আর গন্ধটা এই মুহূর্তে আর হালকা নয়, স্পষ্টই গন্ধটা বোঝা যাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি সিগারেট ধরাল, চারমিনারের গন্ধে যদি অগুরুর গন্ধটা চাপা দেওয়া যায়। ভদ্রলোক কী সব যেন বলছে তাকে, সে সে সব কথা শুনছিল না। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে সে বুঝল, গন্ধটা সে তাড়াতে পারেনি। সে জানে এই গন্ধের মধ্যে থাকলে তার গা গুলোতে শুরু করবে, বমিও করে ফেলতে পারে। এই শবের গন্ধের মধ্যে সে বসে থাকতে পারবে না। সে অধীর হয়ে দরজার দিকে তাকায়, না অনুপকাকুর কোনো চিহ্ন নেই।

'আমার খোঁজ করলে বলবেন, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।', এই বলে সে বাইরে বেরিয়ে আসে। ভিড় করিডোর ঠেলে একদম রাস্তায়, গোটা পথটায় সে দম বন্ধ করে ছিল। বাইরে এসে সে একবারে নিশ্বাস নিল। না, গন্ধটা যায়নি। সে পেছনের দিকে একবার তাকাল, ভদ্রলোক কী তার সঙ্গে সথে বেরিয়ে এসেছে? না, ভদ্রলোক নেই। তাহলে গন্ধটা কোথা থেকে আসছে? একটু এদিক-ওদিক তাকাতেই সে গন্ধের উৎসটা খুঁজে পেল। একটা রঙ চটে যাওয়া কালো কোট পরে মোটা মতো যে লোকটা ঘর্মাক্ত হয়ে মুড়িয়ালার কাছ থেকে মুড়ি কিনছে, গন্ধটা আসছে তার গা থেকে। সে বুঝছে না বাকিরা কী করে গন্ধটা সহ্য করছে। সে অনেকটা সরে এসে দাঁড়াল রাস্তার উল্টোদিকে। কিন্তু গন্ধটা তার সঙ্গ ছাড়ছে না। তুলনায় অল্পবয়সী কয়েকজন লোক ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে তার মধ্যে সবুজ টি-শার্ট পরা লোকটার গা থেকে সে এবার গন্ধটা পেল। গোটা রাস্তাটা জুড়েই এখন গন্ধটা। তার গা তো গোলাচ্ছেই সঙ্গে মাথার ভেতরে পুরোনো অস্বস্তি। সে আর কিছু ভাবতে পারছে না। সে দ্রুত পায়ে রাস্তাটা থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল। এ রাস্তাটা জুড়েই গন্ধটা, আর গন্ধটা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। বেগুনি ছাতা মাথায় দিয়ে যাচ্ছেন যে মহিলা, ল্যাম্পপোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে খৈনী ডলছে যে লোকটা, সবার গায়েই অগুরু সেন্টের গন্ধ, শবদেহর গন্ধ। গন্ধটা থেকে পালাতে সে ছুটতে শুরু করল।

সে কতক্ষণ ছুটেছে, এই ভিড় রাস্তা দিয়ে কী ভাবে ছুটেছে তা সে জানে না। একটা ধাক্কা লাগতে সে দাঁড়িয়ে গেল। 'এ ভাই, এভাবে ছুটছ কেন?', যে লোকটা কথাটা বলল, সেই শক্ত হাতে তার কাঁধটা ধরে ছিল। উচ্চারণ থেকে বোঝা যায় লোকটা অবাঙালি। সে তখন হাঁফাচ্ছে, দম নিতেই নাকে এল পাশে সদ্য স্টার্ট নেওয়া মিনিবাসের ডিজেলের গন্ধ। গন্ধটা জীবন্ত কিছুর, সে নিশ্চিত হয় আপাতত দুঃসময়টা সে কাটিয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরনো জায়গায় আবার ফিরে যাবার সাহস তার নেই।

•

রাত্রিবেলায় খাবার পর সে সিগারেট খাচ্ছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আর এ সময়টা হল তার তিশির সঙ্গে কথা বলার সময়। রাতের মতো অন্ধকার দিনগুলোকে কাটিয়ে তার ভোর হয় সামান্য এইটুকু সময়েই। এত বছর ধরে সে দেখেছে, তিশির ঘরে সব সময়ই সাদা লেসের পর্দাই লাগানো থাকে। তার কেন যেন মনে হয় তিশি জেনেশুনে তার জন্যই এটা করে, যাতে পর্দার ওপারে তিশির অস্তিত্ব সে সব সময় বুঝতে পারে। তিশির ঘরে এখন নতুন বিষয় হল একটা টেপ রেকর্ডার। রাতে যখন সব কিছু থেমে যায় তখন প্রায় দিনই সে তার আওয়াজ শুনতে পায়। তিশি আজ কারোর একটা ঠুংরি শুনছে, তার মনে হচ্ছে বেগম আখতারের। অসম্ভব জেনেও সে শুনতে পায় গানের সুরে সুর মিলিয়ে তিশি গুনগুন্ করে গানটা গাইছে। যতক্ষণ তিশি জেগে থাকে, সে বারান্দায় অপেক্ষা করে। তারপর তিশির

ঘরে জ্বলে উঠবে হালকা নীল আলো, তিশি আস্তে-আস্তে এগিয়ে আসবে তার কাছে।

ছোট বারান্দায় ঢুকেছে এটা সে সঙ্গে সঙ্গেই টের পায়। ছোট আজকাল সিগারেট খায়, না থাকলে মাঝেমাঝে তার কাছ থেকে সিগারেট চাইতে আসে। তার মনে হল আজও বোধহয় ছোট তার জন্যই এসেছে। সিগারেট নিয়ে ছোট ঘরে চলে যায়, আজ ঘরে না গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়েই সিগারেটটা ধরাল। তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

'দাদা, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।', তার মনে হল ছোট যেন কিছুটা কুণ্ঠিত হয়ে কথাটা বলল। সে অন্ধকারের মধ্যে তাকাল ছোটর দিকে।

'বুঝলি, আমাদের সব ব্যাপারটা তো পার্টির লোকেরা জানে। কলেজ স্ট্রিটের একটা পাবলিশিং হাউস সেলসম্যান নেবে, সজলদা তোর কথা বলছিল।'

সজলদা কে তা সে জানে না, কিন্তু ছোটর কথা থেকে মনে হচ্ছে পার্টির কোনো নেতা। আর এটা সে বোঝে পাবলিশিং হাউসের সেলস্ম্যান মানে, বইয়ের দোকানে কাজ করা। সে কী উত্তর দেবে? দুজনেই তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে। এক সময় তারই মনে হল এ ভাবে চুপ করে থাকাটা ঠিক না।

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

'করবি?'

'তুই বল।'

'দাদা তুই দেখ্, বাবাদের ওখানে আজ না হোক কাল তোর তো পার্মানেন্ট একটা ব্যবস্থা হবেই। মাঝখানের কয়েকটা দিন। চুপচাপই তো বসে আছিস। আর তোর যদি ব্যাপারটা ভাল না লাগে তবে ছেড়ে দিবি।'

'ঠিক আছে।', সে সিগারেটের শেষ টুকরোটা রাস্তায় ছুড়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে আসে। ছোটর কথা ভেবেই পার্টি তার জন্য একটা কাজের কথা ভেবেছে, তাকে একাজ করতেই হবে। তার হঠাৎ হাসিই পেল, নিজের জন্য না, হয় বাবার জন্য তা না হলে ছোটর জন্য, সে একটা চাকরি পাবেই।

সে শুয়ে পড়ল। এত সহজে আজকাল তার ঘুম আসে না। প্রথম রাতটা তার কেটে যায় ঘুমের চেষ্টায়। কিন্তু আজ তার আরো দুর্ভোগ বাকি। শোয়া মাত্র কারেন্ট চলে গেল। এ সময় সচরাচর লোডশেডিং হয় না। লোডশেডিং হলে তাও বাঁচোয়া, আর যদি কেবল ফল্ট হয় তবে তো সারা রাত। ছোট একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে বোধহয় রান্নাঘরে মার কাছে দিয়ে এল। মোমবাতির আলো মিলিয়ে যেতেই আবার অন্ধকার। জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করল তারা দেখা যায় কি না। না, কোনো তারাই নেই। এ রকম একদম কালো অন্ধকারে তার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। ভেতর থেকে একটা আলোর জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়।

আলোটা এসে একদম ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখে। আলোটা এতটাই জোরাল যে চোখ বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কিন্তু আলোটার সঙ্গে সঙ্গেই মেসিনগানের আওয়াজ। প্রথমেই তার যেটা মনে হল তারা ধরা পড়ে গেছে। প্রায় সহজাত প্রবৃত্তিতেই সে মাটিতে শুয়ে পড়েছে। কিন্তু এ রকম একটা ঢালু পাড়ে প্রতিপক্ষ যখন ওপরে রয়েছে তখন আত্মরক্ষার পক্ষে এই শুয়ে পড়াটা যথেষ্ট নয়। সে ঢালু পারটা দিয়ে পিছলে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করল। কানের কাছে আর্তনাদটা তার চেনা, সে জানে যার আর্তনাদ এটা,

এটাই তার শেষ আর্তনাদ। আর আওয়াজটা আসছে তার একদম ডান দিক থেকে, মানুষটাকেও সে চেনে। তার অনেকদিনের পুরোনো কমরেড, কাঁচরাপাড়ায় সুশীল। আগে একটা ছোট দোকানের মালিক ছিল। আর্তনাদের সঙ্গে শরীরটা লাফিয়ে উঠল। সে হাত বাড়িয়েছিল ধরার জন্য, কিন্তু কোনো সুযোগ না দিয়েই শরীরটা হুড়মুড় করে নেমে গেল, গিয়ে পড়ল নোংরা জলের নালাটায়। এই তীব্র আলোয় গোটাটাই প্রায় দিনের মতো পরিষ্কার। সে জানে তারা বেকায়দায় পড়েছে, একদম শেষ হয়ে যাবে তারা।

গোটাটাই অপ্রত্যাশিত। শত্রুরাই বেকায়দায় আছে। যে কোনো সময়ই শহরটা তাদের দখলে চলে আসবে। গত সাত-আটটা দিন ধরে আস্তে-আস্তে তারা এগিয়েছে। শহরের উত্তর দিকটা তাদের দখলেই, গত কাল থেকে পুব দিক দিয়েও তারা ঢুকতে শুরু করেছে। শহরের কেন্দ্রটায় শেষ লড়াই যে কোনো মুহূর্তেই শুরু হয়ে যাবে। শহরের মাঝখান দিয়ে যে নালাটা গেছে সেটা কোনো এক সময়ে চওড়া খাল ছিল, বড় বড় নৌকো গিয়ে পড়ত গঙ্গায়। এখন গোটা শহরের ময়লা জল বয়ে নিয়ে যাবার একটা নালা ছাড়া এটা আর কিছু নয়।

নালাটার ওপারেই টেলিফোনের অফিসটা। শত্রুপক্ষ উড়িয়ে দেবার আগে আচমকা আক্রমণে ওটাকে দখল করে নিতে পারলে অনেকগুলো সুবিধা। ফ্রন্টলাইন থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার এগিয়ে এসে অভিযানটা তারা চালিয়েছিল। এবং তাদের সাফল্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ তাদের ছিল না। মূল ফ্রন্টে শত্রুপক্ষ এতটাই ব্যস্ত রুটিনমাফিক কিছু পাহারা ছাড়া আর কিছু থাকবে বলে তাদের মনে হয়নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাদের ধারণাটা ভুল। তার সন্দেহ হল, কেউ কি তাদের দিক থেকেই খবরটা পাচার করেছিল?

একটানা মেসিনগান চলবার পর এই প্রথম উল্টোদিক থেকে রাইফেলের গুলি আসতে শুরু করেছে। কিন্তু সে নিশ্চিত এতক্ষণে যা ক্ষতি হবার তা তাদের হয়ে গেছে। কিন্তু সে নিজে কী করে বাঁচবে সেটাই সে বুঝে উঠতে পারছে না। একবার মনে হল যা হবার হোক, একবার ছুট লাগাই। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজের চিন্তাটা বাতিল করল, এ কাজটা হবে একদম আনাড়ির মতো এবং আত্মহত্যার শামিল। ছুটতে হলে তাকে ছুটে পার হতে হবে ফাঁকা জমির ওপর অন্তত পঁচিশগজ, আর তার মাঝখানে পড়বে পাঁকে ভরা নালাটা—একদম ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। কোনোভাবে যদি লাইটটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় তবেই একমাত্র পালাবার একটা সুযোগ তার সামনে আসতে পারে। এই বৃষ্টির মতো গুলির মধ্যে সে অক্ষত আছে এতেই তার মনে হচ্ছে যে কোনোভাবে সে কিছু একটার আড়ালে পড়ে গেছে। আড়ালটা কিসের সেটা মাথা তুলে দেখার মতো সাহস তার নেই। কিন্তু তার এই নতুন ধারণাটায় সে কিছুটা ভরসা পেল। কোমরে বাঁধা ক্যানভাসের ব্যাগটার মধ্যে গ্রেনেডগুলো আছে লাইটটাকে লক্ষ করে যদি একটাকে ছুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু একটা বিপদ আছে, যদি লাইটটাতে মারতে পারে তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু না পারলে সে নিশ্চিতভাবেই ধরা পড়ে যাবে। এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুকে কয়েক ফুটের মধ্যে রেখে কতক্ষণই বা সে পড়ে থাকবে, ধরা তো তাহলে এমনিতেই পড়বে।

গ্রেনেডটার পিনটা খুলে সে মনে মনে পাঁচ গুনে সোজা ছুড়ে মারল লাইটটার দিকে। বিস্ফোরণের আওয়াজের আগেই সে মাথাটা নামিয়ে নিয়েছিল। মাথাটা তুলতে প্রথমেই সে বুঝল লাইটটা অক্ষতই আছে। আর পরমুহূর্তেই কাঁধের কাছে একটা ধাক্কা। বাঁ হাত দিয়ে ডান কাঁধটা চেপে ধরতেই সে টের পেল চটচটে গরম একটা তরল। সে বুঝেছে তার

কী হয়েছে, কিন্তু সে অবাক হল তার কোনো ব্যথা বোধ হচ্ছে না, শুধু কাঁধটা অসম্ভব ভারী লাগছে। সে মাথাটাকে প্রায় মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে, তার তখন একটাই চিন্তা আর যেন কোনো গুলি না লাগে।

সে কতক্ষণ এভাবে পড়ে ছিল তা তার খেয়াল নেই। তার মনে হল বোধহয় সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। প্রথমেই সে যেটা লক্ষ্য করল যে, লাইটটা নেই, চারিদিকটা অন্ধকার। থেমে গেছে গুলির শব্দ, কান পেতে সে শুনবার চেষ্টা করল। না, একটানা ঝিঁঝির আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। সে চুপ করে ওভাবেই পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা তুলল, উঁচু পাড়টাতে সার্চলাইটটা নেই, কিন্তু কাছেই কোথাও আগুন জ্বলছে, আগুনটা দেখতে না পেলেও এখান থেকে তার আভা দেখা যাচ্ছে। শরীরের সামনের দিকটা সে কিছুটা তুলল। আর মাথাটা তোলামাত্র কাঁধ থেকে শুরু করে তীব্র একটা ব্যথা ছুটে গেল পিঠ পর্যন্ত। ব্যথাটা এতটাই তীব্র যে সে না চাইতেও একটা আর্তনাদ তার গলা থেকে বেরিয়ে এল। হাত দিয়ে সে আবার চেপে ধরল কাঁধের ক্ষতস্থানটা। জায়গাটা চটচটে থাকলেও তার মনে হল নতুন করে খুব বেশি রক্ত আর পড়ছে না। তাও ব্যথাটা সামলাতেই সে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। পরের বার সে উঠবার চেষ্টা করল অনেকটা কোমরে ভর দিয়ে। অসম্ভব ব্যথা করছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে উঠে দাঁড়াল। তার মাথাটা ঘুরছে, সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল কোনো মতে দাঁড়িয়ে থাকতে। তার চেষ্টায় কোনো লাভ হয়নি। সে শুধু বুঝল যে সে ঢালু পাড়টা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। ব্যথাটা অসম্ভব তীব্র হয়ে ওঠায় সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, সে গিয়ে পড়ল পাঁকে ভরা নালাটায়। একটা দুর্গন্ধ চারিদিকটায়। কিন্তু সেই অবস্থাতেই সে পড়ে রইল সেখানে। তার হঠাৎ ভয় হল, এভাবে পড়ে থাকলে সে মরে যাবে। অনেক চেষ্টা করে সে আবার উঠে দাঁড়াল এবং হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল খাড়া পাড়টা দিয়ে। পাড়ের ওপরে আগুনের আলোটাকেই তার এখন মনে হচ্ছে বাঁচবার একমাত্র আশা।

কতক্ষণের চেষ্টায় তা তার মনে নেই, কিন্তু সে উঠে আসতে পেরেছিল। সে এর আগে কখনো এ জায়গাটায় আসেনি। একটা ছোট মাঠের মাঝখানে টেলিফোনের অফিসটা। চারিদিকের অন্ধকারকে সারা গায়ে মুড়ে নিঃশব্দে অফিসটা পুড়ে যাচ্ছে। ওঠবার আগেও সে এই সম্ভাবনা মাথায় রেখেই উঠেছিল সে সরাসরি শত্রুদের সামনে পড়ে যাবে। কিন্তু তার কিছু করার নেই সে যেভাবে ঘায়েল হয়েছে এভাবে পড়ে থাকলে সে এমনিতেই মরে যাবে। রক্ত পড়াটা একেবারে বন্ধ হচ্ছে না। কিন্তু কেউ এখানে নেই। এই জ্বলন্ত বাড়িটার সামনে কেউ নেই। আওয়াজ বলতে শুধু আগুনের আওয়াজ।

সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই জ্বলন্ত টেলিফোন অফিসটা দেখে সে বুঝতেও পারছে না—তাদের অভিযানের ফল কী হয়েছে। তারা কী অবশেষে জিতেছে নাকি মার খেয়ে পিছিয়ে গেছে। সবচেয়ে জরুরি যেটা, তাকে জানতেই হবে তাদের বাহিনী কোথায় আছে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞাসা করবে? আগুনের আলো যতদূর যায় তারপর শুধু অন্ধকার। তার ভীষণ তেষ্টা পাচ্ছে। সে জানে না কোথায় জল পাবে। তার ভয় হচ্ছে সে এভাবে আস্তে আস্তে মরে যাবে, কারণ তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। নিজের একাকিত্ব যে এত ভয়ঙ্কর তা সে আগে জানত না। 'কে আছ?', বলে সে প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল। নিজের চিৎকারে সে নিজেই প্রায় চমকে উঠল।

কেউ একটা এভাবে চ্যাঁচাতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না। লোকটা এখন তার থেকে অনেকটা এগিয়ে। মাথায় লাল শালুতে মোড়া একটা বড় ঝুড়ি, সে বুঝতে পারল না লোকটা আসলে কী বিক্রি করছে। আচমকা তার কানের কাছে লোকটা এমনভাবে চ্যাঁচাল যে সে প্রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিল। গোটা কলেজ স্কোয়ার জুড়ে অনেক ফেরিআলা, কিন্তু কেউই এভাবে চ্যাঁচাচ্ছে না। সূর্য ঢাকা পড়েছে ইউনিভার্সিটির বড় বাড়িতে। গরমকালের বিকেল, প্রচুর বাচ্চা সাঁতার কাটছে, রেলিং-এর ধারে তাদের মায়েদের ভিড়। এদিক-ওদিকের বেঞ্চিতে ঘুমোচ্ছে কিছু লোকজন। কাঁধে ঝোলা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আসা যাওয়া। বিদ্যাসাগরের মূর্তির তলায় কারা যেন পতাকা টাঙাচ্ছে, বোধহয় মিটিং হবে। তার কোথাও যাওয়ার নেই তাই সে এখানে বসে।

ছোটর পার্টির সজলদা তাকে নিয়ে এসেছিল। যে ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হল তাকে সজলদা ডাকছিল ভোলাবাবু বলে। লোকটাকে দেখে তার কেন যেন মনে হচ্ছিল লোকটা বোধহয় ময়দাকলের মালিক। মোটা ফরসা ভদ্রলোকের মাথা জোড়া টাক, কিন্তু ভুরুর চুলগুলো সাদা। যদিও ভদ্রলোক কথা বলছিল খুব আস্তে আস্তে, কিন্তু কিছুতেই তার মনে হচ্ছিল না যে লোকটা কোনো বইয়ের দোকানের মালিক। গোটা কথোপকথনে ভদ্রলোকের একটাই উৎকণ্ঠা ফুটে বেরোচ্ছিল, তা হল তার সততা সম্পর্কে। আর যে সজলদা তাকে মাত্র আধঘণ্টা আগে প্রথম দেখেছে সেই তার সততা সম্পর্কে লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট দিয়ে গেল। শেষমেশ তাকে খুব নরম গলায় ভোলাবাবু গল্প শোনালেন, তার এই দোকানেই তার মতোই কাকে একজনকে সহানুভূতি দেখিয়ে চাকরি দেবার পর কী ভাবে সে টাকাপয়সা সরিয়েছিল এবং কী রকম বুদ্ধি করে ভোলাবাবু সেই চুরি ধরলেন এবং আজও সেই ছেলে কী ভাবে জেলে পচছে। সে আর না পেরে হঠাৎই জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা আপনার এখানে পেচ্ছাব করার জায়গাটা কোনটা?' বক্তৃতায় বাধা পেয়ে ভদ্রলোক কেমন ঘাবড়ে গিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে হাত তুলে দেখাল। বোঝা গেল পাবলিক ইউরিনালই ভরসা।

সামনের মঙ্গলবার পয়লা, সেদিন থেকেই তাকে আসতে হবে। প্রথম ছ-মাস তার কাজ পাকা হবে না, তার কাজকর্ম দেখে তারপর কাজ পাকা হবে। রবিবার ফুল আর সোমবার হাফ বেলা ছুটি। সে মাইনে পাবে আপাতত চারশ টাকা। এবার পুজোয় সে কোনো বোনাস পাবে না। আর ভোলাবাবু ওকে আগাগোড়া তুমি বলেই ডেকেছে।

এখন তার প্রায় অভ্যাস হয়ে গেছে। এর জন্য তাকে অবশ্য একটু আগে বাড়ি থেকে বেরোতে হয়। বাসস্ট্যান্ডে আসতে তার লাগে হেঁটে মিনিট দশেক। যদি বাসে বসবার জায়গা না থাকে তবে সে পরের বাসের লাইনে দাঁড়ায়। ডবল ডেকার বাসের দোতলায় জানালার পাশে বসতে পারলে সে সবচেয়ে খুশি। রাতে তার ভাল করে ঘুম হয় না, আর তার ফলে সারাদিনই তার কেমন ঘুমঘুম পায়। কন্ডাক্টার টিকিট কেটে নিলে সে ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুম না হলেও কেমন একটা ঝিমুনি মতো হয়। আর কলেজ স্ট্রিটের কাছাকাছি তার এই ঘুমঘুম ভাবটা বেশ ভারি হয়ে আসে, আর তার প্রতিদিনই মনে হয় বইয়ের দোকানটা কলেজ স্ট্রিটে না হয়ে হাওড়ায় হলেই ভাল হত, আর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। অবশ্য ভিড় ঠেলে দোতলা থেকে নামতে তার ঘুম কেন একেবারে কালঘাম ছুটে যায়। অবশ্য প্রতিদিন কপাল এত ভাল থাকে না, অনেক দিনই বাসস্ট্যান্ডে বাস থাকে না। তখন তাকে গড়িয়াহাটে নেমে আবার বাস পাল্টাতে হয়। আর দুটো বাসেই থাকে অসম্ভব ভিড়। ট্রামে গেলে হয়ত ভিড়টা একটু কম থাকে, কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যায়। অন্তত এগারোটার মধ্যে তাকে পৌঁছতে হয়। সকালবেলা অবশ্য দোকান তাকে খুলতে হয় না, নীরেনদাই খোলে। আর তার বিনিময়ে রাতে তাকে দোকান বন্ধ করার সময় থাকতে হয়। নীরেনদার বাড়ি সোদপুরে, সাড়ে ছটা নাগাদ নীরেনদা চলে যায়। চাবি থাকে পল্টুর কাছে, পল্টুর বাড়ি বউবাজারে। খোলা আর বন্ধ দুবেলাই পল্টু থাকে, আর তার বিনিময়ে দুপুরে পল্টু বাড়িতে ভাত খেতে যায়। ব্যবস্থাটা তারা নিজেদের মধ্যেই করে নিয়েছে, মালিকরা কিছু বলেনি।

দোকানের মালিক দুজন। একজন ভোলাবাবু আর একজন রঞ্জনবাবু। রঞ্জনবাবু আগে কোনো কলেজে পড়াতেন। রঞ্জনবাবুকে বোধহয় তার জন্য সবাই স্যার বলে ডাকে, আর সবার দেখাদেখি সেও ডাকে স্যার বলে। দুজন এরকম বিপরীত চরিত্রের লোক কী করে একসঙ্গে ব্যবসা চালায় এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার। নিজেদের পাবলিশিং হাউসের নতুন পুরোনো মিলিয়ে আছে গোটা তিরিশেক বই, আর অন্য পাবলিশার্সদের বই নিয়ে দোকানটা চলে। কিন্তু তাদের দোকানে প্রধানত কমার্সেরই বই পাওয়া যায়, অন্য কিছুর বই তারা রাখে না। বইপত্রের ব্যাপারটা দেখেন রঞ্জনবাবুই, আর বাকি সব কিছু ভোলাবাবু। রঞ্জনবাবু সকাল বেলায় আসেন না, তিনি আসেন দুপুরে। আর অধিকাংশ দিন বিকেল বেলায় ওনার বন্ধুবান্ধবরা আসে, আর খুব দরকার না থাকলে ভোলাবাবু তখন বেরিয়ে যান। ভেতরের অফিস ঘরে তখন জমিয়ে আড্ডা চলে, বন্ধুবান্ধবরাও বোধহয় কলেজের মাস্টারমশাই। এ সময় তাদের বেয়ারা পল্টুও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বারবার চা আনা, খাবারদাবার আনা। চা আনলে তারাও কখনও কখনও ভাগ পায়। চা খাবার তাদের একটা রুটিন আছে, সকালে দোকান খুলবার পর একবার, দুপুরবেলায় টিফিন খাবার পর আর একবার, আর বিকেলবেলায় একবার। রঞ্জনবাবুর দৌলতে বিকেলের চা'টা মাঝে মাঝে জুটে যায় বিনা পয়সায়। পল্টুর অবশ্য লাভ আরো বেশি হয়, খাবার দাবারের ভাগও পায়। পল্টু একবার

জিজ্ঞাসা করেছিল, সে খাবে কি না, সে রাজি হয়নি। শত হলেও অন্যের প্লেটের বাড়তি খাবার। কোনো কোনো দিন আড্ডা চলে অনেক রাত পর্যন্ত, পল্টুকে বসে থাকতে হয় দোকান বন্ধ করার জন্য, সে চলে যায়। পল্টুর কাছ থেকে শুনেছে, এই সব আড্ডায় মাঝে-মাঝে মদও কিনে আনতে হয়। সে অবশ্য পল্টুকে জিজ্ঞাসা করেনি, সেটা বাড়তি হলে পল্টু কী করে। কারণ এই বেশি রাতের আড্ডা সম্পর্কে পল্টুর কোনো আপত্তি আছে বলে মনে হয় না।

সাত মাসের পর তার মাইনে বেড়ে এখন চারশ ষাট টাকা। চাকরি পাকা হবার আগে ভোলাবাবু তাকে ডেকেছিল। অফিসে সেদিন রঞ্জনবাবুও ছিলেন, তিনি অবশ্য অন্য কী সব কাজকর্ম করছিলেন।

ভোলাবাবু বলল, 'দেখো বাবা, তোমার চাকরি পাকা করে দেব। কিন্তু ওই একটাই কথা, চুরিচামারি কোর না।'

সে গলাটা একটু তুলেই বলল, 'এ-ক'দিনে কী আপনার তাই মনে হয়েছে?' এই একটা প্রসঙ্গের জন্য লোকটাকে প্রথম দিন থেকেই সে অপছন্দ করে, একদম ভেতর থেকে অপছন্দ করে।

'না-না, প্রথম প্রথম সবাই ভাল থাকে। পরে সব ডানা গজায়।'

তার এই চারশ টাকাটা তাদের কতটা জরুরি সেটা সে জানে। তা না হলে সে এক্ষুনি, 'শুয়োরের বাচ্চা, তোর কাজের মুখে আমি লাথি মারি', বলে বেরিয়ে যেত। কোনো কথা না বলে সে এরজন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

লোকটা কী বুঝল জানি না, গলাটাকে একটু নরম করে বলল, 'না আমি তা বলছি না, কাজকর্ম তো তুমি ভালই করো। কিন্তু মাঝে মাঝে তোমার কী হয়? গুম মেরে থাকো, কথা বললে কোনো উত্তর দাও না। পল্টু বলছিল, তোমার নাকি মাথায় মাঝেমাঝে কী সব ব্যথা হয়? যাক গে, ডাক্তার দেখিও।'

'তুমি নাকি বি এস-সি পার্ট ওয়ান পর্যন্ত পড়াশুনা করেছ?', রঞ্জনবাবু যে তাদের কথাবার্তা শুনছে সেটা সে এখনই বুঝল। কারণ কথাটা জিজ্ঞাসা করেছেন রঞ্জনবাবুই। তার সম্পর্কে রঞ্জনবাবু যে আলাদা করে খোঁজ রেখেছেন, এটা জেনে সে কিছুটা অবাকই হল।

সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

'কমপ্লিট করলে না কেন?'

সে আর কী উত্তর দেবে, সে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ ভোলাবাবু খুব সদয় হয়ে বলল, 'আরে বেচারার বাবা মারা গিয়েই তো মুশকিল হল। ওই বাড়ির বড় ছেলে।'

রঞ্জনবাবু কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন, 'না-না, ওটা কোনো কাজের কথা নয়। এখন তো একটা কাজ হয়েছে। তুমি সামনের সেশনেই ভর্তি হয়ে যাও। আমি অনিরুদ্ধকে বলে দেব, ও এখন সিটি কমার্সের টিচার ইনচার্জ, সোজা ভর্তি হয়ে যাও ফার্স্ট ইয়ার বি কমে। বইয়ের কোনো সমস্যা নেই, সব বইই দোকানে আছে। আর কিছু বুঝতে না পারলে সোজা আমার কাছে চলে আসবে।'

সে চুপ করে আছে দেখে এবার প্রায় ধমকেই উঠলেন, 'চুপ করে আছ কী? কিছু করতে হলে এভাবেই করতে হয়। আমি তো এ জি বেঙ্গলে ক্লার্কের চাকরি করতাম। ওই চাকরি

করতে-করতে ইভিনিংয়ে এম. এ. করেছি। বুঝলে ইচ্ছা থাকলে সবই হয়।'

স্যার আমার তো ইচ্ছেটাই হয় না—কথাটা বলবে ভেবেও সে কিছু না বলে চুপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নীরেনদার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। একটা মাইনাস পাঁচ পাওয়ারের চশমা নিয়ে লোকটা গোটা দোকানটা চেনে প্রায় নিজের হাতের তালুর মতো। দোকান শুরুর সময় থেকেই আছে। আগে কাজ করত এই ভোলাবাবুর পুরোনো প্রেসে প্রুফ রিডারের। চোখটা খারাপ হওয়ায় ভোলাবাবু দোকানে নিয়ে এসেছে। ভোলাবাবুর সঙ্গে আছে অনেকদিন থেকে, অথচ অসম্ভব ঘেন্না করে ভোলাবাবুকে। সে একদিন কথাপ্রসঙ্গে প্রথম দিনে ভোলাবাবু তাকে যা-যা বলেছিল, তা নীরেনদাকে বলেছিল। দোকানে তারা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। ভীষণ রেগে গিয়ে নীরেনদা বলল, 'এটা ওর অভ্যাস, দুনিয়ার সবাইকে ও চোর ভাবে। আসলে ও নিজেই চোর। আর কেউ না জানুক আমি তা জানি, কী করে ওর এত ব্যবসা হল। ওর মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনে বোঝা যায় না ও কী জিনিস।'

নীরেনদাই তাকে হাতে ধরে কাজকর্ম শিখিয়েছে। কোনো র‍্যাকে কোনো বইটা থাকে, কীভাবে বইগুলো সাজানো হয়। সবটাই সে শিখেছে নীরেনদার কাছ থেকে। এমনকী প্রথম প্রথম যখন তার অতটা সড়গড় হয়নি তার হয়ে অনেক কাজই করে দিত নীরেনদা। তাকে এসব শেখাতে-শেখাতে শুধু একটাই কথা বারবার বলত, 'শেখাচ্ছি তো শুধু-শুধু, দুদিন পরেই তো উড়ে পালাবে।'

সে হাসতে-হাসতে বলত, 'কোথায় পালাব নীরেনদা, আমার পালাবার কোনো জায়গাই নেই।'

রেগে গিয়ে নীরেনদা বলত, 'আরে রাখো-রাখো, সবাই এ রকম বলে। ওই তো সুবল, সারাক্ষণ নীরেনদা-নীরেনদা। কত যত্ন করে সব কাজকর্ম শেখালাম। তারপর কোনো ঠিকাদার মাসতুতো দাদা কী বোঝাল। বাবু সোজা চলে গেল আসাম। আমারই পণ্ডশ্রম। আমি অবশ্য দোষ দিই না, কেই বা এখানে পড়ে থাকবে। নেহাত আমার চোখটা খারাপ হয়ে গেল, তা না হলে আমিও শালা এই ভোলার কারবার থেকে কবে পালাতাম। এখানে মানুষ থাকে?'

নীরেনদা তাকে শিখিয়েছে কীভাবে বইচোরদের ওপর নজর রাখতে হয়। শীতকালে নজর রাখতে হয় যারা চাদর জড়িয়ে আসে। আর কারা অনেকগুলো বই নামিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে বই পড়তে থাকে। আর কিছু লোক নাকি বইটই বিশেষ কেনে না, কিন্তু দোকানে এসে মনোযোগ দিয়ে বই ঘাঁটে। নীরেনদার ভাষায় এরা নাকি দোকানের লক্ষ্মী। এরা নিজেদের বই খুব একটা না কিনলেও এরাই নাকি মুখে-মুখে নতুন বই, ভাল বইয়ের খবর দেয়। এ রকম কয়েকজনকে সেও এর মধ্যে চিনে ফেলেছে। এদের সঙ্গে নীরেনদার খুব ভাল সম্পর্ক। এক-এক জনের আবার এক এক রকম পছন্দ, সেগুলো নীরেনদা জানে। এদের কেউ আসলে নীরেনদা তার পছন্দের বই নামিয়ে দেয়।

তাদের দোকানে আসে প্রধানত ছাত্ররা। ইউনিভার্সিটি থেকে এম. কমের ছাত্ররা, আর নানা কলেজের ছেলেমেয়েরা আসে। প্রচুর আসে কস্টিং আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সির ছাত্ররা। এরা সবাই প্রায় তার কাছাকাছি বয়সী। প্রথম-প্রথম এদের সঙ্গে সে নিজের তুলনা

করে আরো বিষণ্ণ হত, এখন তার এসব গা সওয়া হয়ে গেছে। তার মতো কেউ এসে যখন বলে, 'দাদা, স্যামুয়েলসন আছে?'

কোনো ভাবান্তর না ঘটিয়ে সে পেশাদার দোকানির মতো বলে, 'পল্টু ডান দিকের তিন নম্বর তাক থেকে হলুদ মলাটের বইটা বার করে দে।' তারপর গলাটা নামিয়ে বলে, 'সঙ্গে বি দাসচৌধুরীর বইটা নিয়ে নিন, কোশ্চেন অ্যানসারে অনেক সুবিধা হবে।'

প্রথম-প্রথম সে দুপুরে আশেপাশের কোনো দোকানে খেয়ে নিত। কিন্তু অল্প কয়েকদিনেই সে বুঝেছে এভাবে সে সামলাতে পারবে না। এখন সে বাড়ি থেকেই টিফিন নিয়ে আসে। বাসের ভাড়া বাঁচানোর জন্য শম্ভু বলেছিল স্টুডেন্টস্ কনসেশন জোগাড় করে দেবে। এই প্রস্তাবে সে রাজি না হলেও কন্ডাকটার যদি কখনো তার কাছে বাসের ভাড়া নিতে ভুলে যায়, সে ভাড়া না দিয়েই নেমে আসে। তার কাছে প্রত্যেকটা পয়সাই খুব মূল্যবান।

ছুটির দিন বাদ দিলে প্রতিদিনই সে বাড়ি থেকে বেরোয় সকাল সাড়ে নটা, আর ফিরতে ফিরতে আটটা সাড়ে আটটা বেজে যায়। আজ নিজেরই কেমন অবাক লাগে, তার জীবন থেকে কী ভাবে বন্ধুরা, তাদের সঙ্গে আড্ডাগুলো সব মিলিয়ে গেল। তার মাঝেমাঝে মনে হত সব ফেলে আবার সে কলেজের আড্ডায় গিয়ে বসবে। প্রথম দিকে ইচ্ছে থাকলেও সে যেতে পারেনি, কারণ জানত শুভ ছাড়া সবাই ব্যস্ত তাদের পরীক্ষা নিয়ে। শুভ কলেজে আর আসে না, আর কোথায় গেলে শুভকে পাওয়া যাবে তাও সে জানে না। আর এখন তার ইচ্ছেও করে না। কলেজের আড্ডায় গিয়ে সে কী করবে? তার বন্ধুদের আর তার জীবন কোনো একটা বিন্দুতেও কাছাকাছি আসে না। দুটো জগৎই আলাদা হয়ে আছে, একমাত্র যোগসূত্র হয়ে টিকে আছে গায়ত্রী। পাড়ার আড্ডাতেও যেতে তার আর ভাল লাগে না, ছুটির দিন ছাড়া তার সময়ও থাকে না। বাড়ি আর বইয়ের দোকানের বাইরে তার জীবন বলতে, বারান্দা থেকে দেখা ননীমাধব দে লেনের খণ্ডিত আকাশ—এতদিন ধরে দেখা সত্ত্বেও যা তার কাছে কখনো পুরনো হয় না, অন্ধকার নেমে আসার পর তিশির আলোকিত জানালা, রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে ছুটে যাওয়া কর্নেল চ্যাটার্জির আকাশি ফিয়াট। সে আর নিজেকে নিয়ে ভাবে না, আগামীকাল তার কী হবে তাই নিয়েও সে চিন্তিত না। মা আর ছোট বারবার বলা সত্ত্বেও সে একবারও আর বাবার অফিসে গিয়ে খোঁজ নেয়নি। শুধু মাঝেমাঝে সব কিছুকে ভীষণ খারাপ লাগার অনুভূতি যখন বিস্ফোরিত হয় তার ভেতরে, তখনই একমাত্র তার চলে যেতে ইচ্ছে করে অর্জুন গাছের নীচে পাথরের চাতালটায়। বালির চড়াটা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে দ্রুতগতিতে ছুটে যাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা জলে। সে ভেবেছিল সত্যি সত্যিই একবার চলে যাবে। কিন্তু তার একটা ভয় হয়, যদি সে জায়গাটাকে আগের মতো করে চিনতে না পারে। তার থেকে বরং তার চেতনাতেই বেঁচে থাক অর্জুনগাছ, পাথরের চাতাল, ছুটে যাওয়া নদীর পারে ছোট্টো বালির চর, আর আচমকা ডানা ঝাপটে ওঠা খয়রি রঙের পাখার পাখি। সে সেখানেই চেষ্টা করবে তার জন্মস্থানকে স্পর্শ করে সব কিছুকে অগ্রাহ্য করার শক্তি সঞ্চয় করতে।

সকাল থেকেই মেঘলা। বৃষ্টি নেই, কিন্তু জোরে হাওয়া দিচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল

প্রায় আসে আসে, দোকানে ভিড় বিশেষ নেই। ভোলাবাবু কোথায় বেরিয়েছে, আর রঞ্জনবাবুও আসেনি। সেই সুযোগে নীরেনদা অফিসঘরের লম্বা বেঞ্চিটায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পল্টু আশেপাশের কারোর সঙ্গে আড্ডা মারতে গেছে। সে একাই দোকানে। গায়ত্রী কোথা থেকে হাজির। হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরে, একগাল হাসি নিয়ে।

আজ পর্যন্ত তার পরিচিত কেউ দোকানে আসেনি। বোধহয় সে চায়ও না কেউ আসুক সে কোনোদিন কাউকে আসতে বলেওনি। তার পুরনো বৃত্ত সে চলে এসেছে, পুরনো কাউকে সে জানাতেও চায় না সে কোথায় এসে পড়েছে। গায়ত্রীই প্রথম।

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, তুই কোথা থেকে?'

দোকানের চারদিকটা ঘুরে দেখতে দেখতে গায়ত্রী বলল, 'আমি এসেছিলাম বোর্ডের অফিসে, ভাবলাম এতটা এসেছি, একবার তোর সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'খুঁজে পেলি কী করে?'

'ও মা, কলেজ স্ট্রিটে এসে একটা দোকান খুঁজে পাওয়া এমন কি কঠিন কাজ?'

'বোস। চা খাবি?'

'এখানে আনাবি?'

'দাঁড়া, এক্ষুনি আনাচ্ছি।', সে কাউন্টার ছেড়ে বেরিয়ে আসে। পল্টু নেই, তাকেই বেরিয়ে চায়ের কথা বলে আসতে হবে। গায়ত্রী তাকে বাধা দেয়।

'আনাবি কেন? একটু ম্যানেজ কর। চ বাইরে বেরিয়ে কোথাও গিয়ে চা খাই। অনেক সকালে বেরিয়েছি, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।'

নীরেনদাকে ডাকতেই নীরেনদা উঠে পড়ল।

'ও নীরেনদা, আমার এক বন্ধু এসেছে, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে একটু ঘুরে আসছি।'

চোখ কচলাতে-কচলাতে নীরেনদা গায়ত্রীকে ভাল করে একবার দেখল, তারপর বলল, 'সাড়ে চারটা বাজে, আর ফিরবে কখন। একেবারেই চলে যাও, আমিই বন্ধ করবখন।'

সে আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভোলাবাবু?'

'ভয় নেই, শান্তিপুরে গেছে, আজ আর ফিরবে না।'

বেরোতে-বেরোতে গায়ত্রী বলল, 'কী ভাল রে তোর এখানকার লোকেরা, একদম ছুটি দিয়ে দিল।'

সে বলল, 'হ্যাঁ, সেটাই ভাবছিলাম, কার মুখ দেখে আজ উঠেছি।'

রেস্টুরেন্টটায় খুবই ভিড়, তাও পেছনের দিকে একটা বসার জায়গা তারা পেয়ে গেল।

'বল, কী খাবি?'

হাসতে হাসতে গায়ত্রী বলল, 'এই তো, তোর বলা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তুই একটা চাকরি করছিস।'

অনেক আলোচনা করে অবশেষে গায়ত্রী দুটো মোগলাই পরটার অর্ডার দিল। তারপর খুব উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তোকে বলা হয়নি, শালিনী আসছে।'

সে খুশি হয়েই জিজ্ঞাসা করল, 'ও মা, কবে?'

'এই তো সামনের চোদ্দ তারিখ।'

সে এবার কিছুটা বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'আমার সঙ্গে বোধহয় দেখা হবে না।'

'কেন হবে না, তুই না চাইলেও শালিনী এসে তোর সঙ্গে দেখা করবে। অবশ্য তুই যা অসভ্য, আমি হলে তোর সঙ্গে দেখা করতাম না। শালিনীকে একটাও চিঠি দিসনি।'

'ও সব চিঠি-ফিঠি লেখা আমার আসে না।'

'বাজে কথা বলিস না। আর ও প্রত্যেকটা চিঠিতে আমার কথা যত না জিজ্ঞাসা করে তার থেকে তোর কথা বেশি জিজ্ঞাসা করে।'

'তো, তুই কী লিখিস?'

'তোকে বলব কেন?'

'আচ্ছা, আমার সম্পর্কে কী লিখিস, সেটাও আমায় বলবি না।'

'বাকি সব বলতে পারি, কিন্তু তোর সম্পর্কে কী লিখি সেটাই শুধু তোকে বলা যাবে না।'

'এটা অন্যায়।'

হাসতে-হাসতে গায়ত্রী বলল, 'কোনো অন্যায় না। এটা শুনবার মতো অ্যাডাল্ট তুই এখনো হোসনি।

বেয়ারা প্লেট দিয়ে গেল।

খেতে-খেতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুব তো আমায় ছুটি করিয়ে নিয়ে আসলি, এবার কী করবি?'

'বল তো কী করি, আমিও ছটা পর্যন্ত ফ্রি।'

'চ, কোথাও একটা যাই।'

'কোথায় যাবি?'

'দেখেছিস, আজ ওয়েদারটা কী দারুণ! চ, শহর ছাড়িয়ে কোথাও একটা চলে যাই। একদম ফাঁকা একটা রাস্তায়। যে রাস্তায় বাস যায় না, কোনো গাড়ি যায় না। অনেক দূরে চলে গেছে রাস্তাটা। কেউ নেই শুধু তুই আর আমি। মেঘলা, তাই কোনো রোদ নেই। বৃষ্টি নেই, কিন্তু পাগলের মতো ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। এত হাওয়া যে তুই শাড়ি সামলাতে হিমশিম খাবি, আমি সিগারেট ধরাতে পারব না। হাওয়ার উল্টোদিকে আমি আর তুই হাঁটব, গোটা রাস্তাটায় আমরা দুজন।'

একটা প্রশ্রয়ের হাসি হেসে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'আর কেউ থাকবে না?'

'ঠিক আছে, একটা কালো ছাগলের গলার দড়ি টানতে-টানতে একটা বাচ্চা মেয়ে উল্টো দিক থেকে আসবে। পাশের পুকুরের পাড়ে বাসন মাজতে মাজতে অল্পবয়সী একটা বউ একবার মুখ তুলে আমাদের দেখবে। দূর থেকে ভেসে আসবে ঢাকের আওয়াজ।'

'তারপর?'

'রাস্তাটা এক সময় চওড়া একটা নদীর পারে এসে পড়বে। নদীর জলের রং হবে প্রথম বর্ষার মতো, মেটে সাদা। একদিকে নদী আর একদিকে সবুজ ধানখেত, মাঝখানটা দিয়ে রাস্তাটা গেছে। তুই বলবি, 'আর হাঁটতে পারছি না, একটু জিরোতে দে চাঁদু'। নদীর ধারে ঝুপসি মতো পুরনো একটা বিশাল তেঁতুলগাছের নীচে একটা ছোট চায়ের দোকান। পাড়ের ওপর দু-একটা উল্টে রাখা নৌকো। চায়ের দোকানটায় কেউ নেই, শুধু বৃদ্ধ চাআলা। 'দাদু দু কাপ চা দিন', বলে আমি বসব, তেঁতুলগাছের নীচে একসময় বাঁধানো এখন ভেঙেচুরে যাওয়া চাতালটার ওপর। তুই গাছের নীচে পড়ে থাকা তেঁতুল কুড়োবি। একবার এসে বলবি, 'চাঁদু খা, দেখ কী মিষ্টি।', আমি বলব, 'ওরে বাবা, তেঁতুল খেলেই আমার ভীষণ

দাঁত টকে যায়। আর তোরই বা কী আক্কেল, চা খাব এক্ষুনি, আর তুই তেঁতুল খেতে শুরু করলি।' তুই বলবি, 'চা তো রোজই খাই।' তারপর চেঁচিয়ে বলবি, 'ও দাদু, একটু নুন দিন না।' দোকানের ভেতর থেকে বৃদ্ধ বলবে, 'দেখে খাবেন মা, বাঁদরে অর্ধেক খেয়ে বাকিটা ফেলে যায়। এই তেঁতুল পাকলেই শুরু হয় তেনাদের অত্যাচার।' তুই ভয় পেয়ে লাফিয়ে আমার একদম কাছে চলে আসবি, তারপর ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করবি, 'দাদু, কোথায় বাঁদর?' দাদু বলবে, 'না এখন নেই, ওরা আসে সকাল বেলায়।'

সে গায়ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, গায়ত্রী মুগ্ধ হয়ে শুনছে। সে বলে চলে, 'তারপর আবার আমরা হাঁটতে শুরু করব। এই ঝোড়ো হাওয়ায় নদীতে কোনো নৌকো চলছে না। চিলগুলো পাখা ঝাপটে একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। আর হাওয়া ওদের উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেক দূর। তুই হঠাৎ গলা খুলে গান ধরবি—'পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে, পাগল আমার মন জেগে ওঠে।' তুই গাইবি, আমি তালে তালে হাততালি দেব। আর তুই যখন গাইবি—'যা না চাইবার তাই আজি চাই গো, যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো', আমি হেঁড়ে গলাও তোর সঙ্গে গলা মেলাব। তুই হাসতে-হাসতে গান থামিয়ে দিবি।'

ফিস্‌ফিস করার মতো করে গায়ত্রী বলল, 'চ'।

'যাবি, গায়ত্রী তুই সত্যি-সত্যি যাবি?'

'হ্যাঁ, যাব।'

'আগে তো কখনো যেতে চাসনি?'

'কী করব?। তুই যে কেবল যেতে চাস ওখানে। চ, আমাকে নিয়েই চ তাহলে।'

সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে গায়ত্রীর দিকে। সে খেয়াল করে গায়ত্রী ছোট্ট একটা কালো টিপ পরেছে। সে গলাটা নামিয়ে বলে, 'কিন্তু কী করে যেতে হয়, তা তো আমি জানি না।'

'তাহলে তুই যেতে চাস কেন?' একটা অসম্ভব তীব্রতা নিয়ে গায়ত্রী কথাটা বলে।

'যেতে পারি না বলে।'

গায়ত্রী তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। সে চোখ ফেরাতে পারছে না। কান্না জড়ানো গলায় গায়ত্রী বলে, 'চাঁদু, তোর কী হয়েছে? আমাকে অন্তত বল।'

গায়ত্রীর গালের ওপর দিয়ে চোখের জলের রেখাটা সে নেমে আসতে দেখে। আর বিদ্যুতের মতো ব্যথাটা তার মাথায় একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটে যায়। কী তীব্র আর অসম্ভব সে যন্ত্রণা। একটা লো অলটিচুড ফ্লাইটের আওয়াজে তার কানটা প্রায় বধির হয়ে আসছে। আর তার পরমুহূর্তে মাটি কাঁপিয়ে বিস্ফোরণের আওয়াজ। ওরা বোম ফেলছে ঘনবসতি অঞ্চলে, কত যে লোক মরবে! অভ্যাসবসতই সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'গায়ত্রী, মাথাটা নীচু কর।'

তার জন্যই রবিবার ঠিক হয়েছে। রাস্তাও ফাঁকা-ফাঁকা, আর বাসেও ভিড় নেই। সে আর গায়ত্রী যখন এস্‌প্ল্যানেডে এসে নামল তখনও পাঁচটা বাজতে মিনিট পনের বাকি। গায়ত্রী বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে না থেকে বরং রেস্টুরেন্টের ভেতরে গিয়েই বসি।'

এখানেই শালিনীর আসার কথা। ভেতরে ঢুকে তারা পেল গৌতমকে, গৌতম

তাদেরও আগে এসে বসে আছে। শালিনী এল কয়েক মিনিটের মধ্যেই। অনেক দিন পরে সে দেখল শালিনীকে। শালিনী ঠিক আগের মতোই আছে। তাদের দেখে, দূর থেকেই চেঁচাতে শুরু করল, 'তোদের দেখে কী ভাল লাগছে আমার।'

টেবিলের কাছে এসে ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল শালিনী, তারপর বলল, 'উঠে দাঁড়া তো চাঁদু।'

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'সে কী রে? দাঁড়াব কেন?'

গৌতম বলল, 'মুখে-মুখে তর্ক না করে, দিদিমণি উঠে দাঁড়াতে বলছে, কান ধরে উঠে দাঁড়া।'

শালিনী কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'তুই দেখতে কেমন লোক-লোক হয়ে গেছিস চাঁদু।'

'হবে না? রোজ সকালে ধুতি আর শার্ট পরে কাজে যায়, নস্যি নেয়', গৌতম বলল।

ভীষণ বিস্মিত হয়ে গায়ত্রীর দিকে তাকিয়ে শালিনী বলল, 'গায়ত্রী, সত্যিই?'

গায়ত্রী হেসে কুটিপাটি। সে গৌতমকে বলল, 'শালা, এক লাথি মারব।'

বেয়ারা অর্ডার নিতে এসেছে। শালিনী বলল, 'দেখ শুভর কাণ্ড, এখনো এল না', তারপর বেয়ারাকে বলল, 'আপাতত চারটে থাম্‌স আপ দিন।'

শালিনী বলল, ' যে যা খুশি মনে কর, আমি চাঁদুর জন্য একটা জিনিস এনেছি', তারপর ওর বড় ঝোলাব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বার করল। প্যাকেট খুলতে ভেতর থেকে বেরোল হালকা জলপাই রঙের একটা শার্ট।

সে বলল, 'তুই কী ভাল রে শালিনী, দারুণ শার্টটা!'

আর্তনাদ করে উঠল গৌতম, 'আমি? আমার জন্য কী এনেছিস শালিনী।'

'তোর জন্য?', ব্যাগ থেকে একটা পেন বার করে গৌতমের দিকে এগিয়ে দিল শালিনী।

'এই হয়, জগতের এই নিয়ম। চাঁদু বইপত্রের মধ্যে আছে ওর দরকার পেন, আর সবাই জানে আমি একটু শো বিজনেসের মধ্যে আছি, একটা ভাল শার্ট পরলে বাজার দরটা একটু ওঠে।'

গায়ত্রী বলল, 'দুঃখ করিস না গৌতম, শালিনী আমার জন্য ভারি সুন্দর রাজস্থানি গয়নার একটা সেট এনেছে, আমি ওটা তোকে দিয়ে দেব। পরে দেখ যদি বাজার দর ওঠে।'

'আমাকে দিতে হবে না, রেখে দে। বিয়ের রাতে বরকে পরাস।'

সে জিজ্ঞাসা কর, 'শুভর জন্য কী আনলি?'

'বাবা! শুভর জন্য? কোনোটা তার বিপ্লবী ইমেজের সঙ্গে খাপ খাবে, কোনটা খাবে না, আমি তাই ওসব ঝামেলায় যাইনি।'

'বাজে কথা বলিস না, চাঁদুর জন্য যে শার্টটা এনেছিস ও রকম একটা শার্ট দিব্যি আমার খাপ খেত, সত্যি কথা বল না, আমাকে তুই কিছু দিসনি।' চেয়ার টেনে বসতে-বসতে শুভ বলল।

'শুভকে শালিনী কী দিয়েছে সেটা আমি জানি।' খুব গম্ভীর হয়ে গৌতম বলল।

ভুরু কুঁচকে শালিনী জিজ্ঞাসা করল, 'কী দিয়েছি আমি শুভকে?'

'তুই মারবি না, যদি এই প্রতিশ্রুতি দিস তাহলেই একমাত্র পাবলিকলি আমি সেটা বলতে পারি।'

টেবিলের উল্টোদিক থেকে কোল্ড ড্রিংস্'য়ে স্ট্রটা ছুড়ে মারল শালিনী গৌতমের

দিকে। 'একদম অসভ্যতা করবি না গৌতম।'

সেদিকে নজর না দিয়ে গৌতম বলল, 'দেখো শুভব্রত, গ্রামার মেনে চলো। আর তুই তোকারি না, শালিনীকে এখন থেকে 'ওগো তুমি' বলে ডেকো। দেখছ না, শালিনী আর তোমার নাম মুখে আনছে না।'

হাসতে-হাসতে গয়াত্রী বলল, 'এটা কিন্তু গৌতম তুই ঠিক খেয়াল করেছিস।'

রাগ-রাগ গলা করে শালিনী বলল, 'তোর যে এত অধঃপতন হয়েছে গায়ত্রী, সেটা আমি জানতাম না।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে শুভ বলল, 'দাঁড়-দাঁড়া গৌতম, তোকেই তো আমি খুঁজছিলাম। তুই এত ছ্যাঁচড়া হয়েছিস। কনফারেন্সের আগে তোর কোছে কুড়িটা টাকা চাইলাম, আর কালকেই দিয়ে যাব বলে তুই আর দেখাই করলি না?'

'কেন যে তোদের স্মৃতিশক্তি এত ভাল?' বিড়বিড় করল গৌতম। তারপর বলল, 'বিশ্বাস কর তোর জন্য আমি পঁচিশ টাকা জোগাড় করেছিলাম, তারপর যে কী হয়ে গেল।'

শুভ বলল, 'তারপর কী হল?'

গৌতম জিজ্ঞাসা কর, 'গ্যাস দেব, না সত্যি কথা বলব?'

হাসতে-হাসতে শালিনী বলল, 'না রে গৌতম, তুই একদম পাল্টাসনি।'

'বল তোর গল্পটা বল', শুভ বলল।

'মা কালীর দিব্যি, সত্যি কথা বলছি। টাকাটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম তোকে দেব বলেই, কিন্তু মাঝখানে রিনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

শালিনী চেঁচিয়ে উঠল, 'রিনা কে রে?'

'এ বছরের তিন নম্বর বোধহয়', গায়ত্রী বলল।

'না জেনে বাজে কথা বলিস না, রিনা আমার একদম স্টেডি যাচ্ছে।'

'ভাল তো, তাহলে আজকে ওকে নিয়ে আসলেই পারতিস। আমাদের সবার সঙ্গে আলাপ হয়ে যেত।' শালিনী বলল।

'কী করে আনবে, বোধহয় বলে রেখেছে ও ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব্ ম্যানেজমেন্টের ছাত্র।'

তার মন্তব্য শুনে গৌতম তার দিকে এমনভাবে তাকল, যেন ভস্ম করে দেবে।

শুভ বলল, 'তুই যা খুশি বল, তোর এই রিনা কিছুতেই স্টেডি হবে না। এক সন্ধ্যায় যার পেছনে তোর পঁচিশ টাকা খরচ করতে হয় সে কিছুতেই তোর স্টেডি হবে না রে, অঙ্কের নিয়ম বলে দিচ্ছে।'

কলারটা তুলে দিয়ে গৌতম বলল, 'গুরু, ও সবে গৌতম মিত্র চমকায় না। সব ফিট হয়ে গেছে, পুজোর পর জয়েন করছি মেডিকাল রিপ্রেসেন্টেটিভের চাকরিতে, তারপর দেখবি কী হয়।'

'কী আর হবে, ভেজাল ওষুধে লোক মরার সম্ভাবনা বাড়বে।'

ওরা যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়েছিল তখন বাজে প্রায় সাড়ে সাতটা। শুভর কী সব মিটিং আছে, যাবার আগে ও শালিনীকে ঠাকুমার বাড়িতে পৌছে দিয়ে যাবে। গায়ত্রী বলল ওরও কী সব কাজ আছে। এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথে সে আর গৌতম।

সে বলল, 'চ গৌতম বাস ধরি।'

'ধুৎ, এত তাড়াতাড়ি কী? জানিস ক্যালিফোর্নিয়ায় সবে সকাল হচ্ছে।'

'ঠিক আছে তুই ক্যালিফোর্নিয়ায় যা, আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'বোর করিস না, চ।'

'কোথায় যাব?'

'একটা হেভি ঠেক আছে।'

'কীসের ঠেক?'

'এই তোদের দোষ চাঁদু, কিছু একটা নতুন কথা শুনলেই সি আই ডির মতো জেরা করতে শুরু করিস। বলছি যখন চ না, ভাল না লাগলে চলে আসবি।'

'তাও বলবি তো, কীসের ঠেক?'

'কীসের আবার, একটু মাল খাবার ঠেক।'

'না, না, ওসবের মধ্যে আমি নেই। তুই খুব ভাল করে জানিস আমি মাল ঠাল খাই না।'

'হাসাস না চাঁদু, জন্ম থেকে কেউই মাল খায় না। সবাই কোনো না কোনো দিন শুরু করে।'

'আমি ওসব শুরু করতে চাই না।'

'কে তোকে শুরু করতে বলেছে। তোকে তো আমার সঙ্গে যেতে বলেছি। যদি খাস তবে ওয়ান টাইম এক্সপেরিয়েন্সের জন্য।'

'ওয়ান টাইম এক্সপেরিয়েন্সও আমি চাই না।'

'বিধবা পিসিমার মতো কথা বলিস না চাঁদু। দুনিয়া শুদ্ধু মাল খায়, সবাই পাপ করছে? তোর কী ধারণা এক দিন মাল খেলে তুই পাক্কা মাতাল হয়ে দাঁড়াবি। আরে, এক দিন জাস্ট খেয়ে দেখবি। ভাল না লাগলে খাবি না, ব্যাস ল্যাঠা চুকে যাবে।'

'আমার কাছে টাকা নেই।'

'টাকা আমার কাছেও বিশেষ নেই, এর জন্যই একটা বিশেষ জায়গাতে যাব। জানিস তো শক্তি চট্টোপাধ্যায় ওই ঠেকে আসে, শুনেছি ঋত্বিক ঘটকও নাকি আসত। কলকাতার একদম ঘ্যাম-ঘ্যাম আঁতেলদের ঠেক। আর দাঁড়া, টাকা-পয়সা জোগাড় করে তোকে একদিন ওল্ড ট্যাভার্নে নিয়ে যাব। তুই রিয়েলি এনজয় করবি।'

ঢোকবার মুখে তারা সিগারেট কিনছিল। কানের কাছে মহিলার কণ্ঠস্বর, 'কী গো দুজনে মিলে কোথায় চললে?'

কথা বলার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে খুবই যেন জানাশোনা। কিন্তু মহিলার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল না, কোনোদিনই তাকে সে দেখেছে। মহিলার বয়স কত তা সে আন্দাজ করতে পারছে না, সাজগোজও অদ্ভুত। আর সবচেয়ে অদ্ভুত হল মাথার ওপর একটা লাল রঙের ফিতে বাঁধা, সচরাচর বাচ্চা মেয়েরাই এভাবে ফিতে বাঁধে। তার মনে হল হয় তো গৌতমের চেনা। কিন্তু সিগারেট নিতে নিতে গৌতম একবার আড় চোখে মহিলার দিকে তাকাল, কিন্তু ওর হাবভাবেও চেনে বলে মনে হচ্ছে না। এবং সবচেয়ে মুশকিল হল মহিলা হাসছে তার দিকে তাকিয়েই। সে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গৌতম তার হাত

ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে হাঁটতে শুরু করে। তার বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটেনি। পেছন থেকে ভেসে আসে একটা খিলখিল করা হাসি। গৌতম বলে, 'এই মাসিদের জ্বালায় রাস্তা দিয়ে হাঁটাও যায় না।'

সবটা নিয়ে তার ভয় হচ্ছিলই, ভয় তার আরো বাড়ল। এখন মনে হচ্ছে, গৌতমকে ছেড়ে এ চত্বর ছেড়ে সে বেরোতেও পারবে না বোধহয়।

ভয়ে-ভয়ে সে প্রথম চুমুকটা দিল। উৎসুক চোখে গৌতম তার দিকে তাকিয়ে আছে। ব্যাপারটা এত বাজে খেতে, তার কোনো ধারণাই ছিল না। গন্ধ এবং স্বাদ দুটোই অসহ্য। মুখ চোখ বিকৃত করে সে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল। হাসতে-হাসতে গৌতম বলল, 'কী রে, কী হল?'

'ধুৎ, বোগাস। জঘন্য, আমি আর মুখেও দেব না।'

নিজের গ্লাস থেকে একটা চুমুক দিয়ে গৌতম একটা প্রশ্রয়ের হাসি হাসল। 'প্রথম-প্রথম খুব খারাপ লাগে। আসলে জিনিসটা খেতে অতটা ভাল না, তোর ভাল লাগবে খাবার পর। নে পরের চুমুকটা দে, দেখ অতটা খারাপ লাগবে না।'

তাদের কলেজের বন্ধুদের মধ্যে গৌতমই এসব খেত। শুভ সামনে না থাকলে তাদের কাছে গল্পও করত। সে সব কথার গুরুত্ব তারা কোনোদিনই দেয়নি। আসলে কোনোটা গৌতম গুল মারছে আর কোনোটা সত্যি এটাই বোঝা যেত না। কিন্তু তাকে এখানে নিয়ে আসা, বেয়ারাদের ডেকে অর্ডার দেওয়ার মধ্যে দিয়ে বোঝা যাচ্ছে গৌতম এখানে নবাগত নয়। তবে চারিদিকের চেহারা দেখে সে নিশ্চিত, শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা ঋত্বিক ঘটক ওগুলো নিশ্চিত গুল। কোনো ভদ্রলোক এখানে আসে বলে তার মনে হচ্ছে না। সে আর গৌতমই প্রায় এখানে বেমানান। মদ খাওয়া বলতে সে দেখেছে একমাত্র মেজ পিসেমশাইকে। কিন্তু তার সেই দেখা থেকে আজকের ব্যাপারটা অনেক আলাদা। অফিস থেকে ফিরে, চান করে একটা জমকালো সিল্কের স্লিপিং গাউন পরে সাহেবের মতো পিসেমশাই হালকা কাচের গ্লাসে সোনালি রঙের যে পানীয়টা খেত, দেখলেই সেটাকে মনে হত বিষয়টা ভয়ানক দামী কিছু। কিন্তু এখানকার এই ভীষণ অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, চারিদিকের চিৎকার চেঁচামেচি, মোটা কাচের গ্লাসে রংহীন কুৎসিত পানীয়—দুটোকে সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না।

দ্বিতীয় চুমুকের সময় সে নাকটা প্রায় বন্ধ করে রেখেছিল, তাতে গন্ধটা একটু কমলেও স্বাদের কোনো তারতম্য নেই। সঙ্গে একটা ভীষণ ঝাল চানাচুর দিয়েছিল, সেটাকে মুখে দিয়ে সে কিছুটা সামাল দেবার চেষ্টা করল। গ্লাসটা নামিয়ে রাখার সময় তার মনে হল মাথাটা বোধহয় একটু ঘুরল। গৌতম অবশ্য অবলীলাক্রমে খেয়ে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না, কী ভাবে গোটা গ্লাসটা শেষ করবে। সে বলল, 'আমি আর খাব না।'

খুব সহানুভূতি নিয়ে গৌতম বলল, 'ঠিক আছে তোকে আর খেতে হবে না, কিন্তু যেটা নিয়েছিস সেটা শেষ কর।'

'না, আমি এটাও শেষ করতে পারবো না।'

'পয়সা দিয়ে কিনেছি, নষ্ট করিস না।'

আবার এই জঘন্য জিনিসটা তাকে খেতে হবে। সে ঠিক করল, যা হবার হোক যন্ত্রণাটা সে একবারে শেষ করবে। সে ওষুধ খাবার মতো করে একবারে গোটাটা কোনোমতে গলায় ঢেলে দিল। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই, মাথাটা তার ভাল ভাবেই ঘুরছে। সে চোখ

বন্ধ করে ধাক্কাটা সামলাবার চেষ্টা করে। চোখ বন্ধ করেই সে শুনল গৌতম বলছে, 'এই খেয়েছে, এতটা একবারে খেলি?'

চোখ খুলতে গিয়ে তার মনে হল, চোখ খুলতেই তার একটু অসুবিধা হচ্ছে। সে চোখ খুলে দেখল গৌতম উৎকণ্ঠিত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। গৌতমকে আশ্বস্ত করতেই সে গৌতমের দিকে তাকিয়ে হাসল। গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হল, আর তাকে খেতে হবে না। কিন্তু পেটের কাছটায় একটু অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হল একবারে এতটা না খেলেই পারত। সে চুপচাপ বসে রইল। কিন্তু অস্বস্তিটা বাড়ছে, গাটা তার গোলাচ্ছে। সে অনুভব করে যে কোনো মুহূর্তে সে বমি করে দেবে।

'গৌতম, আমি বাইরে যাচ্ছি' বলে সে উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু সে হাঁটতে পারে না, সে শুধু খেয়াল করতে পারে—সে পড়ে যাচ্ছে। গৌতম ছুটে এসে তাকে তুলে দাঁড় করায়। আর দাঁড়ানো মাত্র সে বমি করতে শুরু করে। বমি করতে-করতে সে বসে পরে নোংরা মেঝেটায়। তারপর চারিদিকে কী হচ্ছে তা আর তার খেয়াল নেই। শুধু মনে আছে চারিদিকে একটা হইচই।

কত রাত হয়েছে তা সে জানে না, এমনকী নিজের ঘড়ির দিকে তাকালে যে সময়টা জানা যায় তাও তার মনে পড়েনি। সারা গা তার ভিজে। রাস্তার একটা কলে সে বমিতে মাখামাখি হয়ে যাওয়া জামাকাপড়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছিল। গৌতম তাকে জোর করে বসিয়ে রেখেছিল কার্জন পার্কের এক কোণে। সে কয়েকবার বাড়ি ফেরার কথা বলেছিল, কিন্তু গৌতম তাকে ধমকে বসিয়েছে, বলেছে এই অবস্থায় তাকে বাড়ি যেতে হবে না। তারপর রাস্তা ফাঁকা হয়ে এলে বোধহয় শেষ বাসে করে তারা দুজন ফিরে এসেছে। তাকে গলির মোড়ে ছেড়ে দিয়ে গৌতম চলে গেছে।

তাদের পাড়ার রাস্তা ফাঁকা, কেউ নেই। রাস্তার কুকুরগুলো চেনা লোক দেখে চুপচাপ। সে ছোটর ঘরের জানালার নীচে এসে দাঁড়ায়। সে চায় না, মা এসে এখন দরজা খুলুক, সে সোজা বাথরুমে ঢুকবে, তারপর চান করে বেরোবে, মা যাতে কিছু বুঝতে না পারে।

কী ভেবে সে তাকিয়েছিল মাই হেভেনের দিকে। সে স্বপ্নেও ভাবেনি, তিশিকে সে এখন দেখতে পাবে। নিজের বারান্দায় না, তিশি দাঁড়িয়ে বাইরের গেটে, এত রাতে একা। তিশিকে ঘিরে একটা স্বচ্ছ নীল আলো। তিশি তাকে ডাকছে। সে যা দেখছে তা অসম্ভব, তা জেনেও সে ধীরে-ধীরে গিয়ে দাঁড়ায় তিশির সামনে। তিশির মুখের দিকে তাকিয়ে সে বোঝার চেষ্টা করে, কেন তিশি তাকে ডেকেছে। তিশি গম্ভীর, সচরাচর না হাসলেও যতটা গম্ভীর থাকে তার থেকেও বেশি গম্ভীর। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এক হাত দূরে দাঁড়িয়ে তিশি তাকে ভাল করে দেখে। সে লজ্জায় মরে যাচ্ছে এভাবে তিশির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে। প্রথমে গৌতমের ওপরই তার রাগ ধরল, কেন গৌতম তাকে নিয়ে গেল এভাবে। অনেকক্ষণ পরে তিশি কথা বলল, 'এত দেরি করলে কেন?'

সে এ কথার কী উত্তর দেবে? সে নিশ্চিত তিশি সবটাই বুঝেছে। সে খুব আস্তে আস্তে বলে, 'সরি, আর কোনোদিন হবে না।'

একটা করুণ মুখ করে তিশি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার এই অধঃপতনে তিশি ব্যথিত। সে অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার তিশি প্রায় ধমকে ওঠে, 'এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না যাবে?'

সে জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায়?'

'ও, সেটাও ভুলে গেছ? সত্যি! এসো আমার সঙ্গে।' গেট খুলে তিশি ভেতরে ঢুকে যায়। সেও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তিশির পেছন পেছন ভেতরে ঢোকে। আর তখনই শীতের সকালের কুয়াশার মতো গোটা মাই হেভেনটা পৃথিবী থেকে মুছে যায়। আকাশটা ভোর না হয়েও ভোরের মতো রুপোলি পাড় দেওয়া কমলা রঙের। আর সেই আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটা অলৌকিক সিঁড়ি বেয়ে তিশি উঠতে শুরু করে। সেও তিশির পেছন পেছন উঠতে থাকে। তিশির ওঠার ভঙ্গি সাবলীল, তিশি যেন ভেসে যাচ্ছে। আর তার সারা পা জুড়ে সারা জীবনের ক্লান্তি আর অবসাদ। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে তিশির সঙ্গে তাল রাখতে। তার সারা শরীর ভেজা, হাওয়ায় তার কেমন একটা কাঁপুনি দিচ্ছে। তার ভয় হচ্ছে তিশি হারিয়ে যাচ্ছে, তিশিকে সে আর কোনোদিন পাবে না। সে সেই সিঁড়ি দিয়ে আপ্রাণ ছোটে তিশির আকাশি দোপাট্টার প্রান্তকে লক্ষ করে। সে পারছে না, তিশি আরো দূরে চলে যাচ্ছে। তার আর দম নেই, সে পাগলে মতো তিশিকে ডাকে। তিশি তার ডাক শুনতে পাচ্ছে না, তার আশঙ্কাই ঠিক—তিশি চলে যাচ্ছে। সে শেষ বার ডাকবার চেষ্টা করে, তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে একটা আর্তনাদ। সে নিশ্চিত ছিল, এবারও তিশি শুনতে পাবে না। কিন্তু তার সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তিশি ফিরে তাকায়। তিশিকে ফিরে তাকাতে দেখে সে বসে পড়ে সিঁড়িতে, দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতাও তার নেই। তাকে বসে পড়তে দেখে তিশি সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে থাকে দ্রুতগতিতে। তিশির সারা চোখে, সারা শরীর জুড়ে তার জন্য উৎকণ্ঠা আর দুঃখ।

তিশি এসে বসে তার পাশে। তার ঠাণ্ডা হয়ে আসা একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে তিশি জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে তোমার?'

সে আস্তে-আস্তে তার মাথাটা নামিয়ে দেয় তিশির কোলে। গভীরভাবে শ্বাস নিয়ে সে অনুভব করতে চায় তিশির গন্ধ। তিশি তার মাথার চুলে বিলি কেটে দেয়। আবার তিশি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কী হয়েছে, বললে না?'

সে মুখ তুলে তাকায় তিশির দিকে। তিশির গোটা মুখ আলোকিত, কোনো এক ছোটবেলার স্বপ্নে সে মায়ের মুখে এ রকম আলো দেখেছিল।

'আমার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হয় তিশি। আমি কাউকে বলতে পারি না। কী ভীষণ, কী অপরিচিত সে ব্যথা! আমার তখন সব কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায়, আমার সব কিছু ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করে, আমার সব কিছু ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।'

তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে তিশি বলে, 'দেখ, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমার সব ব্যথা সারিয়ে দেব, সব কিছুকে ভুলিয়ে দেব।'

'তুমি তাই করো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি আলোতে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি শুধু অন্ধকারে, আরো গভীর অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। সবাই তো দিব্যি আছে, আমাকেই কেন সবার যন্ত্রণা নিয়ে বাঁচতে হবে? তুমি আমার সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দাও। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়ব, একদম চিরকালের মতো। আমি কতদিন ঘুমোই না তিশি।'

তিশি কোনো কথা না বলে কেবল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তিশির হাতে কনকচাঁপার গন্ধ। সে হাতে স্পর্শে এক অদ্ভুত শীতলতা, যা সব উত্তাপ মুছে দেয়।

ছোটর বন্ধুরা খুঁজতে-খুঁজতে তাকে যখন মাঝরাতে আবিষ্কার করে, সে তখন পাড়ার মোড়ে ভ্যারাইটি স্টোর্সের সামনের বারান্দায় ঘুমোচ্ছিল। পরের সারা দিন সে যন্ত্রণায় মাথা তুলতে পারেনি। তারপর থেকে ছোট তার সঙ্গে কথা বলেনি অনেক দিন।

'তুমি যাবে না কেন?'

'আহা আমি কী তা বলেছি? বলেছি, আপনারা যান আমি আজ যাব না, আমার একটা ঝামেলা আছে।'

'ওই একই তো কথা হল। মোদ্দা হচ্ছে, তুমি যাবে না।'

কাউন্টারের আরেক দিক থেকে পল্টু মন্তব্য করল, 'বুঝলেন না নীরেনদা। চন্দ্রশেখরদা হল চালাক। যদি লড়ে আপনারা কিছু আনতে পারেন তাহলে তো সবার মতো ওনাদেরও হবে। তাহলে শুধু শুধু মিছিল-মিটিং করে কেন মালিকের কুনজরে পড়বেন?'

'তুমি থামবি। কে তোকে পাকামো করতে বলেছে।' কড়া ভাবে ধমকে উঠল নীরেনদা। তারপর তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পল্টুর কথায় রাগ কোরো না, ওর ও রকম বলদ বলদ কথা।'

সে বিষণ্ণভাবে হেসে বলল, 'না, পল্টু তো ঠিকই বলেছে।'

'ও চন্দ্রশেখরদা, আমার কথায় রাগ কোরো না। আমি অত সব ভেবে কিছু বলিনি। আমরা দুজন যাব তুমি যাবে না, এ হয় নাকি? চল না, তোমারও ভাল লাগবে। এমনিতে মালিকদের হাবভাব দেখলে মনে হয় সব শালা ভগবান। মিটিংয়ে গেলে আমি বেশ কষ পাই, পরের কয়েক দিন আমিও উল্টোপাল্টা কিছু বললে ছেড়ে কথা বলি না।'

পল্টুর বলার ভঙ্গিতে তারা দুজন হেসে উঠল। বইয়ের দোকানের কর্মচারীদের ইউনিয়নের আজকে মিটিং কলেজ স্কোয়ারে। গত কয়েকদিন ধরে নীরেনদা তাকে নিয়ে পড়েছে, তাকে সে মিটিংয়ে নিয়ে যাবেই। আর সে আপ্রাণ কাটাবার চেষ্টা করছে। আজ মিটিং, কাজেই এখন চলছে চূড়ান্ত হেস্তনেস্ত।

'তোমার কি এসব দেখেও একটু প্রতিবাদও করতে ইচ্ছে করে না', নীরেনদা জিজ্ঞাসা করে।

'আমি এই সব ব্যাপারে আপনাদের সঙ্গে একমত।'

'তাহলে আমাদের সঙ্গে মিটিংয়ে যাবে না কেন?'

'আচ্ছা মিটিংয়ে না গেলে প্রতিবাদ করা যায় না?'

'এত লেখাপড়া শিখে তুমি এ সব কী বল? তুমি না গেলে সবাই কী করে বুঝবে তোমার কথা। আর তুমিই বা জানবে কী করে, তোমার সঙ্গে আর কারা আছে। মালিকের ওপর রাগ হল, তুমি ছাদে গিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে খুব গাল দিলে, তাতে তোমারই বা

কী লাভ, মালিকেরই বা কী ক্ষতি? পল্টু একটা কথা ঠিক বলেছে—মিটিং-মিছিলে না গেলে বোঝা যায় না নিজের জোর কতটা। ছোট একটা জায়গায় আমরা কজন, মনে হয় মালিক চাইলে পিষে মারতে পারে। কিন্তু আমাদের মতো এতগুলো লোককে একসঙ্গে দেখলে ভরসা পাওয়া যায়।'

সে হাসতে-হাসতে বলে, 'ঠিক আছে, আজ আমায় ছেড়ে দিন, পরের বার নিশ্চয়ই যাব।'

কাউন্টার মোছার কাপড়টা দিয়ে নীরেনদা জোরে জোরে কাউন্টারটা মুছতে শুরু করল। আর মাথাটা নীচু রেখেই বলল, 'বুঝি-বুঝি, তুমি শত হলেও তো ভদ্রলোকের ছেলে। আমাদের মতো খাপড়া আর টালির ঘরে থাক না। আমাদের সঙ্গে এত গা ঘষাঘষি করতে তোমার ভাল লাগবে কেন?'

সে অসহায়ের মতো বলল, 'আমার কথার এই মানে করলেন আপনি? আমাকে দেখে আপনার এত দিনে এই মনে হল?'

'কী জানি ভাই, ভদ্রলোকদের দেখে আমি কিছু বুঝি না। এই যে ভোলা, ওকে দেখলে বোঝা যায় ও কত বড় শয়তান?' মালিকের অবর্তমানে নীরেনদা সবসময়ই মালিকের নাম ধরেই উল্লেখ করে। 'আমি কোনোদিন ভুলব আমাদের নারানদার কথা? নারানদা ভোলার আগের প্রেসের ক্যাশিয়ার ছিল। একবার ব্যাঙ্কে প্রেসের টাকা জমা দিতে গিয়ে নারানদার কাছ থেকে টাকাটা ছিনতাই হয়ে গেল। আর এই শুয়োরের বাচ্চা ভোলা বাপের বয়সী নারানদাকে এক বাজার লোকের সামনে কী মার মারল। নারানদা যদি তোমাদের মতো ভদ্রলোক হত, তাহলে কোনোদিন ভোলা এ কাজ করত না। কিন্তু আমি তো শালা ছোটলোক, আমিও ঠিক করেছি যদি কোনোদিন সুযোগ পাই আমিও শালা এই ভোলাকে বাজারের মধ্যে জুতো খুলে মারব।

নীরেনদাকে এত উত্তেজিত হতে এর আগে সে কখনো দেখেনি। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'ঠিক আছে নীরেনদা, আমি যাব।'

তাকে নিয়ে এমন ভাবে নীরেনদা কলেজ স্কোয়ারে ঢুকল যেন যুদ্ধ জয় করে এসেছে, আর সে হল সেই যুদ্ধ জয়ের ট্রফি। এর আগে একপ্রস্থ হয়ে গেছে দোকানে। তাদের হয়ে নীরেনদাই ভোলাবাবুকে বলেছিল যে, তারা বিকেল চারটায় দোকান বন্ধ করে দিয়ে মিটিংয়ে যাবে। লোকটা ছোটলোকের মতো চ্যাচাতে শুরু করল। গলা না তুলেও নীরেনদা তার কথা বলে গেছে। তারপর লোকটা পড়ল তাকে নিয়ে, 'ও সেদিন চাকরি পাকা করলাম আর এর মধ্যে একদম পাখা গজিয়ে গেল?'

সে এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। রাগ তারও হচ্ছিল, এবার সুযোগ পেয়ে সে মুখ খুলল, 'চাকরি মানে কি আমার সব কিছুর মালিক আপনি? আমার যেখানে ইচ্ছে হয় সেখানে যাব, আপনি বলার কে? দরকার হলে আপনি একদিনের মাইনে কেটে নেবেন।'

চ্যাঁচামেচি শুনে এতক্ষণে বেরিয়ে এলেন রঞ্জনবাবু। ভোলাবাবুকে থামিয়ে তিনিই কথা বললেন তাদের সঙ্গে। কথাবার্তায় ঠিক হল, আজকের ব্যাপারটা ঠিক আছে কিন্তু ভবিষ্যতে এভাবে যাওয়া যাবে না। আগের থেকে মালিকদের জানাতে হবে। আর চেষ্টা করতে হবে দোকানটা যেন বন্ধ না হয়। কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোলাবাবু, 'না, যেদিন মিটিং-মিছিলে যাবে সেদিনের মাইনে কাটা যাবে।'

উত্তর দিল নীরেনদা, 'ঠিক আছে মাইনে কাটবেন। কিন্তু আমরাও জানিয়ে রাখছি, চাকরির শর্ত ঠিক করে দিতে হবে। ওই যা ইচ্ছে হবে তা করানো যাবে না। আট ঘণ্টার বেশি ডিউটি দিলে ওভারটাইম দিতে হবে। আর পুজোর সময় এক মাসের মাইনে বোনাস দিতে হবে, ঐ নমনম করে দুশো টাকা দিলে হবে না।'

ভোলাবাবু আবার কী একটা বলতে যাচ্ছিল, আটকালেন রঞ্জনবাবু, 'ঠিক আছে নীরেন, সে সব ঠাণ্ডা মাথায় পরে দেখা যাবে। শুধু-শুধু অশান্তি বাড়িয়ো না।'

নীরেনদা বলল, 'অশান্তি আমরা বাড়াব কেন স্যার? আপনি জানেন, আপনার দেওয়া ওই কয়েকটা টাকাই আমাদের সম্বল। নেহাত বাধ্য না হলে আমরা কিছু বলি না।'

'হ্যাঁ, ওই টাকাই তোমার সম্বল, সেটা মনে রেখো।' গজরাতে-গজরাতে ভোলাবাবু বেরিয়ে যায়।

পারলে নীরেনদা সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেয়। সবার কাছে তার পরিচয় করানো হচ্ছে লেখাপড়া জানা লোক বলে। তাকে কলেজে ভর্তি হতে বলেছে রঞ্জনবাবু, এই ঘটনাটাই নীরেনদার বর্ণনায় হয়ে যাচ্ছে, তার বিদ্যাবুদ্ধি দেখে রঞ্জনবাবু কেমন মুগ্ধ হয়েছেন তার বিবরণে। আর এমনভাবে নীরেনদা বলছে সে বাধাও দিতে পারছে না। সে ইতিমধ্যেই ওখানে শ'তিন-চারেক যে লোক জড়ো হয়েছিল তাদের কাছে বেশ দর্শনীয় বিষয় হয়ে উঠেছে। শেষমেশ নীরেনদা বলল, 'তবে আজ আমাদের চন্দ্রশেখর ভোলার মুখের ওপর যা বলে এসেছে, ভোলা আর কোনোদিন মুখ খুলবার সাহস পাবে না।'

সে জানে কথাটা ভীষণ মিথ্যা। সে কিছুই বলেনি, অন্তত ভোলাবাবু ভয় পেতে পারে এ রকম কিছু। আসলে যা লড়াই করেছে, তাদের হয়ে যা কথা বলার, তা বলেছে নীরেনদাই।

মিটিং শুরু হবে। একটা মাইকে কয়েকজন তারস্বরে স্লোগান দিচ্ছে। সে এক কোণে দাঁড়িয়ে ভাবে, এই যে নীরেনদা এভাবে বলছে, তা কি বিনয়? না মানুষটা এতটাই ভাল যে, তার সম্পর্কে এত বড় করে ভাবে। তার অতিপরিচিত ভদ্রলোকের গণ্ডিতে একটা প্রথামাফিক বিনয়ের ব্যাপার আছে, যেটা কাঁটার মতো আলাদা করে অনুভব করা যায়, বোঝা যায় এগুলো আসলে কৌশলগত কারণে তৈরি মেকি অলঙ্কার। কিন্তু সে নিশ্চিত নীরেনদার গোটা ব্যাপারটার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই। তার ভয় হল, সত্যিই কি লোকটা তাকে এত বড় মনে করে? কিন্তু তা ভাবলে সেটা হবে ভীষণ ভুল। সে কী, তা তো সে নিজে জানে। সে যে আসলে চারশ বাহাত্তর পাওয়া একটা অতি সাধারণ ছেলে, তার জন্মই হয়েছে অ্যাকাউন্টেন্সি আর অডিটিংয়ের বই বেচবার জন্য। নীরেনদার ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকার, সম্ভব হলে এক্ষুনি।

যে নেতার বক্তৃতা দিতে আসার কথা ছিল সে বোধহয় চলে এসেছে। মঞ্চের দিকে একটা বাড়তি ব্যস্ততা। দূর থেকে সে দেখল, হলুদ রঙের পাঞ্জাবি পরা ভাল চেহারার একজন লোক, তাকে ঘিরেই উত্তেজনাটা। সে ভয় পেয়ে গেল এবার যদি নীরেনদা তাকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় নেতার সঙ্গে আলাপ করাতে, তাহলে সেটা হবে একদম কেলেঙ্কারি। সে আরো পিছিয়ে গিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়ায়, যাতে নীরেনদা তাকে দেখতে না পায়। আর তখনই কথাটা তার মাথায় খেলে যায়। গোটাটা বোধহয় নীরেনদার

কৌশল। তাকে সবার কাছে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসলে নীরেনদা তার সরে যাবার পথটা বন্ধ করে দিতে চাইছে। সবাই তাকে আলাদা চোখে দেখছে, সবাই তার কাছ থেকে অনেক কিছু প্রত্যাশা করছে, এটা বুঝিয়ে দিয়ে নীরেনদা তাকে মানসিকভাবে এমনভাবে জড়িয়ে দিতে চাইছে যাতে সে আর পালাতে না পারে। সে আস্তে-আস্তে মিটিং থেকে বেরিয়ে আসে।

বিকেল বেলার মির্জাপুর স্ট্রিট দিয়ে বন্যার স্রোতের মতো মানুষ ছুটছে শিয়ালদার দিকে। হয়ত উল্টোদিকের একটা ক্ষীণ স্রোতও আছে, কিন্তু সে স্রোত এত দুর্বল যে তাকে আলাদা করে বোঝা যায় না। পুজো এগিয়ে আসছে, হকারদের স্টলে তুমুল ভিড়। সে উল্টো দিকের ফুটপাত ধরে এগোয়। পুঁটিরামের দোকানের সামনে এক দল ছেলেমেয়ের ভিড়, বোধহয় প্রেসিডেন্সির। তার মধ্যে চশমা পরা একটা মেয়ে দেখতে ভারি মিষ্টি। চলার গতি কমিয়ে সে মেয়েটাকে ভাল করে দেখে। তার প্রায় নিজের বয়সী ছেলেমেয়েদের তার মনে হয় অন্য প্রজাতির কেউ। সে যে কোনোদিন এ রকম ছিল তা তাকে কষ্ট করে ভাবতে হয়। সে যেন আজন্মকাল থেকে এই কলেজ স্ট্রিট থেকে শিয়ালদাগামী জনস্রোতের এক বৈশিষ্ট্যহীন বিন্দু। তার কোনো অতীত নেই, তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের উল্টোদিকে নতুন ওঠা ফুলকপির সামনে জমে থাকা ভিড় এড়িয়ে সে বিগত শতাব্দীর মতো এগিয়ে যায়। শুধু তার একটাই সন্দেহ হয়, যদি সে অনন্তকাল ধরে এ পথেই হেঁটে থাকে তবে কেন সে নীরেনদার মিটিং ছেড়ে পালিয়ে এল? যদি এটাই তার ভবিতব্য হয় তবে এই নতুন বাস্তবতাকে আঁকড়ে না ধরে সে কেন পালিয়ে যাচ্ছে? এরাই তো তার আপনজন, সে তবে কেন এটা গ্রহণ করতে পারছে না। এরা তাকে ভালবাসে, এরা তাকে আপন করে চায়। তাহলে কী নীরেনদার কথাই ঠিক—খাপরা আর টালির চালের ঘরে থাকে না বলে সে আলাদা জগতের লোক? অথচ সে নিশ্চিত করে জানে তার নিজের কোনো জগৎ নেই, যা ছিল তা সে হারিয়েছে। কলেজ ক্যান্টিন, নিউ এম্পায়ারের ম্যাটিনি শো বহুদূরে আবছা হয়ে এসেছে।

সে ওই ভিড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। কারণ তার নাকে আসছে অগুরুর গন্ধ। সে আতঙ্কিত হয়ে চারিদিকে তাকায়, গন্ধের উৎস খুঁজতে। কিন্তু তার পাশ দিয়ে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যেতে যেতে কমলা শাড়ি পরা অল্পবয়সী মেয়েটা নাকে রুমাল চাপা দেয়। সে পরিষ্কার দেখতে পায় মেয়েটার চোখেমুখে ঘেন্না। সে গন্ধটার উৎস খুঁজে পেয়েছে। গন্ধটা আসছে তার নিজের গা থেকে।

সকালবেলায় সে খাচ্ছিল কাজে বেরোনোর আগে। এ সময় সে খেতে বসে বারান্দায়। মা তাকে খেতে দিচ্ছিল। গায়ত্রী এসে হাজির বেশ সাজগোজ করে। এসেই মাকে টিপ করে প্রণাম।

মা'ই জিজ্ঞাসা করল, 'কী রে, কী হল? হঠাৎ প্রণাম?'

এক গাল হেসে গায়ত্রী বলল, 'মাসিমা, জীবনে প্রথম চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি, একটু আশীর্বাদ করুন যাতে চাকরিটা হয়।'

মা'ও খুব খুশি হয়ে বলল, 'করছি রে, আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি তোর যাতে চাকরিটা হয়।'

'গায়ত্রীদি ইন্টারভিউতেই যা সেজেছ, চাকরি পেলে তাহলে কত সাজবে?' আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে ছোট কখন বেরিয়ে এসেছে।

'সে আমি জানি না, সবাই বলে ইন্টারভিউতে সেজেগুজে যেতে হয়।'

সে জানে আসলে গায়ত্রী খবরটা দিতে এসেছে তাকে। খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, সে উঠে হাত ধুতে যায়। শুনতে পায় গায়ত্রী ছোটকে বলছে, 'বলিস না ছোট, কী কাণ্ড! কাল বিকেলে ইন্টারভিউয়ের চিঠিটা এসেছে। অথচ পোস্ট করেছে সাত দিন আগে। ভাব, যদি কাল না এসে আজ বা আরো পরে আসত, তাহলে কী হত?'

ছোট বলল, 'আসল কথা বলো, কোথায় ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছ?'

'ও সেটাই বলিনি? হেল্‌থ ডিপার্টমেন্টে, এল ডি ক্লার্কের পোস্টে।'

মা হঠাৎ বলে, 'হ্যাঁ রে ছোট তোদের পার্টির লোকদের একটু বলে দিতে বল না, গায়ত্রীর চাকরিটা যাতে হয়।'

হাসতে-হাসতে ছোট বলে, 'মা সরকারি চাকরি এভাবে হয় না।'

'কেন হবে না, সবাই তো তাই বলে। তোদের পার্টির লোকরাই তো সরকার চালায়।'

ছোট বোঝানোর চেষ্টা করে, 'মা, আগে এ সব হত। এখন এ সব হয় না।'

'সে সব আমি জানি না, মেয়েটার চাকরিটা হওয়া খুব দরকার', মা রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

গামছায় হাত মুছতে-মুছতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর ইন্টারভিউ কটায়?'

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গায়ত্রী জবাব দেয়, 'এগারোটায়। আমি একদম রেডি হয়ে বেরিয়েছি।'

গায়ত্রী তার সঙ্গেই বেরোয়। বাসস্টপে এসে গায়ত্রীকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'কী রে ট্যাক্সি করে যাবি নাকি?'

চোখ কপালে তুলে গায়ত্রী তাকে বলে, 'তুই পাগল হয়েছিস?'

সে বলে, 'ঠিক আছে চ, মিনিবাসে করে আমিই তোকে পৌঁছে দিই।'

'তুই যাবি আমার সঙ্গে?' গায়ত্রীর প্রশ্নের ভঙ্গিতেই বোঝা যায় যে সে খুশি হয়েছে। 'চ, তুই গেলে খুব ভাল হয়, আমার ভীষণ নার্ভাস লাগছে। কিন্তু তোর পৌঁছতে দেরি হবে না?'

যে অফিসে গায়ত্রীর ইন্টারভিউ সেটা এসপ্ল্যানেড থেকে মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ। মিনিবাস থেকে নেমে হাতের ফাইলটা তার হাতে দিয়ে খুব যত্ন করে শাড়ির ভাঁজ ঠিক করল। তারপর তার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'দেখ তো চাঁদু, ঠিকঠাক লাগছে তো?'

সে নিশ্চিত এ রকম হাসি সে কখনও হাসতে পারবে না। কিন্তু হাসিটা বোধহয় সংক্রামক, অনেক দিন পরে তার হঠাৎ ভাল লাগছে।

যেতে যেতে খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁ রে, ইন্টারভিউতে কী ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করবে?'

সে বলল, 'আমার মনে হয় না। রাজ্য সরকারের ক্লার্করা ইংরেজি বলতে পারে বলে আমার মনে হয়নি কোনো দিন।'

গায়ত্রীর ভয় যায়নি, 'সে জানি না, কিন্তু যদি সত্যি-সত্যি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করে

তবে আমি কিচ্ছু পারব না।'

সে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে, 'আরে না পারার কী আছে। শুধু মনে রাখবি, বাকি যারা ইন্টারভিউ দিচ্ছে তারা কেউ ইংরেজির পণ্ডিত না।'

'না, সে আমি ভেবে রেখেছি। আমি পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দেব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গায়ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করে, 'জানিস চাঁদু, চাকরিটা হলে কত মাইনে পাব?'

সে জোর করে গলায় কিছুটা উৎসাহ এনে বলে, 'কত রে?'

'আমি হিসেব করে দেখলাম, প্রায় বারোশ টাকা।'

'বলিসি কী রে, তুই তো বড়লোক হয়ে যাবি?'

'সে বড়লোক কী না জানি না। তবে আমি ঠিক করে রেখেছি, চাকরিটা হলে টিউশনিগুলো সব ছেড়ে দেবো, একটা রান্নার লোক রাখব। আর পারা যায় না।'

'সত্যি, তুই কী স্বার্থপর রে গায়ত্রী, আমাদের খাওয়াবি না?'

'খাওয়াব, বন্ধুদের সবাইকে খাওয়াব। আর তোকে একদিন আমি নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াব।'

গায়ত্রীকে পৌঁছে দিয়ে, বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে সে জীবনে এই প্রথম চোখ বুজে মনে মনে বলে, 'ভগবান, গায়ত্রীর চাকরিটা করে দিও।'

দুপুরে ভোলাবাবু বেরিয়ে যাবার পর যখন রঞ্জনবাবু যখন একা তখন সে অফিসে ঢুকে রঞ্জনবাবুকে বলে, 'স্যার, আপনি একটু বলে দেবেন? আমি আবার কলেজে ঢুকব।'

ভারী চশমার ফাঁক দিয়ে রঞ্জনবাবু তাকে একবার ভাল করে দেখলেন 'ভেরি গুড, আমি বলে দেব। কিন্তু এখন তো বোধহয় সেশন শেষ হয়ে গেছে। তুমি যখন এতদিন অপেক্ষা করলেই, আর একটু অপেক্ষা কর। সামনের হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্টা বেরনো পর্যন্ত, তারপর আবার নতুন সেশন শুরু হবে।'

সে বাধ্য ছেলের মতো মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর কুণ্ঠিতস্বরে বলে, 'স্যার একটা ফোন করব?'

এসব ব্যাপারে ভোলাবাবুর সামনে কোনো কথাই বলা যায় না। রঞ্জনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, করো না।'

অনেক কষ্ট করে অনুপকাকুকে সে ধরতে পারল। প্রথমেই এত দিন কেন সে যোগাযোগ করেনি এর জন্য গালাগাল করে, অনুপকাকু যেটা বলল—তার ফাইল দিল্লিতে চলে গেছে। কিন্তু এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

'এতদিন যখন অপেক্ষা করেছি, আরো কিছুদিন না হয় অপেক্ষা করব', বলে সে ফোন রেখে দেয়।

অনেক দাম হওয়া সত্ত্বেও শিয়ালদা থেকে সে একটা ফুলকপি কিনে বাড়ি ফেরে।

সে যখন পৌঁছেছে তখন ওদের মিটিং শুরু হয়ে গেছে। গোটা ইউনিভার্সিটি লনটা জুড়ে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের ভিড়। ভিড় ঠেলে সে এমন একটা জায়গায় দাঁড়ায় যেখান থেকে মঞ্চটা পরিষ্কার দেখা যায়। মঞ্চে শুভ নেই। অথচ ছাপানো পোস্টারে সে শুভর

নাম দেখেছিল। তাদের দোকানের উল্টোদিকের দেওয়ালে কারা যেন পোস্টারটা লাগিয়েছিল। সে জীবনে এই প্রথম কারোর একজনের নাম পোস্টারে দেখল, যাকে সে চেনে। মিটিংয়ে আসবে এটা সে আগে ভাবেনি। মিটিংয়ের দিনই তার মনে হল, কলেজ স্কোয়ারের উল্টোদিকেই ইউনিভার্সিটি লন। শুভ আসবে সেখানে বক্তৃতা দিতে। বহুদিন শুভর সঙ্গে তার দেখা হয়নি। টিফিনের সময়, 'আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি' বলে সে এখানে চলে এসেছে। কিছুক্ষণ পরে সে শুভকে দেখতে পেল। মঞ্চের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে একদল ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। সে ভিড় ঠেলে শুভর দিকে এগোতে শুরু করল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, সে শুভর কাছে পৌঁছানোর আগেই শুভর ডাক পড়ল বক্তৃতা দেবার জন্য। সে আবার ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বক্তৃতা শেষ করেও শুভ অনেকক্ষণ মঞ্চের থেকে নামেনি। সে একবার ভাবল চলে যাবে, কিন্তু কী ভেবে সে দাঁড়িয়ে রইল। শুভ মঞ্চ থেকে যখন নামল তখনও মিটিং পুরোদমে চলছে। যে বলছে ছাত্রনেতা হবার পক্ষে তাকে একটু বয়স্কই মনে হল। সে শুভকে ডাকবার আগেই শুভ তাকে দেখতে পেয়েছে। ভিড় ঠেলে শুভই এগিয়ে এল, তাকে দেখে শুভ খুশি হয়েছে সেটা ওর হাসি দেখেই বোঝা যায়।

'কী রে চাঁদু তুই? মিটিং শুনতে এসেছিস?'

সে মাথা নেড়ে বলল, 'না, তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

শুভ বলল, 'চ, চা খাই।'

সে আর শুভ ভিড় ঠেলে এগল। কিন্তু তার এগনো যত সহজ শুভর ততটা নয়। অসংখ্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুভকে এগোতে হচ্ছে। সে ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে শুভর জন্য অপেক্ষা করে। শুভ আসতে পারল অনেক পরে এবং এল ভিড়ের একটা টুকরো সঙ্গে নিয়ে। বোঝা যাচ্ছে শুভ ভিড়টা এড়াতে চাইছে, কিন্তু নতুন নতুন মানুষ ভিড়ে এসে যুক্ত হচ্ছে, প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গেই শুভকে কথা বলতে হচ্ছে। অনেক চেষ্টার পর সে আর শুভ ইউনিভার্সিটির ক্যান্টিনে এসে বসতে পারল। এতক্ষণে সে আর শুভ আলাদা হতে পেরেছে। চায়ের অর্ডার দিয়ে শুভ বলল, 'বল চাঁদু, তোর খবর কী?'

সে হেসে বলল, 'আমি হচ্ছি সেই লোক যার সত্যি-সত্যি কোনো খবর নেই। দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছি। বরং বল, তোর খবর কী?'

'আমার? ওই, যে রকম থাকার কথা সে রকমই আছি।'

সে বলল, 'এটাই হল মুশকিল। আমিও বুঝব না তুই কেমন আছিস, তুইও বুঝবি না আমি কেমন আছি।'

একটু বিষণ্ণ হয়ে শুভ বলল, 'তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। তবুও তোদের সঙ্গে দেখা হলে ভীষণ ভাল লাগে। মাঝেমাঝে আবার কলেজের আড্ডায় যেতে ইচ্ছে করে। তোর করে না চাঁদু?'

'না।'

'কেন?'

'ভয়ে। অতীতের কথা ভেবে যদি বর্তমানটা গুলিয়ে যায়।'

একদল ছেলেমেয়ে হইহই করে তাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাদের মুখপত্র বাচ্চা মতো একটা মেয়ে, 'তুমি এখানে শুভদা? তোমাকে আমরা সব জায়গায় খুঁজে বেড়াচ্ছি,

আর তুমি এখানে বসে আছ? ডেট দাও, আমাদের ওখানে কবে যাবে?'

শুভ বলল, 'ঠিক আছে, আমি পরে গিয়ে বলছি।'

সেই মেয়েটাই আহ্লাদি গলায় বলল, 'পরে না, এখনই ডেট দাও, অনেকগুলো পসিটিভ ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের ওখানে।'

শুভ বলল, 'প্লিস্, এখন একটু কথা বলছি।'

তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে মেয়েটা চলে যাচ্ছিল তার দলবল নিয়ে। হঠাৎ শুভই জিজ্ঞাসা করল, 'এই, তোমাদের জমায়েত কত হল?'

যেতে-যেতে ঘাড় ঘুড়িয়ে মেয়েটা বলল, 'বলব না, তুমি এসো তারপর বলব।'

শুভ প্রশ্রয়ের হাসি হাসল। তারপর আবার তার দিকে ফিরে বলল, 'না রে একদিন জমিয়ে আড্ডা দিতে হবে। একদিন তোর ছুটি দেখে তোদের বাড়িতে চলে যাব। মাসিমাকে বলে রাখবি, সারাদিন থাকব।'

'বল, কবে যাবি?'

'জানিয়ে দেব তোকে।'

'কী করে জানাবি?'

শুভ অসহায়ভাবে বলে, 'ঠিকই, সেটা একটা প্রবলেম তোকে জানাব কী করে। আচ্ছা তুই তো বাড়ি ফেরার পথে আমাদের অফিসে মাঝে-মাঝে আসতে পারিস? একটু আড্ডা মারা যায়।'

সে হাসতে-হাসতে বলল, 'বেশিক্ষণ আড্ডা মারতে পারবি না। তোর আমার কমন সাবজেক্ট তো অতীতের কয়েকটা দিন। সে ভাঙিয়ে আর কতক্ষণ আড্ডা মারা যাবে?'

শুভ তার কথা শুনে একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কেন রে চাঁদু, ভবিষ্যৎ তো কিছুটা কমন হতে পারে?'

কে একজন এসে খবর দিল, কোন দাদা শুভকে এক্ষুনি ডাকছে। কোন দাদা, সেটা সে ভাল করে বুঝতে পারল না। একরাশ বিরক্তি নিয়ে শুভ উঠে দাঁড়াল, 'চাঁদু, প্লিস্ একদিন অফিসে আয়। মোটামুটি প্রত্যেক মঙ্গলবার বিকেলে আমি অফিসে থাকি। ওই দিন আমাদের সেক্রেটারিয়েট মিটিং হয়।'

সেও উঠে দাঁড়ায়। চলে যাবার মুখে শুভ হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়, তারপর কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোর চেহারাটা এ রকম হয়েছে কেন রে?'

সে হাসতে-হাসতে বলে, 'কমরেড, মেহনতি মানুষের চেহারায় কোনো লালিত্য থাকে না।'

তার কাঁধে একটা হাত রেখে উৎকণ্ঠা মেশানো গলায় শুভ বলে, 'বাজে কথা ছাড়। তোকে ভীষণ সিক্‌লি লাগছে। মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরে অসুখে ভুগছিস।'

'যা শুভ, তোর দেরি হয়ে যাচ্ছে', বলে সে বেরিয়ে আসে।

তার মাথার যন্ত্রণাটা কখন হবে তার কোনো ঠিক নেই। কিন্তু সে দেখেছে সাধারণত রাতের দিকেই সেটা বেশি হয়। কোনোদিনই সে কোনো ওষুধ খায়নি এর জন্য। কারণ তার যেটা হয় সেটা কোনো পরিচিত ব্যথা নয়, একটা তীব্র অস্বস্তি। আর মুশকিল হয় তখন সে কিছু ভাবতে পারে না, সবটা কেমন জট পাকিয়ে যায়। একটাই বাঁচোয়া, সমস্যাটা

যে রকম হঠাৎ শুরু হয়, চলে যায়ও হঠাৎ। কিন্তু আজ তার অস্বস্তিটা শুরু হয়েছে দুপুর থেকেই। তার এখন দোকান ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আজকে তারও কোনো উপায় নেই। শরীর খারাপ বলে রঞ্জনবাবু আসছে না, থাকছে ভোলাবাবু। তাকে আগে চলে যাবার কথা বলা যায় না। কিন্তু অস্বস্তিটা আজ এতটাই তীব্র যে, সে কিছু করতে পারছে না। কাউন্টার থেকে নীরেনদা তাকে একটা বই র‍্যাক থেকে নামিয়ে দিতে বলছে, এটুকু সে বুঝতে পারছে, কিন্তু তারপর সে কী করবে সেটা সে বুঝতে পারছে না। এমনকী বার দুয়েক নীরেনদা বলা সত্ত্বেও সে বইটার নামও মনে করতে পারছে না। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বইয়ের র‍্যাকের সামনে। বিরক্ত নীরেনদা তাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বইটা র‍্যাক থেকে নামিয়ে নিয়ে যায়। যে ছেলেটি বইটা কিনছিল সেও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

বইটা নিয়ে ছেলেটা চলে গেলে নীরেনদা তার কাছে এসে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, 'খুব যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়?'

সে চুপ করে থাকে। নীরেনদা বলে, 'ঠিক আছে তুমি বিশ্রাম নাও, কিছু করতে হবে না।' পকেট থেকে পয়সা বার করে পল্টুকে বলে, 'যা তো পল্টু একটু কড়া করে চা বানিয়ে নিয়ে আয়। চা খেলে মাথার যন্ত্রণা কমে।'

পল্টু তার কেটলি নিয়ে বেরিয়ে গেলে বলে, 'কী তোমার অসুখ আমি বুঝি না। ডাক্তারও দেখাও না, ওষুধ-বিষুধও খাও না।'

সে চুপচাপ বসে থাকে পেছনের দিকের একটা টুলে। কিন্তু তার বারবার মনে হচ্ছে কী একটা জরুরি কাজ তাকে এক্ষুনি করতে হবে। কিন্তু কাজটা কী সে মনে করতে পারছে না। অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে সে মনে করার চেষ্টা করে।

এক সময় সে উঠে দাঁড়ায়। একটা ধাক্কা মেরে অফিসের দরজাটা খুলে সে ভেতরে ঢুকে যায়। ভেতরে ভোলাবাবু একাই ছিল। লোকটা একটা টেলিফোনে কথা বলছে। কিন্তু যেটা দেখে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল, তা হল লোকটা পা দুটো টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে ফোনটা করছে, তাকে দেখেও পাটা নামায়নি। রাগ চেপে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার কেন যেন মনে হল লোকটা নিজের রক্ষিতার সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার কথা আর শেষ হয় না, কিন্তু তার ফোন করাটা জরুরি। সে আর থাকতে না পেরে বলল, 'তাড়াতাড়ি ফোনটা ছাড়ুন আমাকে, একটা জরুরি ফোন করতে হবে।'

লোকটা তার কথা শুনতে পেরেছে এমন কোনো ভাবই করল না। তার একবার মনে হল হাতের ব্যাটনটা দিয়ে সে মারবে নাকি লোকটার টেবিলে তুলে রাখা পাটায়। কিন্তু সে যে কাজে আছে সেখানে থেকে এ রকম উন্মত্ত রাগ দেখানো উচিত নয়। তাই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু মনে-মনে সে গুনতে থাকে। সে ঠিক করে সে সেকেন্ডের হিসাবে তিরিশ পর্যন্ত গুনবে, তার মধ্যে লোকটা যদি টেলিফোনটা ছাড়ে তাহলে ঠিক আছে, আর না হলে সে মজা দেখাবে।

তিরিশ গোনা শেষ হওয়ার পর সে লোকটার দিকে তাকায়, লোকটা ঝুঁকে পড়ে হাসি হাসি মুখে কী যেন বলছে। তার মনে হয় হাসিটা যথেষ্ট অশ্লীল। সে প্রায় বিদ্যুতের চমকের মতো এক ঝটকায় লোকটার হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে ক্রেডেলে রেখে দেয়।

লোকটা কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, একবার তার দিকে আর একবার টেলিফোনটার দিকে তাকাল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, লোকটা এতটাই উত্তেজিত যে, কী বলছে সেটা বোঝাই গেল না।

সে এবার টেলিফোনটা টেনে নিয়ে বলল, 'আমি একটা জরুরি ফোন করব।'

লোকটা তখনো চ্যাঁচাচ্ছে, 'ফোন করব? মামা বাড়ির আব্দার নাকি? যেখান থেকে খুশি করো এখানে কেন?'

লোকটা হাত বাড়িয়ে এবার ফোনটা তার হাত থেকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করল। সে গলাটাকে যথাসাধ্য স্বাভাবিক রেখে কড়া গলায় বলল, 'আপনি খুব ভাল করে জানেন আমার কাজে বাধা দেবার ফল কী হতে পারে। বিপ্লবী পরিষদের ঘোষণা সব কাগজে বেরিয়েছে।'

'কীসের বিপ্লবী পরিষদ? এই ফোন আমার, আমি যা খুশি করব। কে কী করবে?'

'আপনি জানেন যে কাজ করছেন তাতে বিপ্লবী পরিষদ আপনাকে কী শাস্তি দিতে পারে?' টেলিফোনটাকে শক্ত করে ধরে রেখে সে বলে।

লোকটা জানোয়ারের মতো চেঁচিয়ে বলে, 'বিপ্লবী পরিষদ আমার ইয়ে ছিঁড়বে।'

ভারি রিভালবারটার বাটটা দিয়ে সে লোকটার মাথায় একবারই আঘাত করে। লোকটা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বসে পড়ে। পেছনের দুজন যারা এতক্ষণ তার নির্দেশের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে সে বলে, 'এটাকে নিয়ে যাও, ওর বিরুদ্ধে অনেক কমপ্লেন আছে। পরে আমি দেখব।'

দক্ষ হাতে লোকটাকে টানতে-টানতে নিয়ে যায় দুজন। লোকটা তখন কান্নাকাটি করছে। সে মনে-মনে ভাবে নীরেনদা এটা দেখলে খুশি হত। হয়ত এই সুযোগে কয়েক ঘা জুতোর বাড়িও মারত ভোলাকে।

এবার সে ঘরে একা। কিন্তু সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না, সে কেন ফোন করতে এসেছিল। অনেক কষ্টে সে মনে করতে পারছে, তাকে খোঁজ নিতে হবে গায়ত্রীর চাকরির ব্যাপারে। কিন্তু কার কাছে খোঁজ নেবে সেটা সে মনে করতে পারে না।

বোধহয় নীরেনদা ভোলাবাবুকে কিছু বলেছে। ভোলাবাবু তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'কী খুব খারাপ লাগছে?' যথারীতি ভোলাবাবুর গলা খুবই নরম। সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়। কিন্তু তার অসম্মতিকে কোনো গুরুত্ব না দিয়েই বলে, 'ঠিক আছে, আজ চলে যাও। ভাল করে ডাক্তার দেখাও। আর শরীর খারাপ হলে আসতে হবে না, ছুটি নাও।'

সে বোঝে ভোলাবাবুর গোটা বক্তব্যের শেষ কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ছুটি নাও মানে সে যে দিন আসবে না সেদিনের মাইনেও সে পাবে না। এই শেষ কথাটার ধাক্কায় তার সম্বিত ফিরে আসে। সে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'না না, ছুটি নিতে হবে না। আজ একটু বাড়তি রোদে ঘোরাঘুরি হয়ে গেছে, তাই একটু মাথাটা ধরেছে। আপনি ভাববেন না, ও আমি ঠিক হয়ে যাব।'

'সে তোমার ব্যাপার তুমিই ভাল বুঝবে, কিন্তু আমি বলে রাখছি কাজ করার মতো শরীরের অবস্থা না থাকলে ছুটি নিয়ে নেবে।' বলে ভোলাবাবু ভেতরে ঢুকে যায়।

একদিন ছুটি নেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব না। ছোট ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে কলেজে ঢুকেছে। তার মাইনে আর মায়ের পেনশন এই দিয়ে তাদের কোনো মতে চলে যায়। ছোট টাকাপয়সার কথা ভেবেই জয়েন্ট এনট্রান্সের ফর্ম তুলেও জমা দিল না। ছোট বলেছে পারবে না বলে সে ফর্ম জমা দেয়নি। কিন্তু সে জানে ছোট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পেতই। সব বুঝেও সে এমন একটা ভাব করেছে যেন ছোটর কথাই ঠিক, কারণ অন্য কিছু বলার ক্ষমতা তাদের নেই।

কাউন্টারের উল্টোদিক থেকে নীরেনদা তার দিকে তাকিয়ে আছে অসহায়ের মতো। তারপর বলে, 'যাই হোক আজ বাড়ি চলে যাও, আমি সামলে নেব।' তারপর তার একদম কাছে এসে গলাটা নামিয়ে বলে, 'তোমরা আজকালকার ছেলে তোমরা মানো কি না জানি না, একদিন চলো আমার সাথে পায়রাডাঙায়, ওই দিকে এক বাবা আছেন—একদম সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। সব রোগ সারাতে পারেন।'

সে শুধু ভয় পাওয়া স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'চলে যাব বলছেন? যদি ভোলাবাবু কিছু করে?'

'যাও না, আমি আছি। কিচ্ছু করবে না। আমরা মানুষ না? রোগ-ভোগ নেই আমাদের?' নীরেনদা তাকে আশ্বস্ত করে।

বারণ করা সত্ত্বেও নীরেনদা পল্টুকে পাঠিয়েছিল তার সঙ্গে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত। সাড়ে চারটে বেজে গেছে, বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কমলেও মাথার অস্বস্তিটা তার এখনও আছে। সে গেটের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলছিল। আজ মঙ্গলবার কথাটা তার মাথায় আসা মাত্রই সে বাস থেকে নেমে পড়ল। বাসটা তখন মৌলালির মোড়ে বাঁক নিচ্ছে।

শুভদের অফিসটা কোথায় সেটা সে নিশ্চিত করে জানত না, কিন্তু তার একটা আন্দাজ ছিল। কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই সে অফিসটা খুঁজে পেল। একটা অন্ধকার সিঁড়ির ওপরে দোতলায় শুভদের অফিস। ছোট একটা ঘর, একগাদা ছেলেমেয়ের ভিড়। সে সেই ভিড়ের মধ্যে শুভকে খুঁজে পেল না। বড় একটা টেবিলের ওপারে বসে আছে যে ছেলেটি তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কাউকে খুঁজছেন?'

সে শুভর কথা জিজ্ঞাসা করাতে ছেলেটি বলল, 'আপনি বসুন, ও একটা মিটিং করছে।'

সে পেছনের বেঞ্চিটায় বসল। বাইরের থেকে একটা ছেলে ঘরে ঢুকে উল্টোদিকের একটা দরজা খুলে ভেতরের ঘরে ঢুকছিল। এ ঘর থেকে কে একটা বলল, 'এই নান্টু, শুভদাকে বলিস তো ওর সঙ্গে দেখা করতে একজন বসে আছে।' ছেলেটি এমনভাবে ঘরে ঢুকে গেল যার থেকে সে বুঝতে পারল না ছেলেটি আদপেও কথাটা শুনতে পেয়েছে কিনা। কিন্তু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত শুভ এখানেই আছে এবং শুভর সাথে তার দেখা হবে। কথাটা শুভর কাছ থেকে আজই তাকে জেনে নিতে হবে। একটা অল্পবয়সী ছেলে সবাইকে চা দিচ্ছিল, তাকেও এক কাপ চা দিয়ে গেল। সে চুপচাপ চা খেতে শুরু করল। ঘরে সবাই প্রায় কথা বলছে। মাঝে-মাঝে গোটা ঘরটা জুড়ে হাসির রোল উঠছে। গোটা ঘরটার পরিবেশ আদপেও কোনো অফিসের মতো নয়। বরং এটা অনেক বেশি তাদের কলেজের ক্যান্টিনের মতো। কিন্তু ওরা কেন এত হাসছে, তা সে বুঝছে না, সে বোঝার চেষ্টাও করছে না, কারণ সে জানে ওরা যে ভাষায় কথা বলছে সে ভাষাটা সে জানে না। একটাই বাঁচোয়া ওরা কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না, সে চায় না কেউ জানুক তার এখানে আসার উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পরে বন্ধ দরজা ঠেলে শুভ বেরিয়ে এল। দরজা খুলেই শুভর চোখ পড়ল তার দিকে।

'চাঁদু তুই? বোস, একটু বোস আমার মিটিংটা কিছুক্ষণের মধ্যে শেষ হবে। তোর কোনো তাড়া নেই তো? চা খেয়েছিস?'

শুভ প্রায় এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে যায়। তাকে এখানে দেখে মনে হচ্ছে শুভ কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। সে শুভকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে, 'আমি বসছি, তুই মিটিং করে আয়।'

সে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে শুভর জন্য সে প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে বসে আছে। তার পক্ষে এভাবে বসে থাকাটা কঠিন। তার মাথার যন্ত্রণাটা তাকে এক ভাবে বসে থাকতে দেয় না। আর এও তো সত্যি, তার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার থেকে অনেক জরুরি শুভর সেক্রেটারিয়েট মিটিং। কিন্তু তার থেকে বড় কথা যে আওয়াজটা অনেক দূর থেকে আসছিল সেটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। সে মনে মনে হিসাব করে, কোনো হিসাবেই তাদের বাহিনীর এর মধ্যে এতটা চলে আসার কথা নয়। কিন্তু শত্রুদের ট্যাঙ্কের যা হিসাব তাদের আছে, তাতে এত ট্যাঙ্ক ওদের থাকার কথা নয়। প্রকৃতপক্ষে গত এক মাসের যুদ্ধে ওদের ট্যাঙ্ক বাহিনীটাকে তারা ধ্বংস করে দিতে পেরেছে। পশ্চিমদিকে ন্যাশানাল হাইওয়ের সব কটা মুখই তাদের দখলে। তাহলে? তাদের কি হিসাবে কোনো ভুল হল? কিন্তু এ অবস্থায় সে কী করে বসে থাকে। কোনো কথা না বলেই সে শুভদের অফিস থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে বেরিয়ে সে আটকে যায়। অল্পবয়সী কতগুলো ছেলে রংচঙে চামাকাপড় পরে হাতে কতগুলো লম্বা-লম্বা পতাকা দিয়ে ছুটছে। বাচ্চাগুলোর কোমরে ঘুঙুর বাঁধা, ওদের ছোটার তালে-তালে সেগুলো বাজছে। সে জানে এগুলো আসছে মহরমের মহড়া। বাংলায় অনার্সের ইউসুফের কাছ থেকে সে মহরমের গল্প শুনেছিল। আসলে ওরা হাজার-হাজার বছর আগের একটা যুদ্ধের অভিনয় করছে। সে মুগ্ধ হয়ে বাচ্চাগুলোর ছুটে যাওয়া দেখে। রাস্তার ভিড় ঠেলে সে এগোয় মৌলালির দিকে, অনেক দেরি হয়ে গেছে, তাকে তাড়াতাড়ি বাস ধরতে হবে। দেরি হলে মা চিন্তা করবে।

পাড়ার মুখে সে যখন নামে, তখনও বাস স্টপে অনেক লোক। কিন্তু সে কোনো দিকে তাকায় না, কারণ সে বাসে বসে বসেই ভেবে নিয়েছে সে এখন কী করবে। পার্টি অফিসটা বাস স্টপ থেকে দু পা। সে বাইরের থেকে দেখবার চেষ্টা করে ছোট আছে কি না। ছোটকে ভেতরে দেখে সে আশ্বস্ত হয়। সে অফিসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছোটকে ডাকে। তাকে পার্টি অফিসে দেখে ছোট বিস্মিত, হয়ত কিছুটা আতঙ্ক নিয়েই তার দিকে তাকায়। সে হাত তুলে ছোটকে ডাকে। তাকে দেখে সুবীরদা বলে ওঠে, 'কী রে চাঁদু, তোকে তো দেখিই না। আয় আয় ভেতরে আয়।'

'পরে একদিন আসব', বলে সে বেরিয়ে আসে, তার পেছন পেছন ছোট। রাস্তায় নেমে ছোট উৎকণ্ঠাভরা গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কী হয়েছে?'

'তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

ছোটর বিস্ময় তখনও কাটেনি, 'কী?'

'তুই বলতে পারবি, জেনারেল গিয়াপ এখন কী করে?'

চোখ-মুখ কুঁচকে ছোট জিজ্ঞাসা করে, 'কে?'

সে বলে, 'জেনারেল গিয়াপ, ভিয়েতনামের জেনারেল গিয়াপ।'

ছোট আরো বিস্মিত হয়ে বলে, 'তুই এটা জিজ্ঞাসা করতে এখানে এসেছিস?'

'হ্যাঁ বল না, আমার ভীষণ দরকার।'

ছোট অনেকক্ষণ চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মনে হয় ছোট ব্যাপারটা বোঝেনি। সে ছোটকে ভাল করে বোঝাবার চেষ্টা করে, 'আসলে ভিয়েতনামে তো যুদ্ধ অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে...'

তার কথায় মাঝখানে বাধা দিয়ে ছোট বলে, 'দাদা, তুই বাড়ি যা।'

সে আবার ছোটকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করে। ছোট আরো কড়া করে বলে, 'তুই এক্ষুনি বাড়ি যা।'

সে শেষবারের মতো ছোটকে কাতরভাবে অনুনয় করে, 'বলবি না তুই আমাকে?'

গলাটাকে নরম করে ছোট বলে, 'যা তুই বাড়ি যা, আমি এক্ষুনি আসছি। বাড়ি গিয়ে বলব তোকে।'

সে ঠিক করে যাবার সময় গায়ত্রীকে ডেকে নেবে, কিন্তু বাড়ির গেটে গিয়ে খেয়াল করে, এর মধ্যেই সে গায়ত্রীকে ডাকার কথা ভুলে গেছে। সে আর গায়ত্রীকে ডাকতে যায় না। এখন সে ছোটর জন্য অপেক্ষা করবে, আজকেই ফয়সালা হয়ে যাবে। সে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা ছোটর ঘরে চলে যায়, হাতমুখ না ধুয়েই। মা রান্নাঘরে, সে যে ঢুকেছে সেটা বোধহয় মা খেয়াল করেনি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে ছোট ঢুকল। মাকে ডাকতে-ডাকতে। রান্নাঘর থেকে মা সাড়া দিল। তারপর রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মা আর ছোট কী কথা বলছে, সেটা সে শুনতে পাচ্ছে না। সে চ্যাচায়, 'ছোট, আমি তোর ঘরে।'

ছোট ঘরে ঢোকে, সঙ্গে মা। ছোট চেয়ারটা টেনে তার সামনে এসে বসে, তারপর জিজ্ঞাসা করে, 'বল, কী বলছিলি?'

সে শান্তভাবে আবার প্রশ্ন করে, 'আমি জানতে চাইছিলাম, জেনারেল গিয়াপ এখন কী করে?'

ছোট জিজ্ঞাসা করে, 'তুই এই প্রশ্নটা করছিস কেন?'

ছোটর মতো বুদ্ধিমান ছেলে এই সামান্য ব্যাপারটাও বুঝতে পারছে না দেখে সে কিছুটা অবাকই হয়, তাও সে বলে, 'যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে, তাহলে জেনারেল গিয়াপ এখন কী করে?'

তার প্রশ্নে ছোট যেন কিছুটা বিভ্রান্ত, থমকে বলে, 'হ্যাঁ, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। জেনারেল গিয়াপ এখন ওখানে যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছে।'

সে হো-হো করে হেসে ওঠে, হাসতে-হাসতেই বলে, 'কী বোকার মতো কথা বলছিস ছোট। এত বড় লড়াইয়ের নেতা, আর তুই কি না বলছিস সে এখন কারখানা বানাচ্ছে, চাষবাস করছে? তাও ভাল বলিসনি সে এখন বাড়ির বাগানে গোলাপ ফুলের চারা লাগাচ্ছে।' সে আবার হেসে ওঠে।

ছোট বলে, 'তোর কী ধারণা? কারখানা তৈরি বা চাষবাস করাটা কখনো যুদ্ধ হতে পারে না।'

সে এবার গলাটা তুলে জোরের সঙ্গে বলে, 'তুই আমাকে বোকা বানাতে পারবি না। তুই কি আমাকে অসীমদা পেয়েছিস? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে বলে, সোজা ও. এন. জি. সি-তে গিয়ে চাকরি করতে শুরু করব?'

'শোন, কারখানা বানানো বা চাষবাস করা তো বটেই, কখনো-কখনো গোলাপ ফুলের চারা লাগানোটাও একটা লড়াই। তোদের সমস্যা হচ্ছে, লড়াই কাকে বলে সেটাই তোরা জানিস না। তোদের কাছে লড়াই আর সিনেমা দেখা এক। লড়াইয়ে নাটক থাকবে, উত্তেজনা থাকবে, দর্শকের মনোরঞ্জনের সমস্ত উপকরণ থাকবে। আর তোরা ড্রেস সার্কেলে বসে হাততালি দিবি কিংবা চোখের জল ফেলবি।' ছোট একটানা বলে একটু থামে, তারপর তার দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলে, 'দাদা তুই অসুস্থ, তোকে চিকিৎসা করাতে হবে।'

কেন যেন মা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

সেদিন রাতে ছোট পাড়ার ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে, একগাদা বিরক্তিকর, অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার পর লোকটা তাকে একটা ইঞ্জেকশন দেয়। সে ভেবেছিল ইঞ্জেকশনটা না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যাবে, কিন্তু মার কথা ভেবেই সে বাধ্য ছেলের মতো ইঞ্জেকশনটা নিয়ে নেয়। আগে ডাক্তারবাবুকে দেখে সে কখনো খেয়াল করেনি, আজই প্রথম খেয়াল করল—লোকটার চিবুকটা মাঝখান থেকে কাটা, দেখলেই বোঝা যায় লোকটা ভীষণ অহঙ্কারী। সে সেই রাতে না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

অনেক রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়, কারণ তিশির কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। তাকে একদিন না দেখলেই মেয়েটা ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। সে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। কিন্তু মাই হেভেনের দিকে তাকানোর আগে তার নজর পড়ে বারান্দার কোণে। সে জীবনে এত খুশি হয়নি—কাঠের ঘোড়াটা আবার ফিরে এসেছে। সেই সাদা আর গোলাপি রঙ করা কাঠের ঘোড়াটা, এমনকী ঘাড়ের ওপর কালো রঙ করা চুলগুলোও এখনো জ্বলজ্বল করছে। সে মাকে ডেকে দেখাবে ভাবে, মা'ও নিশ্চয়ই তার মতো খুশি হবে। পরে তার মনে হয়, থাক, সারাদিন পরিশ্রম করে মা সবে ঘুমিয়েছে, কাল সকালেই না হয় দেখাবে। কিন্তু তিশিকে ঘোড়াটা দেখাতেই হবে। সে মুখ তুলে তাকায়। সেখানেও আরো বিস্ময়! ফিরে এসেছে কাপাস গাছটা। আধো আলো আধো অন্ধকার একটা নীল চাঁদের আকাশের নীচে কাপাস গাছটা ফিরে এসেছে। সেই অলৌকিক আকাশের নীচে উড়ে যাচ্ছে হাজার হাজার কাপাস তুলো—সে নিশ্চিত এত সুন্দর দৃশ্য এর আগে সে কখনো দেখেনি। আজকের রাতটা তার জন্য যেন আলাদা করে তৈরি হয়েছে। সে খুশি, সে ভীষণ খুশি। সে জানে এখন কাপাস গাছের কাছে গেলে সে খুঁজে পাবে টুনটুনি পাখির বাসাটা।

সকালে তার ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। বিছানায় শুয়েই সে প্রথমে অনুভব করল, মাথার যন্ত্রণাটা এখন আর নেই। সে আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে বিষয়টা যাচাই করে নেয়, তারপর নিশ্চিত হয়, ব্যথাটা নেই। রান্নাঘরে মা'কে চা দিতে বলে সে সোজা বাথরুমে চলে যায়। ফিরে এসে মা'র হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বলে, 'মা, বাজারের থলি দাও।'

মা কিছুটা ইতস্তত করে বলে, 'তুই বাজারে যাবি?'

'তুমি কি পড়া থেকে তুলে ছোটকে বাজারে পাঠাতে চাও? বলো, বাজার থেকে কী কী আনতে হবে?'

রাতে খাবার সময় ছোট কথাটা বলল, 'শুনেছ মা, গায়ত্রীদির চাকরিটা হয়ে গেছে।'

কথাটা সেও এই শুনল। মা বলল, 'তাই? বা! সত্যি ভগবান মেয়েটার দিকে মুখ তুলে তাকাল।'

এখন দশটা বেজে গেছে, এত রাতে গায়ত্রীদের বাড়িতে যাওয়া যায় না। সে মনে-মনে ঠিক করল, কাল সকালেই যাবে।

গায়ত্রীর নাম ধরে ডাকতেই বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে এল বুড়ি। তাকে দেখে বুড়ি বলল, 'দিদি বাড়ি নেই।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এত সকালে কোথায় গেছে রে?'

'দাদার বাড়ি।' বুড়ির সব জবাবই কেমন যেন দায়সারা। অথচ বুড়ি এ রকম না। সব সময়ই বুড়ি হাসিখুশি। আজ কেন যেন একটু অন্য রকম মনে হচ্ছে। সে আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কখন ফিরবে?'

আবার দায়সারাভাবে বুড়ি উত্তর দিল, 'জানি না।'

আর কোনো কথা না বলে সে চলে আসে।

গায়ত্রী এল রাতে, সে কাজ থেকে ফেরার পর। সে ছিল ঘরে, বাইরে গায়ত্রী মা'র সঙ্গে কথা বলছিল, তাতেই সে টের পেল গায়ত্রী এসেছে। গায়ত্রী তার ঘরে ঢুকতে সে বলল, 'তুই তো অদ্ভুত! মিষ্টি না নিয়ে খালি হাতে এসেছিস?'

গায়ত্রী একটা ক্লান্তিভরা হাসি দিয়ে বলল, 'আগে চাকরি নিই, তারপর তো মিষ্টি খাওয়াব।'

সে গায়ত্রীর কথাটাকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'কবে জয়েন করবি?'

'সেটাই তো ঠিক করতে পারছি না, আমাকে জয়েন করতে হবে আলিপুরদুয়ারে।'

সে কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আলিপুরদুয়ার? সে তো অনেক দূর।'

গায়ত্রী খাটের ওপর তার পাশে এসে বসে, বলে 'তাই তো ঠিক করতে পারছি না, কী করব। সকালবেলা গিয়েছিলাম দাদার কাছে। বললাম জয়েন করলে বাবা-মা আর বুড়িকে কে দেখবে। দাদা পাল্টা বলল, ভবিষ্যতে চাকরি না পেলে আমাকে কে দেখবে। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, কী করব।'

সে বোঝে গায়ত্রী তার পরামর্শ চাইছে। কিন্তু কী পরামর্শ সে দেবে? সে জানে না এই সমস্যার সমাধান কী হতে পারে।

গায়ত্রী বলে যায়, 'আর ঝামেলা করছে বুড়িটা। বলছে, তুই চলে যা, আমি ঠিক সামলে নেব। কিন্তু আমি তো জানি ওর পক্ষে গোটাটা সামলানো প্রায় অসম্ভব। বল না চাঁদু কী করি?

ছেড়ে দেব, পরে অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা করব?'

সে বলে, 'যদি তুই ভাল মনে করিস তবে তাই কর।'

চোখের কোণে একটা ঘনীভূত সন্দেহের ছায়া জমিয়ে গায়ত্রী বলে, 'ছেড়ে দেব? কীসের ভরসায়? কার ভরসায়? পরে যদি আর কোনোদিন চাকরি না পাই?'

সে যদি একটা সুস্থ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হত তাহলে সে বলতে পারত, 'ছেড়ে দে, আমি আছি। দুজনে মিলে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে নেব।' কিন্তু সে পোকা লেগে নষ্ট হয়ে যাওয়া মানুষের মতো চুপ করে বসে রইল।

গায়ত্রী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে, তারপর বলে, 'বাইরে গিয়ে একটা মেয়ে একা-একা থাকবে, লোকে এটা ভাল চোখে নেয় না।' সে নিরুত্তর।

'কাল অফিসে গিয়ে অফিসারকে বলব ভেবেছি, আমাকে কলকাতার কাছাকাছি কোথাও দিন, তা না হলে আমি কী করে পারব।' সে গায়ত্রীর মুখের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে।

গায়ত্রী হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'মেসোমশাইয়ের অফিসে তোর চাকরি পাবার ব্যাপারটা কিছুটা এগোল?'

শুকনো গলায় সে বলল, 'না।'

গায়ত্রী উঠে চলে যায়।

তার চারিদিকের শূন্যতায় সে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে এখনো বাকি আছে। তার জীবনে যেটুকু উত্তাপ তা গায়ত্রীই এনে দেয়। গায়ত্রীও যদি চলে যায় তবে তার আর কিছু থাকে না, যাকে অবলম্বন করে কয়েকটা মুহূর্তও বেঁচে থাকাটা অর্থপূর্ণ মনে হবে। কিন্তু কোনো জোরে সে গায়ত্রীকে থেকে যেতে বলবে? সে নিশ্চিত গায়ত্রীকে দেওয়ার মতো তার কিছু নেই, শুধু গায়ত্রী কেন গোটা পৃথিবীর কাউকেই কিছু দেবার ক্ষমতা তার নেই। সে অভিশপ্ত, কাউকে ভালবাসার ক্ষমতাও তার নেই। বরং গায়ত্রী চলেই যাক, গায়ত্রীর কাছে সে আস্তে আস্তে অতীতের একটা স্মৃতি হয়ে যেতে চায়, যা ক্রমশ সময়ের বৃষ্টিপাতে ফিকে হয়ে আসবে। কিন্তু এই অতল পর্যন্ত বিস্তৃত শূন্যতা সে কী করে সহ্য করবে? সে আর ফিরে আসতে চায় না, সে সারাক্ষণই রঙিন আকাশের জগতেই থেকে যেতে চায়। তার জন্য যদি বিদ্যুতের মতো তীব্র যন্ত্রণাটা তার মাথায় ভেতরে চিরস্থায়ী হয়, তাও সে মেনে নিতে রাজি। তার কাছে যুক্তি অর্থহীন, সত্য অর্থহীন—যাক সবটা তালগোল পাকিয়ে, সে বাস্তবতায় ফিরতে চায় না। বালিশে মুখ ঢেকে সে কাঁদে, গায়ত্রীর জন্য, জীবনে এই প্রথম। যে কান্নার উৎস বিশুদ্ধ দুঃখ তা মানুষকে আরো পরিশুদ্ধ করে, আরো পবিত্র করে। কিন্তু তার কান্নার পেছনে কোনো দুঃখ নেই, আছে এক তীক্ষ্ণ অসহায়তা, কান্না সেই অসহায়তাকে আরো বাড়ায়। তাই তার কান্নার পেছনে পেছনে কোনো নিশ্চিত ঘুমের আলিঙ্গন নেই, আছে মরুভূমির মতো এক ঘুমহীন অতৃপ্তি।

দু-দিন পর কাজ থেকে ফেরার সময় সে গায়ত্রীদের বাড়িতে গিয়েছিল। গায়ত্রী তাকে দোতলার ঘরে ডেকে নেয়। গায়ত্রী আর বুড়ি থাকে ছোট একটা ঘরে। ঘরে একটাই চেয়ার, সে বসে সেই চেয়ারে, গায়ত্রী খাটে। দু-বোন মিলে ওরা হিসাব করছিল গায়ত্রীকে কী-কী কিনতে হবে। তাকে সাক্ষী মানে গায়ত্রী, 'দেখ চাঁদু, আমি বুড়িকে কিছুতেই বোঝাতে

পারছি না, মশারি আর বালিশ এখান থেকে কিনে না গিয়ে ওখান থেকেই কেনাটা বেটার না?'

বুড়ি আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে, 'আমি চা করে আনছি' বলে চলে যায়। খাটের ওপর ডাঁই করে রাখা এক গাদা প্যাকেট। গায়ত্রী বলে, 'দেখ চাকরি পেয়ে কেমন কপাল খুলে গেছে, বৌদি এসে নতুন শাড়ি দিয়ে গেল।'

গায়ত্রী তাকে তার নতুন কেনা জিনিসপত্র দেখায়। আর এই সুযোগে বোধহয় দেখাবার চেষ্টা করে যে, সে খুশি। বুড়ি চা নিয়ে আসে। গায়ত্রী বলে, 'এই চাঁদু, গরম-গরম ডালের বড়া খাবি?' সে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। গায়ত্রী আজ তাকে কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে না। এমনিতে গায়ত্রী একটু চুপচাপ, কিন্তু আজ গায়ত্রী অন্য রকম, ওর কথা থামছেই না। 'আচ্ছা বল চাঁদু টিকিটটা আর-এ-সি, হয়ে যাবে না?'

সে অবশেষে সুযোগ পেলে জিজ্ঞাসা করে, 'তুই কবে যাচ্ছিস?'

'ও, তোকে আসল কথাটাই বলিনি? সত্যি আমার যা অবস্থা না, আমি সব জিনিস ভুলে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি সামনের সোমবার। আলে আমাকে জয়েন করতে হবে পরের সপ্তাহে, কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই একটু আগে যাচ্ছি। নতুন জায়গা তো।'

'এই সামনের সোমবারেই চলে যাবি?' সে অসহায়ের মতো জিজ্ঞাসা করে।

'যেতে যখন হবেই, তখন আর দেরি করব কেন?' বলতে-বলতে গায়ত্রী তন্নতন্ন করে খাটের ওপর কী যেন খুঁজতে শুরু করে। তারপর চেঁচাতে শুরু করে, 'বুড়ি, দেখ তোর কাণ্ড। বারবার করে বলা সত্ত্বেও তুই টেবিল ক্লথটার কথাটা মনে করালি না। আমি এখন কবে আবার টেবিল ক্লথ কিনতে যাব?'

রান্নাঘর থেকে বুড়ি চেঁচায়, 'কেন ওটাও তুই ওখানে গিয়ে কিনিস।'

'আমি মরছি আমার জ্বালায়, আর তুই ইয়ার্কি মারছিস?'

'ছেড়ে দে, আমি তোকে একটা টেবিল ক্লথ এনে দেব', সে বলে।

'না না, ও আমি নিয়ে আসব।'

'আমি দিই না।'

গায়ত্রী হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা তুইই দে।'

'বল, তোর কোন রঙ পছন্দ?'

গায়ত্রী তখনো তার দিকে তাকিয়ে, 'আমার পছন্দ জেনে তুই কী করবি? তুই তোর পছন্দমতো দে।'

এরপর তারা দুজন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। সে বোঝে গায়ত্রীকে বলার মতো কোনো কথা এই মুহূর্তে তার নেই। সে শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'তুই চলে গেলে তোর জুঁই ফুল গাছের কী হবে?'

কোনো কথা না বলে গায়ত্রী এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

গত কয়েকদিন তার মাথার যন্ত্রণাটা হয়নি। ডাক্তারবাবু দুটো ওষুধ দিয়েছে, একটা দিনে দুবার খেতে হয় আর রাতে ঘুমোনোর আগে। দোকান থেকে ওষুধ কিনে এনেছে ছোট, মা তাকে নিয়ম করে ওষুধ খেতে দেয়। বোধহয় ওষুধের গুণেই মাথার যন্ত্রণাটা হচ্ছে না। আজ রবিবার, তার ছুটি। মা আজ গায়ত্রীকে তাদের বাড়ির খেতে বলেছে। বাজার থেকে ফিরে সে

বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটটা শেষ করে সে টুকরোটা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ডাকল, 'প্লিস একটু শুনবেন?'

গলাটার আওয়াজটা একটু ভাঙা-ভাঙা কিন্তু বোঝা যায় কোনো অল্পবয়সী মেয়ের। সে পেছন ফিরে তাকাল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিশি তাকেই ডাকছে। সে আর কিছু অনুভব করতে পারছে না, শুধু অনুভব করছে তিশির সৌন্দর্য। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। হালকা গোলাপি একটা শাড়ি আর হাতখোঁপা নিয়েও তিশি কী অসম্ভব সুন্দর। সে অনেক কষ্ট করে বলে, 'আমাকে কিছু বলছেন?'

একটু কুণ্ঠা নিয়ে তিশি বলে, 'ছোট বাড়িতে আছে?'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে বলে, 'না, ছোট একটু বেরিয়েছে।'

একটু সময় চুপ করে তিশি ভাবে, তারপর বলে, 'ওর দুটো বই আমার কাছে ছিল, ওকে একটু দিয়ে দেবেন?'

সে বারান্দা থেকে হাত বাড়ায়, একটু এগিয়ে এসে তিশি দুটো বই তার হাতে দেয়। তার মনে হয় তিশির আঙুল তার হাতকে এক মুহূর্তে ছুঁয়ে গেছে।

বইটা দিতে দিতে তিশি বলে, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

এই কথার কোনো উত্তর দেওয়া সেই মুহূর্তে তার পক্ষে অসম্ভব, সে শুধু ঘাড় নাড়ে। একটা লাজুক হাসি দিয়ে তিশি বলে, 'আপনাদের ম্যাগাজিনটা আপনারা আর বার করেন না?'

সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কোন ম্যাগাজিন?'

'কেন ক্যানভাস? ছোট আমাকে পড়তে দিয়েছিল। আমার খুব ভাল লেগেছিল। অনেকদিন ভেবেছি আপনাকে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু সাহসই পাইনি।'

'সাহস পাননি? কেন?'

'ও বাবা! আপনি যা গম্ভীর। আমার ভয় লাগত, কিছু বললে যদি রেগে যান।'

সে হাসতে-হাসতে বলে, 'আজ ভয় লাগছে না?'

তিশিও হেসে জবাব দেয়, 'না, আজ আর ভয় লাগছে না। কারণ আজকে রেগে গেলেও আপনি কিছু করতে পারবেন না।'

'কেন?'

'আমরা চলে যাচ্ছি।'

আকাশে কি মেঘ করেছে?

সে জিজ্ঞাসা করে, 'চলে যাচ্ছেন? কোথায়?'

'আসলে আমি জে এন ইউতে লিঙ্গুইস্টিক নিয়ে পড়ব। আর বাবাও বললেন, এখানের পাট চুকিয়ে দিয়ে দিল্লিতে চলে যাবেন। এখানকার ওয়েদার সুট করছে না, বয়সও তো হচ্ছে ওনার।'

'আর আসবেন না?'

মাথা নেড়ে তিশি বলল, 'না, বাবা বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছেন।'

আকাশের দিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই, সে জানে আকাশের রং পাল্টাচ্ছে। আগ্নেয়গিরির মতো যন্ত্রণাটা উঠে আসছে মাথার ভেতর থেকে।

তিশি ভীষণ সুন্দর করে হাসে তারপর বলে, 'আচ্ছা চলি। আর হয়ত কোনোদিন দেখা হবে না। ভাল থাকবেন।'

সে ভীষণ খুশি। অবশেষে সে ভীষণ খুশি। সে যা চাইছিল তাই হয়েছে। তিশিকে সে বলে, 'দাঁড়াও, এক্ষুনি যাচ্ছ কী? আগে দেখো কী করি।'

এমনিতে রকেট লঞ্চারটা ভারি। একটা বেখাপ্পা চৌকো বাক্সের মতো। এতদিন ব্যবহারের পরও কাঁধে নিয়ে যখন এগোতে হয়, ব্যথায় গোটা কাঁধটা টনটন করে। কিন্তু আজ তার মনে হচ্ছে ওটা পালকের মতো হালকা। সে দু পা এগিয়ে ভাল করে পজিশন নেয়, ঘাড় ঘুরিয়ে তিশিকে বলে কানে আঙুল দিতে। এত ভাল লক্ষ্যভেদ বোধহয় সে জীবনেও করেনি। রকেটটা গিয়ে আছড়ে পড়ল, এক তলা আর দোতলার মাঝখানে। আগুনের শিখাটা লাফিয়ে উঠল এমনভাবে যে, কয়েক মুহূর্তে আগুন ঢেকে দিল গোটা বাড়িটা। তারপর তাদের দুজনের চোখের সামনে স্লো মোশান সিনেমার মতো করে মাই হেভেন ভেঙে পড়তে শুরু করল। আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল তিশি। তিশির এই আনন্দের কারণ সে বোঝে, তিশি তার জেলখানা থেকে চিরকালের মতো মুক্তি পেয়েছে তাই কেবল না তার চোখের সামনে সেই জেলখানা ভেঙে পড়ছে। সে অবশ্য নিশ্চিত না, লোকটা ভেতরে আছে কি না। যদি নাও থাকে, যদি শেষ মুহূর্তে পালাতেও পারে, তবে তার ব্যবস্থাও সে করে রেখেছে। সব কটা আউট পোস্টকে বলা আছে—আকাশি রঙের কোনো ফিয়াট যেন পালাতে না পারে। একটা রকেটই যথেষ্ট, কিন্তু সে আবার তার লক্ষ্য ঠিক করে নেয়। জ্বলন্ত বাড়িটার ডান দিকের একটা অংশ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয় রকেটটা আছড়ে পড়ার পর সে কাঁধ থেকে লঞ্চারটা নামিয়ে নেয়। কারণ সে এখন চোখ ভরে মাই হেভেনের ধ্বংস দেখতে চায়। বিস্ফোরণে যে ভাঙা টুকবোগুলো এদিক-ওদিক এসে পড়ছে, পারলে সে সেগুলোকেও মিশিয়ে দিতে চায় মাটিতে। সে চায় মাই হেভেনকে ধ্বংস করে দিতে, তার স্মৃতি বা চেতনা কোথাও সে মাই হেভেনের কোনো চিহ্ন রাখবে না।

মা প্রাণপণ চেঁচাচ্ছে, 'কী করছিস চাঁদু? ভেঙে ফেলিস না সব কিছু। ছোট, শিগ্গি ছুটে আয় দেখ দাদা সব কিছু ভেঙে ফেলছে।'

সে কিছুটা অবাক হয়। মাই হেভেন ভেঙে পড়ছে, মা তাতে এত অধীর হচ্ছে কেন। সে বলে, 'মা প্লিস্, তুমি সরে যাও। ভাঙা টুকরো-টুকরো এসে পড়ছে, গায়ে লেগে যাবে।' সে আরো বিরক্ত হয়, কারণ মা'র পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দোতলার মাসিমা। এই ভদ্রমহিলাকে সে কোনোদিনই দু-চক্ষে দেখতে পারে না, সারাদিন কেবল পরনিন্দা আর পরচর্চা।

সে গলাটাকে যথেষ্ট কড়া করে বলে, 'আপনি এখানে কী করছেন? যান এখান থেকে।'

তার এক ধমকেই ভদ্রমহিলা হুড়মুড় করে ছুট লাগালেন। দৌড়ের ভঙ্গিটা এতই হাস্যকর, সে হাসতে শুরু করল, তার দেখাদেখি তিশিও। কিন্তু মাকে সামলানো যাচ্ছে না, তাকে দু হাতে জাপটে ধরে রেখেছে আর ছোটকে ডাকছে। হাসতে-হাসতে সে মা'র মাথার চুলে বিলি কেটে দেয়। মা'র চুল এখনও কত সুন্দর। সে মাকে বলে, 'শোনো মা, কতগুলো দরকারি কথা আছে। আজ গায়ত্রীর সঙ্গে তিশিও খাবে আমাদের এখানে।'

কিন্তু মা কোনো কথাই শুনছে না। সে জোর করে মার হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

মা'র দুটো কাঁধ শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, 'কী হয়েছে তোমার? কী পাগলের মতো করছ? কী মনে করবে তিশি, ও তো সবটা দেখছে।' কথাটা বলতে বলতেই সে দেখল ছোট ঢুকছে, সঙ্গে ওর কয়েকটা বন্ধুবান্ধব। কিন্তু তার যেটা খারাপ লাগছে, ছোট ইউনিফর্ম পরে নেই। এটা ঠিক যুদ্ধটা শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু তার মানে তো যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়া নয়।

কোনো কথা না বলেই ছোট তাকে এসে একটা ধাক্কা মারল। বিষয়টা তার কাছে এতটাই অপ্রত্যাশিত যে, সে কোনো প্রতিরোধই করতে পারে না। সে ছিটকে গিয়ে পড়ে খাটের ওপর। তাকে উঠে দাঁড়াবার কোনো সুযোগ না দিয়ে ছোটর সঙ্গের লোকেরা তাকে জাপটে ধরে। সে নড়াচড়াই করতে পারছে না। এখন বিষয়টা তার পরিষ্কার হচ্ছে। হেড কোয়ার্টার থেকে আগেই তাদের সতর্ক করা হয়েছিল, যুদ্ধ শেষ হবার মুখে শত্রুপক্ষের চরেরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। তাদের লক্ষ্য হবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি এবং বিপ্লবী বাহিনীর নেতারা। কিন্তু এই সব কিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে একটা কথা, তার নিজের ভাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। পরিবারকে শত্রুর প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে দেশকে মুক্ত করা যায় না—পার্টির মধ্যে চালু এই কথাটা যে কতটা সত্যি আজ সে বুঝছে। কিন্তু এখন তার আর কিছু করার নেই, সে অসহায়ভাবে পড়ে থাকে। ডাক্তারবাবু এসে একটা ইঞ্জেকশন দেয়, সে জানে এটাও গোটা চক্রান্তের একটা অংশ। সে আপ্রাণ চেষ্টা করে বাধা দিতে, কিন্তু পারে না। তবে সে একটা ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত ওরা তিশিকে ধরতে পারেনি। সে আশায় আছে তিশি তার কমরেডদের খবরটা দিতে পারবে। আর কমরেডরা চলে এলে সে দেখে নেবে।

সারা রাত ধরে তার ভাল করে ঘুম হয়নি। দূরের একটানা বিস্ফোরণের আওয়াজ কিছুটা গা সওয়া হয়ে যায়, কিন্তু তার সঙ্গে মাটির কাঁপুনিটাই ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দেয়। তাদের ট্যাঙ্কের ব্যাটেলিয়ানটাকে গত দু-দিন ধরে রিজার্ভে রেখে দেওয়া হয়েছে। তারা যেখানটায় আছে সেখান থেকে কলকাতা বড় জোর দু-ঘণ্টা। তাদের গোটা বাহিনীটা মনমরা হয়ে আছে, এতদূর এসে শেষ যুদ্ধের সময় কেন তাদের বসিয়ে রাখা হচ্ছে, এ নিয়ে সবার মধ্যেই প্রায় চাপা ক্ষোভ। কে আবার হাসতে হাসতে বলল—ভালই হয়েছে, যুদ্ধের শেষ দিকে স্নাইপারের গুলি খেয়ে মরলে আপসোসের সীমা থাকবে না।

এখন একটা আমবাগানে পলিথিনের শিটের ওপর শুয়ে তারা দক্ষিণ দিকের আকাশটাকে দেখতে পাচ্ছে, সেটা আগুনের আলোয় আলোকিত। সবাই জানে ওটা কলকাতার আগুন। কাল থেকে তাদের বাহিনীর কামানের আওতায় দমদম এয়ারপোর্ট চলে এসেছে। কলকাতা থেকে পালানোর সব রাস্তা এখন বন্ধ। গোটা রাত তার অর্ধেক ঘুম আর অর্ধেক জাগার মধ্যে কেটেছে। এক পুরোনো কমরেড বলেছিল, 'বুঝলে, জিতে গেলে প্রথম কদিন স্রেফ ঘুমোব।' এটা এখন তারও মনের কথা।

তার ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে সে অবাক হল এই গরমেও ঘরের জানালাগুলো সব বন্ধ, এমন কী দরজাটাও বন্ধ করে রাখা হয়েছে। খাট থেকে নেমে দরজার সামনে এসে সে দেখল, দরজাটা বাইরের থেকে বন্ধ করা। সে এ সবের মানে কিছুই বুঝতে পারছে না। দরজাটা সে ভেতর থেকেই ধাক্কা দিতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে টের পায় বাইরের থেকে দরজা খোলা হচ্ছে। দরজা খুলল ছোট তার পেছনে মা। মা'র মুখচোখে গভীর উৎকণ্ঠা। ছোট

জিজ্ঞাসা করল, 'কী?'

সে বাথরুমে যাবে বলাতে ছোট দরজাটা ছেড়ে দাঁড়ায়। ঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে সে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করে রাখার কোনো দরকার নেই।' তার কথার কোনো উত্তর কেউ দেয় না। বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে সে খেয়াল করে ছোট তার পেছন পেছন এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ এখানেও তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। সে মুখ না ধুয়েই বেরিয়ে আসে, কারণ জল দেখলে তার কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে, সে জল ছুঁতে চায় না। সে আবার ঘরে ফিরে আসে। মা বিছানা তুলছিল। বিছানা তোলা হয়ে গেলে মা জিজ্ঞাসা করে, 'চা খাবি?'

সে সম্মতি জানালে মা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। দরজার বাইরে ছোট দাঁড়িয়ে। একটু পরে মা ফিরে আসে, এক হাতে চা আর এক হাতে কাঁসার প্লেটে রুটি-তরকারি নিয়ে। রুটি দেখে তার খেয়াল হয় তার ভীষণ খিদে পেয়েছে, কাল সারা দিন সে কিছু খায়নি। সে গোগ্রাসে রুটিগুলো খায়, খাটের বাজু ধরে মা এক দৃষ্টিতে তাব খাওয়া দেখে। খাওয়া হয়ে গেলে মা কাপ আর প্লেটটা নিয়ে যায়। ছোট বাইরের থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

সে আবার শুয়ে পড়ল বিছানায়। এই মুহূর্তে তার কিছু করার নেই। সে তাদের পুরোনো বাড়ির অল্প-অল্প নোনা ধরা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে এক অসীম শূন্যতা নিয়ে। এই মুহূর্তে তার কোনো ভাবনাও নেই। মাথার ভেতরের অস্বস্তিটা এখন একটা ভোঁতা অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে। সে কিছু ভাবতে চায় না। সে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

ডাক পড়া মাত্র সে লাফিয়ে ওঠে। সে যেন মনে-মনে এই ডাকটার অপেক্ষাতেই ছিল।

কমান্ড হেড কোয়ার্টারটা হয়েছে একটা পুরোনো স্কুলবাড়িতে। বাইরের চাতালটা জুড়ে বিপুল ব্যস্ততা। ব্রিগেডিয়ারের ঘরে সে যখন ঢোকে, ঘরে ব্রিগেডিয়ার ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ব্রিগেডিয়ার তার পুরোনো চেনা লোক। ওনার নেতৃত্বে অনেকগুলো লড়াই সে লড়েছে। মাঝবয়সী লোকটি যুদ্ধ শুরুর আগে কোনো একটা কারখানার ফোরম্যান ছিল। তাকে দেখে একটা অদ্ভুত হাসি দিয়ে ব্রিগেডিয়ার বলল, 'কী খুব রেগে আছ তো?'

সেও হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কমরেড?'

'এই তোমাদের এনে চুপচাপ বসিয়ে রেখেছি বলে।'

'না, রাগব কেন? নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে আমাদের নিয়ে।'

হাতের সামনে গোটানো ম্যাপটা তার দিকে এগিয়ে ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'এই নাও পরিকল্পনা। অপারেশন গ্রিন ওয়ে। দু-ঘণ্টার মধ্যে স্টার্ট করো। রাস্তায় আর বাধা দেবার মতো কেউ নেই। তোমারাই প্রথম কলকাতায় ঢুকবে। তোমরাই রাজধানীতে আমাদের ফ্ল্যাগ তুলবে এটাই আমাদের ইচ্ছা।'

সে চেয়ার থেকে উঠে স্যালুট করে ব্রিগেডিয়ারকে। আরো আধ ঘণ্টা সে ওখানে ছিল, তাকে তাদের পরিকল্পনা কী হবে, তা খুঁটিনাটি-সহ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমবাগান থেকে তাদের টি-ই সেভেন্টিসিক্স ট্যাঙ্কগুলো যখন হাইওয়েতে উঠে আসছে, তখন তার ঘড়িতে সোয়া আটটা।

সে খুব জোরে জোরে দরজাটা ধাক্কা দেয়। এবারও দরজা খুলল ছোট, পেছনে ছোটর বন্ধু পিকলু। সে জিজ্ঞাসা করে, 'মা কই রে?'

ভুরু কুঁচকে ছোট জিজ্ঞাসা করে, 'কেন?'

সে অধৈর্য হয়ে বলে, 'ডাক না মাকে।'

চেঁচামেচিতে মা চলে এসেছিল। মাকে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, আজকেই তো সোমবার? গায়ত্রী তো আজই যাবে?'

ইতস্তত করে মা মাথা নাড়ল। সে বলল, 'মা, আমি একটু গায়ত্রীদের বাড়িতে যাব। ওকে বলে আসতে হবে, আমি ওর সঙ্গে স্টেশনে যাব। আমি কথাটা বলেই চলে আসছি।'

ছোট বলল, 'না।'

'আমাকে যেতেই হবে। ওরা দুটো মেয়ে সব কিছু সামলাতে পারবে না।'

'তুই আজ কোথাও যাবি না।'

সে যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে বলে, 'কেন?'

'আমি দুপুর বেলায় তোকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে যাব।'

'ঠিক আছে, সে তো দুপুরে। ডাক্তার দেখিয়ে আমি বিকেলে স্টেশনে যাব।'

'না, ডাক্তারবাবু তোকে দেখবে, তারপর যদি মনে করে, তোকে আজকেই হাসপাতালে ভর্তি করবে।'

সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'কী বললি? আমি কিছুতেই হাসপাতালে ভর্তি হব না।'

তাকে জোর করে ভেতরে ঢুকিয়ে ছোট বাইরের থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে প্রাণপণে দরজায় ধাক্কা দেয়, দরজায় লাথি মারে, কিন্তু দরজা খোলা হয় না। সে ঘরের চারিদিকটায় তাকায়, যদি দরজা ভাঙার মতো কিছু পাওয়া যায়। না কিছুই নেই। সে দেশলাই খোঁজে, সে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবে। একবার আগুন লাগালে, দরজা খুলতে বাধ্য হবে। সে তন্নতন্ন করে মায়ের পুজোর সিংহাসনটা খোঁজে। ধূপ জ্বালানোর জন্য ওখানে একটা দেশলাই থাকে। না, আজ সেখানে কোনো দেশলাই নেই। সে কী করে আগুন লাগাবে?

এখনও আধপোড়া ধ্বংসস্তূপগুলো থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। যত এগোচ্ছে তারা, তত বোঝা যাচ্ছে গোটা রাস্তটা জুড়ে কী প্রচণ্ড লড়াই হয়েছে। এখন গোটা চত্বরটা জুড়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। রাস্তার ওপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা লাশ, পুড়ে যাওয়া বাড়িঘরের কাঠামো, এখানে-ওখানে জ্বলন্ত সাঁজোয়া গাড়ি—এতদিন যুদ্ধ করার পরেও মনে হচ্ছে এ রকম নরকের দৃশ্য এর আগে সে দেখেনি। রাস্তায় মানুষজন বলতে একমাত্র রেড ক্রশের কিছু লোক, অসংখ্য মৃতের মধ্যে থেকে আহতদের খুঁজে বেরাচ্ছে। দু-একটা মোড়ে অবশ্য পার্টিজানরা দঙ্গল বেঁধে ছিল, তাদের দেখে তারা পতাকা নাড়ছিল। এখনো পর্যন্ত একটি গুলিও তাদের ছুঁড়তে হয়নি। কিন্তু ভেতরের দিকে বোধহয় এখনো লড়াই চলছে, কারণ মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে বিক্ষিপ্ত গুলির আর ছোটখাটো বিস্ফোরণের আওয়াজ। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল তাদের চারটে মিগ-২৩, বোধহয় পোর্টের ওপর হামলা করতে।

দরজাটা খুলল হঠাৎ। মা আগে ঢুকল, পেছনে ছোট। মা বললে, 'চান করবি চ।'

সে মাথা নাড়ল।

ক্লান্ত গলায় মা বলল, 'না বলিস না, কালও চান করিসনি। চ, আমি তোকে চান করিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি একাই চান করতে পারব।'

সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দেয়। সে জানে দরজার বাইরে হয় ছোট অথবা তার কোনো বন্ধু দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। চৌবাচ্চা ভর্তি জলটা দেখে আবার তার গা শিরশির করছে। তা সত্ত্বেও সে মগে করে জল নিয়ে মেঝেতে ঢালতে শুরু করে। অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সে এই কাজটা করতে থাকে। এ কাজটা সে ছোটবেলায় শীতকালে করত। বাইরের থেকে মা'র যাতে মনে হয় সে ভাল করে চান করছে, কিন্তু মাথা ছাড়া কিচ্ছু ভেজাত না। বাঁ হাতে জলটা ঢালতে ঢালতে সে সাবধানে বাথরুমের দরজাটা খোলে। উঠোনের ও পাশ থেকে ছোটদের কথা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক বাথরুমটার সামনে কেউ নেই। সে পা টিপেটিপে বেরিয়ে আসে। সামনেই শুকোচ্ছিল ছোটর একটা শার্ট, দ্রুত হাতে সেই অর্ধেক ভেজা সার্টটাই সে পরে নেয়। তারপর সোজা রাস্তায়।

কিন্তু এই রাস্তায় আবার যুদ্ধের চিহ্ন বিশেষ কিছু নেই। শত্রুরা বোধহয় আর যুদ্ধ না করে পালাচ্ছে। শ্যামবাজারের মোড়ে যুদ্ধের চিহ্নমাত্র নেই। নেতাজির মূর্তি একই ভাবে পুব দিকে তাকিয়ে। ওয়ারলেস বলছে কলেজ স্ট্রিটের ওখানে এখনও লড়াই চলছে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হল কলেজ স্ট্রিট এড়িয়ে হ্যারিসন রোড সেন্ট্রাল এভিনিউ হয়ে এগোতে। কলেজ স্ট্রিটে তাদের পার্টিজানরাই লড়াইটা শেষ করে দিতে পারবে, তার জন্য তাদের দরকার নেই। তা ছাড়া হাতাহাতি যুদ্ধে ট্যাঙ্কের কিছু করার থাকে না।

হ্যারিসন রোড থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে ঘুরতে গিয়ে দেখা গেল লড়াইটা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতেও হচ্ছে। কলুটোলা আর বউবাজারের মধ্যে দুটো এম ১১৩ সাঁজোয়া গাড়ি। এই আমেরিকান সাঁজায়া গাড়িগুলো গোটা যুদ্ধেই তাদের অসম্ভব জ্বালিয়েছে, একেকটা গাড়িই প্রায় গোটা একটা কোম্পানির কাজ করে। মেসিনগানের অবিশ্রান্ত আওয়াজ। তাদের পার্টিজানেরা রয়েছে আশেপাশের গলিগুলোতে। এর ফলে শত্রুরা সামনে আসতে পারছে না। কিন্তু সাঁজোয়া গাড়িগুলো থেকে ছুটে আসছে মেসিনগানের গুলি।

সাঁজোয়া গাড়িগুলো তাদের দেখতে পেয়েছে। কারণ ইতিমধ্যেই পেছনের গাড়িটা পেছনের দিকে সরতে শুরু করেছে। কিন্তু ঝুঁকি নেবার কোনো অর্থ নেই। এখানে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউটা যথেষ্ট চওড়া। নির্দেশ দেওয়ামাত্র সামনের তিনটে ট্যাঙ্ক প্যারালাল ফর্মেশনে চলে এসেছে। তার গানম্যান সত্যেনের টিপ অসম্ভব ভাল। কিন্তু পেছনের গাড়িটা অসম্ভব দ্রুতগতিতে পাশের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ফর্মেশনের সামনের তিনটে ট্যাঙ্ক থেকে আগুন উগরে গোলাগুলো প্রায় একসঙ্গেই ছুটে গেল বাকি সাঁজোয়াটার দিকে। কোনোটাই ঠিক লক্ষ্যভেদ করল না। কিন্তু সাঁজোয়াটার ডান দিকের বিস্ফোরণটা হওয়ায় গাড়িটা হেলে পড়ল বাঁ দিকে এবং দাঁড়িয়ে গেল। আই পিস্ থেকে চোখ না সরিয়ে সে বলল, 'সত্যেন তোর চোখটা গেছে, এখান থেকে মারতে পারলি না। নে এবার মার, দাঁড়িয়ে গেছে।'

কিন্তু পরের দৃশ্যটার জন্যে সে তৈরি ছিল না। আশেপাশের গলি আর বাড়ি থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে মানুষ। ঘিরে ফেলল দাঁড়িয়ে পড়া সাঁজোয়াটাকে, লাফিয়ে উঠে পড়ল ওটার ওপর। এখন তাদের চুপচাপ হাত গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই। সাঁজোয়াটার কাছাকাছি তাদের ট্যাঙ্কগুলো আসবার আগেই ভেতর থেকে লোকগুলাকে টেনে বার করা হয়ে গেছে। সে আর ওদিকে তাকাচ্ছে না, কারণ সে জানে ওদিকে যে ঘটনাগুলো ঘটবে, তা

তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখা খুব কঠিন। মানুষ তার এতদিনের সমস্ত রাগ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই কটা লোকের ওপর। মানুষগুলো যেন পাগল হয়ে গেছে। পাগলের মতো হাত নাড়ছে তাদের দিকে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ছুটে চলে আসছে তাদের ট্যাঙ্কের সামনে। ওরাও বুঝেছে মুক্তি আর কয়েক ঘণ্টা দূরে।

গাড়ি ছাড়তে আর মাত্র মিনিট কুড়ি বাকি। গোটা রাস্তাটা জুড়ে একে ওকে সময় জিজ্ঞাসা করতে করতে এসেছে, কারণ সে ঘড়িটা নিয়ে বেরোতে পারেনি। তার কাছে কোনো পয়সাও ছিল না তাকে এতটা রাস্তা পায়ে হেঁটে আসতে হয়েছে। সে প্ল্যাটফর্মের আশেপাশের সব কটি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে গায়ত্রীকে খুঁজতে শুরু করে। সে প্রথমে খুঁজে পায় বুড়িকে, ট্রেনের জানালা ধরে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ভেতরে বসে থাকা গায়ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিল।

সে হাঁপাতে-হাঁপাতে গিয়ে জানালাটার বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। তাকে দেখে গায়ত্রী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'চাঁদু, তুই?' তাকে দেখে বুড়ি ছিটকে সরে যায় জানালাটা থেকে। তার চোখেমুখে পরিষ্কার আতঙ্ক। গায়ত্রী কিছুটা সামলে নিয়ে বলে, 'দাঁড়া আমি বাইরে আসছি।'

ভিড় ঠেলে গায়ত্রী নেমে আসে। গায়ত্রীর গলায় তখনো বিস্ময়, 'তুই এখানে কী করছিস চাঁদু?'

'কেন আবার, তোকে সি-অফ্ করতে।'

গায়ত্রী এবার হাসে, বলে, 'খুব ভাল করেছিস। আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু এখান থেকে তুই বাড়ি ফিরে যাবি তো?'

সে বোঝে, সে যে এভাবে পালিয়ে এসেছে খবরটা গায়ত্রী পেয়েছে। সে হাসতে-হাসতে বলে, 'কী করব বল, ওরা কিছুতেই আমাকে তোর কাছে আসতে দিচ্ছিল না।'

'ঠিক আছে। এখান থেকে তুই বাড়ি ফিরে যাবি কিন্তু। দেখ না, বুড়ি এতটা রাস্তা একা ফিরবে। তুই সঙ্গে থাকলে নিশ্চিন্ত হব।'

এই মুহূর্তে এই প্রসঙ্গে সে কথা বলতে চাইছিল না। সে বলল, 'তাহলে সত্যি-সত্যি তুই চললি।'

একটা বিষণ্ণ হাসি হেসে গায়ত্রী বলল, 'হ্যাঁ চললাম। আমি গিয়েই তোকে আমার ঠিকানা জানিয়ে চিঠি দেব। তুই কিন্তু উত্তর দিবি।'

কথাটার উত্তর না দিয়ে সে কেবল হাসল।

গায়ত্রী আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে চিঠি দিবি তো?'

সে হাসতে-হাসতে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

গায়ত্রী বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন?'

সে শুধু মাথা নাড়ল। মুখটা করুণ করে গায়ত্রী বলল, 'আমার চিঠিরও উত্তর দিবি না?'

সে বলল, 'তুই আমায় ভুলে যা গায়ত্রী।'

'কেন এ সব বলছিস চাঁদু? তোকে যে আমার দরকার।'

'না রে গায়ত্রী আমি তোর কোনো কাজে লাগব না। আমি নষ্ট হয়ে গেছি, শেষ হয়ে গেছি।' গায়ত্রীর মুখ দেখে সে বোঝে গায়ত্রী আপ্রাণ কান্না চাপার চেষ্টা করছে। তখনই তার মনে পড়ে, সে ঠিক করে এসেছিল আজ সে সারাক্ষণ হাসিমুখে থাকবে, এমন কিছু সে বলবে না, যাতে গায়ত্রীর মন খারাপ হয়।

'শোন তোকে বলি, তুই তো আলিপুরদুয়ার যাচ্ছিস, শুভদের বাড়ির কাছাকছি। ওখানে একটা নীল-সবুজ নদী, তার পাড়ে একটা ছোট্টো বালির চড়া আর তার ওপরে অর্জুন গাছের নীচে একটা পাথরের চাতাল আছে। যদি আমাকে খুব দরকার হয়, তুই ওখানে চলে যাস—আমি ওখানে থাকব। আমি কাউকে বলিনি, শুধু তোকে বলছি—ওটাই আমার জন্মস্থান, আমি ওখানেই থাকব। আর তুই মনে করে তোর কবিতার খাতাটা নিয়ে যাবি। যে কবিতাগুলো তুই কাউকে পড়াসনি, সেই কবিতাগুলো তুই ওখানে বসে পড়বি। তুই খুব ভালো করেছিস, কবিতাগুলো তুই কোথাও ছাপতে দিসনি। বিশ্বাস কর গায়ত্রী, তোর কবিতা আমি আর তুই ছাড়া কেউ বুঝবে না। হয়ত বহুযুগ পরে কেউ কেউ বুঝবে। তুই কিন্তু ভুলবি না, নিয়ে যাবি খাতাটা।'

কান্না চেপে গায়ত্রী বলল, 'তাহলে তুইও চল আমার সঙ্গে। আমরা ওখানে দুজনে মিলে কবিতা পড়ব। তোর কোনো ভয় নেই চাঁদু। তুই নিজে কবিতা লিখতে পারবি, আমি তোকে সব শিখিয়ে দেব। আমরা দুজনে মিলে ওখানে যাই। আয় চাঁদু, আমি তোর সব অসুখ ভাল করে দেব।'

সে নিজে কিছুতেই আজ বিষণ্ণ হবে না।

'তুই আমায় ভাল করতে পারবি না, মাঝখান থেকে আমি তোকে খারাপ করে দেব।' আর আমি বুঝে গেছি, আমার দ্বারা কবিতা লেখা হবে না।'

'তুই আমাকে কেন ভোলাতে চাইছিস চাঁদু?'

সে গায়ত্রীর কথাটার কোনো উত্তর না দিয়ে বলে, 'তোর মনে আছে গায়ত্রী? অনেক দিন আগে আমরা বোধহয় তখন ক্লাস এইট না নাইনে পড়ি। একদিন সন্ধ্যাবেলা তোদেব বাড়ির সামনে তুই আমার হাত ধরে বলেছিলি—চাঁদু, তুই না খুব ভাল ছেলে। আজ তোকে বলি, আমার না সেদিন ভীষণ ভাল লেগেছিল।'

প্ল্যাটফর্মটায় ট্রেন ছাড়ার আগের মিনিটের ভিড়টা পাগলের মতো ছুটছে। এই ধাক্কায় তারাও প্রায় দাঁড়াতে পারছে না। গায়ত্রী আবার সেদিনের মতো তার হাত দুটো ধরে বলে, 'চাঁদু, সত্যিই তুই বড় ভাল ছেলে।' তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে, 'চাঁদু তুই কেন এত ভাল হলি? তুই তো আরো খারাপ হতে পারতিস?'

সে হো-হো করে হাসে, 'দূর বোকা মেয়ে, সবাই বলে শুনিস না, সময়টাই ভীষণ খারাপ।'

'দিদি ওঠো, গাড়ির সিগনাল দিয়ে দিয়েছে।'

ট্রেনের পেছনের লাল আলো যতক্ষণ দেখা যায় সে ততক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর ফিরে দেখে বুড়ি কখন যেন চলে গেছে।

সে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কাটেনি, কাজেই খুব সাবধানে গেটটা পার হবার চেষ্টা করল। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে যা হয়, বেশি সাবধান হলেই ধরা পড়ার চান্স বেশি। কালো কোট পরা দুটো টিটি তার দিকেই তাকিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে তার সম্পর্কেই কিছু বলছে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক ওরা তার কাছে টিকিট চায়নি। সে বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। স্টেশনটার ঠিক বাইরেই একটা প্যান্ডেলে তারস্বরে মাইক বাজছে। রাস্তায় বেরনোর আগে তার খেয়ালই ছিল না, আজ বিশ্বকর্মা পুজো। সে প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে যাবার সময়ই খেয়াল করল, ভেতরে অল্পবয়সী যে ছেলে দুটো বসে আছে, তারা তাকে নিয়ে কথা বলছে। বিরক্ত হয়ে সে দ্রুতপায়ে প্যান্ডেলটা পেরিয়ে যায়।

মোড় ঘুরলেই ধর্মতলা। ওয়্যারলেস আগেই জানাচ্ছে রাস্তায় আর কোনো বাধা নেই। ধর্মতলার মোড়েই দুটো সেঞ্চুরিয়ান ট্যাঙ্ক। আড়াআড়িভাবে রাস্তার ওপর দাঁড় করানো। শেষ সময় ফেলে পালিয়েছে। তাদের স্কাউট গ্রুপগুলো বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে। তাদের আশেপাশে দু-চারজন লোক যারা দাঁড়িয়ে, তারা বোধহয় ধর্মতলার রাস্তায় যারা থাকে তাদেরই কয়েকজন। দক্ষ হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্কগুলোকে কাটিয়ে নিতেই সামনে রাজভবন। তার এই মুহূর্তে কোনো উত্তেজনা নেই। ফেলে আসা যুদ্ধের কয়েকটা বছরও যেন স্মৃতিতে আবছা হয়ে আসছে। তার শুধু মনে হচ্ছে সে ননীমাধব দে লেনে ফিরে আসছে, এত দিনের যুদ্ধ স্রেফ এই ফিরে আসার জন্যই।

তাকে চমকে দিয়েই ছিটকে বেরোল গোলাটা, সত্যেন তার নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করেনি। পুব দিকে মুখ করে থাকা রাজভবনের গেটের ওপরের সিংহটা একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী তুলে মিলিয়ে গেল, যেন ওটা কোনোদিন ছিলই না। তার ট্যাঙ্কের সামনে একশ বছরের পুরোন গেটটা ভেঙে পড়ল পলকা কাঠের মতো। তারপর নুড়ির ওপরে ভারী ক্যাটারপিলারের এক অদ্ভুত আওয়াজ তুলে তাদের ট্যাঙ্কগুলো ঢুকে পড়ল 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' অঞ্চলটায়। তার এ কে ৪৭ টার মডেলে বেয়নেট লাগানো যায়, সে বেয়নেটটা লাগিয়ে ম্যানহোল থেকে লাফিয়ে নামল নুড়ি বেছানো চাতালটায়। এবার লড়াইটা হবে হাতাহাতি, বেয়নেটটা সেখানে খুব জরুরি। তার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামল আরো জনা পঞ্চাশেক। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে গোটা পরিস্থিতিটা তারা পরিমাপ করার চেষ্টা করল। না, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষীরা আছেই। নিজের বোঝাপড়া মতো দুটো দলে ভাগ হয়ে তারা ঢুকে পড়ল ভেতরে। সে ডানদিকের দলটার সামনে।

ভেতরের খোলা হলটায় প্রাচীন রোমের সম্রাটদের আবক্ষ মূর্তি। চওড়া সিঁড়িটা দিয়ে তারা দোতলায় উঠে এল, বিনা বাধায়। সামনের বারান্দার ঠিক মাঝখানটায় যে মানুষটা পড়ে আছে তার পোশাক-আশাক দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় আর্দালি। কে মারল, কেন মারল? এই গবেষণা করার সময় এখন তাদের নেই। কিন্তু ঘোরানো বারান্দাটা জুড়ে বিশাল বিশাল দরজাগুলো সব কটা বন্ধ। মাঝখানের দু-মানুষ সমান সোনালি কাঠের কাজ করা আয়নাগুলোতে কেবল তাদেরই প্রতিফলন। প্রথম দরজাটা সে আস্তে-আস্তে ধাক্কা দিতে খুলে গেল। বিশাল ঘরটার উত্তর দিকের দরজাগুলো দিয়ে হু-হু করে হাওয়া আসছে। আর সেই হাওয়ায় উড়ছে বিশাল সাদা পর্দাগুলো। এটা বোধহয় কোনো বসার ঘর, রুপালি হ্যান্ডেল দেওয়া বিশাল-বিশাল সোফাগুলোতে চেরি রঙের মখমলের গদি। এক কোণে একটা বড় পিয়ানো। কেউ নেই। শুধু সব কিছু যে এই প্রাসাদে ঠিক নেই এটা বোঝা যাচ্ছে, ওপরের বিশাল ঝাড়লণ্ঠনটা থেকে ছিঁড়ে পড়েছে বেশ কিছু কাচের টুকরো, বাকি সব কিছুই স্বাভাবিক। অন্যদিকের দরজা দিয়ে ওপাশের একটা ঘরের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় পর্দার আড়ালে, তারপর বোঝার চেষ্টা করে ভেতরের ঘরে কেউ আছে কি না। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবার পর সে নিশ্চিত হয় ঘরে কেউ নেই। পর্দাটা সরিয়ে আচমকা সে ঢুকে পড়ে। ঘরের মাঝখানে পড়ে আছে কুকুরটা। অসংখ্য মৃত্যুর দৃশ্যকে অতিক্রম করে এসেও এ রকম একটা সুন্দর সাদা লাসাকে মরে পড়ে থাকতে দেখে সে চমকে উঠল। হয়ত গুলি করেই মারা হয়েছে, কারণ মেঝের কার্পেটের রঙটাও জমাট বাঁধা রক্তের মতো। ঘরের মাঝখানে একটা ডাইনিং টেবিল।

একটু আগেও বোধহয় খাওয়াদাওয়া চলছিল। বিশাল টেবিলটার মাঝখানে রুপোর মোমদানিতে এখনো মোমটা জ্বলছে। ফলের বাস্কেট, স্যালাডের প্লেট, আধ খাওয়া মুরগির ঠ্যাং, একটুও না-ছোঁয়া সুফ্‌লের প্লেট, সবই আছে শুধু নেই যারা খাচ্ছিল তারা।

পরের ঘরটার এক প্রান্তে একটা বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল। সে যখন প্রায় ধরে নিয়েছিল এই প্রাসাদে আর কেউ নেই, তখনই সে লোকটাকে খুঁজে পেল। কিন্তু লোকটা কেন আগের থেকে বুঝতে পারল না যে সে আসছে? তার হাতে রাইফেল, কিন্তু লোকটা নিরস্ত্র, এমনকী পরে আছে কেবল একটা পাজামা। সে লোকটার চোখের দিকে তাকাল, এটা দেখতে, মাঝখানে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে, লোকটা তাকে চিনতে পারে কি না। না লোকটার নীলচে চোখে তাকে চিনতে পারার কোনো চিহ্ন নেই। এখনও লোকটাকে ঘিরে রেখেছে অহংকারের একটা বর্ম, তাকে ভেদ করে চোখের ভাষা বোঝা তার সাধ্য না। এমনকী লোকটা ভয় পেয়েছে কি না তাও সে বুঝতে পারছে না। কেন জানি, তার হঠাৎ ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

স্টেশনের চত্বরে বসা আনাজের বাজারে তুমুল ভিড়। ভিড়ের মধ্যেই আনাজ কেনা বন্ধ করে ময়লা কাপড় পরা একজন মাঝবয়সী মহিলা হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বোঝে ছোট সবাইকে খবর দিয়েছে। বৌবাজারের ফ্লাইওভারের নীচে রুমাল বিক্রি করে যে ছেলেটা সে এবার 'ও দাদা, এদিকে আসুন' বলে তাকে ডাকছে। তাকে যদি বাঁচতে হয় তবে এক্ষুনি কেউ ধরে ফেলবার আগেই তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। সে সামনের ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার ফল হয় আরো খারাপ, এখন গোটা ভিড়টাই তার দিকে তাকিয়ে, এমনকী যারা উল্টোদিকে যাচ্ছে, তারা এখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখছে। সে দ্রুত বেরিয়ে যেতে চায়, তার ধাক্কা লাগে সামনের একটা লোকের সঙ্গে, লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে তার হাতটা ধরে ফেলে। সে একটা ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়তে শুরু করে। এই ভিড়ের মধ্য দিয়ে ছোটাটা কঠিন, কিন্তু তার কিছু করার নেই। চারিদিকে একটা হইচই, সবাই তাকে ধরে ফেলতে চাইছে। আন্ডারপাসটার বাইরে এসে সে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়, কোন দিকে যাবে ঠিক করতে। তার হাতে সময় নেই, গোটা শিয়ালদা ছুটে আসছে তার দিকে। ফাঁকা একমাত্র ফ্লাইওভারটা। সে সে-দিকেই ছুটতে শুরু করে। উল্টোদিক দিয়ে ছুটে আসছে দানবের মতো বাসগুলো। সে তার মধ্যে দিয়েই ছুটতে শুরু করে। বাসে তার কোনো ভয় নেই, ভয় তার মানুষে। সে হাওয়ার মতো ছুটছে। তার পা আর মাটিকে স্পর্শ করছে না। সে ছুটতে-ছুটতেই হাসে—ছোট আর তাকে ধরতে পারবে না।

ওরা তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কোথায়? কত দূরে? আর কতক্ষণ? সে নাক পায় ফর্মালডিহাইডের ঝাঁঝালো গন্ধ। তারপর সময় থেমে গেলে সে দেখতে পায় মাকে, পাশে ছোট। ছোটকে দেখেই সে বোঝে বেচারা তার সামনে আসতে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছে, রুমালে মুখটা ঢেকে রেখেছে। মা'র দিকে তাকিয়ে সে হাসে, তারপর এই আসছি বলে কোথায় মিলিয়ে যায়। এই লুকোচুরি খেলাটা চলতে থাকে অনেকক্ষণ। রাত ক্লান্ত হলে সে তাদের রেহাই দেয়। চোখ খুলে সে মা'কে খুঁজে পায় না। সে জানে আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। তাকে খুঁজে পেতে হবে নিজেকে, স্পর্শ করতে হবে নিজের অস্তিত্বকে, স্পর্শ করতে হবে সময়কে।

লোকটা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে। সে হিসাব করার চেষ্টা করে কত বছর আগে এক

অষ্টমীর সকালে সে প্রথম লোকটাকে দেখেছিল। কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে একটা কথা, লোকটার বয়স বেড়েছে কিন্তু লোকটা এখনো কী সুন্দর। ওই ভয়ঙ্কর অহংকারী মাঝখানে কাটা চিবুক সত্ত্বেও লোকটা ভীষণ সুন্দর। লোকটাকে দেখলে বোঝা যায় তিনি কেন এত সুন্দর। আজ তার কয়েক ফুট দুরে খালি গায়ে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। সে এখান থেকেও জেন্‌স পারফিউমের মৃদু গন্ধ পাচ্ছে। সে কোনোদিন কোনো গ্রিক মানুষকে দেখেনি, কিন্তু তার ধারণা পৌরাণিক গ্রিকরা এ রকমই দেখতে ছিল। সে নিশ্চিত এই মানুষটি অন্য কোনো জগতের।

সে কি কিছু বলবে? এ রকম মুহূর্তে কিছু বলা উচিত কিনা সে নিশ্চিত নয়। সে চোখ ভরে মানুষটাকে দেখে। তার এখন আস্তে-আস্তে ভয় হচ্ছে। সে এখন নিজেকে ভয় পাচ্ছে। কই তার সেই ঘৃণার অগ্নিস্রোত? এই একটা মুহূর্তের জন্যই তো এত রক্তপাত, তার গোটা জীবনটা জুড়ে সে অনুভব করেছে এই মুহূর্তের জন্য তার কামনা। আকাশ তো ঠিকই নিজের রঙ পাল্টে গোলাপি আর হালকা ভায়োলেটে মাখামাখি। আর লোকটাও নিশ্চয়ই জানে তার অসহায়তা। তাই ওর চোখে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। পেছনে আরো পায়ের আওয়াজ, তার কমরেডরা আসছে লোকটা হঠাৎ ধূর্তের মতো আস্তে-আস্তে একটা হাত টেবিলের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ও ওর অস্ত্র খুঁজছে। একদম দরজাটার পেছনেই তার নাম ধরে ডাকছে কমরেডরা। ওরা তাকে খুঁজছে, এক্ষুনি ওরা ঘরে ঢুকবে এবং লোকটা তখন পাল গুলি চালাবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা চালাবে। সে জানে এক সাথে চার পাঁচটা এ কে ৪৭ একটা শরীরকে কীভাবে টুকরো-টুকরো করে দিতে পারে। না, তা সে কিছুতেই হতে দেবে না। তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে একটা জান্তব চিৎকার তারপর তার গোটা জীবনের শক্তি সে ঢেলে দেয় বেয়নেটটার পেছনে। তার মুখে এসে লাগছে মানুষটার গরম নিশ্বাস, কয়েক ইঞ্চি দুরে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পায় লোকটার চোখ দুটো সে যতটা ভেবেছিল তার থেকেও বেশি নীল।

এভাবে হালকা হয়ে ছুটতে কী ভাল লাগে! সে ছুটন্ত বাসগুলোকে অগ্রাহ্য করে, সে নিশ্চিত তাকে এখন কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না। সে উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা বাসগুলোকে নিয়ে এক অদ্ভুত খেলা শুরু করে। তার ভাল লাগছে এই খেলা। সে দেখতে পাচ্ছে সবাই ভয় পাচ্ছে, কিন্তু আজ তার আর কোনো ভয় নেই। সব কিছুকে ভয় পেতে পেতে সে বিরক্ত, সে ভয় কে অবশেষে ছুটি দিতে পেরেছে। সে দু-পাশে তার হাত দুটোকে ছড়িয়ে এসে দাঁড়ায় সেই কাল্পনিক সরলরেখাটার ওপর, যার ওপর দিয়ে প্রাইভেট বাসটার ছুটে আসার কথা। না, কিচ্ছু হয়নি তার। অসীমদা তাকে বলেছিল— ভয়কে জয় করতে পারলে আর কোনো পিছুটান থাকে না। শুধু বুকের ডানদিকটা কেমন যেন হালকা লাগছে। কী একটা স্রোতে তার গলাটা বুজে যাচ্ছে, তার জিভে সেই স্রোতের লবণাক্ত স্বাদ। সে আকাশের দিকে তাকায়, না আজ আকাশ রঙ পাল্টায়নি। অথচ তার ভাল লাগছে, এই ভাল লাগার জন্যই তো সে গোটা জীবনটা টেনে নিয়ে এসেছে। শুধু কালো-কালো মানুষেরা আবার তার চারিদিকে ভীড় করে আসছে। সে অবশ্য আর তাদের ভয় করে না। কেন যেন বাসটা দাঁড়িয়ে পরেছে। কারা তাকে তুলে নিচ্ছে কোলে।

মানুষটার দেহ ক্রমশ নীচের দিকে নামতে চাইছে, নামতে পারছে না গেঁথে থাকা বেয়নেটটার জন্য। সে রাইফেলটা ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে ধরে রাখে শরীরটা। কাত হয়ে মানুষটা

ঢলে পরে তার গায়ে। সে ডান হাতে গরম রক্ত অনুভব করে। সে অনুভব করে কর্নেল চ্যাটার্জির মৃত শরীরে জীবনের শেষ উত্তাপ। কিন্তু ভারী শরীরটা সে ধরে রাখতে পারছেনা, সে দেহটাকে শুইয়ে দেয় মাটিতে। সে নতজানু হয়ে বসে মৃত মানুষটার পাশে, সে হাত তুলে দেখে তার দু হাতে লেগে থাকা রক্ত। এক আদিম কান্না উঠে আসে তার ভেতর থেকে। সে কাঁদে, সে অবশেষে কাঁদে। সে একটা পশুর মতো করে কাঁদে, সেই কান্নায় কোন শালীনতা নেই, নেই কোনো ছাপ। ঈশ্বরের মৃত্যুতে আদম যেভাবে কেঁদেছিল, সে ঠিক সেভাবে কাঁদে।

এখনই তো সেই মুহূর্ত, যখন সারা গায়ে শিশির মেখে তারারা নিজেদের আরো উজ্জ্বল করে নেয়। ওদিকের পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা অন্ধকার ত্রিভুজ কীভাবে যেন কিছুক্ষণ পরে ধীরে-ধীরে নীল হয়ে আসবে। দু-একটা বাধোবাধো কণ্ঠস্বর, দু-একটা পাখার ঝটফটানি, তারপর একসঙ্গে ডেকে উঠবে সবাই। জঙ্গলে কেউ দেরি করে ওঠে না। কিন্তু এখন এই প্রায় অন্ধকারে পাতাগুলো থেকে টুপটুপ করে জমে থাকা রাতের শিশির ঝরে পড়ছে। এক প্রহর আগে কাদার ওপর পায়ের ছাপ এঁকে দিয়ে একপাল সম্বর জল খেয়ে গেছে, সেখানে এখন জল খাচ্ছে একটা তৃপ্ত নিঃসঙ্গ চিতাবাঘ। জল খাবার পর দ্রুত জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে গিয়ে চিতাবাঘটা লাফিয়ে উঠল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে পড়ে থাকা গোল পাথরটার ওপর, তারপর হঠাৎ কী যেন ভেবে এক মুহূর্ত দাঁড়াল। মাথা তুলে তাকাল একবার আকাশের দিকে, শুক্লপক্ষের অষ্টমীর চাঁদ তখন হাজারটা টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে নদীর জলে। পাথর থেকে লাফিয়ে পড়ে চিতাবাঘটা মিলিয়ে গেল অন্ধকার পাকদণ্ডীতে, যে রাস্তা দিয়ে এ দিককার লোকজন বৈশাখ মাসে ভুটিয়াদের মেলায় যায়।

এ জঙ্গলে কী করে হাসনুহানার গন্ধ এল? এ ফুল বিদেশী, এমনকী নামটাও বিদেশী। আসলে কাল সকাল থেকে কানে বাজছে নাটমন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ, এমনকী ধুনোর গন্ধও মাঝেমাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এ জঙ্গলের দক্ষিণের পাহাড়টা নাকি শঙ্খচূড়ের আড্ডা। হাসনুহানার গন্ধে কি শঙ্খচূড়েরা আসবে? আর আসলেই বা কী?

একটু আগে যে পথটা দিয়ে চিতাটা নদী থেকে জঙ্গলে ঢুকল সেই পথটাকে আড়াআড়ি ভেঙে দিয়ে সে নেমে গেল নদীটার দিকে। সাইবেরিয়া কিংবা বৈকাল হ্রদে যারা দল বেঁধে ফিরে গেছে তাদেরই দলছুট একজন উড়তে-উড়তে চলেছে। একা, যখন আর কোনো পাখি জাগেনি, এমনকী দুই পাহাড়ের মাঝখানের ত্রিভুজে একটুও রঙ লাগেনি, তখন সে উড়তে উড়তে চলেছে। ওড়া দেখেই বোঝা যায় শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ তাকে আকর্ষণ করে না, এমনকী আগামী আলোর পুব দিকেও তার ঘোর অনীহা, কারণ সে উড়ছে উত্তর পশ্চিমের চুম্বক দেখে। তার লক্ষ্য একটাই—ঘর, যেখানে বাকিরা আছে, সন্তান আছে, আছে আগামী সন্তানের সম্ভাবনা।

নদীতে পা ডুবিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর নদীর জল স্পর্শ করে। দু-হাতে আজলা করে জল নিয়ে সে অন্ধকারেই সেই জল দেখে, দেখে সেই জলের সঙ্গে হাতে উঠে এসেছে ভাঙা চাঁদের টুকরো। যেন স্মৃতির দিকে সে তাকিয়ে আছে। বিশ্বাসঘাতক স্থূল আঙুলের ফাঁক গলে ধরে থাকা জল শীর্ণ স্রোত হয়ে এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। সে হতবাক

হয়ে দেখে তার স্মৃতিশূন্য হাত। নদীও হেসে ওঠে নিঃশব্দে। সে তখন নদীর জল থেকে উঠে আসে সাদা বালির ওপর। পুব দিকে ঝুঁকে থাকা অর্জুন গাছটাই এখন তার চলার লক্ষ্য।

প্রতিটি পাতা থেকে তখন জ্বলন্ত ফসফরাসগুলো উড়ে যাচ্ছে জোনাকির মতো, গ্রীষ্মের দুপুরের কাপাস তুলোর মতো। প্রতিটি পাতার প্রান্ত তখন নীলচে আলোয় উজ্জ্বল। সে এসে দাঁড়ায় গাছের নীচে। অনেকদিন ধরে খোঁজবার পরে পাবার আনন্দ তার সারা মুখ ছড়িয়ে। এ সবই তার চেনা—এই স্নিগ্ধ নীল আলো, এমনকী আকাশটা যে গ্ল্যাডিওলার মতো সাদা মেশান বেগুনি রঙের হয়ে গেল—এ সবই তার চেনা। আকাশের এই রং পৃথিবীর কেউ চেনে না, কিন্তু সে চেনে।

গ্রিলের সঙ্গে বাঁধা থাকত কাঠের ঘোড়াটা, যাতে সে সেটাকে টেনে সারা বাড়িময় করতে না পারে। জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পড়লে ভাইকে সেখানে শুইয়ে দেওয়া হত। সে বেচারা কখনো ঘুমোত, কখন হাত পা ছুড়ে খেলত। আর কাঁদলেই ঘোড়া ছেড়ে সে ছুটতো কান্না থামাতে। কান্না প্রায় কোনো দিনই থামত না, কারণ যে কারণে বাচ্চাটা কাঁদত তার কোনোটারই সমাধান করার ক্ষমতা তার ছিল না। ওই ছুটে যাওয়াটাতেই ছিল আনন্দ। আর সবচেয়ে মজা হত ভাইয়ের সঙ্গে খেলতে। হাত-পা ছুঁড়ত বাচ্চাটা, আর মুখটা কাছে নিয়ে গেলেই ছোটছোট হাত দিয়ে নাক মুখ খিঁমচে ধরতে চাইত, বিনা কারণে হাসত। কিন্তু এসব কতক্ষণই বা ভাল লাগে। তার থেকে অনেক ভাল কাঠের ঘোড়ায় বসে দোলা। ওই দুলতে-দুলতে কখন যেন আকাশটা এরকম গ্ল্যাডিওলার মতো সাদা মেশানো বেগুনি হয়ে যেত, সমস্ত রূপকথার গল্পগুলো অন্য রকম হয়ে ভিড় করে আসত। পরীর মতো করে মাকে সেখানেই সে প্রথম দেখেছিল, বাবাকে অবশ্য কোনো দিন দেখেনি। সেই দিনগুলো থেকেই সে আকাশটাকে চেনে। এতদিনে সে জেনে গেছে এই আকাশটাই তার মুক্তি, এই আকাশটাই তাকে সারা জীবন বন্দি করে রেখেছে।

সেই চেনা রঙের আকাশ আবার ফিরে এসেছে। কোনো মেশিনগানের আওয়াজ নেই, নেই কোনো মর্টারের বিস্ফোরণের শব্দ, এমনকী স্নাইপারের বিচ্ছিন্ন কোনো গুলির আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে না। টি ই সেভেনটি সিক্স-এর অপ্রশস্ত কুঠুরিতে বসে অনবরত যে কাঁপুনিটা অনুভব করত, সেটাও এখন অনুপস্থিত। সে গাছটার নীচে চাতালের মতো পাথরের টুকরোটায় গিয়ে বসে। সে নিশ্চিত এটাই তার জন্মস্থান।·

বিশ্বকর্মা পুজোর মাইকগুলো বন্ধ হয়ে গেছে বহুক্ষণ।

এই আকাশ আর জঙ্গলের প্রতিটি বিন্দুতে কেবল মালকোষ ছাড়া অন্য কোনো সুর ওঠে না।

শুধু তার একটাই ভয় যদি আবার সেই মানুষটা ফিরে আসে। সেই অসম্ভব সুন্দর আর অহঙ্কারী মানুষটা, যাকে সে খুন করেছে। তারপর তার বুকে মাথা রেখে কেঁদেছে সারা রাত। এখনো দু-হাত আর কপালে লেগে থাকা গরম রক্ত সে অনুভব করছে। সে মানুষটাকে খুন করতেই চেয়েছিল, কিন্তু প্রতিটি রঙিন আকাশের বেলাতে সে নিজের অজ্ঞাতে মানুষটাকে বসিয়েছিল পিতৃস্থানে। এখনো বাঁ দিকের কানটা জ্বালা করে। বহুদিন ধরে সে ক্যাম্বিসের বলটা খুঁজছে, কিন্তু পাচ্ছে না। বলটা পড়ুক অফস্ট্যাম্পের বাইরে, ওভারপিচ, তারপর ঢুকে আসুক মিড্‌লস্ট্যাম্পের ওপর। ব্যাটের সুইট স্পটে বলটাকে কেবল অনুভব করবে, গোটা শরীরের ওজনটা ছেড়ে দেবে এগিয়ে থাকা বাঁ পায়ের ওপর। তারপর ফিরেও তাকাবে না। সাদা বারান্দা

আর পেতলের মোটা রেলিং, কালচে লাল রঙের পাতাওয়ালা টবের ওপর ঝুপসি গাছ, দুটো রেলিংয়ের ফাঁকে লাসা কুকুরের মুখ, পেছনের দেওয়ালে রাজস্থানি ছবির প্যানেল—কোনো দিকে তাকাবে না। কারণ সে জানে তিশি বলে কেউ নেই, ওটা তার নিজের কল্পনা। এমনকী তিশির গোলাপি, সাদা আর বাদামি মেশানো আঙুলগুলো, যা এরকম রঙিন আকাশের রাতে সে বারবার স্পর্শ করেছিল তার বহু যুগের তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দিয়ে, তাও কল্পনা। তিশির কান থেকে কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা জমাট মোমের স্রোতের মতো গলাটার ওপর সে একবার মাথা রাখতে চেয়েছিল, ওটাও কল্পনা। তবুও জ্বরে কপালটা পুড়ে যাচ্ছে, একবার ইচ্ছে করে বুকে কপালটা রেখে মিশে যেতে, নিঃশেষে বিলীন হয়ে যেতে। যা তার জানার কথা না, কিন্তু সে নিশ্চিত জানে ওখানে আছে সেই গন্ধটা, যা মা লুকিয়ে রাখত আলমারিতে, শাড়ির ভাঁজে। অভিমানে কান্নায় গলা বুজে আসে—মা গো তিশি একবারও এল না। আমি আমার গোটা জীবনটাকে মরুভূমির মতো বিছিয়ে রাখলাম, কিন্তু তিশি একবারও এল না। অভিমান আর কান্নার স্তূপ ঠেলে সে নতজানু হয়ে বসে গাছের নীচে। আলোকিত প্ল্যাটফর্ম যেখানে অন্ধকারে মিশেছে সেখানে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে গায়ত্রীর ট্রেনের লাল আলো দুটো।

গাছ প্রবল স্নেহে বাতাস বুলিয়ে দেয়, গুনগুন করে কানের কাছে ঘুমপাড়ানি গান শোনায়, চুলে বিলি কেটে দেয়। আর সে দুরন্ত অবাধ্য ছেলের মতো সব কিছু অগ্রাহ্য করে বলে ওঠে, 'আমাকে শেকড়ে ফিরিয়ে দাও, আমি তো ফুল ফোটাতে পারিনি।'

কিছুক্ষণ আগে পেছনের ঝোপে ঝগড়া লেগেছিল বুনো শুয়োরদের মধ্যে, এখন তারাও চুপ। সেই নিঃসঙ্গ পাখিটাও মিলিয়ে গেছে অভ্রের পাতের মতো মেঘের আড়ালে।

স্নেহশীল পিতার মতো, ঈশ্বরের মতো, সেই মহাপ্রৌঢ় জবাব দিল—'শুভদের বাড়িতে ক্যামেলিয়া ফুটতে দেখে তুমি সারা জীবন দুঃখ নিয়ে কাটালে, কেন ননীমাধব দে লেনে তোমার বাড়িতে তা ফুটল না—একে কি ভালবাসা বলে?'

'তবে কেন আমি শুয়ে আছি হাসপাতালের বেডে? তবে কেন আমি সকাল থেকে সন্ধে কাটিয়ে দিলাম অ্যাকাউন্টেন্সি আর অডিটিংয়ের বই বেচে? বলো না ভালবাসার জন্য এর বেশি আর কে দিয়েছে?'

'এ তো ভালবাসা নয়, এ তো প্রলোভন, বড় জোর এটা আকর্ষণ।'

তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে অবরুদ্ধ ক্রোধ, 'দেখো বৃদ্ধ, নিজের সন্ততির সঙ্গে কেউ এভাবে কথা বলে না।'

উত্তর আসে সারা আকাশ জুড়ে, সে উত্তরে সম্মতি জানায় প্রতিটি ঘাস, প্রতিটি শিশির বিন্দু।

'আত্মজ আমার, আমি তোমাকে দোষ দিই না, তোমরা এক নষ্ট লগ্নের ফসল। তোমাদের সৃষ্টিকালে স্বাতী ঢাকা ছিল মেঘে, আর তাই ভালবাসা আর ঘৃণার সীমান্তরেখা তোমাদের অস্পষ্ট হয়ে আছে। যখন ফুল ফোটাতে পারোনি তখনই শেকড়ের খোঁজ করেছ। যাকে ঘৃণা করা উচিত তার জন্য গোপনে লালন করেছ তীব্র আকর্ষণ। আর যে কোনো ঊষাকাল থেকে রইল তোমার অপেক্ষায়, যার কাছে গেলেই পেয়ে যেতে শেকড়ের খোঁজ, তাকে করেছ অবজ্ঞা। অবশেষে যখন তুমি তার কাছে গেলে, তখন তুমি তার ভাষা ভুলে গেছ, তার গান ভুলে গেছ—তার সময় তোমাকে অতিক্রম করে চলে গেছে বহু দূর। সন্তান আমার, সময় তোমাকে অস্বীকার করছে, তুমি নষ্ট হয়ে গেছ।'

হাহাকার করে ওঠে সে।

জোনাকিরা শেষবারের মতো আলো জ্বালিয়ে ফিরে যাচ্ছে পাতার আড়ালে, দিনের অন্ধকারে। উত্তর দিক থেকে একটা হিমেল বাতাস, নদী ছোঁবে না পাথর ছোঁবে, তা ঠিক করতে না পেরে শেষ হয়ে গেল বালির একটা ঘূর্ণি তুলে। নদীর জলে ঘাই মারল প্রাচীন এক মহাশোল।

'আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।' সে শেষ বারের মতো মিনতি করে। 'তোমার তো গোটা আকাশ জোড়া বিস্তার, লক্ষ পাতায় তোমার অস্তিত্ব। অথচ দেখো আমার স্মৃতিতে একটাই মাত্র শৈশব, আমি নষ্ট করেছি কেবল একটাই যৌবন। তুমি তো জানো, আমার একটাই কাঠের ঘোড়া ছিল, আমি একবারই মাত্র ভালবেসেছিলাম। এ হয় না, এ ভাবে শেষ হয়ে যাওয়া যায় না।'

সে আস্তে-আস্তে লুটিয়ে পড়ে, স্পর্শ করে মাটিকে। সময় হয়ে যাওয়ায় চাঁদ নেমে যায় পশ্চিমের গাছগুলোর ওপারে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ধ্বনিত হয় গোটা জঙ্গল জুড়ে।

হে অমৃতের পুত্র, যাত্রা শুরু করো। ব্যক্তি-অস্তিত্বের থেকে নৈর্ব্যক্তিক অমর্ত্যের দিকে। নদীর প্রতিটা বিন্দুর দিকে তাকাও—তারা জানে না কোথায় যাচ্ছে। তার প্রতিটি স্পন্দনে, প্রতিটি হিল্লোলেই আনন্দ আর দুঃখ। প্রতিটি বিন্দু নদীর সঙ্গে মিশে যায়, নদী তাকে আলাদা করে হারিয়ে ফেলে। কিন্তু নদী জানে কোথায় সে যাচ্ছে। দিকভ্রান্ত বিন্দুর জন্য নদী চোখের জল ফেলে না। তার একমাত্র তৃপ্তি, একমাত্র পাওয়া—সাগর। তুমি নদীর কথা ভাবো, শেকড় খুঁজে পাবে। তুমি বরং সাগরের কথা ভাবো, দেখো ফুল ফুটবে।

সান্ত্বনার অঝোর বর্ষণে সে সিক্ত হয়, সিক্ত হয় তার রোগক্লান্ত শরীর। সে কেঁদে যায়। এ সান্ত্বনা তার কাছে অর্থহীন কারণ তার কাছে একটাই জীবন ছিল। সে ক্রমাগত সরে আসতে চায় মায়ের কাছে। সন্ধ্যাবেলায় গা ধুয়ে আসবার পর মায়ের গায়ে থাকত পাউডারের গন্ধ, ওটাকেই সে জানত মায়ের গন্ধ বলে। জ্বর হলে প্রতিদিন এই গন্ধটাই ছিল তার পরম পাওনা। মাটিতে নাক ঠেকিয়ে সে এবার সেই গন্ধ খুঁজে পায়। তার চেতনায় এই মুহূর্তে কোনো বইয়ের দোকানের কাউন্টার নেই, তিশি বলে কেউ নেই—সে শুধু অনুভব করে তার মাকে। বহু দিন পর, বাবা মারা যাওয়ার পর, সে এই প্রথম মায়ের কপালে দেখতে পায় স্নিগ্ধ সিঁদুরের ফোঁটা। সে ভাবে একবার মাকে জিজ্ঞাসা করবে—মা তাকে বেশি ভালবাসে, না ছোটকে বেশি ভালবাসে। আর তারপর মুহূর্তেই নিজের ছেলেমানুষির জন্য তার নিজেরই হাসি পায়।

এর মধ্যে কখন জানি আকাশের রং পাল্টে গেছে। পুব দিকটা ঘন কালো থেকে আস্তে আস্তে ঘন নীল হয়ে আসছে।

কত দিন সে ঘুমোয়নি। তার বহু যুগের ঘুম পাওনা। একটানা যুদ্ধে সে ক্লান্ত।

সে শুধু অস্ফুট স্বরে বলে, 'মা ইমন গাও, 'জাগো মোহন প্যারে'।'

ইমনের সুর বেজে ওঠে তার সারা শরীরে, সারা চেতনায়। সে সারা মুখে স্মিত হাসি ছড়িয়ে ইমনকল্যাণ শোনে, তার জীবনের প্রথম রাগ, মায়ের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যা সে কোনোদিনও ঠিক করে গাইতে পারেনি। ইমনের সুরে চাপা পড়ে যায় বাইরে প্রথম ট্রামের আওয়াজ।